Articles on

# ISLAM & INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

Compiled & edited by
**Dr. Ameur Zemmali**

ICRC

REFERENCE

Articles on

# ISLAM & INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

**Compiled & edited by:**
**Dr. Ameur Zemmali**

**Bengali Translation Reviewer**
**Dr. Md. Abu Bakar Siddique**
Professor & Former Chairman, Department of Arabic , University of Dhaka

**Proof-reader**
**Dr. Abu Bakar Muhammad Zakaria**
Associate Professor, Department of Al-Fiqh, Islamic University Kushtia

**With Assistance of:**

**Dr. Maimul Ahsan Khan**
Professor & Former Chairman, Department of Law, University of Dhaka

**Dr. Md. Nizam Uddin**
Professor, Department of Arabic , University of Rajshahi

**Dr. Muhammad Mahbubur Rahman**
Professor, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi

**And all teachers of Department of Islamic studies**
**University of Rajshahi**

**Dr. Abdul Jalil**
Deputy Director, Publication Department, Islamic Foundation, Dhaka

**Sadik Muhammad Yaqub**
Lecturer, Department of Islamic Studies, Bangladesh Islami University

**Publisher**
International Committee of the Red Cross (ICRC)
House 72 Road 18, Block J Banani Dhaka 1213 Bangladesh
Phone: +88 02 8837461, Fax: + 88 02 8837462
Email: dhaka@icrc.org, website: www.icrc.org

**Copyright**
All rights are reserved by International Committee of the Red Cross (ICRC)

**First edition**
Sawal 1437 H, Srabon 1423, August 2016

**Layout, design and print**
Color Horizon

**NB: The opinions expressed in the articles of this book are solely that of the authors.**

# ইসলাম
# ও
# আন্তর্জাতিক মানবিক আইন

## প্রবন্ধ সমগ্র


সংকলন ও গ্রন্থনা

**ড. 'আমের আয-যামালী**

অনুবাদ ও সম্পাদনা

**ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন**

প্রফেসর ও সভাপতি

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়



আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি

ঢাকা, বাংলাদেশ

University of Rajshahi

ICRC

**রিভিউয়ার**

**ড. মো: আবু বকর সিদ্দীক**
প্রফেসর এবং সাবেক চেয়ারম্যান, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

**প্রুফ-সংশোধন**

**ড. আবুবকর মুহাম্মদ যাকারিয়া**
সহযোগী অধ্যাপক, আল-ফিক্‌হ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

**সার্বিক সহযোগিতা**

**ড. মাইমুল আহসান খান**
প্রফেসর এবং সাবেক চেয়ারম্যান, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

**ড. মো: নিজাম উদ্দীন**
প্রফেসর আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

**ড. মুহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান**
প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ও **ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ**

**ড. আবদুল জলিল**
উপ-পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা

**সাদিক মুহাম্মদ ইয়াকুব**
প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

**প্রকাশক**

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি, ঢাকা
বাড়ী ৭২, রোড ১৮, ব্লক জে, বনানী, ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮ ০২ ৮৮৩৭৪৬১, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৮৮৩৭৪৬২
ইমেইল: dhaka@icrc.org, ওয়েব সাইট: www.icrc.org

**গ্রন্থস্বত্ব**

আইসিআরসি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

**প্রথম প্রকাশ**

শাওয়াল ১৪৩৭ হি:, শ্রাবণ ১৪২৩, আগষ্ট ২০১৬

**প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ**

কালার হরাইজোন

**বি:দ্র: উল্লেখ্য যে, গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধসমূহের সকল তথ্য ও বিষয়বস্তুর মতামত ও দায়-দায়িত্ব প্রাবন্ধিকদের।**

# সূচীপত্র

আল-কুরআনের আলোকে মানব মর্যাদা: প্রসঙ্গ জেনেভা কনভেনশন ১৩
- মুহাম্মাদ এরেকসূসী

ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ৩১
- ‘আয়ায ইব্ন আশূর

আন্তর্জাতিক ইসলামিক মানবিক আইন:একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি ৪৭
- প্রফেসর ড. মুহাম্মদ তাল‘আত আল-গুনায়মী

ইমাম আল-আওযা‘ঈ ও তাঁর মানবিক চিন্তাধারা ১০৭
- ড. ‘আমের আয-যামালী

ইসলাম ও প্রচলিত আইনের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ১২১
- ড. মুহাম্মদ সা‘ঈদ আদ্-দাক্কাক

আন্তর্জাতিক ইসলামী আইনে মানবিকতার ধারণা ১৩৯
- ড. ইমানুয়েল স্ট্যাভরাকি

ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে যুদ্ধবন্দিদের মানবাধিকার ১৬৭
- ড. ‘আব্দুস্ সালাম মুহাম্মদ শরীফ

সশস্ত্র সংঘর্ষে যোদ্ধা ও আক্রান্তদের অধিকার:
আরবীয়-ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ১৮৯
- কর্নেল (অব) সাইয়েদ হাশিম

ইসলামী শরী‘আত ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে
যুদ্ধাক্রান্তদের সুরক্ষা ২১১
- কর্নেল আহমাদ ‘আলী আল-আনওয়ার

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে ধর্ম, নৈতিকতা ও সংস্কৃতির প্রভাব ২৩৭
- ড. ইহ্সান হিন্দী

**ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের দৃষ্টিতে যুদ্ধ বিষয়ক কার্যক্রমের প্রক্রিয়াগত কতিপয় মূলনীতি** ২৫৫
- ড. ‘আমের আয-যামালী

**ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনঃ সভ্যতার সংঘাত থেকে সংলাপ** ২৬৭
- জেম্‌স কোকেন

**ইসলামে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন** ৩০৫
- ড. জা‘ফর ‘আব্দুস সালাম

**ইসলামী শরী‘আত ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে যুদ্ধাক্রান্ত জনগণের সুরক্ষা** ৩৫৭
- প্রফেসর ড. ওয়াহ্‌বাহ্‌ আয-যুহায়লী

**ইসলামী শরী‘আহ্‌ আইনের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন** ৩৮৫
- ব্রিগেডিয়ার উসামা দামাজ

# ভূমিকা

যুদ্ধে আক্রান্তদের সুরক্ষা সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধগুলো নিয়ে এ সংকলন। অন্য কোনো শিরোনামেও এর নামকরণ করা যেতো। তবে আমরা সংক্ষেপে *মাকালাত ফীল কানূন আদ্-দাওলী আল-ইনসানী ওয়াল ইসলাম* শিরোনামকে সংকলনটির নাম হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছি, যাতে বিজ্ঞ পাঠক  বুঝতে সক্ষম হন যে, এ তুলনামূলক আলোচনাটি কেবল সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও সম্পদ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিধি-বিধানের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কারণ আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের শাখাসমূহের একটি ক্ষুদ্র শাখার সাথে ইসলামের ফিক্হ ও সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা সম্বলিত বিধি-বিধানের তুলনামূলক আলোচনা নিতান্তই অযৌক্তিক। উল্লেখ্য *আন্তর্জাতিক মানবিক আইন* একটি আধুনিক পরিভাষা, যা ইতোপূর্বে প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইনে *যুদ্ধ আইন* বা পরবর্তীতে *সশস্ত্র সংঘাত সম্পর্কিত আইন* নামে পরিচিত ছিল। এ দু'টি পরিভাষার ব্যবহার  আজও প্রচলিত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয় অবলম্বনে রচিত বিশেষ গ্রন্থরাজি, আইনী দলীল দস্তাবেজ ও মিডিয়াগুলোতে এ আইনের যে পরিভাষা-ই ব্যবহৃত হোক না কেন, এটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, *আন্তর্জাতিক মানবিক আইন* বলতে *সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনের* সে শাখাটিকেই বুঝায়, যা বেশ কিছু প্রচলিত বিধি-বিধান ও চুক্তি দ্বারা গঠিত হয়েছে। সশস্ত্র সংঘর্ষে বিশেষ শ্রেণির জনগণ ও সম্পদের সুরক্ষা প্রদান করা এবং যুদ্ধে বিভিন্ন পক্ষের জন্য যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ করাই হলো এ আইনের অভীষ্ট লক্ষ্য।

আমরা জানি যে, ইসলামের ফকীহ্গণ প্রাথমিক যুগ থেকেই আল-কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে জিহাদ ও সিয়ারের অধ্যায়সমূহে যুদ্ধ সংক্রান্ত বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তুলনামূলক পদ্ধতিতে বিভিন্ন ভাষায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে তা আমাদের অজানা নয়। এসব রচনা থেকে আমরা কেবল আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত প্রবন্ধমালা এ সংকলনে স্থান দিয়েছি (এছাড়া অন্যান্য সংস্থার সাথে যৌথভাবে প্রকাশিত যে সব নিবন্ধ এতে স্থান পেয়েছে, সেগুলোর উৎসও যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।) এর কারণগুলো আমরা সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরছি:

যুদ্ধকালীন মানুষের সাথে আচরণ সংক্রান্ত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনার সুযোগ উন্মুক্ত করার বিষয়ে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির আকাঙ্খা ও আগ্রহ থেকে বুঝা যায় যে, ১৮৬৩ সালে সুইজারল্যান্ডে যুদ্ধাক্রান্ত মানবতার কষ্ট লাঘব এবং

যুদ্ধের বিভীষিকা ও ধ্বংসযজ্ঞ সীমিত করার লক্ষ্যে এ সংস্থা গঠিত হয়েছিল। সংস্থাটি মানুষের সুরক্ষা ও তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে ইসলামী নীতিমালার মূল্য যথার্থরূপেই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল। বিশেষ করে সেসব অবস্থায় যখন লোকদেরকে যুদ্ধের বিভীষিকা ও ধ্বংসযজ্ঞ থেকে দূরে রাখার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

যুদ্ধে আক্রান্ত লোকদের সুরক্ষার জন্য ১৯৪৯ সালে *চতুর্থ জেনেভা কনভেনশন স্মারক* সম্পাদনের পর থেকেই আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি, তার '*আন্তর্জাতিক রেড ক্রস জার্নাল*' নামে গবেষণা পত্রিকার মাধ্যমে উক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লেখার জন্য বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদেরকে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করেছে। ফলশ্রুতিতে ১৯৫২ সালে উক্ত জার্নালের মার্চ ও জুন সংখ্যা দু'টিতে খ্যাতিমান মিসরীয় পণ্ডিত ড. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ দারায- এর '*আল-কানূনুদ্-দাওলী আল-'আম ওয়াল ইসলাম*' এবং ফরাসী প্রাচ্যবিদ লুই ম্যাসিনিওন- এর '*ইহ্তিরামুশ-শাখ্স আল-ইনসানী ফীল ইসলাম ওয়া আওলাওয়িয়্যাতু হাক্কিল ইজারাতি 'আলা ওয়াাজিবিল হারবিল 'আদিলাহ*' শিরোনামে দু'টি নিবন্ধ ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস জার্নাল আরবী ভাষায় প্রকাশের পূর্বে (যা ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ত্রৈমাসিক এবং ১৯৯৯ সাল থেকে বাৎসরিক জার্নাল হিসেবে প্রকাশিত হয়) আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি এ গবেষণা পত্রিকাটির বেশ কিছু লেখার আরবী অনুবাদ প্রকাশ করে। তন্মধ্যে অন্যতম প্রবন্ধ ছিল মরহুম এরেকসূসীর, যা আমরা পাঠকদের জন্য এ সংকলনের প্রথম লেখা হিসেবে উপস্থাপন করব। এছাড়া উক্ত অনুবাদকৃত লেখাগুলোর মধ্যে আরো ছিল তিউনিসিয়ান আইনবিদ অধ্যাপক 'আয়ায ইবন আশূর-এর লেখাটি, যা আমাদের এ সংকলনের দ্বিতীয় লেখা।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি আরব পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। ফলে গত আশির দশকের শেষভাগে এমন সময়ে উক্ত জার্নালটি আরবী ভাষায় প্রকাশিত হয়, যখন অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা আরবী ভাষাকে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং যখন পূর্বোক্ত জেনেভা চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট ১৯৭৭ সালে গৃহীত দু'টি এডিশনাল প্রটোকল পৃথিবীর অন্যান্য পাঁচটি ভাষার সাথে আরবী ভাষায়ও অনূদিত হয়।

এ সংকলনে উৎকলিত প্রবন্ধমালা মুসলিম বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের রচনা। তাঁদের অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন। পাশাপাশি এতে পাশ্চাত্যের দু'জন আইনবিদের প্রবন্ধও স্থান পেয়েছে। তাঁদের পরিচয় যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংকলিত প্রবন্ধগুলোতে ইসলামী শরী'আহ্ আইন বিশেষজ্ঞ, আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞ এবং সেনাআইন বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। প্রবন্ধগুচ্ছ সুবিন্যস্ত ও সজ্জায়নের ক্ষেত্রে আমরা প্রকাশের তারিখের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছি। কম্পিউটারে কম্পোজ করার কারণে প্রবন্ধগুলো আমাদের বারবার পড়ার সুযোগ হয়েছে। প্রবন্ধকারদের শ্রম-সাধনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং আমানতের প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রবন্ধের ভাষা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তবে আয়াত ও হাদীসের প্রয়োজনীয় সূত্র উল্লেখ এবং মুদ্রণ-প্রমাদ যথাযথভাবে সংশোধন করা হয়েছে।

কেউ কেউ হয়তো এ প্রশ্ন উত্থাপন করবেন যে, প্রবন্ধগুলো বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর আবার দ্বিতীয়বার সেগুলোকে একত্রে প্রকাশের কী যৌক্তিকতা রয়েছে? অপর দিকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বিষয়ে আধুনিক গবেষণার এত অগ্রগতি ও উন্নতি হয়েছে যে, এগুলো পুনরায় প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আছে কি? এর জবাবে আমরা বলব, এতে সংকলিত প্রবন্ধমালার গুণগতমান বিষয়বস্তুতেই নিহিত, তার বাহ্যিক ভাষ্যে নয়। প্রায় চৌদ্দশ' বছর পূর্বে ইসলামী শরী'আতের অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। আর উনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মূলনীতি প্রণীত হয়। কিন্তু তারপরও এ দুটি শাস্ত্রের মৌলিক নীতিমালা ও বিধি-বিধান তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। আমরা এ সংকলনের মাধ্যমে যুদ্ধে আক্রান্তদের সুরক্ষাদান বিষয়ে গবেষণালব্ধ ফল সহজ-সরলভাবে আরব পাঠকদের সমীপে উপস্থাপন করতে চেয়েছি; যাতে করে তা গবেষক ও অন্যান্যদের নাগালের মধ্যে থাকতে পারে। আর এর মাধ্যমে তারা তাদের গবেষণা ও পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য আরো বেশি জানার প্রয়াস পায়। আশা করি সংকলিত নিবন্ধসমূহের মূল ভাষ্য কিংবা পাদটীকায় প্রবন্ধকারগণ যে সকল সূত্র ও উৎসের উল্লেখ করেছেন, তা এ বিষয়ে গবেষণা ও জ্ঞান অর্জনে উৎসাহ যোগাবে, যা আজ সময়ের দাবি। বিশেষ করে এটি বিভিন্ন জাতির মধ্যে সংঘাত বা অভ্যন্তরীণ চলমান দ্বন্দ্ব নিরসনে পাঠককে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করবে।

এ প্রবন্ধগুলো এমন এক সময়ে সংকলিত হচ্ছে যখন দুটি প্রবণতা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে: প্রথমত: নিঃশেষ প্রবণতা, যা তথ্য প্রযুক্তির যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ যুগে চলছে মুদ্রিত গ্রন্থ এবং ইন্টারনেটে প্রাপ্ত বিস্তৃত তথ্যের মাঝে প্রবল প্রতিযোগিতা। শক্তিশালী ও দুর্বল তথ্যসূত্রের তরঙ্গে গবেষকগণ আজ প্রচEভাবে তরঙ্গায়িত ও দুদোল্যমানতায় নিমজ্জিত। যাদের এ বিষয়ের অভিজ্ঞতা নেই, তাদের পক্ষে এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব।

সংকলনটির সব প্রবন্ধ ইন্টারনেটে পাওয়া যায় না। সুতরাং আমরা আশা করব যে, এ প্রবন্ধগুলো পুনরায় একটি গ্রন্থে প্রকাশের মাধ্যমে তুলনামূলক গবেষণা বিষয়ে পাঠকদের উপকার হবে।

*সভ্যতার সংঘাত* বিষয়ে উত্তপ্ত বক্তৃতা, তার সাথে সম্পৃক্ত ইসলাম ও পাশ্চাত্যের সম্পর্ক নিয়ে টানাপড়েন, *সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ* নামক পতাকা উত্তোলন, কখনো কখনো তা এমন সব অস্ত্র ও কৌশল প্রয়োগ করছে, যা সকল সভ্যতা ও মানবতার ঐকমত্য পোষণ করা এবং সকল মানুষের যৌথ উৎস হিসেবে পরিগণিত মানবাধিকার বিষয়ক প্রণীত নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক।

সংকলিত প্রবন্ধগুলোর বিষয়বস্তু দ্বিধাহীনভাবে নিশ্চিত করছে যে, মুসলিমরা তাঁদের বিশ্বাস, বিধি-বিধান ও ব্যবহারসহ সকল আচরণে বিশ্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ ধারণ করে থাকে।

উপরন্তু মানবিক কার্যক্রম ও এর মূলনীতি এবং চিন্তা ও দর্শনের ক্ষেত্রে এতদসম্পর্কিত সকল পক্ষের সাথে সংলাপের পথ প্রশস্ত ও সুদৃঢ় করার জন্য মুসলিম বিশ্ব এবং এর বাইরে বিশাল পরিমণ্ডলে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির যে সকল কার্যক্রম ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেসব প্রচেষ্টার দিকে ইঙ্গিত করা প্রয়োজন। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে এ সংস্থা অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গিতেই সামনে অগ্রসর হচ্ছে। আজ তাদের এ ধরনের কার্যক্রম আরো যে অনেক বেশি প্রয়োজন, তা গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে। এ প্রচেষ্টাকে আরো বেশি শক্তিশালী করা এবং সময়ের তালে সংস্থাটির চলার পথকে সুসংহত করতে খ্যাতিমান মুসলিম পন্ডিতগণ গ্রন্থ রচনা এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

এ সংস্থার মাঠ পর্যায়ে কর্মরত প্রতিনিধিগণ মানবিক কর্মকাণ্ড এবং মানবিক আইনের গুরুত্ব ও কার্যক্রম জোরদার করার জন্য গবেষকদেরকে বিভিন্ন ভাষায় বিশেষ করে আরবীতে সুনির্দিষ্ট বিষয়ের গ্রন্থ রচনা ও লেখনি দ্বারা সমৃদ্ধ করার দাবি উত্থাপন করে আসছেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, এ সংকলন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমৃদ্ধ গবেষণার প্রতি মুসলিম বিশ্বের উৎসুক ব্যক্তি ও সংস্থার প্রবল চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে। এর মাধ্যমে তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলামী শরী‘আতের বিধি-বিধান ও আধুনিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিধি-বিধান সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।

পরিশেষে আমরা পাঠকবৃন্দ, জেনেভায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির কার্যালয়ের সহকর্মীবৃন্দ, আরব বিশ্বের প্রতিনিধি দলসমূহ এবং কায়রোতে

অবস্থিত সংস্থাটির গণমাধ্যম কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সাথে সাথে কায়রোর গণমাধ্যম কার্যালয়ের নারী কর্মকর্তাবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, তারা যদি সময় ও শ্রম ব্যয় না করতেন তাহলে গ্রন্থটি আজ পাঠকদের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হতো না। ভাষায় তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কঠিন। আমাদের ও পাঠকদের পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ্ তাদেরকে উত্তম প্রতিদানে অভিষিক্ত করুন।

আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সকল প্রবন্ধকারের প্রতি। তাঁদের মধ্যে যারা এ নশ্বর সৃষ্টিলোক থেকে মৃত্যু যবনিকার ওপারে অবস্থান করছেন, তাদের উপর বর্ষিত হোক রহমতের বারিধারা। আমরা পাঠকবৃন্দের কাছে সন্তুষ্টির দৃষ্টি প্রত্যাশা করছি। সন্তুষ্টির নয়ন ভুল-ত্রুটি নির্ণয়ে অক্ষম। পরিশেষে আমরা যে বাক্য দিয়ে ইতি টানছি সে বাক্যের চেয়ে আর উত্তম ও সমৃদ্ধ বাক্য কী হতে পারে?

﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾

'যা ফেনা তা উড়ে যায়, আর যা মানুষের উপকারী তা মাটিতে রয়ে যায়।' [সূরাহ্ আর-রা'দ : **১৭**]

**'আমের আয্-যামালী**

২৭. ০৩. ২০০৭

# আল-কুরআনের আলোকে মানব মর্যাদা: প্রসঙ্গ জেনেভা কনভেনশন*

**মুহাম্মাদ এরেকসূসী****

## ভূমিকা

প্রত্যেক নবীর ভাষায় অবতীর্ণ আসমানী ধর্মগ্রন্থ মানব মনে যে ভিত্তি বদ্ধমূল করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক জেনেভা কনভেনশন সেটির উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগ্রহে অন্য সকল সৃষ্টি থেকে মানুষকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন, যে মর্যাদাকে আমরা '*মানব মর্যাদা*' নামে আখ্যায়িত করে থাকি। আল-কুরআন বিভিন্ন উপলক্ষ্যে মানব মর্যাদার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে এবং প্রকাশ্যে এর সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা *সূরাহ্ আত-তীনে* জোরদার শপথ করার পর বিষয়টির উল্লেখ করে বলেন,

﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. وَطُورِ سِينِينَ. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾

'শপথ তীন ও যায়তূন-এর। শপথ সিনাই পাহাড়ের এবং শপথ এ নিরাপদ নগরীর, আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে।[১]' এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾

---

* জেনেভা ইসলামী সংস্থায় সাবেক ইমাম অধ্যাপক মুহাম্মাদ এরেকসূসীর কাছ থেকে ''আল-কুরআনুল কারীম ও জেনেভা কনভেনশনের আলোকে মানব মর্যাদা'' শীর্ষক গবেষণা নিবন্ধ আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির গবেষণা পত্রিকা ও প্রকাশনা বিভাগের হস্তগত হয়েছে। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি আনন্দের সাথে তা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে, যাতে সকলেই এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। ১৯৭৩ সালে নিবন্ধটি ছাপা হয়। উল্লেখ্য যে, আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (আইসিআরসি) পক্ষপাতহীন, নিরেপেক্ষ ও স্বাধীন একটি সংস্থা যার বিশেষ মানবিক লক্ষ্য হলো সশস্ত্র সংঘাত ও অন্যান্য সহিংসতাজনিত ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জীবন ও আত্মমর্যাদা রক্ষা করা এবং তাদেরকে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করা।

** সাবেক ইমাম, জেনেভা ইসলামী সংস্থা। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি, জেনেভা, সুইজারল্যান্ড, ১৯৮৬।

*** আল কুরআন সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ। এ মহাগ্রন্থের সাথে কোন বস্তুই তুলনীয় নয়। এ দিক লক্ষ্য করে প্রবন্ধে উপস্থাপিত আলোচনার সাথে সঙ্গতি রেখে এর মূল শিরোনাম কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে।

* নিবন্ধটি আরবী থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন ড. আব্দুল জলীল, যা আইসিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। পৃ. ১০-২৭- প্রকাশক।

১ সূরাহ্ আত-তীন: ৪।

‘আর অবশ্যই আমরা আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে আমরা তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং আমরা যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের উপর এদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।[২]’

ফিরিশতাগণ নূরানী সত্তা। তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য ও দায়িত্ব পালনে এক উন্নত আদর্শ। এতদসত্ত্বেও আল-কুরআন গুরুত্বের সাথে ঘোষণা দিয়েছে যে, তাদের তুলনায় মানব জাতির সম্মান ও মর্যাদা উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। এর বড় প্রমাণ হলো, আল-কুরআন যখনই আদম সৃষ্টির প্রসঙ্গ আলোচনা করেছে তখনই ফিরিশতার উপর তার মর্যাদার বিষয়টি উত্থাপন করতে গিয়ে উল্লেখ করেছে যে, ফিরিশতাদেরকে দিয়ে তাঁকে *সাজদাহ্* করানো হয়েছে। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া হিসেবে প্রদত্ত এ সম্মান বহু আয়াতে বিধৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ *সূরাহ্ আল-আ‘রাফের* বর্ণনাটি আমাদের জন্য যথেষ্ট। সেখানে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ﴾

‘আর অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে আকৃতি প্রদান করেছি, এরপর ফিরিশতাদেরকে বলেছিলাম আদমকে সাজদাহ্ করতে; ফলে ইবলীস ছাড়া সকলেই সাজদাহ্ করেছিল। সে সাজদাহ্কারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না[৩]।

মানব মর্যাদা বর্ণনায় আল-কুরআন সাথে জেনেভা কনভেনশন ঐকমত্য পোষণ করেছে। কারণ আল-কুরআন এ মর্যাদাকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের স্থান হিসেবে গ্রহণ করা আবশ্যক করে দিয়েছে। এ মর্যাদা রক্ষার তাগিদে মহান আল্লাহ কর্তৃক জান্নাত থেকে ইবলীসের বহিষ্কার ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইবলীস কর্তৃক মানব মর্যাদাকে অস্বীকার করা এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন না করা ছিল জান্নাত থেকে ইবলীসের বহিষ্কারের কারণ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ * قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾

---

[২] সূরাহ্ ইসরা: ৭০।

[৩] সূরাহ্ আল-আর‘রাফ: ১১।

'তিনি বললেন, আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কীসে তোমাকে নিবৃত্ত করল যে, তুমি

সাজদাহ্ করলে না? সে বললো, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছ এবং তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছ। তিনি বললেন, 'এখান থেকে নেমে যাও, এখানে অহংকার করবে-এটি হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও, নিশ্চয় তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত।[৪]'

মানব মর্যাদার অস্বীকৃতি যখন মহান আল্লাহর রহমত থেকে বহিষ্কারের কারণ ঘটায় তখন মু'মিনদের মধ্যে কে নিজে ইচ্ছাকৃতভাবে মহান আল্লাহর রহমত থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার ধৃষ্টতা দেখাবে? মানব মর্যাদা অস্বীকার করা এমন একটি বিষয় যাতে ইবলীস ছাড়া আর কেউ সন্তুষ্ট হয় না। সুতরাং কে নিজে ইবলীস হতে সন্তুষ্টি বোধ করবে?

আল-কুরআন শুধু মানব মর্যাদাকে মূলনীতিরূপে গ্রহণ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং এর সংরক্ষণের জন্য মানুষের উপর কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করেছে। জেনেভা কনভেনশন আল-কুরআনের এ নীতি অনুসরণ করেছে বলে প্রতীয়মান হয়। এ দায়িত্ব ও কর্তব্যকে সংক্ষেপে দু'ভাগে ভাগ করা যায়:

**প্রথম:** ব্যক্তি সত্তার মর্যাদা তথা একজন মানুষের ব্যক্তিগত সম্মান- মর্যাদা রক্ষা এবং ভুলুণ্ঠিত হওয়া থেকে তাকে সংরক্ষণের দায়িত্ব।

**দ্বিতীয়:** অন্য ব্যক্তিদের মর্যাদা রক্ষার জন্য একজন মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

## প্রথম: ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা

কোনো মু'মিনের জন্য তার সৃষ্টিকর্তাকে ছাড়া অন্য কাউকে সাজদাহ্ করা বৈধ নয়। তাই সে সূর্য, চন্দ্র ও কোনো মূর্তির প্রতি অবনত হবে না। কোনো মানুষকে সে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করবে না। সে তার প্রতিটি কর্মে নিজের উপর নির্ভর করে যথাযথভাবে উপায়-উপকরণসমূহ ব্যবহার করবে এবং ফলাফলের ব্যাপারে তার সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভর করবে। এটিই ইসলামের বিধান। এমনিভাবে স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব করা কোনো মু'মিনের জন্য বৈধ নয়, না শান্তিকালীন আর না যুদ্ধাবস্থায়। সে পানাহার ও বেশ-ভূষায় অপচয় করবে না; বরং তার মর্যাদার দাবি হলো, সব সময়ই সে স্মরণ রাখবে যে, তার ছোট-বড় সকল কর্মের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। এটিই হলো শেষ দিবসের

[৪] সূরাহ্ আল-আর'রাফ: ১২-১৩।

প্রতি বিশ্বাসের মর্মকথা, যা একজন মু'মিনকে স্বীয় মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তে সৎ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এটি উন্নত মানবতার পরিচায়ক। মু'মিনের কর্তব্য হলো এ মর্যাদা ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহের কথা মানুষকে অবগত করানো, যাতে ব্যাপক জনগোষ্ঠী সচেতন হয়ে উক্ত মর্যাদা সংরক্ষণ এবং তা প্রচার-প্রসারে ভুমিকা রাখতে পারে। এসবের সাথে আরো একটি বিষয় সংযোজন করা প্রয়োজন যে, মু'মিন কোনো সমস্যায় নিপতিত হয়ে অথবা বিপদগ্রস্ত হয়ে হা-হুতাশ করবে না; বরং ধৈর্য ধারণ করবে। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তার এ বিপদ দূরীভূত না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোনরূপ শারীরিক ক্লেশ বা মানসিক দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবে না। আল-কুরআনে সূরাহ্ আল-আসরে এ কথার-ই সারসংক্ষেপ উপস্থাপিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

'সময়ের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে, সৎ কর্ম করে, পরস্পরকে সত্য গ্রহণের উপদেশ দেয় এবং একে অপরকে ধৈর্য অবলম্বনের উপদেশ প্রদান করে।'[৫]

জেনেভা কনভেনশন পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং সৎকর্মের প্রতি আহ্বান করে, এর বাইরে কিছু নয়।

## দ্বিতীয়ঃ অন্যের মর্যাদা

জেনেভা কনভেনশন যেহেতু একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি যার অধিকাংশ নীতি ব্যক্তির উপর অন্যের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় করণীয় নির্দেশ করে সেহেতু আমরা বলতে পারি যে, আল-কুরআন অন্যের সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের বিষয়ে যে শিক্ষা উপস্থাপন করেছে জেনেভা কনভেনশন সেগুলোর অধিকাংশের সাথে সামঞ্জস্যশীল। যেমন,

### সাম্য সংরক্ষণ

অন্যের সম্মান রক্ষার্থে ব্যক্তির উপর আপতিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের প্রথমটি হচ্ছে, সকল মানুষের জন্য সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে একই নীতি ও মানদ স্থাপন

[৫] সূরাহ্ আল-আসর: ১-৩।

করা। আল-কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এটিই ঘোষণা দিয়েছে। জেনেভা কনভেনশনও এরূপ সাম্য সংরক্ষণের ঘোষণা দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আহত ও অসুস্থ ব্যক্তিগণের চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে জেনেভা কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১২-তে বলা হয়েছে, ''*সশস্ত্র ও নিরস্ত্র জনগণ, যাদের কথা পরবর্তী অনুচ্ছেদে আসছে, নির্বিশেষে সকল আহত ও রোগক্লিষ্ট লোকদের সর্বাবস্থায় মর্যাদা রক্ষা করতে হবে এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। আর বিবাদমান গোষ্ঠীগুলোর উপর দায়িত্ব হবে, যারা তাদের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রানাধীনে আসবে তাদের সাথে মানবিক আচরণ করা এবং লিঙ্গ, বর্ণ, জাতীয়তা, ধর্ম, বা রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতার ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তির সাথে বৈষম্য না করে সকলের প্রতি সমান গুরুত্ব প্রদান করা।*'

আল-কুরআন সাম্যের এ বিষয়টির উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করে বলেছে,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

'হে মানব মণ্ডলী! তোমরা তোমাদের সে রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকেই সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন, আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত নারী ও পুরুষ। আর সে আল্লাহর ব্যাপারে সদা সচেতন থাকো, যার নামে তোমরা একে অন্যের কাছে যাচঞা করে থাকো এবং আত্মীয়দের ব্যাপারে সতকর্তা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন।'[৬]

সাম্য যে ইসলামের এক উল্লেখযোগ্য নীতি সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অকাট্যভাবে প্রমাণিত নির্ভরযোগ্য অনেক হাদীস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেন,

يأيها الناس ! إن إلهكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب، وليس لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى

'হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের ইলাহ বা উপাস্য এক। তোমরা প্রত্যেকেই এক আদম থেকে সৃষ্ট হয়েছ, আর আদম সৃষ্ট হয়েছেন মাটি থেকে। তাকওয়ার ভিত্তি ছাড়া কোনো অনারবের উপর আরব এবং কোনো আরবের উপর অনারব, কোনো কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গ এবং কোনো শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের বিশেষ কোনো মর্যাদা নেই।'

---

৬ সূরাহ্ আন-নিসা : ১।

তিনি আরো বলেন,

الناس سواسية كأسنان المشط

'মানুষ চিরুনীর দাঁতের ন্যায় সবাই সমান।'

এ ধরনের আরো বহু হাদীস রয়েছে যেগুলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মতো একজন বিশ্ব নবীর মুখ হতে নিঃসৃত, যিনি কখনো মনগড়া কথা বলেন নি। তাঁর এ সব বাণী থেকে এটিই গুরুত্বের সাথে প্রতিভাত হয় যে, ইসলাম মানব মর্যাদার জন্য আল-কুরআন ও সুন্নাহ্র মাধ্যমে সকল মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছে; তাদের বাসস্থান, জাতি ও বর্ণ যত পৃথকই হোক না কেন। এ মর্মে আল-কুরআন বিভিন্ন রাসূলের উম্মতদের সম্পর্কে উল্লেখ করেছে যে, মানব মর্যাদার দিক থেকে তারা সবাই সমান। তাই রাসূলগণকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে,

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ * وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾

'হে রাসূলবৃন্দ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার কর এবং সৎকাজ কর। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আমি অবহিত। আর তোমাদের এ জাতি তো একই জাতি এবং আমি-ই তোমাদের রব, অতএব আমাকে ভয় কর।[৭]'

আমরা দেখতে পাই যে, আল-কুরআন মানবিক আচার-আচরণের ক্ষেত্রে সাম্যের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে; বিশেষ করে সে সব লোকের ক্ষেত্রে সাম্য বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছে যারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। জেনেভা কনভেনশনেও সাম্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে। যেমন এ কনভেনশন ৩ –এর সাধারণ ধারাতে বলা হয়েছে যে, সশস্ত্র যুদ্ধ, যা আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করে না, তাতে প্রত্যেক পক্ষের উচিৎ ন্যূনপক্ষে নিম্নোক্ত বিধানগুলোর উপর ঐকমত্য পোষণ করা:

'যে সব ব্যক্তি আক্রমণাত্মক কর্মকাণ্ডে সরাসরি অংশগ্রহণ করবে না, এমনকি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মধ্য থেকেও যাদেরকে অসুস্থতা, আহত হওয়া, বন্দি হওয়া বা অন্য যে কোনো কারণে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা হয়, সর্বাবস্থায় তাদের সাথে মানবিক আচরণ করতে হবে। ধর্ম, বর্ণ, বিশ্বাস, লিঙ্গ, বংশ, অথবা সম্পদ কিংবা অনুরূপ কারণে এ আচরণে কোনো রূপ ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না।'

[৭] সূরাহ্ আল-মু'মিনূন : ৫১-৫২।

মানব মর্যাদায় সমতা রক্ষার মূলনীতির ভিত্তিতে আল-কুরআন ফির'আউন কর্তৃক তার লোকজনকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা, অতঃপর স্বগোত্রকে সম্মান দান করা এবং অন্য পক্ষকে হীনবল করার নীতিকে ভর্ৎসনা করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾

'ফির'আউন পৃথিবীতে পরাক্রম দেখিয়েছে। সে সেখানকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে তাদের এক শ্রেণিকে হীনবল করেছিল; তাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করতো এবং নারীদেরকে জীবিত রাখতো। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'[৮]

অতএব আল-কুরআন মর্যাদার ক্ষেত্রে সব মানুষের মধ্যে সমতা বিধানের স্বীকৃতি না দেয়াকে ফির'আউনী চরিত্রের কাজ বলে সাব্যস্ত করেছে। যার কারণে ফির'আউন বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত হয়েছে।

স্বভাবতই মর্যাদার ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো, মানুষের পারস্পরিক আচার-আচরণে সমতার প্রভাব পরিদৃষ্ট হওয়া। আর সে আচার-আচরণ হওয়া বাঞ্ছনীয় পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে। আল-কুরআন সে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রকাশার্থে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরে এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে এবং অন্যের সম্মানহানীকর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾

'হে মুমিনগণ! কোনো পুরুষ যেন অন্য কোনো পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অন্য কোনো নারীকে যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অন্যকে মন্দ নামে ডেকো

[৮] সূরাহ্ আল-কাসাস: ৪।

না; ঈমানের পর মন্দ নাম খুবই খারাপ। আর যারা তওবা না করে তারাই জালিম। হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে দূরে থাকো; কারণ কোনো কোনো অনুমান পাপ। আর তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অন্যের পেছনে নিন্দা করো না, তোমাদের মধ্যে কী কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত: তোমরা তো একে ঘৃণ্য মনে করো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।'[৯]

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এ আয়াতসহ আরো যে সব আয়াত আছে, তা আমাদেরকে যুদ্ধবন্দিদের সাথে সদাচরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে জেনেভা কনভেনশনের ৩ –এর ৯২ নং ধারাতে বলা হয়েছে, *'যে যুদ্ধবন্দি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে কিন্তু পালিয়ে যেতে সক্ষম হওয়ার পূর্বেই ধৃত হবে তাকে এ কাজের ফলে কেবল শিক্ষামূলক শাস্তি দেয়া হবে। এমনকি পলায়ন করে পুনরায় ফিরে আসার ক্ষেত্রেও এই একই শাস্তি প্রযোজ্য হবে।' এ কাজের ফলে কেবল শিক্ষামূলক শাস্তি দেয়া হবে।* এ ঘোষণার দ্বারা এ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য সব রকমের ধারণা ও অপবাদ দূর করে দেয়া হয়েছে।

একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন কুরাইশ নেতার সাথে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। এসময় এক অন্ধ এসে তাঁর কাছে আল-কুরআন সম্পর্কে কিছু জানতে চাইল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশংকা করলেন যে, তিনি যদি অন্ধের প্রতি মনোযোগ দেন, তাহলে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ দূরে সরে যাবেন, যাদের ইসলাম গ্রহণের জন্য তিনি আকাঙ্খা করছিলেন। তাই তিনি অন্ধ লোকটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তাঁর এ আচরণের জন্য তাঁকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করে কুরআনুল কারীমের আয়াত নাযিল হয়। যদিও তিনি অন্ধের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রদর্শন করেন নি; বরং তিনি আশংকা করেছিলেন যে, কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সামনে তিনি তাদেরকে রেখে অন্ধের প্রতি মনোযোগ দিলে তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে। এ ঘটনার সাথে সাথেই আয়াত নাযিল করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ধরনের আচরণ করতে নিষেধ করা হয় এবং এ ব্যাপারে তাঁকে উপদেশ দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى * أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى. أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى. فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى* وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى* وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى* وَهُوَ يَخْشَى* فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾

[৯] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ১১-১২।

‘তিনি ভ্রু কুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন, কারণ তাঁর নিকট অন্ধ লোকটি এসেছিল। আপনি কেমন করে জানবেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো, ফলে সে উপদেশ তার কাজে আসতো! পক্ষান্তরে যে পরোয়া করে না, আপনি তার প্রতি মনযোগ দিয়েছেন। অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোনো দায়িত্ব নেই। অপরপক্ষে যে আপনার নিকট ছুটে আসলো, আর সে ভয় করে, আপনি তাকে উপেক্ষা করলেন। কখনো এরূপ করবেন না, এটি উপদেশ বাণী।’[১০]

সর্বশ্রেষ্ঠ মানব আল্লাহর নির্বাচিত ও মনোনীত রাসূলকেই যখন এমন কঠোরভাবে উপদেশ দেয়া হয়েছে, এ জন্য নয় যে, তিনি তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন বা তার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেছিলেন; বরং শুধু এ জন্য যে, অন্ধের প্রতি অমনোযোগী হয়ে তিনি কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে তাদের ইসলাম গ্রহণের আশায় সাময়িক- সুন্দর আচরণ করেছিলেন; তখন আর কে আছে যে, উক্ত অপরাধ ও পাপের কাজ করবে এবং তা থেকে ফিরে না এসে আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার ধারণা করবে?

সুতরাং মুমিনের কর্তব্য হলো অন্যের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় সকলের ক্ষেত্রে সমআচরণ করা। *জেনেভা কনভেনশন* যেখানে শত্রু ও প্রতিপক্ষের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার কথা বলে সেখানে আল-কুরআন মাজীদের মানব মর্যাদা ও সম্মান প্রতিষ্ঠার আয়াতসমূহের পাশাপাশি আমাদের কর্তব্য হচ্ছে প্রতিপক্ষ সম্পর্কিত আল-কুরআনের বিশেষ নির্দেশনা সম্বলিত বর্ণনাসমূহ বাস্তবায়ন করা।

## ২. ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন

প্রতিপক্ষের মানবিক মর্যাদা ও তার সম্মান রক্ষার ন্যূনতম উপযোগী ব্যবহার হচ্ছে, তার সাথে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করা। এ জন্য আল-কুরআন ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বনের নির্দেশ সম্বলিত আয়াতসমূহ আমাদের সামনে বারবার উপস্থাপন করেছে এবং এ কথার তাগিদ দিয়েছে যে, ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা করা অবশ্য কর্তব্য, যদিও তা প্রতিপক্ষের সাথে হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

[১০] সূরাহ্ ‘আবাসা: ১-১১।

‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে, কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনো ন্যায়পরায়ণতা পরিত্যাগ করবে না। ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন কর, এটি তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা করো আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।’[১১]

মানুষ হয়তো বুঝতে পারে যে, প্রতিপক্ষের সাথে ন্যায় বিচার করা বলতে কেবল বুঝায়, দুজন শত্রুর মধ্যে সংঘটিত বিবাদের ন্যায়ানুগ ফয়সালা করা। কুরআনুল কারীমে গুরুত্বের সাথে ঘোষণা করেছে যে, (বিষয়টি শুধু দুজন শত্রুর মাঝে সীমাবদ্ধ নয়) ন্যায় বিচার করা অবশ্য কর্তব্য যদিও এর ফায়সালা মুমিনের বিরুদ্ধে গিয়ে তার শত্রুর পক্ষে যায়, তার নিকটতম আত্মীয়স্বজন, যেমন পিতামাতা বা নিকটতম কোনো লোকের বিরুদ্ধে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

‘হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ। যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক, আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্টতর। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচানো কথা বলো অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তাহলে তোমরা যা করো আল্লাহতো এর সম্যক খবর রাখেন।’[১২]

এমনিভাবে ইসলামের শিক্ষা ও জেনেভা কনভেনশনের নীতিমালা একসূত্রে গ্রথিত। ন্যায় বিচারের দাবি-ই হলো অভিযুক্তকে বিভিন্ন উপায়ে তার আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ প্রদান করা। জেনেভা কনভেনশন ৩ এর ৮৪নং ধারায় এটিই নিশ্চিত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, *যুদ্ধবন্দিকে কোনো অবস্থাতেই এমন আদালতের মাধ্যমে বিচার করা যাবে না, যে আদালতে সাধারণভাবে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তার পক্ষে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার গ্যারান্টি নেই; বিশেষত: সেখানে তার সাথে এমন কোনো কাজ করা যাবে না যাতে জেনেভা কনভেনশন ৩-এর ১০৫ নং ধারা অনুযায়ী*

[১১] সূরাহ্ আল-মায়িদা: ৮।

[১২] সূরাহ্ আন-নিসা: ১৩৫।

*অভিযুক্তের অধিকার ও আত্মপক্ষ সমর্থনের উপায়সমূহ অবলম্বনের সুযোগ না দেয়া হয়।' উক্ত ১০৫ নং ধারায় আরো বলা হয়েছে, 'যুদ্ধবন্দির কোনো সহবন্দির সাহায্য নেয়া, তার মনোনীত যোগ্য আইনজীবীর মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থন করা, সাক্ষী নিয়োগ করা এবং প্রয়োজনবোধে দোভাষীর সাহায্য নেয়ার অধিকার রয়েছে।*

## ৩. প্রতিপক্ষের বিশ্বাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সম্পদ সংরক্ষণ

আল-কুরআন সাম্য ও ন্যায় নীতির পাশাপাশি আরেকটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। তা হলো প্রতিপক্ষের বিশ্বাস ও সম্পদের সংরক্ষণ। আল-কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রতিপক্ষের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্যতম আবশ্যকীয় বিষয় হলো, এর পবিত্র বিষয়গুলোকে অসম্মান না করা। এজন্য মুশরিকরা মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার পূজা করে তাকে গালিগালাজ করতে কুরআনুল কারীম মুমিনদেরকে নিষেধ করেছে। এ নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে আল-কুরআনের যুক্তি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আর তা হলো, মুশরিককে তার বিশ্বাসে আঘাত করার ফলে তা তার জন্য মুমিনের বিশ্বাসে আঘাত করার বৈধতা প্রদান করে। তাই মু'মিন যখন তার নিজের বিশ্বাসের প্রতি সম্মান বজায় রাখতে আগ্রহী, তখন তার উচিত অন্যের বিশ্বাসের প্রতি অসম্মান না করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾

'আর তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। তাহলে তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশত: আল্লাহকে গালি দেবে।'[১৩]

অনুরূপভাবে আল-কুরআন মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস পরিবর্তনের জন্য জোর-জবরদস্তি করতে নিষেধ করেছে। ঘোষিত হয়েছে,

﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾

'দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। সত্যপথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে।'[১৪]

---

[১৩] সূরাহ্ আল-আন'আম:১০৮।

[১৪] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ২৫৬।

ইমাম তাবারী প্রণীত *'তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক'* গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) *আল-কুদস* তথা ফিলিস্তীনবাসীদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিতে নিজের উপর যে শর্ত আরোপ করে নিয়েছিলেন তাতে লেখা ছিল,*'তাদের জান-মাল, গীর্জা, ক্রুশ, ভালো লোক, মন্দ লোক এবং গোটা জাতিকেই নিরাপত্তা প্রদান করা হলো। তাদের গীর্জাসমূহকে বাসগৃহ বানানো যাবে না; ধ্বংসও করা যাবে না, তা থেকে কোনো অংশ কমানো যাবে না, তার আয়তন থেকে কোনো অংশ হ্রাস করাও যাবে না, তাদের ক্রুশ ভাঙ্গা যাবে না, তাদের সম্পদের কোনো ক্ষতি করা যাবে না, তাদের দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি করা যাবে না, এককথায় তাদের কারো কোনোরূপ ক্ষতি করা যাবে না।'*

এ চুক্তিপত্র আমাদেরকে জেনেভা কনভেনশনের বহু ধারার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ধারা নং ৫৩ উল্লেখ করা আমরা যথেষ্ট মনে করছি। সেখানে বলা হয়েছে *'দখলদার কোনো রাষ্ট্রের উপর এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো যে, তারা সেখানকার কোনো ব্যক্তির, দলের, রাষ্ট্রের অথবা কোনো সামাজিক সংগঠনের বা সাহায্যকারী সংস্থার মালামাল, স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বিনষ্ট করবে না। তবে যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্যক্রমের ফলে যদি এ ধরনের ধ্বংস বা বিনষ্টকরণ অবধারিত হয়ে পড়ে তাহলে তা ভিন্ন কথা।'*

## ৪. দয়া ও সদাচরণ

ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, সাম্য, ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বাসের মর্যাদা এবং সম্পদ সংরক্ষণ করা হলো মানব মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সর্বনিম্ন নির্দেশনা। সুতরাং এগুলো বিনষ্ট করা বৈধ নয়। কিন্তু আল-কুরআন এর থেকেও উঁচু স্তরের নির্দেশনা প্রদান করেছে। আল-কুরআনের সাথে জেনেভা কনভেনশন ন্যায় বিচারের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছে। আল-কুরআন এ ব্যাপারে মুমিনদেরকে আরো উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে বিষয়টির উপর এভাবে গুরুত্বারোপ করেছে যে, তারা যেন প্রতিপক্ষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে শুধু ন্যায়বিচারের উপরই সীমাবদ্ধ না থাকে; বরং ন্যায় বিচারের সাথে সাথে সদাচরণ এবং দয়াও যেন প্রাধান্য পায়। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে ঘোষিত হয়েছে,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দিচ্ছেন।'[১৫]

সদাচরণের কয়েকটি স্তর আছে। প্রথম স্তর হলো, প্রতিপক্ষের অপরাধ ক্ষমা করা এবং তাদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত কষ্টের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা। কারণ হয়তোবা মহান আল্লাহ তাদের শত্রুতাকে ভালোবাসায় রূপান্তরিত করে দেবেন। নিম্নলিখিত আয়াতসমূহে এ কথাই ফুটে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ সূরাহ্ আশ্-শূরায় মু'মিনদেরকে ক্ষমার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এভাবে,

﴿وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾

'মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। আর যে ক্ষমা করে দেয় এবং আপোষ-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে। নিশ্চয় তিনি জালিমদেরকে পছন্দ করেন না।'[১৬]

অনুরূপ সূরাহ্ আল-মুমতাহিনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً والله قديرٌ والله غفورٌ رحيمٌ﴾

'যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে সম্ভবতঃ আল্লাহ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।'[১৭]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, উহুদ যুদ্ধে মুশরিকরা যখন তাঁর চাচা হামযা (রা.) ও অন্য শহীদদের নাক-কান কেটে বিকৃতি করে ফেলল তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ যদি তাদের বিরুদ্ধে আমাকে বিজয় দান করেন তাহলে অবশ্যই আমি তারা যে রকম নাক-কান কেটে বিকৃতি করেছে তার দ্বিগুণ তাদেরকে বিকৃত করব।' এমতাবস্থায় কুরআন কারীম নিশ্চুপ থাকে নি; বরং সাথে সাথেই ওহী নাযিল হলো,

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ﴾

'যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তা-ই তো উত্তম।'[১৮]

---

১৫ সূরাহ্ আন-নাহল: ৯০।

১৬ সূরাহ্ আশ-শূরা: ৪০।

১৭ সূরাহ্ আল-মুমতাহিনা: ৭।

১৮ সূরাহ্ আন-নাহ্ল: ১২৬।

এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন; বরং 'আমরা ধৈর্যধারণ করব'। সুতরাং যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্যধারণ করেছেন এবং শত্রুরা তাঁর চাচা ও তাঁর উত্তম সাহাবীগণের প্রতি যে জঘন্য আচরণ করেছিল তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি, তখন অপরাপর মু'মিনের জন্য শত্রুর অপরাধ ক্ষমা করা এবং মহান আল্লাহর রাস্তায় প্রতিপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রচ  আঘাত ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা কতোখানি উচিত, তা সহজেই অনুমেয়। কারণ মু'মিনতো এ আঘাত সে আল্লাহর পথেই পেয়েছে যিনি প্রতিপক্ষ ও বন্ধুর মধ্যে একটি মর্যাদা সমভাবে প্রদান করেছেন, আর তা  হলো মানব মর্যাদা। ইচ্ছা করলে কোনো একদিন মহান আল্লাহ শত্রুকেও বন্ধু বানিয়ে দিতে পারেন। প্রতিপক্ষের মন্দ আচরণের ক্ষেত্রেও যখন তার সাথে সদাচারণ করা একান্ত কর্তব্য তখন কোনো সন্দেহ নেই যে, তার পক্ষ থেকে কোনো রকম মন্দ আচরণ না করা হলে তার প্রতি সদাচারণ করা আরো বেশি কর্তব্য এবং সেটিই উত্তম।

আল-কুরআন আরো একটি নির্দেশ দিয়েছে যা ক্ষমা থেকে আরো উঁচুস্তরের, তা হলো মন্দ আচরণের পরিবর্তে উত্তম আচরণ করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾

'আর ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত করো উৎকৃষ্ট দ্বারা, ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো মতো।'[১৯]

## মূলনীতির বাস্তব প্রয়োগ

আল-কুরআন মানব মর্যাদার যে মূলনীতিসমূহ পেশ করেছে জেনেভা কনভেনশন সেসব মূলনীতির প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেছে। যেমন, মানব মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা এবং এ সম্মান প্রদর্শনের যত শাখা-প্রশাখা রয়েছে, যেমন সাম্য, ন্যায়বিচার, সদাচরণ প্রভৃতি সেগুলো সাধারণ মানুষের সাথে তো বটেই, প্রতিপক্ষের ক্ষেত্রেও প্রদর্শন করা। এসব ক্ষেত্রে আল-কুরআন যে মূলনীতি পেশ করেছে তার সাথেও জেনেভা কনভেনশন একাত্মতা পোষণ করেছে, তা যুদ্ধের সময়ে হোক বা শান্তি ও নিরাপত্তার সময়ে হোক। এখানে উক্ত একাত্মতার কয়েকটি নমূনা তুলে ধরাই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে।

[১৯] সূরাহ্ ফুস্সিলাত: ৩৪।

১. জেনেভা কনভেনশন সে সকল লোককে রক্ষা করার প্রচেষ্টা চালায়, যারা আক্রমণাত্মক কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করে না, বিশেষতঃ স্বাস্থ্যকর্মী, আহত ও অসুস্থ সৈনিক, পানিতে নিমজ্জিত ব্যক্তি এবং যুদ্ধবন্দি অথবা বেসামরিক লোকজন যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না। আল-কুরআন যুদ্ধের জন্য কিছু সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো, যুদ্ধ কেবল তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে যারা যুদ্ধ করে। অতঃপর যখন সেটি তাদের অতিক্রম করে যাবে তখন তা হয়ে যাবে সীমালঙ্ঘন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ﴾

'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালবাসেন না।'[২০]

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা তাঁর সাহাবীদেরকে উপদেশ দিতেন যে, তারা যেন কোনো শিশু, মহিলা বা গীর্জায় উপাসনাকারীদেরকে হত্যা না করে।

২. জেনেভা কনভেনশন রেড ক্রস বা রেড ক্রিসেন্টের আড়ালে আত্মগোপন করে আক্রমণ করা অথবা হাসপাতালের অভ্যন্তরে অবস্থান করে শত্রুর প্রতি কোনো রকম আক্রমণ বা তার ক্ষতি সাধন করতে নিষেধ করেছে। ইসলামের পূর্বে আরবরা হাসপাতাল চিনতো না। তবে তারা কোনো কোনো স্থানে যুদ্ধ করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করতো, যেমন *মসজিদুল হারামে*। আল-কুরআন এ ঐকমত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে এবং তার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। ঘোষিত হয়েছে,

﴿وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾

'আর তোমরা মসজিদুল হারামের কাছে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না, যে পর্যন্ত না তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে।'[২১]

৩. জেনেভা কনভেনশনের দাবি হলো, যুদ্ধবন্দিদের সাথে সুন্দর আচরণ করা। আর আল-কুরআনও (জেনেভা কনভেনশনের বহু বছর পূর্বে) মু'মিনদের থেকে খুবই উঁচুস্তরের সদাচারণ দাবি করেছে। আর তা হলো, মন্দের প্রতিদানে ভালো

২০ সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯০।

২১ সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯১।

আচরণ করা। যুদ্ধবন্দি ক্রীতদাসদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তারা তোমাদের ভাই, তোমাদের সহযোগী। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সুতরাং তাদের কেউ যদি তোমাদের কারো অধীনে থাকে সে যেন নিজে যা আহার করবে তাকেও তা-ই আহার করায় এবং নিজে যা পরিধান করবে তাকেও তা-ই পরিধান করায়। আর তোমরা যেখানে বসবাস করো তাদেরকে সেখানেই বসবাস করতে দাও এবং তাদের উপর তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো কাজ চাপাবে না। আর যদি তাদের উপর সাধ্যের বাইরে কোনো কাজের দায়িত্ব দাও তাহলে তোমরা তাদেরকে সাহায্য করো'। যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সদাচরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا * عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا * يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا * وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾

'নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা পান করবে কাফূর মিশ্রিত পানপাত্র থেকে। এটি একটি ঝরণা, যা থেকে আল্লাহর বান্দারা পান করবে, তারা একে প্রবাহিতও করবে। তারা মানত পূরণ করে এবং সেদিনের ভয় করে যেদিনের বিপদ হবে ব্যাপক। তারা খাবার খাওয়ায় অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দিকে, তার ভালোবাসায়। তারা বলে, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে (এর বিনিময়ে) কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।'[২২]

পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মানব মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার নির্দেশ প্রদান, এমনকি যদি তা প্রতিপক্ষের ক্ষেত্রেও হয়। তবে ইসলাম সেটিকে কেবল আশা-আকাঙ্খার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে নি; বরং বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনার মাধ্যমে তার সত্যতা প্রমাণ করেছে। এর দু-একটি নযীর বা উদাহরণ আমাদের জন্য যথেষ্ট। মানুষের ব্যক্তিগত মর্যাদা যে বিনষ্ট করে অথবা অন্যের সম্মানহানি করে, মুসলিম খলীফা কর্তৃক তার প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার রয়েছে। এমনকি লাঞ্ছিত ব্যক্তি যদি তার রাষ্ট্রের প্রতিপক্ষও হয়। এ কারণে খলীফা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মিসর বিজয়ী 'আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর পুত্রকে ভর্ৎসনা করেছিলেন এ কারণে যে, তার পিতা বিজয়ীর বেশে যে দেশে প্রবেশ

[২২] সূরাহ্ আল-ইনসান বা দাহর: ৫-৯।

করেছিলেন সে দেশেরই একজন নাগরিকের মর্যাদা সে ক্ষুণ্ন করেছিল। ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তা জানতে পেরে সে সন্তানের পিতা ‘আমর ইবনুল ‘আসের (রা) কাছে লিখে পাঠালেন যে, ‘কবে থেকে তোমরা লোকজনকে দাস বানিয়ে নিয়েছ অথচ তাদের মাতা তাদেরকে স্বাধীনরূপে জন্মদান করেছে।’ শীঘ্রই তিনি প্রহৃত কিবতী ও প্রহারকারী আমর তনয়কে ডেকে পাঠালেন এবং কিবতীর হাতে চাবুক তুলে দিয়ে মিসর বিজয়ীর পুত্রকে প্রহার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে বললেন, ‘সম্মানিতদের পুত্রকে প্রহার করো।’ এটিই হলো দুনিয়াতে মানব মর্যাদা ক্ষুণ্নকারীর শাস্তির এক অপূর্ব উদাহরণ। দুর্বল আত্মার অধিকারীদেরকে ধমক দেয়া এবং সতর্ক করার জন্য এটিই যথেষ্ট। আর মু’মিনদের দৃষ্টিতো এর চেয়ে উঁচু পর্যায়ের বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ থাকা উচিত, আর তা হচ্ছে, মহান আল্লাহর কাছে তাদের জন্য রয়েছে সংরক্ষিত প্রতিদান ও সম্মান । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

‘হে লোকসকল! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। এবং তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি-ই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়ার অধিকারী। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।’[২৩]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাক্ওয়ার পথ সুস্পষ্ট করে দিয়ে বলেন,

الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله

‘সকল সৃষ্টিই আল্লাহর পরিবার। তাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো সে ব্যক্তি, যে তার পরিবারের বেশি উপকার করে।’

[২৩] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ১৩।

# ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইন*

**‘আয়ায ইব্ন আশূর****

ইসলাম সম্পর্কে সমসাময়িক রাজনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে গবেষকদের প্রসূত চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে প্রধানতঃ দু’ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে একটি হলো, পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি। যেসমস্ত গবেষক বা বুদ্ধিজীবী পাশ্চাত্যে ইসলাম অথবা প্রাচ্যবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করেছেন তাদের গবেষণা কর্মে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির অস্তিত্ব বিরাজমান। তারা পশ্চিমা সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত। এজন্য আমরা তাদেরকে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির ধারক বলে অভিহিত করি। তারা যখন ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তখন তারা ঐ বিষয়গুলোকে পাশ্চাত্যে বিরাজমান রাজনৈতিক ও আদর্শিক মানদণ্ডে বিশ্লেষণ করে থাকেন। আর দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি যাকে আমরা *উদার দৃষ্টিভঙ্গি* হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। এ দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণতঃ মুসলিম লেখকদের রচনায় পরিলক্ষিত হয়। তারা প্রথমোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির ধারকদের সমালোচনার জবাবে ইসলামের মর্যাদা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে তারা এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, আধুনিক বিশ্বে তথা পাশ্চাত্যে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে ইসলাম-ই হলো এর মূল উদ্‌গাতা বা প্রচারক। এ সব বুদ্ধিজীবীদের অভিমত হলো, ইসলাম-ই গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, মানবিক অধিকার ও মানবিক আইনের ধারণা দিয়েছে এবং তা প্রচার করেছে।

উপরিউক্ত দু’টি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের চেয়ে বাহ্যিক পার্থক্য অনেক বেশি। তবে উভয় দৃষ্টিভঙ্গির ধারকগণ স্ব-স্ব উৎস থেকে ইসলামকে মূল্যায়ন করেছেন। উভয় দৃষ্টিভঙ্গির লোকেরাই (প্রথমটি জেনে-বুঝে, অপরটি নিজের অজান্তেই) মনে করে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা এতটাই উন্নত যে, এর সাথে অন্য

---

* প্রবন্ধটি মূলত: একটি লেকচার, যা ১১ অক্টোবর ১৯৭৯ সালে ফ্রান্সভাষীয় রাষ্ট্রের জন্য অনুষ্ঠিত আফ্রিকান সেমিনারে উপস্থাপন করা হয়। আন্তর্জাতিক মানবিক আইন প্রচারের লক্ষ্যে রেড ক্রিসেন্ট তিউনিসিয়ার সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি তিউনিসিয়ায় ১৯৭৯ সালে ৯-১১ অক্টোবরে এ সেমিনারের আয়োজন করে। অত:পর ১৯৮০ সালে প্রবন্ধটি আরবি ভাষায় অনূদিত হয়ে রেডক্রসের আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়।

** ‘আয়ায ইবন আশূর তিউনিসীয় একজন আইনবিদ। তিনি ১৯৪৫ সালে তিউনিসিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন । তিনি তিউনিসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডীন। আন্তর্জাতিক ও ইসলামী আইনের তিনি একজন বিশেষজ্ঞ। এ বিষয়ে তাঁর অনেক গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রয়েছে। তিনি জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির একজন সম্মানিত সদস্য। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো *আস-সিয়াসাহ্ ওয়াদ-দ্বীন ফীল ‘আলামিল ‘আরাবি*। Cf. http:///www.ledevoir.com/ international/actualites

কিছুর তুলনা চলে না। এ অবস্থায় প্রথম মতের ধারক বুদ্ধিজীবীরা কখনো প্রসঙ্গক্রমে আবার কখনো প্রকাশ্যে ইসলামের সমালোচনায় অবতীর্ণ হন এবং ইসলামী সভ্যতাকে অনুন্নত সভ্যতা হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকেন। আর দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গির ধারকগণ এটি সাব্যস্ত করতে সচেষ্ট থাকেন যে, কোনো অবস্থাতেই বা কোনো প্রেক্ষাপটেই ইসলামকে পশ্চাৎগামী কোনো সভ্যতা হিসেবে চিত্রায়িত করা যাবে না; বরং ইসলামকে আধুনিক দর্শন ও চিন্তাধারার মৌলিক উপাত্ত হিসেবে দেখাই বেশি উপযোগী।

উপরিউক্ত বিষয়বস্তুর পরিসরে পদ্ধতিগত প্রথম যে সমস্যাটির উদ্ভব ঘটেছে তা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য নিঃসন্দেহে বিরোধপূর্ণ দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই যথাসম্ভব দুরে অবস্থান করা। এর সাথেই দ্বিতীয় আরেকটি পদ্ধতিগত সমস্যারও উদ্ভব ঘটেছে, যার কারণ হচ্ছে ঐতিহাসিক ক্রমোন্নতিতে ভিন্নতা যা ইসলামী নিয়মনীতি ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের নীতিমালার মধ্যে যে কোনো তুলনামূলক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আধুনিক একটি সম্পুরক ব্যাখ্যা গ্রহণ করা প্রয়োজন । এ কথা মনে রাখতে হবে যে, খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে ইসলামের আগমন ঘটে। এ সময় ইসলাম যুদ্ধ, সমরাস্ত্রের ব্যবহার, বন্দি এবং বেসামরিক জনগণ সম্পর্কিত বিধি-বিধান ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমসাময়িক যুগের বৈশিষ্ট্য ও রীতি বহন করেছে। কিন্তু আধুনিক সমর প্রক্রিয়া ও প্রকৃতি এ যুগের জনসাধারণের স্বভাব ও নৈতিকতা এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন ও সম্পর্ক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতক থেকে পরিবেশগত দিক দিয়ে ভিন্নতর। এ অবস্থায় আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সাথে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা কাছাকাছি পর্যায়ে কিংবা সাদৃশ্যতা ও বিপরীত অবস্থা বর্ণনার উপরই নির্ভরশীল থাকবে। অবস্থা যেহেতু এমন পর্যায়ের তখন সেখানে শুরু থেকেই (উভয়ের মধ্যকার) সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

পরিশেষে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইসলাম যদিও স্বতন্ত্র একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক, তদুপরি আজকের মুসলিম বিশ্ব বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন বৈচিত্রময় সংস্কৃতির বেষ্টনে পরিবৃত্ত। এছাড়া আল-কুরআনকে ঘিরে বিভিন্ন ভাষ্যগ্রন্থ এবং বৈচিত্রময়ী গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। বক্ষমান এ নিবন্ধে মানবিক আইন প্রসঙ্গে আল-কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখের ক্ষেত্রে এমন ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হবে, যা সুন্নী মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত।

এ গবেষণায় আমাদের প্রধান উৎস ও উপাত্ত *সিয়ার নামে* আখ্যায়িত মৌলিক গ্রন্থসমূহ থেকে সংগৃহীত হয়েছে, যা কেবল যুদ্ধ সম্পর্কিত বিধি-বিধানকে বিশ্লেষণ করে।

এ পর্যায়ে একটি উৎস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সেটি হলো ইমাম আওযা'ঈর (মৃত্যু ৭৭৪ হি.) *সিয়ার গ্রন্থ*। হানাফী মাযহাবের প্রবর্তক ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফের (রহ.) পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে আমরা এ গ্রন্থের পরিচয় জেনেছি। গ্রন্থটি ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে আবূল ওয়াফা আল-আফগানী কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে *কিতাবুর রাদ্দি 'আলা সিয়ারিল আওযা'ঈ* শিরোনামে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়। এছাড়া ইমাম শাফি'ঈ রচিত *কিতাবুল উম্ম*-এর সপ্তম খণ্ডে ব্যবহৃত তথ্যসূত্র থেকেও আমরা এ গ্রন্থের *(কিতাবুস্-সিয়ার)* সন্ধান লাভ করি।

এছাড়া যুদ্ধ বিষয়ক রচিত গ্রন্থরাজির মধ্যে আরো বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে অষ্টম শতকে রচিত ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানীর গ্রন্থ। আর এ শায়বানী ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)- এর আরেকজন শিষ্য। হিজরী ১২ শতকে ইমাম সারাখসী কর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত গ্রন্থের মূল ভাষ্য হিসেবে '*আস্-সিয়ার আল-কাবীর*' নামটির সাথে আমরা পরিচিত হই যা ১৯৭১ সালে সালাহ্ আদ-দ্বীন আল-মুনজিদ প্রকাশ করেন।

যুদ্ধ ও এর বৈধতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ যদিও একটি প্রয়োজনীয় বিষয় তথাপি এ আলোচনা আমাদের বিষয়বস্তুর বাইরে হওয়ায় আমরা এ বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো না; কারণ তা আমাদেরকে নৈতিক, আইনী ও ধর্মীয় বিবিধ বিষয়ের আলোচনায় টেনে নিয়ে যাবে। সে জন্য আমরা আমাদের আলোচনাকে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখব:

**প্রথম বিষয়:** যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আর তা হচ্ছে, যোদ্ধাদের মধ্যে যারা বন্দি হবে তাদের আইনী অবস্থান ও তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণবিধি।

**দ্বিতীয় বিষয়:** বেসামরিক জনগণ সম্পর্কিত বিধি-বিধান।

**তৃতীয় বিষয়:** যুদ্ধে পরাজিত সেনাদেরকে দাস বানানো সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি।

**প্রথম বিষয়:** যোদ্ধাদের মধ্যে যারা বন্দি হবে তাদের অবস্থান ও তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণবিধি

## ক. ইসলামী মূলনীতি অনুযায়ী

মুসলিম লেখকদের কাছে 'যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ' সম্পর্কিত বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়নি। এ বিষয়টি গুরুত্ব না পাওয়া একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবেই

ধরা যায়, কারণ তখনকার অস্ত্র-শস্ত্র আজকের যুগের চেয়ে খুব কমই সর্বনাশী ছিল। সে যুগে এ ধরনের ব্যাপক বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না। ফলে সে সময় যুদ্ধে জয়লাভ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'যুদ্ধকালীন ধোকা' সহ সকল ধরনের রণকৌশল অবলম্বনের যথাযথ কারণ ছিল।

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে যুদ্ধবন্দিদের আচরণবিধি সম্পর্কিত বিষয়গুলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আল-কুরআনের তিনটি স্থানে বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। আল-কুরআনের আট নম্বর সূরাহ্ আল-আনফালের ৬৭ থেকে ৬৮ নং আয়াতে[১] বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এ দু'টি আয়াত মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ বদরের যুদ্ধবন্দি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। এসব যুদ্ধবন্দিদের সাথে কীরূপ আচরণ করা হবে এ নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণ কেবল প্রথমবার এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। কতিপয় সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বন্দিদের বন্দি রেখে তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে মুক্তি দেয়ার পরামর্শ দেন, কিন্তু উমার (রা), যিনি পরবর্তীতে মুসলিম জাহানের খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁর অভিমত ছিল বন্দীদেরকে হত্যা করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সাহাবীর মতামত গ্রহণ করেন। ফলে মুক্তিপণের বিনিময়ে শত্রু বন্দিদের ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সাবধান করে আয়াত নাযিল হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

'নবীর জন্য উচিৎ নয় বন্দিদেরকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না সে পৃথিবীতে রক্তপাত ঘটাবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহ্ চান আখিরাত। আর আল্লাহ্ হলেন মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান।'[২]

---

[১] আয়াতটি হলো,

﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

"কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয় যে, তার নিকট যুদ্ধবন্দি থাকবে (এবং পণের বিনিময়ে তিনি তাদেরকে মুক্ত করবেন) যতক্ষণ না তিনি যমীনে (তাদের) রক্ত প্রবাহিত করেন। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা করছ, অথচ আল্লাহ চাচ্ছেন আখিরাত। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। আল্লাহর লিখন অতিবাহিত না হয়ে থাকলে, অবশ্যই তোমরা যা গ্রহণ করেছ, সে বিষয়ে তোমাদেরকে মহা শাস্তি স্পর্শ করত।"

[২] সূরাহ্ আল-আনফাল: ৬৭।

উল্লিখিত আয়াতে বন্দিদের ব্যাপারে আল্লাহ্র কিতাবে (আল-কুরআনে) ফয়সালা বর্ণিত হয়েছে। কিছু কিছু তাফসীরকার আয়াতটির তাফসীর করেছেন এভাবে যে, সকল যোদ্ধাই বন্দিদের ন্যায় হওয়ায় বিনা প্রশ্নে তাদেরকে হত্যা করা যাবে। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, আয়াতটি বদর যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ। আর এ সময় ছিল ইসলামের আগমনের প্রাথমিক পর্যায়। এ সময় ইসলামের কোনো শক্তিই অর্জিত হয়নি এবং বন্দিদেরকে দেখভাল করার জন্য রাষ্ট্রও সক্ষম ছিল না। এ ভিত্তিতে কতিপয় তাফসীরকার আয়াতটির সম্পর্ক শুধু বদর যুদ্ধের সাথেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হবে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ অভিমতের সমর্থনে আল-কুরআনের অপর একটি আয়াত উপস্থাপন করা যেতে পারে, যা বন্দিদের ব্যাপারে দ্বিতীয় পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়। যেমন আল-কুরআনে ৪৭ নং সূরাহ্র ৪ নং আয়াতে এসেছে,

﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾

'অতএব যখন তোমরা (যুদ্ধের ময়দানে) কাফিরদের সাথে যুদ্ধ মুকাবিলা কর তখন তাদের গ্রীবাদেশে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ (আদায় করে তাদেরকে ছেড়ে দেবে) যতক্ষণ না যুদ্ধ তার বোঝা নামিয়ে ফেলে'। এটিই বিধান। এটি এ জন্য যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের কর্ম বিনষ্ট হতে দেন না।'[৩]

উল্লিখিত আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বন্দির প্রকৃতি-ই হলো সাময়িকী। প্রয়োজনে তাকে নিঃশর্ত মুক্তি অথবা মুক্তিপণের বিনিময়ে শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দেয়া যায়। বিশেষ অবস্থা অথবা রাষ্ট্রের কল্যাণের কথা ভেবে উক্ত দু'টি অভিমতের মধ্যে যে-কোনো একটিকে রাষ্ট্রপক্ষ গ্রহণ করবে। সুতরাং নির্বিচারে বন্দীকে হত্যা করা বিধিসম্মত নয়।

আল-কুরআনের তৃতীয় আরেকটি ভাষ্য, যা উপর্যুক্ত দ্বিতীয় ভাষ্যের পর অবতীর্ণ হয় যাকে *আয়াতুস্-সাইফ* হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। আয়াতটি হলো আল-কুরআনের ৯ নং সূরাহ্ আত-তাওবার ৫ নং আয়াত। এতে যুদ্ধবন্দি

---

[৩] সূরাহ্ মুহাম্মাদ : ৪।

সম্পর্কিত আচরণবিধি সুস্পষ্ট ও সুক্ষ্মভাবে বিধৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

'অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে (মক্কার) মুশরিকদের হত্যা কর,* যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দি এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৪]

কতিপয় 'আলিমের অভিমত হলো এই যে, উল্লিখিত আয়াতটি যে আয়াতে অনুগ্রহ বা মুক্তিপণ দিয়ে বন্দিদেরকে ছেড়ে দেয়ার কথা বিবৃত হয়েছে সেটিকে মানসূখ বা রহিত করেছে। এজন্য তাদের দৃষ্টিতে যুদ্ধবন্দিদেরকে হত্যা করা-ই যুক্তিযুক্ত।

আল-কুরআনে যুদ্ধবন্দি সম্পর্কিত উক্ত তিনটি আয়াত তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, এগুলোতে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। সুতরাং এ মাস'আলায় বিদ্যানগণের মতানৈক্য থাকা কোনো অভিনব বিষয় নয়।

এ বিষয়ে যদি আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্র প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তাহলে আমরা সেখানে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো স্থায়ী মাপকাঠির সন্ধান পাই না। তাই অবস্থার বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে যুদ্ধবন্দিদের বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্তও বিভিন্ন ধরনের হয়েছিল।

*সিয়ার, হাদীস* ও *তাফসীর* গ্রন্থসমূহে বিশেষ করে ইমাম আল-জাস্সাসের '*আহ্কামুল কুরআন*' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধের কিছু বন্দি যেমন নদ্বর ইবন হারিস এবং উহুদের যুদ্ধবন্দিদের মধ্য থেকে 'আবূ 'আয্যা' কবিকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কিন্তু এ একই সূত্র বা উৎস এও বর্ণনা করেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ যুদ্ধবন্দিকে বিনা শর্তে মুক্তি দিয়েছেন। আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'টি পন্থায় মুক্তিপণ গ্রহণ করতেন। এ মুক্তিপণ কখনো সম্পদের বিনিময়ে হতো আবার কখনো শত্রুদের হাতে আটককৃত মুসলিম বন্দিদের বিনিময়ে হতো।

---

৪ সূরাহ্ আত্-তাওবা: ৫।

* এটি তৎকালীন মুশরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা তারা ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। তাদেরকে ইসলাম থেকে ফিরে আসতে বাধ্য করার জন্য নির্যাতন চালিয়ে ছিলেন। এমনকি তারা মুসলমানদেরকে তাদের জন্মভূমি থেকে বহিস্কার করেছিল। এ সমস্ত কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উপরোক্ত আয়াতে এ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। দ্রষ্টব্য: *ফী যিলালিল কুরআন* (কায়রো: দারুশ শুরুক, ২০০৭ খ্রী: পৃ. ১৮৯।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সুন্নী 'আলিমগণ বিষয়টির সমাধান সম্পর্কে যে অভিমত উপস্থাপন করেছেন তা সুদূর প্রসারী বলে প্রতীয়মান হয়। তাদের মধ্যে কতিপয় 'আলিম বা ফকীহ্ শুধু মুক্তিপণ অথবা অনুগ্রহের ভিত্তিতে বন্দিদেরকে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে ইতিবাচক অভিমত উপস্থাপন করেছেন। কেননা বিষয়টি দু'টি পন্থায় তথা মুক্তিপণ ও অনুগ্রহ (المن أو الفداء) সূরাহ্ মুহাম্মাদের ৪ নং আয়াতে[৫] বিধৃত হয়েছে। অপর একদল 'আলিম অনুগ্রহ বা المن কে অস্বীকার করেছেন এবং মুক্তিপণকে গ্রহণ করেছেন। তৃতীয় আরেকদল সবধরনের সমাধানের পক্ষেই মত ব্যক্ত করেছেন। তারা বিষয়টিকে রাজনৈতিক শাসকের হাতে অর্পণ করেছেন। তিনি হত্যা, অনুগ্রহ প্রদর্শন, মুক্তিপণ, বন্দি বিনিময় অথবা দাস বানানোর যে কোনো একটি মত গ্রহণ করতে পারেন। এ শেষোক্ত বিষয়ের আলোচনায় আমরা অচিরেই আবার প্রত্যাবর্তন করব।

উপরিউক্ত (হত্যা, অনুগ্রহ, মুক্তিপণ, বন্দি বিনিময় বা দাস বানানোর মত) কাজগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন নিয়েও আলিমদের মাঝে মতভেদ থাকার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

উক্ত বিষয়ে আল-কুরআনের তাফসীর এবং রাসূলের সুন্নাহ্র ব্যাখ্যা নিয়ে মাযহাবী মতভেদ থাকা সত্ত্বেও বিষয়টির উপর সমকালীন মুসলিম চিন্তাবিদগণের মধ্যে এ মর্মে '*ইজমা*' সংঘটিত হয়েছে যে, সূরাহ্ মুহাম্মাদ এ যুদ্ধবন্দি সম্পর্কে বর্ণিত নীতিমালা-ই হলো বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন। এটি ছাড়া যুদ্ধবন্দি সম্পর্কে অন্যান্য বর্ণনাগুলো সাময়িক ছিল অথবা বিশেষ কিছু লোক অথবা বিশেষ অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট ছিল। সুতরাং বন্দিদের ক্ষেত্রে তিনটি সমাধান-ই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। **এক.** যুদ্ধ শেষে তাদেরকে বিনিময় ব্যতিরেকে ছেড়ে দেয়া। **দুই.** মুসলিম সৈন্যদের মুক্তির বিনিময়ে তাদের ছেড়ে দেয়া। **তিন.** মুক্তিপণের মাধ্যমে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া। সমকালীন কতিপয় খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ যেমন প্রফেসর ড. ওয়াহবাহ আয-যুহায়লী স্বীয় গ্রন্থ '*আছারুল হারব ফীল ফিক্হীল ইসলামী*' অনুরূপ 'আলী (ইবন) 'আলী মানসূর তাঁর '*আল-ইসলাম ওয়াল কানূনুদ্-দাওলী*' এবং মুহাম্মাদ কামালুদ্দীন ইমাম *আল-হারব ওয়াস-সালাম ফীল কানূনিদ-দাওলী আল-ইসলামী*' গ্রন্থে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া আধুনিক তাফসীরকারদের মধ্যে সাইয়্যিদ কুতুব এবং শায়খ মাহমূদ সালতূতও এ মতের প্রবক্তা।

---

৫ আয়াতটি হলো নিম্নরূপ,

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

## খ. প্রচলিত প্রথা বা রীতি অনুযায়ী

এবারে আমরা দেখব ইসলামের প্রাথমিক যুগে বন্দিদের সাথে বাস্তবেই কীরূপ আচরণ করা হতো। একথা মনে রাখতে হবে যে, সে সময় ব্যক্তির তেমন কোনো মর্যাদা ছিল না, যেমন আজকের যুগে রয়েছে। আজকে যেমন ব্যক্তি অধিকার সংরক্ষিত হয় সে যুগে তেমনটি ছিল না; বরং গোষ্ঠী অধিকার সংরক্ষণ ও স্থায়িত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হতো। যে সময় ইসলামের আগমন ঘটে সে সময়কার যুদ্ধরীতিতে ব্যক্তির কোনো মর্যাদা ও সম্মান ছিল না; বরং সে সময়ে সমাজে প্রচলিত ছিল কঠোরতা ও প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা। এ ছাড়া যুদ্ধে এমন জঘন্য কার্যকলাপ প্রচলিত ছিল যাকে আজ জঙ্গীবাদ ও মানবতা বিবর্জিত অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমনঃ অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, শত্রুকে শুলে চড়ানো, চেহারা বিকৃতি করা এবং শরীরকে টুকরো টুকরো করা অথবা ঘাড়ে প্রচণ্ড আঘাত করা। এরূপ মানবতা বিবর্জিত ঘৃণিত কাজে নারী-পুরুষ সমভাবে অংশগ্রহণ করত।

ইসলাম সেকালের এরূপ ঘৃণিত কাজের মূলোৎপাটন করে । শর্তহীন বা শর্তযুক্ত যে কোনো অবস্থায় সব ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হারাম করে দেয়। চাই তা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে হোক অথবা নিরাপদ সময়ে হোক। এর উদাহরণ হলো, ইসলাম পূর্ব-যুগে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো এবং তা সাধারণ প্রথায় পরিণত হয়েছিল। ইসলাম কঠোর হস্তে এ প্রথা বিলুপ্ত করে। যুদ্ধে আটককৃত যোদ্ধাদের সাথে আচরণ দু'টি বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। **এক.** তাদের সাথে সম-আচরণ নীতি অবলম্বন করা। **দুই.** অত্যাবশ্যকতা ব্যতীত তাদেরকে শাস্তি না দেয়ার নিয়ম মান্য করা। প্রতিপক্ষের বন্দিদেরকে হেনস্থা করা অথবা তাদের সাথে অমানবিক আচরণ করা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ। এ বিষয়ে 'আলিমগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ইসলামের আগমনের সময় যে যুদ্ধ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তা দ্বারা সে প্রভাবিত হলেও ইসলাম সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধনীতিকে মানবিক ও চারিত্রিক রঙ্গে রঙ্গায়িত করার প্রতি সবচেয়ে বেশি সচেষ্ট হয়।

এ বিষয়ে হাদীস গ্রন্থসমূহে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিধৃত হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের মুসলিম যোদ্ধাদেরকে যুদ্ধবন্দিদের সাথে সদাচরণ করতে নির্দেশ দেন। এরূপভাবে কোনো এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্দিদেরকে রৌদ্রে পড়ে থাকতে দেখে সাহাবীদেরকে তাদের প্রতি এরূপ আচরণ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, 'বন্দিদের উপর অস্ত্রের গরমের সাথে আবহাওয়ার গরমকে যুক্ত কর না।'

প্রাচীন উৎস থেকে জানা যায় যে, সে সময় যুদ্ধবন্দিদেরকে উন্নতমানের খাদ্য পরিবেশন করা হতো। যুদ্ধকালীন ও তৎপরবর্তী সময়ে যুদ্ধ বন্দিদের সাথে

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের এরূপ সদাচরণকে মূলভিত্তি হিসেবে ধরে নিয়ে 'আলিমগণ এরই আলোকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সকল অবস্থায় বন্দিদের সাথে সুন্দর আচরণ করা অনস্বীকার্য। তাদেরকে তৃষ্ণা-ক্ষুধা অথবা রোদে রেখে শাস্তি দেয়া সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)'*আল-খারাজ*' গ্রন্থে 'আলিমগণের এ সিদ্ধান্ত বলবৎ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

যুদ্ধে কাদেরকে হত্যা করা যাবে এ ব্যাপারে ইসলামের অভিমত অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট। জাহিলী যুগে 'আরব উপদ্বীপ ও অন্যান্য অঞ্চলে শত্রুদের লাশ বিকৃত করার প্রবণতা সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। লাশ বিকৃতির ঘৃণ্য কাজে আরব নারীরাও অংশগ্রহণ করত। কোনো কোনো সময় তারা প্রতিশোধের আগুন ঠাণ্ডা করার জন্য ভাই অথবা স্বামী হন্তার বুক চিরে কলিজা বের করে চিবাতো।

এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো, মু'আবিয়া (রা)- এর মা হিন্দা (রা) উহুদ যুদ্ধে শহীদদের লাশ বিকৃত করার ঘৃণ্য কাজে অংশগ্রহণ করে। বিশেষ করে হিন্দা (রা) উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় চাচা হামযার (রা) বুক ফেঁড়ে তার কলিজা বের করে চিবাতে থাকে। শত্রু বাহিনীর রনাঙ্গন ত্যাগ করার পর মুসলিমরা যখন শহীদদের লাশ দাফন করতে শুরু করে তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় চাচার অবস্থা দেখে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি তার চাচাকে খুব ভালোবাসতেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যদি আল্লাহ্ কোনোদিন তাদের উপর আমাদের বিজয় দান করেন তাহলে আমরা তাদের লাশ এমনভাবে বিকৃতি করব আরবরা যা কোনোদিন করে নি।' আল-কুরআনের তাফসীরকারগণ বলেন, 'এ ঘটনার প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়,

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ.﴾

'আর যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে ঠিক ততটুকু শাস্তি দেবে যতটুকু তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। আর যদি তোমরা সবর কর, তবে তা-ই সবরকারীদের জন্য উত্তম। আর তুমি সবর কর। তোমার সবর তো শুধু আল্লাহর সাহায্যের। তারা যেসব ষড়যন্ত্র করছে তুমি সে বিষয়ে মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল।'[৬]

[৬] সূরাহ্ আন্-নাহল : ১২৬-১২৮।

আল-কুরআনে উল্লিখিত আয়াতের উপর ভিত্তি করে ফকীহ্গণ জীবিত অথবা নিহত যোদ্ধাদের বুক ফেঁড়ে ফেলা, চেহারা বিকৃতি করা, শাস্তি দেয়া অথবা পানিতে ডুবিয়ে মারা ইত্যাদি ঘৃণ্যকাজ নিষিদ্ধ করেছেন। ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) '*আল-উম্ম*' এবং শাওকানী (রহ.) '*নায়লুল আওতার*' গ্রন্থে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সে যুগে নিহত ব্যক্তির মস্তক কর্তন করে শাসকের দরবারে পাঠানোর প্রথা প্রচলিত ছিল। ইমাম শায়বানী '*আস্-সিয়ার*' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, খলীফা আবূ বাকর (রা) এ ঘৃণ্য প্রথার বিলুপ্তি ঘটান। এটি জানা প্রয়োজন যে, ইসলামে খলীফা চতুষ্টয়ের অনুসরণ অনস্বীকার্য। আবূ বাকর (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল শত্রুরা মুসলিমদের সাথে যেরূপ আচরণ করেছে তার সমবদলা নেয়ার জন্য কেন তাদের সাথে অনুরূপ আচরণ করা যাবে না? আবূ বাকর (রা) জবাব দিয়েছিলেন, আমরা কি পারসিক ও রোমকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব? (কখনও না) ইমাম বায়হাকী ঘটনাটি স্বীয় '*সুনান*' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ইসলামে যোদ্ধাদের সাথে কোনো প্রকার অনৈতিক আচরণ তথা তাদেরকে বিবস্ত্র করা, দিগম্বর করা অথবা অসম্মানজনক ব্যবহার করা অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ বিষয়ে ইসলামী আচরণবিধি খুবই কঠোর।

বিস্তারিত বর্ণনায় অনুপ্রবেশ ছাড়াই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থ যেমন *সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম* এবং *সুনানু বায়হাকীসহ* অন্যান্য নির্ভরযোগ্য উৎসসমূহে এবিষয়ে রাসূলুল্লাহ্‌র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রীতির অনেক উদাহরণ পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে বন্দিদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল ব্যবহার এবং মানবিক আচরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে সেনাপ্রধানদের সীমালঙ্ঘনকেও তিনি মার্জনা করেন নি; বরং নিন্দা করেছেন। যেমনটি খালিদ বিন্ ওয়ালিদের সাথে সংঘটিত হয়েছিল।

## দুইঃ বেসামরিক তথা অযোদ্ধা লোকদের সম্পর্কিত বিধি-বিধান

ফকীহ্গণ বেসামরিক লোকদের ক্ষেত্রে এক সাধারণ নীতি বা বিধানের উপর একমত হয়েছেন যে, যুদ্ধে যে অংশগ্রহণ করেনি তাকে হত্যা করা যাবে না। তাদের এমতের দলীল হলো, মহান আল্লাহ্‌র বাণী:

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।'[৭]

যদি আমরা অযোদ্ধা বেসামরিক লোকদের ব্যাপারে প্রণীত বিধানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তাহলে আমাদের সম্মুখে দ্রুত পরিবর্তন-প্রবণতাসম্পন্ন একটি বিষয় চলে আসে, যা মূলত: যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি ও রীতিনীতির মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হওয়ার ফল।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে নির্দিষ্ট অঞ্চলে কোনো গোত্র অথবা কোনো দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হতো। আর এ যুদ্ধগুলোর সম্পৃক্ততা ভূখণ্ডের সাথে না হয়ে ব্যক্তিবর্গের সাথে বেশি সংশ্লিষ্ট ছিল। এ কারণেই বেসামরিক অযোদ্ধা লোকেরা এবং তাদের সহায়-সম্পদ এমন অবস্থার সম্মুখীন হতো যার সম্মুখীন হতো সামরিক যোদ্ধারা। ফলে তাদেরকে অনেক সময় দাস বানানো হতো এবং তাদেরকে ও তাদের সম্পদকে গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ বৈধ সম্পদে পরিণত করা হতো।

সে যুগে যুদ্ধ ছিল সম্মিলিত ঐক্য কার্যক্রম। তাই পুরুষদের মধ্যে সামর্থবান ব্যক্তিরাই কেবল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত। আর যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণে অক্ষম হতো তাদের ভাগ্য যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের উপর নির্ভর করত। যুদ্ধে পরাজিত হলে তাদেরকে গনীমতের মাল হিসেবে একত্রিত করা হতো এবং বিজেতারা গনীমতের মাল হিসেবে তাদেরকে বণ্টন করত। এ রীতির উপর আলিমগণের ঐকমত্য লক্ষ্য করা যায়।

অপরদিকে বন্দিদেরকে মুক্তি দেয়ার বিষয়ে অনেক মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। হানাফীগণ উপর্যুক্ত মতকে গ্রহণ করেন না। কিন্তু অন্যান্য মাযহাবের অনুসারীরা এটিকে শর্ত সাপেক্ষে গ্রহণ করে থাকেন। এ শর্তগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শর্ত হলো, গনীমতের মালের হকদার মুজাহিদদের সম্মতির উপর নির্ভরশীল। (অর্থাৎ বন্দি লোকদের ছাড়ার ব্যাপারে মুজাহিদের সম্মতি প্রয়োজন)

তবে এ বিষয়ে অধিকাংশ আলিমগণের অভিমত হলো, এ বন্দিদেরকে যুদ্ধ শেষে ছেড়ে দেয়া হবে কী হবে না তা রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নেবে। রাষ্ট্র ইচ্ছে করলে বিনিময় ব্যতিরেকে অথবা মুক্তিপণ গ্রহণ করার মাধ্যমে তাদেরকে মুক্তি দিতে পারবে, অথবা তাদেরকে দাস হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত দিতে পারে।

সে যুগে কোনো গোত্রের মধ্যে যখন কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হতো তখন বিজিত বন্দিদেরকে দাস বানানো হতো। কিন্তু গোত্রযুদ্ধের যুগ পেরিয়ে যুদ্ধ যখন কোনো

[৭] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্ : ১৯০।

রাজ্য বা এমন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংঘটিত হতে আরম্ভ করলো , যাদের নিজস্ব নিয়মিত সেনাবাহিনী রয়েছে, তখন তাদের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত আইন কার্যকর করা হতো না। এমতাবস্থায় বেসামরিক লোকদের ক্ষেত্রে সে নতুন আইন কার্যকর করা হলো যা 'উমার (রা) প্রবর্তন করেন।

সুতরাং ইরাকের বেসামরিক লোকদেরকে দাস বানানো হয় নি; তাদেরকে বাৎসরিক *জিযইয়া* বা প্রাণরক্ষা কর দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে স্বাধীন শহরবাসীদের মতই থাকতে দেয়া হয়। এভাবে ইসলাম যে সমস্ত শহরে বিজয় লাভ করেছে সে শহরে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিককে *যিম্মী* নামে আখ্যায়িত করেছে। পরবর্তীকালে এ নাম শুধু ইসলামী অঞ্চলে বসবাসরত অমুসলিম জনগণের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে তাদের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের জানমাল সংরক্ষণ, প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা, স্বাধীনভাবে ধর্মীয় অধিকার প্রতিপালন, তাদের সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনী অধিকার সাব্যস্ত করা, নিজ সম্পদ স্বাধীনভাবে ব্যবহারের অধিকার এবং বিভিন্ন স্থানে তাদের স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করার অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, তখন সেসব অযোদ্ধাদেরকে বন্দিদশায় পতিত দাস হিসেবে ব্যবহার করা হয় নি; বরং তাদেরকে কর প্রদানকারী স্বাধীন ব্যক্তিবর্গ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া উমার (রা) বিজিত অঞ্চলের জমি ও ভূখণ্ড স্ব-স্ব মালিকের নিকট সোপর্দ করে তাতে '*খারাজ*' নামে নতুন ট্যাক্স নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

অযোদ্ধা বেসামরিক লোকদের সাথে কীরূপ আচরণ করা হবে সে সম্পর্কে হাদীসে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এসব হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেনাপ্রধানদেরকে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে এ মর্মে নির্দেশ দিতেন যে,

اغزوا باسم الله. وفي سبيل الله قاتِلُوْا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا امرأة ولا وليداً.

'আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ শুরু কর, যারা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী* করে তাদের সাথে লড়াই কর, খিয়ানত করবে না, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না, লাশ বিকৃতি করবে না, কোনো নারী ও শিশুকে হত্যা করবে না।'

এছাড়া নারী, বয়স্ক ব্যক্তি, পুরোহিত এবং ধর্মীয় ব্যক্তিদের ব্যাপারে অকাট্য নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে। যেমন খলীফা আবূ বাকর (রা) সিরিয়ায় যুদ্ধ শুরুর

* এখানে আল্লাহর সাথে কুফরী করার অর্থ হলো, কুফরীর ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করা এবং মুসলমানদের উপর আক্রমণ করা।

প্রাক্কালে সেনাপতি ইয়াযিদ ইব্‌ন আবূ সুফ্‌ইয়ান, 'আমর ইব্‌নুল আস ও শুরাহবীল ইব্‌ন হাসনাহ্‌কে এ মর্মে নির্দেশ দেন,

لا تقتلن امراة ولا طفلاً ولا كبيراً هرما. إنك ستمر على قومٍ قد فرغوا أنفسهم في الصوامعِ فدعهم وما فرغوا أنفسهم له.

'তোমরা কখনো কোনো নারী শিশু, বয়োবৃদ্ধকে হত্যা করবে না। অচিরেই তুমি রাস্তায় এমন লোকদের দেখবে যারা দুনিয়া পরিত্যাগ করে আশ্রমকে আবাসস্থল হিসেবে গ্রহণ করেছে, তোমরা সে সমস্ত লোককে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও।'

এ নির্দেশনা দু'টি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। **এক.** অযোদ্ধা বেসামরিক জনগণকে যুদ্ধের ক্ষতি থেকে দূরে রাখা, **দুই.** বিশেষভাবে ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গকে সম্মান করা।

তবে যুদ্ধে আক্রান্ত এলাকা বা শহর বা শত্রুর অসামরিক স্থাপনা ধ্বংস করার ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শায়বানীর মতে 'এগুলো ধ্বংস করা বিধিসম্মত।' তিনি বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফও এ মতের প্রবক্তা। অপরদিকে ইমাম আওযা'ঈর মতে এটি শরী'আতসম্মত নয়।

অন্যান্য উৎসসমূহে এ বিষয়ে খলীফা আবূ বাকর (রা)-এর নির্দেশনার বিস্তারিত বিবরণ বিধৃত হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, তিনি (খলীফা) যুদ্ধের প্রাক্কালে সেনা প্রধান ইয়াযিদ ইব্‌ন আবী সুফ্‌ইয়ানকে এমর্মে নির্দেশ দেন,

لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا ولاطفلا وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ وَلَا تَحْرِقَنَّ نَخلًا وَلَا تُغَرِّقَنَّهُ وَلَا تَغْلُلْ وَلَا تَجْبُنْ

'তোমরা কখনো নারী, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তিদেরকে হত্যা করবে না। কোনো ফলজ বৃক্ষ কাটবে না, স্থাপনা ধ্বংস করবে না; খাওয়ার প্রয়োজন ব্যতীত বকরী উটকে জবাই করবে না। খেজুর বৃক্ষ জ্বালাবে না, পানিতে ডুবাবে না, গনীমতের মাল চুরি করবে না, ভীরুতা দেখাবে না।'[৮]

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে রণাঙ্গনে শত্রুবাহিনী থেকে প্রাপ্ত সকল সম্পদ গনীমতের মাল হিসেবে গণ্য হবে। এ সম্পদ নির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে বণ্টিত হবে। বণ্টনের পূর্বে এ সম্পদগুলো সমাজের সকলের মালিকানা হিসেবে ধরা হবে। এজন্য শত্রুর পরিত্যক্ত সম্পদ চুরি করা অথবা লুট করা কোনো মুসলিম সৈনিকের জন্য অনুমোদিত নয়। তদুপরি এ ধরনের কাজ ইসলামী যুদ্ধ

---

[৮] আল-মুওয়াত্তা, হাদীস নং ৮৫৮।

আইনের পরিভাষায় غلول (গুলুল) বা অবৈধভাবে জাতীয় সম্পদ আত্মসাৎ করা বলে বিবেচিত। এটি যুদ্ধ বা সমর অপরাধের মধ্যে গণ্য হবে এবং এর শাস্তি রয়েছে ভয়াবহ।

যুদ্ধ বন্দিদের সাথে মানবিক আচরণের ক্ষেত্রে আমরা যে আচরণবিধি উদ্ভাবন করলাম স্বভাবতই তা বেসামরিক অযোদ্ধাদের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে।

## তিনঃ দাস বানানো সম্পর্কিত মাস'আলা

প্রাথমিক যুগে ইসলাম দাস বানানোর ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে নি। ফলে সেসময় যুদ্ধবন্দিদেরকে দাস বানানো বৈধ ছিল। আর দাস বানানোর বিষয়টি নীতিগতভাবে বেসামরিক লোকদের উপরও প্রযোজ্য হতো; যখন সামরিক কমান্ড কিংবা শাসনকর্তৃপক্ষ তা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

প্রকৃতপক্ষে এটি সর্বাবস্থায় ইসলামের স্বাধীনতা ও সাম্য নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এজন্য দাস বানানো সম্পর্কে ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাসের নিরীখে দেখা প্রয়োজন। ইসলামের আগমনের প্রাক্কালে সারা পৃথিবীতে দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। বন্দিদের এক বিরাট অংশ যুদ্ধে বন্দি হয়ে আসত। এসময় ইসলাম সমাজে প্রচলিত এ প্রথার বিরুদ্ধে নেতিবাচক কোনো দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে নি। ফলে দাস বানানোর বিষয়টি ফকীহ্গণের নিকট একটি তাত্ত্বিক বিষয়ে পরিণত হয়। কিন্তু খলীফা উমার (রা)-এর খিলাফতকালে দাস বানানোর প্রবণতা ঢাকা পড়ে যায়। মুসলিম বিজিত অঞ্চলে অমুসলিম বাসিন্দাদের স্বাধীনভাবে বসবাসের জন্য খারাজ বা ভূমিকর দেয়ার শর্তারোপ পুরোপুরিভাবে সংরক্ষিত হয়।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রণীত বিধি-বিধানসমূহে এটি লক্ষণীয় যে, সেগুলোতে এ দাসত্ব প্রথা যতটুকু সম্ভব কমানোর প্রবণতা ছিল সুস্পষ্ট। দাস-দাসী সম্পর্কে আল-কুরআন, আস্-সুন্নাহ্ ও সাহাবীগণের দৃষ্টিভঙ্গি এক ও অভিন্ন। সুতরাং আল-কুরআনের অনেক আয়াতে দাস মুক্তি করাকে সৎ কাজ ও খোদাভীরুতার প্রতীক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে সরে নিয়ে যাবে এবং জান্নাতের নিকটবর্তী করবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জবাবে বললেন, তুমি একটি দাস মুক্ত করে দাও।'

অনুরূপভাবে অনেক হাদীসে দাসদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, একবার আবূ যার আল-গিফারী (রা) তার কোনো দাসের সাথে খারাপ ব্যবহার করলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ভর্ৎসনা করে বললেন,

إِخْوانُكُمْ خَولُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحَتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِما يَأْكُلُ، ولْيُلْبِسْهُ مِما يَلْبَسُ،وأسكنوهم فيما تسكنون ولاَ تُكَلفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

‘তোমাদের এ ভাইয়েরা তোমাদের সহযোগী, আল্লাহ্ তা‘আলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের কারো অধীনে এরূপ কোনো ভাই থাকলে তোমরা যা খাবে তাকেও তা খাওয়াবে, তাকে এমন পোষাক দেবে যা তোমরা পরিধান করবে। তাদেরকে এমন জায়গায় থাকতে দাও যেখানে তোমরা থাক, ক্ষমতার বাইরে তাদেরকে কোনো কাজ করতে দিও না। আর তাদেরকে অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে দিলে তোমরা তাদেরকে সাহায্য কর।’[৯]

ইসলাম সর্বপ্রথম দাস প্রথার মূল উৎসসমূহকে সংকীর্ণ করে দেয়। আর এ উৎসগুলো ছিল যুদ্ধের মাধ্যমে দাস বানানো, কোনো অপরাধের কারণে অথবা কৃত অপরাধের বিনিময়ে কিংবা ঋণের কারণে দাস বানানো অথবা পরিবারের কর্তাব্যক্তির নির্দেশক্রমে দাস বানানো। এছাড়া স্বেচ্ছায় কেউ দাস হতে চাইলে দাস হিসেবে পরিগণিত হতো, অথবা উত্তরাধিকারভাবে দাস হিসেবে গণ্য হতো। ইসলাম দু’টি উৎস ব্যতিরেকে দাস বানানোর সকল উৎসকে বাতিল করে দেয়। সে দু’টি উৎস হলো, যুদ্ধ অথবা উত্তরাধিকারের কারণে দাস বানানো।

ইসলাম ব্যাপকভাবে দাস মুক্তির প্রতি উৎসাহিত করে। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলাম ভুল-ত্রুটির কাফ্ফারা হিসেবে দাস মুক্তির ব্যবস্থা করেছে। যেমন, ভুলক্রমে হত্যা অথবা রমযানের রোযা ভঙ্গ করা অথবা কসম ভঙ্গ করা ইত্যাদি (এসব ক্ষেত্রে ইসলাম দাস মুক্তির বিধান প্রবর্তন করেছে)। এগুলোর সাথে সাথে ইসলাম এ বিষয়ে এমন কিছু আইন প্রবর্তন করেছে যার মাধ্যমে কোনো গোলাম বা দাস তার স্বাধীনতাকে ক্রয় করতে পারে। যেমন *মুকাতাবা* তথা চুক্তিবদ্ধ দাস, যে নির্দিষ্ট সময় সেবাদানের মাধ্যমে নিজকে পরাধীনতার জিঞ্জির থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে অথবা أم الولد (উম্মূল ওয়ালাদ) এর মাধ্যমে দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেছে। *উম্মুল ওয়ালাদ* হলো এমন দাসী, যে তার

---

[৯] *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-৩০; *সহীহ্ মুসলিম* হাদীস নং ১৬৬১; *সুনানুত তিরমিযী*, কিতাবুল বির্র ওয়াস সিলাহ। হাদীস নং -১৯৪৫।

মনিবের জন্য সন্তান প্রসব করার পর সে আযাদ বা মুক্ত হবে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, أعتقها ولدها 'তার ছেলেই তাকে মুক্ত করে দিয়েছে।'[১০]

মোটকথা, ইসলাম মানুষের দাসত্ব ভূবনে প্রবেশের অসংখ্য পথ বন্ধ করে দিয়েছে এবং এর সাথে সাথে এমন অনেক পথ অবারিত করে রেখেছে যাতে দাস স্বাধীন মানুষের জগতে প্রবেশ করতে পারে। এ প্রেক্ষিতে সম-সাময়িক মুসলিম লেখকগণ একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারেন যে, ইসলাম তার আগমনের পূর্বে প্রচলিত দাস প্রথাকে স্বীকৃতি দিলেও দাস মুক্ত করার বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেছে। দাস সম্পর্কে ইসলামের এ দৃষ্টিভঙ্গিকে এ বিষয়ের মূল ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন আল-আযহারের বিখ্যাত আলিম শায়খ মানসূর রজব, সাইয়্যিদ কুতুব ও উস্তাদ আব্বাস মাহমূদ আল-'আক্কাদ। অধিকাংশ সম-সাময়িক লেখকের অভিমত হলো, সারা দুনিয়া থেকে দাস প্রথার উচ্ছেদ করা ইসলামী শিক্ষার অনুপ্রেরণার ভিত্তিতে সম্ভব হয়েছে। সুতরাং এ উদ্যোগ ইসলামী বিধানের পরিপন্থী নয়।

পরিশেষে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মৌলিক ইসলামী আইন আধুনিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সাথে কিছু কিছু বিষয়ে বিরোধপূর্ণ হলেও অধিকাংশ আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে তা কখনো কখনো ইসলামী আইনের বিরোধিতাও করে। গতানুগতিক ধারার আইনজ্ঞগণ যুদ্ধ আইনের সমস্যাবলী যে দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সমাধান করে থাকেন তা আমাদের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিছুটা ভিন্নতর।

পরিশেষে আমরা উপর্যুক্ত বর্ণনা দ্বারা ইসলামের মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কে ভ্রান্তির পরিসমাপ্তি ঘটাতে চাই। সুতরাং একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, ইসলাম আইন বিষয়ে যে নীতি-পদ্ধতির উপর নির্ভর করে তা ইজতিহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য সমসাময়িক ফকীহ্গণের উচিৎ আইন সম্পর্কে এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা, যা সমকালীন যুগের চাহিদা পূরণ করবে। তবে এক্ষেত্রে একটি মাত্র শর্ত হলো ফকীহ্গণের গবেষণালব্ধ ফল যেন আল-কুরআন ও সুন্নাহ্র সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আর তাদের এ ফলাফল যেন ইসলামী সমাজের জন্য কল্যাণ সুনিশ্চিত করে। প্রকৃতপক্ষে আল-কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু দেখা যায় না, যা আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বিরোধী। আর বড় বড় ফকীহগণের মতামততো মাযহাবী ইজতিহাদ ছাড়া আর কিছু নয় কিন্তু সময়ের বিবর্তনে ভুলক্রমে অনেকেই তাতে পবিত্রতার আবরণ যুক্ত করেছে।

[১০] *সুনানু ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং-২১৬০।*

# আন্তর্জাতিক ইসলামিক মানবিক আইন: একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি*

**প্রফেসর ড. মুহাম্মদ তাল'আত আল-গুনায়মী****

## মানবিক আইন ও মানবাধিকার আইন

আমার এ বক্তব্য ইসলামী আন্তর্জাতিক মানবিক আইন প্রসঙ্গে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত মত ও পথের আলোচনা দীর্ঘ ও গভীর। মানবিক সসীম জ্ঞান ও বিবেক যথাযথভাবে তা ধারণ করতে অক্ষম। কারণ এটি অতল সমুদ্র তুল্য। একজন ব্যক্তির পক্ষে এর গভীরতায় পৌঁছা এবং এ থেকে কতটুকু সম্পদ আহরণ করা সম্ভব? তবে এ বিষয়ে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে একটি সৎপ্রচেষ্টা ও নাতিদীর্ঘ বক্তব্য উপস্থাপন করার চেষ্টাই আমার জন্য যথেষ্ট। যেমন আরবরা বলে থাকে, পুরোপুরি জানতে না পারলেও সিংহভাগ জানতে ছেড়ো না।

## আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বলতে কী বুঝায়?

আন্তর্জাতিক আইনে দু'টি পরিভাষা প্রচলিত রয়েছে। একটি *মানবিক আইন* অপরটি *মানবাধিকার*। আমার মতে মানবাধিকার না বলে মানবিক অধিকার বলা উচিত। মানবিক আইন যেমন মানবিকতার সাথে সম্পৃক্ত তদ্রূপ মানবিক অধিকার আইনও মানুষের সাথে সম্পৃক্ত। পরিভাষা দু'টির ব্যবহার সম্পর্কে খোদ আইনবিদদের মধ্যেই মতভেদ রয়েছে। একদল আইনজ্ঞ এ বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাদের মতে *মানবিক আইন* হলো, আন্তর্জাতিক সেসব আইনের সমষ্টি, যা মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও জীবিকা অর্জনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। *মানবিক আইনের* আলোচ্য সংজ্ঞায় *মানবাধিকার আইনও* চলে আসে।

---

* ১৯৮২ সালে নভেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি ও আন্তর্জাতিক আইন সংস্থা, মিসর-এর যৌথ উদ্দোগে কায়রোতে আন্তর্জাতিক মানিবক আইন বিষয়ে প্রথম সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রবন্ধটি উপস্থাপিত হয়। প্রবন্ধটি আন্তর্জাতিক রেডক্রসের গবেষণা জার্নালে ১৯৮২ সালেই প্রকাশিত হয়। দ্রষ্টব্য: *গবেষণা জার্নাল*, পৃ. ১৭-৫৩।

** **প্রফেসর ড. মুহাম্মদ তাল'আত আল গুনায়মী:** প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান, আইন অনুষদ, আন্তর্জাতিক সাধারণ আইন বিভাগ, আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, মিসর। তিনি মিসরের একজন প্রখ্যাত আইনবিদ। আইন বিষয়ে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেন। বিশ্বের বিভিন্ন আইন সংস্থার সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। তিনি ইসলামী আইন ও মানবিক আইন বিষয়ে অসংখ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করে সমকালীন বিশ্বে একজন প্রতিষ্ঠিত আইনজ্ঞ হিসেবে বেশ খ্যাতি অর্জন করেন।

অপর একটি দল এর উল্টো ব্যাখ্যা দিয়ে মানবিক অধিকার আইনকে ব্যাপকতর মনে করেন এবং মানবিক আইনকে এর একটি শাখা হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন।

বাস্তবে পরিভাষা দু'টির অর্থ সম্পর্কে যে বিতর্ক রয়েছে তা একেবারেই দৃষ্টিভঙ্গিগত। এক্ষেত্রে এ পরিভাষার অর্থের ব্যাপারে আমাদের ঐকমত্যের প্রয়োজন। আমি মনে করি প্রত্যেক পরিভাষার পৃথক একটি অর্থ রয়েছে। অতএব আমার মতে *মানবিক আইন* হলো, সেসব আইন যা যুদ্ধের সময় এবং সশস্ত্র সংঘর্ষে মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করে। অন্যদিকে মানবাধিকার আইন বা মানবিক অধিকার আইন বলতে বুঝায় সে সব আইনকে যা শান্তি ও নিরাপত্তা তথা সাধারণ সময়ে মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত করে।

আমি যখন কথা বলছি ইসলামী আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বিষয়ে, তখনি আমার মনে একটি বিষয় খটকা লাগছে তাহলো, এটিকে *ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন* থেকে কীভাবে পৃথক করা যাবে? মানবিক শব্দ যুক্ত করে এটিকে কীভাবে বিভক্ত করা সম্ভব? যেখানে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন পুরোটাই মানবিক। কেননা ইসলাম শব্দের উৎপত্তি-ই হলো *সালাম* তথা শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবিকতা থেকে। অস্বীকার করব না যে,এ খটকা আমাকে বিব্রত করেছে। তবে আমি এটিকে একটি বাড়তি বিষয় মনে করে দুর করে দিয়েছি। কারণ আমি এমন একটি পরিভাষা নিয়ে গবেষণা করছি যাতে যুগের ভাষায় সংকীর্ণতা এসেছে। সালাম শব্দটি ইসলামের রূহ্ হলেও সামাজিক জীবনে শুধু শান্তি এর পূর্ণরূপ নয়; বরং এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে প্রতিযোগিতা ও দীর্ঘ সংগ্রাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

'আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রিস্টানদের) গির্জা, ইবাদত খানা, (ইয়াহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়।'[১]

মহান আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট বিভিন্ন পথ-পদ্ধতি, তাঁরই নির্ধারণ করা বিভিন্ন উপায়ে বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করা, কোনো সম্প্রদায়ের অকল্যাণকে অপরাপর সম্প্রদায় থেকে প্রতিহত করা দ্বারা মূলতঃ কল্যাণের পথ সুগম হয় এবং ক্ষতি নিরোধ

[১] সূরাহ্ আল-হাজ্জ: ৪০।

করা যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

'তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোনো একটি বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।'[২]

সুতরাং যুদ্ধ পার্থিব জীবনের একটি অংশ এবং একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা। আর ইসলাম দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের সকল সমস্যার সমাধান করে। ইসলাম হলো একটি জীবন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার নাম। সুতরাং এতে এতদসংক্রান্ত সকল বিষয় ও বিধি-বিধান সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খলিত থাকাটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। ইসলামই প্রথম হিদায়াত যা একটি বর্বর মানব জাতিকে আলোকিত করেছে। এটি এসেছে তাদের সামনে যারা যুদ্ধকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করার বস্তু মনে করত এবং শত্রুদের সাথে নূন্যতম ভালো আচরণ করত না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾

'আর সেদিন অনেক মুখমন্ডল হবে বিবর্ণ–বিষণ্ন। তারা ধারণা করবে যে, এক মহাবিপর্যয় তাদের উপর আপতিত করা হবে।'[৩]

একনিষ্ঠ ও পরধর্মে সহিষ্ণু এ জীবন ব্যবস্থা শত্রুদের সাথে যুদ্ধ সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীক ও রোমানীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন চিন্তা থেকে লোকদেরকে এমন আলোর পথে নিয়ে এসেছে, যে আলো বিকশিত হয়ে গোটা দুনিয়াকে স্বীকৃতি দিয়েছে শত্রুদের অধিকার এবং যোদ্ধাদের সুরক্ষা। শুধু গ্রীক-রোমানদের বর্বরতাকে লক্ষ্য করে ইসলামের যুদ্ধনীতি বড় ধরনের পরিবর্তন নিয়ে এসেছে ব্যাপারটি তা নয়; বরং বর্তমান দুনিয়ার মানুষ তাদের আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে চার শতাব্দীকাল যাবৎ অব্যাহত প্রচেষ্টা চালানোর পর ধ্বংসযজ্ঞ ও ভয়াবহতাকে যতটুকু কমিয়ে এনেছে সেটির তুলনায় ইসলাম তার যুদ্ধনীতির মাধ্যমে যে পরিবর্তন সাধন করেছে সেটি বাস্তবেই অনেক বড়।

---

[২] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ২১৬।

[৩] সূরাহ্ আল-কিয়ামাহ্: ২৪-২৫।

## সত্য কথা

একটি ইসলামী রাষ্ট্র কীভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং অন্য দেশের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করবে ইসলামী শরী'আত তার একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছে। আল-কুরআনে এ প্রসঙ্গে অনেক আয়াত এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী উল্লেখ করা যায়,

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾

'আর তাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে; আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে।'[৪]

উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্নু কাছীর বলেন, ইব্ন যুবায়র (রহ.)–এর সাথে সংঘটিত যুদ্ধের সময় দু'ব্যক্তিকে ইব্ন 'উমার (রা)-এর নিকট নিয়ে আসা হলো। তারা বলল সব মানুষ যুদ্ধে বেরিয়েছে অথচ আপনি 'উমার (রা)-এর পুত্র ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও ঘরে বসে রয়েছেন। যুদ্ধে যেতে আপনাকে কে বারণ করেছে? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন। অতঃপর তারা দু'জন তাকে যুদ্ধ করার নির্দেশনা সম্বলিত আয়াতটি ('আর তোমরা যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয়ে যায়') স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বললেন, আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ লিপ্ত হব যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভুত হয় এবং দ্বীন মহান আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। অথচ তোমরা যুদ্ধ করতে চাচ্ছো ফিতনা সৃষ্টির জন্য এবং *গাইরুল্লাহর* নামে দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য।

সুতরাং ইসলামে যুদ্ধের লক্ষ্য হবে দু'টির যে কোনো একটি: মুসলিমদের বসতবাড়ী যুদ্ধের ধ্বংস থেকে রক্ষা করা এবং তাদের দ্বীনকে ভূলুণ্ঠিত ও নিশ্চিহ্ন হওয়ার হাত থেকে হেফাযত করে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। আর এ জন্যই ইসলাম সম্মান ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা ও আত্মমর্যাদা সমুন্নত করার জোর প্রচেষ্টা চালায়। তাই কবি আহমাদ শাওকী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন:

الحرب في حق لديك شريعة * ومن السموم الناقعات دواء

৪ সূরাহ্ আল-হাজ্জ: ৪১।

'হকের জন্য আপনার যুদ্ধ হচ্ছে শরী'আত সম্মত, আর তা জীবন নাশকারী বস্তুর প্রতিষেধক।'

মহান আল্লাহ যুদ্ধের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরছেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾

'আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনার (সন্ত্রাসের) অবসান হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।'[৫]

## আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের দর্শন ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

উল্লিখিত বিষয়টিই যদি বাস্তবতা হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের ভূমিকা কী? আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের প্রকৃত ভূমিকা সুস্পষ্ট হবে না যতক্ষণ না এটিকে দু'টি বিপরীতমুখী বিষয়ের সামনে এনে তুলনা করা হবে। বিষয় দু'টি হলো, মানবিক মূল্যবোধ ও অত্যাবশ্যকতার দাবি। তন্মধ্যে মানবিকতা, দয়া ও ভালোবাসার দিকে আহ্বান করে। আর অত্যাবশ্যকতা শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করার প্রতি অনুপ্রাণিত করে। আন্তর্জাতিক মানবিক আইন তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে ততটুকু সফল হয়ে থাকে যতটুকু সে এ বিপরীতমুখী দুটি ধারার মধ্যে সমন্বয় করতে পারে। ইসলামী আন্তর্জাতিক মানবিক আইন কীভাবে এ দুটি বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় করেছে তা আমরা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছোট একটি বাক্যে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে বলে দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, انا نبي الرحمة وأنا نبي الملحمة 'আমি রহমতের নবী এবং আমি সংগ্রামের ও নবী।'[৬] এ হাদীছে পরস্পর বিপরীতমুখী দু'টি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে এবং এখানে রহমতকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হলো, একজন মুসলিম যোদ্ধার হৃদয়ে এ কথাটি-ই বদ্ধমূল থাকে যে, তার হাত হলো ইনসাফ প্রতিষ্ঠার হাত, ফাসাদ বা সন্ত্রাস সৃষ্টির তরবারী নয়।

শব্দ চয়নে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি সাধারণভাবে *রহমত* শব্দ ব্যবহার না করে *মারহামাহ* শব্দ উল্লেখ করে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালোবাসা ও দয়া বুঝিয়েছেন। এজন্য তিনি *মারহামা* শব্দকে *মালহামার* উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আর *মালহামাহ* শব্দের

---

৫ সূরাহ্ আল-আনফাল: ৩৯।

৬ ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪র্থ খন্ড, হাদীস নং-৩৯৫।

অর্থ মহাযুদ্ধ বা প্রচন্ড লড়াই হলেও শব্দটির তাৎপর্য এতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর অর্থ হলো, এমন যুদ্ধ যা ফিতনা-ফাসাদ দমন করার জন্য সংঘটিত হয়। সুতরাং *মালহামাহর* অর্থ কেবল বিজয়, দেশজয় বা ক্ষমতা অর্জন এতটুকুই নয়; বরং এর অর্থ হলো, ফিতনা ও সন্ত্রাস নির্মূল করা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। শব্দটির আরো একটি পারিভাষিক অর্থ রয়েছে যেমন, 'আরবরা বলে থাকে, لحم الأمر। বাক্যটি তখনই বলা হয়, যখন কেউ কোনো বিষয়কে অধিকতর শক্তিশালী করে এবং ঠিক করে নেয়। এটিই ইসলামে যে কোনো যুদ্ধের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। এটি-ই বলে দেয় যে, একজন মুসলিম যোদ্ধার আচরণ কেমন হবে। আলোচ্য ব্যাখ্যা-ই উল্লিখিত *মারহামাহ* ও *মালহামাহ* বিপরীতমুখী শব্দ দু'টিকে পাশাপাশি টেনে এনেছে।

একজন মানুষ তার ভাইয়ের সাথে প্রথম সাক্ষাতের দিন থেকেই বিরোধে লিপ্ত। আদম (আ) দুনিয়াতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করতে না করতে তাঁর এক সন্তান স্বীয় হাত দ্বারা আপন ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত করে ফেলে এ যমীন। মানবজাতির এ কলঙ্কিত বিবাদের ঘটনা শতাব্দীকাল যাবৎ চলে আসছে। যুগচক্রের ঘটনাবলী বলে দেয় যে, দ্বন্দ্ব ফাসাদের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন একটি জাতি প্রতিষ্ঠার ভিত রচিত হয় তদ্রুপ অপরদিকে যুদ্ধের মাধ্যমে একটি জাতির ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু সবাই আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উভয়টিকে রাজনৈতিক রং ব্যবহার করে একইভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। আর এখানে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের ভুমিকা হবে, যে যুদ্ধ কল্যাণ বয়ে আনবে তা যেন বিজয় লাভ করে।

সুইজারল্যান্ডের জন বকতী নামে একজন আইনজ্ঞ অল্প কথায় আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা ইতোপূর্বে কোথাও পাওয়া যায়নি। তিনি বিষয়টির মূলকথা তুলে ধরেছেন এভাবে, 'তুমি তোমার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ কর যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর।' আর আমরা জানি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

'তোমাদের কেউই মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অপরের জন্য তা না করে।'[৭]

সুতরাং উপরিউক্ত হাদীসের আলোকে বুঝা গেল যে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের দর্শনকে (পরোপকার) আবশ্যিকরূপে গ্রহণ করা ইসলামের দৃষ্টিতে ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা যা পঞ্চস্তম্ভের পর একটি শাখা। অন্যান্য ধর্ম-

[৭] *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং: ১৩।

দর্শন যখন ইসলামের সঙ্গে এ মৌলিক আদর্শে সম্পৃক্ত হয়েছে তখন এটি ধর্মোপদেশের রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু ইসলাম তো এটিকে শুধু নসীহত হিসেবে নয়; বরং এমন এক অবশ্যকরণীয় বাস্তব কাজ হিসেবে নির্দেশ করেছে; যাতে নেই কোনো সন্দেহ, নেই কোনো দ্বিধা।

যারা প্রাকৃতিক আইনের সমর্থক তারা মনে করে প্রকৃতিগতভাবেই সবকিছু আবর্তিত হয়। অন্য দিকে প্রচলিত আইনের প্রবক্তাগণ বলেন, পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে আন্তর্জাতিকভাবে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করে তা পূর্ণতা প্রদানের চেষ্টা চলছে, যেমন একটি ইটের উপর আরেকটি ইট বসিয়ে পূর্ণ গৃহ নির্মাণ করা হয়। সুইজারল্যান্ডীয় এ আইনবিদ এতদুভয়ের সঠিক রহস্য চিহ্নিতকরণে বেশ অবিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। এ বিষয়ে তিনি পশ্চিমা পণ্ডিতদের পথ অনুসরণ করেছেন, যারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনা  গ্রীক ও রোম সভ্যতা থেকে শুরু করেন, তারপর মধ্যযুগের ব্যাপারে গভীর ঘুমে অচেতন থেকে তারা সে যুগকে অন্ধকারের মোড়কে বেষ্টন করে আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছেন; তারা সে ঘুম থেকে ততক্ষণ জাগ্রত হয় নি যতক্ষণ না সেখানে করাঘাত করা হয়েছে। আর তারা সে করাঘাতে জাগ্রত হয়ে মনে করে বসেছে যে, এটিও বোধ হয় ইউরোপিয়ান। কারণ, একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি, যে পাশ্চাত্যের হাতে সভ্যতা-সংস্কৃতির চাবি-কাঠি তুলে দিয়েছে, সে কখনো মধ্যপ্রাচ্যের সভ্যতার আলো উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে না। মধ্যপ্রাচ্যে সভ্যতার যে আলো বিকশিত হয়েছিল, এ ঘুমন্ত ব্যক্তি কী করে এ সভ্যতা প্রত্যক্ষ করতে পারবে। বস্তুতঃ এটিই হচ্ছে ইসলামী সভ্যতা। এটি প্রথমেই সে সব বিধি-বিধানকে নির্দেশ করেছে যেগুলো আজ আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিষয়ে পরিগণিত হয়েছে। এর কিছু কিছু আইন ক্রুসেড যোদ্ধারা পশ্চিমা দেশগুলোতে স্থানান্তর করেছে। আর কিছু কিছু আইন বর্তমানে ইতালী ও স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হচ্ছে, যেখানে আজ আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের গবেষকগনের উৎপত্তি হচ্ছে।

আমি (প্রবন্ধকার) প্রবন্ধের মূল বিষয় থেকে দূরে না গিয়ে বিজ্ঞজনদের নিকট এ বিষয়ে প্রজ্ঞাচিত প্রমাণ উপস্থাপন করতে চাই। গ্রীক ও রোমান দর্শন যেখানে শত্রুদের জন্য সামান্যতম মর্যাদার জায়গা নেই, সেখানে তাদেরকে এ আইনের ঐতিহাসিক উৎস মনে করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ তারা আসলেই সেগুলো সম্পর্কে কিছু জানত না এবং সেসব নিয়মনীতিকে তারা কখনো বাস্তবায়নও করে নি।  আধুনিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইন হেনরী ডুনান নামে সুইজারল্যান্ডীয় এক ব্যক্তির অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৮৬৪ সালের এক চুক্তির মাধ্যমে প্রথম প্রণীত হয়। তবে চুক্তিতে স্থান পাওয়া বিষয়গুলোকে প্রচলিত মৌলিক আইন-কানুন থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়।

জেনেভা কনভেনশনের দু'টি পরিশিষ্টে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে, যেসব সমস্যা এ কনভেনশনের মাধ্যমে নিরসন সম্ভব হবে না তা প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকার আইন ও অভ্যন্তরীণ সামাজিক আইনে সমাধান করা যাবে। বস্তুতঃ এ প্রচলিত নিয়ম-নীতিগুলো প্রবর্তনে ইসলামী শরী'আতের অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়া ইসলামী শরী'আত জনগণের হৃদয়ের সূরকে বিভিন্নভাবে মেনে নেয়ার তাগিদ দিয়েছে। যেমন, আল-কুরআন পাপকে হারাম ঘোষণা দিয়ে বলে:

﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ﴾

'আর তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন পাপ ত্যাগ কর। নিশ্চয় যারা পাপ অর্জন করে, তাদেরকে অচিরেই প্রতিদান দেয়া হবে। তারা যা অর্জন করে তার বিনিময়ে।'[৮]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাপের পরিচয় দিয়ে বলেন, 'পাপ সেই কাজ, যা মানুষের হৃদয়ে খটকা সৃষ্টি করে এবং অন্য লোক সেটি জানুক এতে সে ভয় পায়।' আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ﴾

'বরং মানুষ তার নিজের উপর যথেষ্ট দৃষ্টিমান। যদিও সে নানা অজুহাত পেশ করে থাকে।'[৯]

বস্তুত: আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিধি-বিধানগুলো স্বভাবজাত। তবে ইসলামে তা এমন স্বভাবজাত যা পালন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি সেটির দাবি যথাযথভাবে পালন করা, মান্য করা, সম্মান করে চলাকে স্বীয় কিতাব আল-কুরআনে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-তাঁর হাদীসে মানুষের উপর ফরয ও আবশ্যক করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

'আল্লাহর প্রকৃতি, যে প্রকৃতির উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।'[১০]

---

[৮] সূরাহ্ আল-আন'আম: ১২০।

[৯] সূরাহ্ আল-কিয়ামাহ্: ১৪-১৫।

[১০] সূরাহ্ রূম: ৩০।

আর যদি বলা হয় যে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন হচ্ছে অত্যাবশ্যকতার দাবি, যার চাহিদা হচ্ছে, অন্যের কল্যাণকামিতা,তাহলে ইসলামী শরী'আতেই কেবল সেই সুযোগ বিদ্যমান। পশ্চিমা প তিরা এখনও তা বুঝতে পারে নি। আমি মনে করি তারা তা বুঝবেও না। ইসলামই নিজ প্রয়োজন সত্ত্বেও অপরের প্রয়োজনীয়তাকে প্রাধান্য দিতে উদ্বুদ্ধ করে এবং এটিকে ঈমানের মহৎ গুণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾

'এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়।'[১১]

এমনকি একজন মুসলিম যদি অত্যাবশ্যকতার নীতির আশ্রয় গ্রহণও করে অর্থাৎ স্বীয় প্রয়োজন মিটেয়ে ফেলে, তারপরও সেখানে তার অধিকার সুস্পষ্টভাবে সীমিত থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.﴾

'সুতরাং যে বাধ্য হবে, অবাধ্য বা সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তাহলে তার কোনো পাপ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[১২]

এ কারণেই অত্যাবশ্যক মুহূর্তেও একজন মুসলিমের প্রবৃত্তির অনুসরণ ও স্বেচ্ছাচারিতার কোনো সুযোগ নেই; বরং তখনও অবাধ্যতা ও পাপাচার থেকে দূরে থাকা প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.﴾

'আর সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় মহান আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।'[১৩]

একই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন,

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.﴾

'তবে কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে, তখন আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[১৪]

[১১] সূরাহ্ আল-হাশর: ৯।

[১২] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৭৩।

[১৩] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯০।

[১৪] সূরাহ্ আল-মায়িদা: ৩।

## কিছু স্বীকৃত বিষয়

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে কতিপয় জরুরী স্বীকৃত বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা বলতে চাই। এ বিষয় সংশ্লিষ্ট যে সব মূলনীতি রয়েছে তা মুসলিম অমুসলিম উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমনিভাবে তা প্রযোজ্য মুসলিমদের মধ্যে। কারণ ইসলাম মানুষকে তার দ্বীন, রং ও বংশের উর্ধ্ব থেকে বিবেচনা করে। ইসলাম মনে করে সকল মানুষ মহান আল্লাহর রূহের ফুৎকার এবং তাঁর নূর থেকে সৃষ্ট। এটি এমনই আসমানী সম্পর্ক যা মানুষকে এ ভূপৃষ্ঠে মহান আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত করে। এ আসমানী সম্পর্কের কারণেই ব্যক্তির সম্মান রক্ষা করার অর্থ হচ্ছে মহান আল্লাহর কুদরতকে সম্মানিত করা, যা প্রকারান্তে মানবতাকে মর্যাদাবান করেছে। সুতরাং এ ঘটনা বিস্ময়ের কিছু নয় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন একজন ইয়াহুদীর জানাযায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। আর সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন 'মৃত ব্যক্তি তো ইয়াহুদী, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেছিলেন, সে কি একজন মানুষ নয়? অতএব এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, আসমানী বিধান সকল মানুষকে একীভূত করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

'প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ কিংবা যমীনে ফাসাদ বা সন্ত্রাস সৃষ্টি করার কারণ ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল '[১৫]

## আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বিষয়ে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সশস্ত্র সংঘাত)

প্রবন্ধের ভূমিকা আর না বাড়িয়ে; বরং আন্তর্জাতিক মানবিক আইন সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনা শ্রেয় মনে করছি এবং এ ক্ষেত্রে সুইজারল্যান্ডীয় আইনবিদ জন বকতীর পদাঙ্ক অনুসরণ করাই যথার্থ মনে করেছি। প্রথমে আন্তর্জাতিক প্রচলিত মানবিক আইনের মৌলিক বিষয়াদির পাশাপাশি ইসলামী আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মৌলিক ভিত্তিগুলো উপস্থাপন করব। এসব সাধারণ মৌলিক

[১৫] সূরাহ্ আল-মায়িদা: ৩২।

ভিত্তি বা নীতিমালাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভূমিকা রয়েছে। কারণ এটি এমন একটি দর্শন, যা কোনরূপ জটিল ব্যাখ্যা ছাড়াই নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করে। এমনকি আইনটিকেও সমৃদ্ধ করে। ইসলামী পরিভাষায় সশস্ত্র লড়াই দু'ভাগে বিভক্ত: ঐতিহাসিক আল- মাওয়ারদীর ভাষায়, একটি হলো *কল্যাণকর স্বার্থ হাসিলের যুদ্ধ*, অপরটি হলো মুশরিক ও ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

## ক. যৌক্তিক যুদ্ধ বা কল্যাণকর স্বার্থ হাসিলের যুদ্ধ

আল-মাওয়ারদীসহ অনেক প্রাচীন আইন বিশেষজ্ঞ একমত যে, যুক্তিসম্মত যুদ্ধ তিন প্রকার, ১. মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ২. বিদ্রোহী ও খারিজী তথা সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্তদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ৩. ডাকাত ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আমার মতে এ প্রকরণ যথেষ্ট নয়। কারণ মুরতাদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও বলা যায়। অনুরূপ ডাকাত ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়াইকে যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করা সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ এরূপ লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। সুতরাং উল্লিখিত প্রকারসমূহের মধ্যে দু'টি বাদ দিলে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট কেবল এক প্রকার যুদ্ধই অবশিষ্ট থাকে, তা হচ্ছে বিদ্রোহী ও খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, আধুনিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে যা *অভ্যন্তরীণ সংঘাত* হিসেবে খ্যাত। তবে তা মৌলিকভাবে আন্তর্জাতিক হিসেবে ধরা যায় না। অথচ মুশরিক ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াইকে *অভ্যন্তরীণ সংঘাত* নামে আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় সশস্ত্র লড়াই হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এভাবে ইসলামী শরী'আতের সশস্ত্র লড়াইয়ের দু'প্রকারকে আধুনিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের দু'প্রকারের বিপরীতে উপস্থাপন করা যায়। মাওয়ারদী, আবূ ইয়া'লা ও তাদের সমর্থকগণ কল্যাণকর বা যৌক্তিক যুদ্ধের যে প্রকার প্রকরণ নির্দেশ করেছেন সে বিষয়ে কিছু বিশ্লেষণ নিম্নে উল্লেখ করছি:

## ১. মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

যে সব ব্যক্তি মুসলিম ছিল অতঃপর ইসলাম ত্যাগ করেছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে *কিতালু আহলির রিদ্দাহ* বলা হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের ব্যাপারে বলেছেন, مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ 'যে কেউ দ্বীন পরিবর্তন করবে তাকে তোমরা হত্যা কর।'[১৬] [উল্লেখ্য যে, এ হাদিসের নির্দেশনা বাস্তবায়নের অধিকার কোন ব্যক্তির নেই। কেবলমাত্র রাষ্ট্র প্রধান অথবা তাঁর

[১৬] *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং: ৩০১৭।

নিয়োগকৃত যথাযথ কর্তৃপক্ষ তা কার্যকর করতে পারেন। অন্যথায় নয়।]*

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ

‘তিনটির একটি কারণ ছাড়া কোনো মুসলিমের রক্তপাত বৈধ নয়, যে ঈমান আনার পর কুফুরী করে, বিবাহের পর ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং কিসাস ছাড়াই কাউকে হত্যা করে।[১৭]

মুরতাদদের ব্যাপারে বিধান হলো, যদি তারা সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে মুসলিমদের থেকে পৃথক না হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি তারা নিজ ধর্মে ফিরে আসে তবে তা গৃহীত হবে। *জিযিয়া* কর গ্রহণ বা চুক্তি করে তাদের আশ্রয় দেয়া বৈধ নয়। তাদের হাতে যবেহ করা প্রাণীর গোশত খাওয়া হালালও নয়। তাদের মেয়েদের বিয়ে করা বৈধ নয়। তবে একটি বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে সেটি হলো, এমন ব্যক্তিকে সাথে সাথে মেরে ফেলা হবে না কী তিন দিন পর্যন্ত ফিরে আসার জন্য সুযোগ দেয়া হবে? প্রকৃত অর্থে মৃত্যুর শাস্তি থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধের পরিবর্তে তাকে মানবিক আইন সম্পর্কে বুঝাতে হবে, তাকে বলতে হবে যে, এটি এমন একটি অপরাধ যার শাস্তি ভয়াবহ। এর অপরাধীকে তা প্রদান করা হবে। এ শাস্তির সম্পর্ক আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে মানবাধিকার আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে। শুধু মানবিক আইনের অধীনে নয়। তবে মুরতাদরা যদি মুসলিমদের থেকে আলাদা হয়ে কোনো এলাকায় পৃথক রাষ্ট্র গঠন করে ফেলে, বা এতটা ক্ষমতা অর্জন করে যে, তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা রাখে, তাহলে তাদের বিরদ্ধে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়বে। তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের মত নিম্নোক্ত চারভাবে যুদ্ধের বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে:

১. মুরতাদদের সাথে এরূপ চুক্তি বৈধ নয় যে, তারা মুসলিম এলাকায় নিরাপত্তা পাবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না।

২. মুরতাদদের সাথে এরূপ চুক্তি হতে পারে না যে, তারা নিজ অবস্থানে ঠিক থাকবে, যা *আহলুল হারবদের* সাথে হতে পারে।

৩. মুরতাদদের মধ্যে যারা যোদ্ধা তাদের দাস হিসেবে ব্যবহার করা বৈধ নয়, তবে অ-যোদ্ধাদের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। অথচ *আহলে হারবদের* মধ্যে যোদ্ধা ও অযোদ্ধা উভয়শ্রেণীর লোককে দাস বানানো যেতে পারে।

[১৭] *সুনানু আবী দাউদ*, হাদীস নং: ৪৫০২।

* দ্রষ্টব্য: ড.ওয়াহ্বাহ্ আয-যুহায়লী, *আল-ওয়াজিয ফীল ফিক্হিল ইসলামী* ২য় খণ্ড (দামিস্ক: দারুল ফিকর ২০০৬ খ্রি:) পৃ:৪১৯ - অনুবাদক

৪. মুরতাদদের থেকে প্রাপ্ত সম্পদ মুসলিমদের জন্য হালাল নয়, অথচ মুসলিমরা *আহলুল হারবদের* সম্পদের মালিক হতে পারবে। আর যারা ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী ইমামকে যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জানাবে বা বাধা প্রদান করবে তারাও মুরতাদদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এরূপ মুরতাদদের বিরুদ্ধেই আবূ বাকর (রা) যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

## দুই. রাষ্ট্রদ্রোহী ও খারিজী তথা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

যারা নতুন কোনো সৃষ্ট মত ও পথ অনুসরণ করে ন্যায়নিষ্ঠ ইমাম বা সরকার ও জনগণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে লিপ্ত হয় তাদেরকে *রাষ্ট্রদ্রোহী* বলা হয়। *খারিজী* বলতে যদিও দলত্যাগীদের বুঝায়, কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে *খারিজী* হলো তারাই যারা 'আলী (রা)-এর দলত্যাগ করেছিল এবং তার বিরুদ্ধে বের হয়েছিল, যখন তিনি মু'আবিয়া (রা) এর সাথে আপোষ-মীমাংসা করেছিলেন। আর তারা *হারুরা* নামক স্থানে একত্রিত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, এ কারণেই তাদেরকে *হারুরিয়া* নামেও আখ্যায়িত করা হয়। এদের নেতা ছিল 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আল-কাওয়া আল-ইয়াশকুরী ও শাবত আত-তামীমী। তারা 'আলীকে (রা)- বিব্রত করার চেষ্টা করছিল। যখন 'আলী (রা) মিম্বারে দাড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিছিলেন তখন তারা ঘোষণা দিয়ে বলছিল, '*আল্লাহ ছাড়া কারো ফয়সালা মানা বৈধ নয়।*' 'আলী (রা) উত্তর দিলেন, 'কথা ঠিক কিন্তু এর অপব্যবহার করা ঠিক নয়। তবে আমার উপর তোমাদের তিনটি হক রয়েছে। ১. আমরা তোমাদেরকে মসজিদে আল্লাহর যিকিরে বাধা দেব না ২. প্রথমে আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হব না। ৩. সরকারী কোষাগারে তোমাদের জন্য নির্ধারিত অধিকার '*ফাই*' প্রদানে বাধা দেব না।

তাদের ব্যাপারে বিধান হলো, যদি তাদের ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে ইমাম তাদের ভ্রান্ত আকীদা তাদের কাছে স্পষ্ট করে দেবেন, তাদের ভ্রষ্টতা সবার সামনে তুলে ধরবেন, যাতে তারা সঠিক বিশ্বাসের দিকে ফিরে আসার সুযোগ পায় এবং জাতির সাথে একাত্মতা পোষণ করে। এ ক্ষেত্রে যদি কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে তাহলে ইমাম বা রাষ্ট্র প্রধান তাকে পরিশোধনমূলক সাধারণ শাস্তি দিতে পারেন, কিন্তু হদ বা হত্যা নয়। এসব ক্ষেত্রে বিধান হলো, তাদের মতের স্বাধীনতা ততক্ষণ অক্ষুণ্ন থাকবে যতক্ষণ তারা চরমপন্থা অবলম্বন না করবে অথবা পেশী শক্তি প্রদর্শন না করবে। যদি তাদের থেকে এরূপ আচরণ প্রকাশিত হয় তাহলে তাদেরকে ইমাম পূর্বোক্ত শাস্তি দিতে পারেন। এটি ইমামের জন্য ফরয। এর সাথে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের কোনো সম্পর্ক নেই। এ বিধান তখন প্রযোজ্য হবে যখন তারা ন্যায়

প্রতিষ্ঠাকারীদের থেকে পৃথক হয়ে কোথাও একত্রিত হয় এবং এদের সঙ্গ ত্যাগ করে। তবে শর্ত হলো, তারা যুদ্ধ শুরু করবে না; বরং অনুগামী হয়েই থাকবে এবং রাষ্ট্রের হক আদায় করবে। এর প্রমাণ মিলে 'আলীর (রা)-এর খিলাফত কালে একটি দল তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করে, *নাহরাওয়ান* নামক স্থানে একত্রিত হয়ে বসতি শুরু করেছিল। 'আলী (রা) তাদের জন্য একজন কর্মকর্তাও নিযুক্ত করেছিলেন। ফলে একসময় তারা সবাই তার আনুগত্য করেছিল বটে, কিন্তু অবশেষে তারা তাঁকে হত্যা করল এবং আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল। এমনকি নিজেদের উপর অর্পিত রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বা অধিকারকে অস্বীকার করে বসল। সুতরাং কোনো দল যখন ইমাম তথা রাষ্ট্র প্রধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন তাদের ব্যাপারে বিধানও পরিবর্তন হবে। কারণ ইমামের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং সেটি কোনো নেতার অধীনে, ব্যক্তি কেন্দ্রিক হোক বা সমষ্টিগতভাবে হোক না কেন, তা গৃহযুদ্ধের একটি অংশ হিসেবে ধর্তব্য হবে। সে ক্ষেত্রে আনুগত্যে ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

'আর যদি মুমিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা কর এবং ন্যায় বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের ভালোবাসেন।'[১৮]

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বাড়াবাড়ি বা বিদ্রোহের অর্থ হলো, যুদ্ধের মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করা অথবা সন্ধি থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করা ৮ (আট) দিক থেকে মুশরিক ও মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে আলাদা:

১. বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্য হলো যুদ্ধ সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা, হত্যা করা উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু মুশরিক ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের লক্ষ্য হলো তাদেরকে বিধিসম্মতভাবে হত্যা করাও যেতে পারে।

[১৮] সূরাহ্ হুজুরাত: ৯।

২. বিদ্রোহীরা যদি সামনে আসে তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে। আর যদি তারা পিছু হটে ও মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। কিন্তু মুরতাদ ও মুশরিক যোদ্ধাদের ক্ষেত্রে উভয় অবস্থায় তাদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ।

৩. বিদ্রোহীদের মধ্যে অবস্থিত আহতদেরকে হত্যা করা বৈধ নয়, কিন্তু মুশরিক যোদ্ধা ও মুরতাদদের ক্ষেত্রে তাদের আহতদেরকে হত্যা করা বৈধ হবে কিনা? আমি সামনে বিস্তারিত উল্লেখ করব। যেমন উষ্ট্রীর যুদ্ধে 'আলী (রা) ঘোষণা দিয়েছিলেন, কেউ যেন পলায়নকারী ব্যক্তি ও আহতদের পেছনে না ছুটে এবং হত্যা না করে।

৪. বিদ্রোহীদের বন্দিদেরকে হত্যা করা যাবে না, তবে মুশরিক ও মুরতাদ বন্দিদেরকে হত্যা করা সম্পর্কে মতভেদ আছে যা আমি সামনে উল্লেখ করব।

এক্ষেত্রে বন্দিদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হবে, যদি বন্দিদের মধ্যে এমন বন্দি থাকে সে পুনরায় যুদ্ধে ফিরে আসবে না তাহলে এরূপ বন্দি ছেড়ে দেয়া যাবে। আর যদি তার ব্যাপারে এমন সন্দেহ হয় যে, সে সুযোগ পেলেই আবারও যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে তাহলে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে নযরবন্দি করে রাখা যাবে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দীর্ঘ সময় ধরে তাকে বন্দি করে রাখা বৈধ হবে না। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ তার প্রতিদ্বন্দ্বী কুতরী ইবন ফুজ্জাআর এক শিষ্যকে বন্দিদশা থেকে ছেড়ে দিলেন। কুতরী তাকে বলল, চলো আল্লাহর দুশমন হাজ্জাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। তখন লোকটি বলল, যে ছেড়ে দিয়েছে তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হাত অবশ হয়ে গেছে, যে ঘাড় মুক্ত করে দিয়েছে ঘাড় মুক্তকারীর কাছে তা বন্দি হয়ে গেছে।

৫. বিদ্রোহীদের সম্পদ গনীমত হিসেবে অধিগ্রহণ করা যাবে না। তাদের সন্তানদেরকে দাসও বানানো যাবে না। এ প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, '*দারুল ইসলাম*' তথা ইসলামি রাষ্ট্র হওয়ায় তার সম্পদ দখল করা হারাম, আর '*দারুশ শিরক কে*' তথা শির্কের দেশ তাতে যা রয়েছে তা (যুদ্ধের মাধ্যমে) গ্রহণের অনুমতি দেয়'। আর বিদ্রোহীদের এলাকাতো দারুল ইসলাম হিসেবেই গণ্য।

৬. বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সন্ধিভুক্ত অমুসলিম অথবা যিম্মী দ্বারা সহযোগিতা নেয়া যাবে না, কিন্তু অমুসলিম যোদ্ধা ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে তাদের সাহায্য নেয়া বৈধ ।

৭. রাষ্ট্র প্রধানের জন্য বিদ্রোহীদের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য নিরাপত্তা চুক্তি অথবা অর্থের বিনিময়ে সন্ধি করা বৈধ নয়। এতদসত্ত্বেও যদি কোনো চুক্তি

সম্পাদিত হয় তাহলে এ চুক্তি কার্যকর হবে না। যদি তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শক্তি না থাকে তাহলে শক্তি অর্জন করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর যদি সম্পদ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের সাথে সন্ধি করা হয় তাহলে এ সন্ধি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং অর্জিত অর্থ বা সম্পদের ক্ষেত্রে দু'টি অবস্থা লক্ষণীয়। যদি গৃহীত এ অর্থ *সাদাকাহ* ও *ফায়*-এর অর্থ হয় তাহলে তা বিদ্রোহীদেরকে ফেরৎ দেয়া যাবে না; বরং *সাদাকাহ্* ও *ফায়* নির্ধারিত খাত ও হকদারদের মাঝে বন্টন করে দিতে হবে। আর যদি এ সম্পদ বিদ্রোহীদের নিজস্ব অর্থ হয় তাহলে তা তাদেরকে ফেরৎ দেয়া তাঁর উপর অত্যাবশ্যক হয়ে পড়বে।

৮. বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বিশেষ যুদ্ধাস্ত্র তথা ক্ষেপনাস্ত্র ব্যবহার করা যাবে না, তাদের ঘরবাড়ী গাছ-পালা নষ্ট করা যাবে না। কারণ এ এলাকা দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত; যদিও এখানকার লোক বিদ্রোহী। বিদ্রোহীরা যদি সঠিকপন্থীদের (রাষ্ট্রের আসল সৈন্য ও সাধারণ নাগরিকদের) বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করে এবং নিরপরাধ বেসামরিক জনগণকে যিম্মী করে রাখে এবং সাধারণ জনগণ যদি নিজেদের প্রাণনাশের আশংকা করে তাহলে সেক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র ব্যবহার করে তাদেরকে নির্মূল করা বৈধ। কারণ, যখন একজন মুসলিমের জীবন অনিরাপদ হয়ে উঠে তখন তা প্রতিরোধের জন্য হত্যা ছাড়া যদি অন্য কোনো উপায় না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে হত্যাযজ্ঞও বৈধ বলে বিবেচিত হবে। এটিই অনুমোদিত একটি শরঈ' পথ।

বিদ্রোহীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত বাহন ও অস্ত্র-সস্ত্র তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে কী না? এ বিষয়ে বৈধ ও অবৈধ দু'ধরনের মত রয়েছে।

আমরা যাদেরকে *বিদ্রোহী* এবং *খারিজী* বলছি জেনেভা কনভেনশনের ৩ নং সাধারণ ধারায় তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তুলনামূলক আলোচনার জন্য ধারাটি পেশ করছি:

'কোনো সম্মানিত চুক্তিভুক্ত দেশে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হলে; যদি তা আন্তর্জাতিক রূপ না গ্রহণ করে, তখন সেখানে প্রত্যেক পক্ষের উপর অবশ্য কর্তব্য হবে নিম্নোক্ত বিধানগুলো বাস্তবায়ন করা:

১. যারা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে শরীক হবে না বা অস্ত্র সমর্পন করবে অথবা অসুস্থতা, আহত বা বন্দি অথবা অন্য কোনো কারণে যুদ্ধ থেকে দূরে থাকবে, তাদের সাথে সর্বাবস্থায় মানবিক আচরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে

ধর্ম-বর্ণ, লিঙ্গ-বংশ, ধনী-গরীব বা অনুরূপ কিছুর যেন তার সাথে আচরণে প্রভাব না ফেলে তার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।

উক্ত কারণে নিম্নোক্ত কাজগুলো নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে এবং উপরিউক্ত ব্যক্তিগণের বিষয়টি সব সময় এবং সকল স্থানে বিবেচনায় রাখতে হবে। নিষিদ্ধ কার্যাবলী হলোঃ

ক. কোনো জীবন বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে বর্বর কোনো কাজ করা যাবে না, বিশেষতঃ হত্যা, অঙ্গহানি বা কঠিন শাস্তি প্রদান এসব কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

খ. সম্পদ অধিগ্রহণ করা যাবে না।

গ. মানবিক মর্যাদায় হস্তক্ষেপ করা যাবে না, কাউকে হেয় বা হেনস্থা করা যাবে না।

ঘ. সভ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য বিচার-ব্যবস্থা, যাতে সর্বপ্রকার সুবিচারের গ্যারান্টি রয়েছে এমন কোনো বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই কারোর উপর শাস্তি আরোপ করা যাবে না।

২. আহত ও অসুস্থদের একত্র করা হবে এবং তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।

আন্তর্জাতিক আইনের উৎকর্ষ সাধনে ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত জেনেভা সম্মেলনে যে দু'টি এডিশনাল প্রটোকল গৃহীত হয়েছিল তার দ্বিতীয়টি ছিল উপরিউক্ত শ্রেণির জন্য, যদিও তাদের সুরক্ষা প্রদান ও তাদের স্বার্থে বিধি-প্রণয়নে আন্তরিকতা ছিল। তদুপরি এ এডিশনাল প্রটোকলটি এমনভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে যে, যে কেউ দৃঢ়ভাবে বলতে পারেন *জীবন্ত সমাহিত শিশুর ন্যায় এ প্রটোকলটির সূচনা হয়েছে*। (অর্থাৎ এর উপর কেউ আমল করছে না)

পূর্বে উল্লিখিত ধারার সাথে এক্ষেত্রে উপরিউক্ত এডিশনাল প্রটোকলটির ব্যাপারে এটি বলা যায় যে, এর মৌলিক গ্যারান্টি কেবল যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি অথবা সীমালঙ্ঘনমূলক কাজেও সংশ্লিষ্ট নয় তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আহত, অসুস্থ ও ডুবন্ত ব্যক্তিরা এ শ্রেণিভুক্ত। এছাড়া এতে বেসামরিক লোক ও শিশুদের ক্ষয়-ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য কিছু পথনির্দেশ যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এর রক্ষণাবেক্ষণ ও জামানতের বিষয়টি, আন্তর্জাতিক সশস্ত্র যুদ্ধ আইনেও রয়েছে। বিধায় এখানে আর বিস্তারিত আলোচনা যৌক্তিক মনে করছি না।

এ পর্যায়ে আমাদের উচিৎ হবে ‘আলী (রা) ও মু‘আবিয়া (রা)-এর মধ্যে দ্বন্দ্বের সময় ‘আলী (রা) নিজ যোদ্ধাদের কী বলেছিলেন তা তুলনা করা। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন,

إذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل ولا تهتكوا سترا ولا تدخلوا دارا الا بإذن ولا تأخذوا من أموالهم شيئا ولا تعذبوا النساء بأذى وإن شتمنكم وشتمن أمراءكم واذكروا الله لعلكم تعلمون.

‘যখন তোমরা তাদেরকে পরাজিত করবে তখন পলায়নকারীদেরকে হত্যা করবে না, আহতদের উপর চড়াও হবে না, নিহতদের উলঙ্গ করবে না, লাশ বিকৃতি করবে না, অনুমতি ছাড়া কারো গৃহে প্রবেশ করবে না, কারো সম্পদ হরণ করবে না, মহিলাদের শাস্তি দেবে না, যদিও তারা তোমাদেরকে এবং তোমাদের নেতৃবৃন্দকে গালি দেয়। সর্বক্ষেত্রে তোমরা মহান আল্লাহকে স্মরণ করবে; যাতে তোমরা জানতে পার।’

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য প্রণীত বিশেষ নীতিমালা; যা কোনো আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করে নি, তা যেন লজ্জার সাথে টিকে আছে। আন্তর্জাতিক সশস্ত্র যুদ্ধের অন্যান্য নীতিমালার তুলনায় এটি একেবারেই নিম্নমানের; বরং মূল জেনেভা চুক্তির পর এ বিষয়ে দু’টি এডিশনাল প্রটোকল গ্রহণ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আন্তর্জাতিক রূপ গ্রহণ করেনি এমন সশস্ত্র যুদ্ধের ব্যাপারে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করা। ইসলামে এর ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে বিদ্রোহী ও খারিজীদের সাথে যুদ্ধ একটি স্পর্শকাতর ইস্যু, যাতে যুদ্ধকালীন সময়ে তাদের সুরক্ষাদানের জন্য যে সব নীতিমালা ও গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে, সে তুলনায় মুশরিক ও মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ, যা আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করে, তাতে এ ধরণের গুরুত্ব দেয়া হয় নি।

## তিন. ডাকাত ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

এরা হলো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এমন দল, যারা একত্রে ডাকাতি, ধন-সম্পদ লুণ্ঠন, মানব হত্যা ও অপরাধমূলক কাজ করে থাকে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ﴾

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমীনে বিপর্যয় বা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি কেবল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে; কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। এটি তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে বড় শাস্তি।'[১৯]

ইমাম আবূ ইয়া'লার মতে এরূপ ব্যক্তিদের শাস্তি তাদের বিশেষণের উপর ভিত্তি করে নয়; বরং তাদের অবস্থার উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হবে। সুতরাং তাদের যদি কেউ হত্যা করে ও সম্পদ হরণ করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে এবং শূলে চড়ানো হবে অথবা কেউ হত্যা করেছে, কিন্তু সম্পদ লুণ্ঠন করেনি তাহলে তাকেও হত্যা করা হবে, শূলে চড়ানো হবে না। কেউ অস্ত্রবাজি করেছে কিন্তু সম্পদ কেড়ে নিতে পারেনি, তাকে *তা'যীরী* শাস্তি স্বরূপ এক শহর থেকে অন্য শহর এবং এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে নির্বাসন দেয়া হবে।

অন্য দিকে ইমাম আল-মাওয়ারদী বলেন, ফকীহগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনটি মতে বিভক্ত হয়েছেন:

১. আবূ ইয়া'লা যেটি বলেছেন।

২. উল্লিখিত চার প্রকারের শাস্তির মধ্যে যে কোনো একটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। ইমাম বা শাসক এ ব্যাপারে যা উপযোগী মনে করেন তা-ই প্রয়োগ করতে পারবেন।

৩. তাদের মধ্যে যে পরিকল্পনাকারী তাকে হত্যা করা হবে, যে পেশীশক্তি সম্পন্ন বিপরীত দিক থেকে তার হাত পা কেটে দেয়া হবে। এরপর যারা তাদের মধ্যে দুর্বল তাদেরকে *তা'যীরী* শাস্তি প্রধান করা হবে এবং গ্রেফতার করা হবে।

উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে প্রতিভাত হয় যে, এটি পূর্বোল্লেখিত যুদ্ধের এমন একটি প্রকার, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই। এজন্য এর কার্যকারিতা ফৌজদারী আইনের অধীনে রাষ্ট্র তার নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো প্রদেশ ও তার জনগণের উপর প্রয়োগ করবে। আর আয়াতে বর্ণিত কঠোর শাস্তিটি মূলত: অপরাধের কঠোরতার সাথে সম্পৃক্ত হবে; যেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। অনেকের মতে উল্লিখিত আয়াত '*উরায়না* অথবা '*উকল* গোত্রবাসী, যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাখালকে হত্যা করে সম্পদ লুট করে নিয়ে গিয়েছিল এবং

---

[১৯] সূরাহ্ আল-মায়িদা: ৩৩।

মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল তাদের জন্য নাযিল হয়েছিল। আবার অনেকের মতে আয়াতে *মুহারিব* দ্বারা উদ্দেশ্য রাস্তা-ঘাটে ছিনতাইকারী। আবার কেউ কেউ বলেছেন এর দ্বারা যারা দিনে-রাতে শহর ও বিভিন্ন অঞ্চলে অস্ত্র বাজিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর *ফাসাদ* বলতে বুঝানো হয়েছে ব্যভিচার, চুরি, হত্যা, শস্য, বংশ ইত্যাদি নষ্ট করা।

## খ. মুশরিক ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

এ পর্যায়ে আমি আন্তর্জাতিক সশস্ত্র যুদ্ধ-তথা মুশরিক ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রসঙ্গে আলোচনা করব। যেমনটি আমি ইতোপূর্বে বলে এসেছিলাম। এখানে এরূপ সশস্ত্র যুদ্ধের বিধি-বিধানের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক দিক সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, প্রচলিত আইনের সকল প্রাথমিক ও মৌলিক বিষয়গুলো ১৮৬৮ সালের *সেন্টপিটার্সবার্গ* ঘোষণার ভূমিকা থেকে নেয়া হয়েছে। সেখানে যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে, শত্রুদের লড়াই করার ক্ষমতা হ্রাস করা যুদ্ধের মূল লক্ষ্য। এ কারণেই যেসব কর্মকাণ্ড এ লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সাথে মিলে যাবে তা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আর যে সব কাজে সীমা লংঘিত হবে সেটি প্রচলিত হোক কিংবা না হোক সেগুলো মানবিক ও মনের চাহিদার বিপরীত হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এ অর্থেই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. ﴾

'আর লড়াই কর আল্লাহর পথে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।'[২০]

এখানে আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের লক্ষ্য উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত ঘটাতে নিষেধ করেছেন এবং একে সীমালঙ্ঘন হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন যা তিনি অপছন্দ করেন। আলোচ্য আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে যুদ্ধের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছে। সেটি হলো সীমালঙ্ঘন প্রতিহত করা। আর এখানে عدوان ('উদওয়ান) শব্দের ব্যবহার جوامع الكلم (জাওয়ামি'উল কালিম) বা '*স্বল্পশব্দ অথচ ব্যাপক অর্থপূর্ণ বাক্য*' হিসেবে বিবেচিত। এজন্য মুফাসসিরগণ বলেছেন, এর মাঝে ঐ সকল কাজ অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো করা থেকে মুসলিম মুজাহিদদেরকে বারণ করা হয়েছে। কিছু পর আমি এর বিস্তারিত আলোচনা করব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[২০] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯০।

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একটি দুর্বল গোত্রের সাথে শক্তিশালী একটি গোত্র যুদ্ধে লিপ্ত হলো এবং দুর্বল গোত্রের লোকেরা যুদ্ধে জয়ী হলো। এতে তারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শত্রুদের আক্রমণ করতে উদ্যত হলো। আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত ব্যক্তিদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর অভিশাপ দিলেন। ইব্ন কাছীর বলেন, হাদীসটি হাসান। এর অর্থ হলো, দুর্বলরা যখন সবলদের উপর প্রবল হলো তখন তারা সীমালঙ্ঘন করে ফেলল। এ কারণে তারা মহান আল্লাহর বিরাগভাজনে পরিণত হলো। এ বিষয়ে অনেক আয়াত ও হাদীসের বাণী রয়েছে, পুনরাবৃত্তি ঘটবে বিধায় এখানে তা উল্লেখ করছি না।

এটিই হল সাধারণ মূলভিত্তি; যার মাধ্যমে অসংখ্য ছোট ছোট বিধি-বিধান বেরিয়ে আসে, যা রাষ্ট্রের স্বাধীন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে কিছু শর্তারোপ করে। আমি সে শর্তগুলোকে ৩টি শিরোনামে আলোচনা করব:

১. অস্ত্রের ব্যবহার

২. রণাঙ্গনে শত্রুদের সাথে আচরণ

৩. বন্দিদের সাথে আচরণ

নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উক্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো:

## ১. অস্ত্রের ব্যবহার

সুস্থ মানবিক চিন্তা যুদ্ধে যথাসম্ভব সামরিক অস্ত্রের ভয়াবহ ব্যবহার কমানো বা হ্রাস আশা করে। এতদুদ্দেশ্যে স্থিরকৃত একটি বিধান হলো, যুদ্ধের ময়দানে যোদ্ধাদের অস্ত্র ব্যবহারের অধিকার অসীম নয়। যুদ্ধে সেসব অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ যা শত্রুপক্ষের লোকদের জন্য বিনা প্রয়োজনে কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রবর্তিত হয়নি যা বিষয়টিকে অধিকতর স্পষ্ট করে। এ বিষয়ে একটি সাধারণ নীতিমালার সন্ধান পাওয়া যায়, যার ভাষা অত্যন্ত দুর্বল। এ নীতিমালায় একটি নতুন ধারা হলো, যা প্রথম এডিশনাল প্রটোকল বা প্রথম অতিরিক্ত সংযোজনীতে ৩৫ও ৩৬ নং অনুচ্ছেদে এবং দ্বিতীয় এডিশনাল প্রটোকল বা দ্বিতীয় অতিরিক্ত সংযোজনীতে ১৩ নং ধারায় উল্লিখিত হয়েছে। এ ধারাগুলো সম্ভবত: ১৯০৭ সালের চতুর্থ হেগ চুক্তির ২২ও ২৩ নং ধারার প্রতিফলন। ধারাগুলোতে দুটি বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

**প্রথমত:** অস্ত্র ব্যবহার ও কৌশল নির্ধারণে কোনো পক্ষেরই অধিকার অসীম নয়। এর দ্বারা বুঝা যায় এটি কোনো আবশ্যকীয় আইন নয়; বরং এক প্রকার উপদেশ যা আবশ্যিক হিসেবে গ্রহণ করা কাম্য।

**দ্বিতীয়ত:** কিছু বিশেষ অস্ত্র রয়েছে যা শত্রুদের অযথা কষ্টের কারণ হয় অথবা মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয় সেসব অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ। বিধানটি রাষ্ট্রের প্রবল ইচ্ছার সামনে খুবই দুর্বল। কারণ সেখানে ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্রের নাম উল্লেখ না করে এমনভাবে বিধানটি প্রণীত হয়েছে, কোনো কোনো দেশ কর্তৃক যার অপব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর কিছু লোক বলেন, ১৮৬৮ সালের *সেন্টপিটার্সবার্গ*-এর ঘোষণা রাষ্ট্রকে একটি নীতি নির্ধারণে শর্তারোপ করে তাহলো, যুদ্ধে কেবল সেসব অস্ত্রই ব্যবহার করা যাবে, যা বিরোধী পক্ষকে লড়াইয়ে অক্ষম করে দিতে পারে। এ বিষয়ে আমার একটি প্রশ্ন রয়েছে, কোনো রাষ্ট্র *স্যান্ট বুট্রসবার্গের* ঘোষণার আওতায় থেকেও এ অস্ত্র প্রয়োগের সীমাকে তার ইচ্ছা অনিচ্ছার বিষয় মনে করার ধৃষ্টতা কীভাবে প্রদর্শন করতে পারে? এবং কীভাবে এটি ভঙ্গ করতে পারে? অথচ এ ঘোষণার ভাষা অবশ্য পালনীয় হিসেবে উক্ত রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়েছে। এর দ্বারা মানবিকতা তার দয়া প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কি অগ্রগামী হবে? না কি শক্তিশালী হওয়ার পর বিপরীতমুখি হয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে?

জীবন বিধ্বংসী, বিষাক্ত গ্যাস এবং জীবানু ও রাসায়নিক গ্যাস প্রয়োগ নিষিদ্ধকারী ১৯২৫ সালের জেনেভা প্রটোকলের মত অনেক আন্তর্জাতিক চুক্তিকে উপেক্ষা করছি বলে অনেকেই আমাকে দোষারোপ করতে পারেন। কিন্তু আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে, কার্যত: এ সকল অস্ত্র প্রয়োগ ও এর আগুনে মানবতা ভস্ম হওয়ার পরেই এগুলো নিষিদ্ধ হওয়ার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সম্ভবত: বিশ্ব এর চেয়েও আরো ভয়ানক অস্ত্রের সন্ধান পাওয়ার পরেই এগুলো নিষিদ্ধের চুক্তি প্রণীত হয়েছে। এক্ষেত্রে আজ আমরা আনবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণের বায়জান্টাইন ধারণা প্রত্যক্ষ করছি। আধুনিক অস্ত্র প্রয়োগে সমর্থ রাষ্ট্রসমূহের সম্মানে প্রথম এডিশনাল প্রটোকলের ৩৬ নং ধারা পরিত্যক্ত হলে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। এ ধরনের সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রসমূহের ঐকমত্য উপেক্ষা করা কতই না হতাশার বিষয়।

এখানে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা অনেক দীর্ঘ করেছি। কিন্তু আমি সুস্পষ্ট করতে চাই যে, এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের উদ্যোগ বুদবুদের চেয়ে বেশি কিছু নয়, যার নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বেই তা ফেটে যায়। আমাদের প্রবল ধারণা যে, বিষয়টি সনাতন মুসলিম ফিক্হবিদদের মনে তেমন গুরুত্ব পায় নি, সুতরাং এ নিয়ে তাদের কোনো চিন্তাও ছিল না। প্রচণ্ড ক্ষতিকর ও ব্যাপক বিধ্বংসী যে অস্ত্রের কথা আমরা বলছি তৎকালীন যুদ্ধে এরূপ ক্ষতিকর অস্ত্রের প্রয়োগ করা হতো না। যেহেতু তাদের সামনে এরূপ অস্ত্র প্রয়োগের কোনো ঘটনা ঘটেনি সেহেতু এ বিষয়ে তাদের ধারণাও ছিল না।

এ পর্যায়ে আমি আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের কার্যকারিতার কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করব। আগের যুগে যেহেতু এসব আধুনিক অস্ত্র ছিল না তাই ফিক্‌হবিদগণকে এসব নিয়ে চিন্তাও করতে হয়নি। তারপরও অনেকে মনে করেন বিষয়টি তাদের নিকট গোপন ছিল না। যেমন মালিকী মাযহাবের ফকীহ্ ইমাম খলীল (রহ.) -এর *আল-মুখতাসার* গ্রন্থে জিহাদ সম্পর্কে যে আলোচনা এসেছে তাতে পাওয়া যায় যে, 'যুদ্ধে সেসব অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ যা ব্যবহার করলে শত্রুপক্ষের এমন ক্ষতি হবে যে ক্ষতি প্রতিপক্ষের উপকারের চেয়ে অনেক বেশী। উদাহরণস্বরূপ তিনি সে সময়ের তীরের অগ্রভাগে বিষাক্ত পদার্থ মিশিয়ে শত্রুদের প্রতি নিক্ষেপ করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। এখানে ফিক্‌হী বিধান প্রবৃত্তির বিরুদ্ধচারণ করে অস্ত্র ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। ফিক্‌হ শাস্ত্র সময়ের প্রেক্ষিতে বিধান আরোপ করে। ইসলাম কাউকে (সঙ্গত কারণে) হত্যা করার নির্দেশ দিলেও এ কাজে বাড়াবাড়ি করা হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا.

'তোমরা সে প্রাণকে হত্যা করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সঙ্গত কারণ ছাড়া। যে অন্যায়ভাবে নিহত হয় আমি অবশ্যই তার অভিভাবককে ক্ষমতা দিয়েছি। সুতরাং হত্যার ব্যাপারে যে সীমালঙ্ঘন করবে না, নিশ্চয় সে হবে সাহায্যপ্রাপ্ত।'[২১]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক যুদ্ধে যাওয়ার সময় তাদেরকে নির্দেশ দিলেন,

إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ: إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا

'যদি ওমুক ও ওমুককে হাতের নাগালে পেয়ে যাও তাহলে তাদের জ্বালিয়ে দেবে। এরপর আমরা যখন বের হওয়ার ইচ্ছে করলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাদের তাদের দু'জনকে জ্বালিয়ে দেয়ার কথা বলেছিলাম সেটি করবে না; বরং হত্যা করেই ক্ষ্যান্ত হবে। কাউকে আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়া কেবল মহান আল্লাহর কাজ।'[২২] হাদীছে বর্ণিত, '*জ্বালিয়ে দেয়া থেকে হত্যায় ফিরে আসা*' প্রমাণ করে যে, যুদ্ধের সময় শত্রুদের অপ্রয়োজনীয় শাস্তি দেয়া হারাম।

[২১] সূরাহ্ আল-ইসরা: ৩৩।

[২২] *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং: ৩০১৬

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক কাজে ইহসান ও ইনসাফের নির্দেশ দিয়েছেন। এই মর্মে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বিষয়টি আরো সরাসরি কোন দলিলের প্রয়োজনীয়তা রাখে, যা আমরা বর্ণনা করব, তবে ইমাম খলীল (রহ.)-এর মতামতের ভিত্তিতে বলা যায় যে, এসব সমরাস্ত্র যা ক্ষতিকারক সেগুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনা ও নাম উল্লেখ করে তা নিষিদ্ধ করা বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে সমসাময়িক আইন অপেক্ষা ইসলামি আইন অধিক সামঞ্জস্যশীল। ‘উমার (রা) যুদ্ধের ময়দানে শত্রু হত্যায় বেশি নৈপূণ্যতার জন্য খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে দায়িত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, ‘খালিদের তরবারী বেশি রক্তযুক্ত’। ‘আমর ইব্‌নুল আসের যুদ্ধে স্বল্প হতাহতের জন্য মুগ্ধ হয়ে ‘উমার (রা) বলেছিলেন, ‘এটি বন্ধুসুলভ যুদ্ধ’। পাশ্চাত্য সভ্যতা মানবতার যুদ্ধ ও সংঘাতের ক্ষেত্রে আজ যে বিষয় নিয়ে গর্ব করে তার চেয়ে ইসলাম প্রতিপক্ষকে কষ্ট না দিয়ে তাকে সুরক্ষার যে নীতি প্রণয়ন করেছে তা থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত। ইবনু হাতিম-এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

‘যখন তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে তখন তার চেহারাকে নিশানা বানাবে না; কারণ আল্লাহ তা‘আলা আদম (আ)-কে নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।[২৩] সুতরাং নিরূপায় না হওয়া পর্যন্ত চেহারায় আঘাত করা হারাম।’

কেউ যেন এ বিষয়ে ‘আলী (রা)-এর ঘটনা উল্লেখ করে বিভ্রান্ত না হয় যে, তিনি কোনো এক গোত্রকে আগুনে জ্বালিয়েছিলেন। এরা ‘আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সাবা ইয়াহুদীর অনুসারী *সাবাইয়্যা* নামে পরিচিত। তারা বলত, আল্লাহ তা‘আলা ‘আলী (রা)-এর মাঝে অবস্থান করেন। এটি ছিল মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার বাণী। এ প্রসঙ্গে ড. ত্বহা হুসাইন তার *আল-ফিতনাতুল কুবরা* গ্রন্থে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে উপর্যুক্ত দাবি খণ্ডন করেন। তিনি বলেন, ইমাম তাবারী ও তার অনুসারী কিছু মুফাস্‌সির ব্যতীত কিছু মুহাদ্দিছ ও *আসহাবুল জাদাল* এ মত পোষণ করেছেন যে, ইবনুস্ সাওদাহ্ ও তার অনুসারীরা ‘আলী (রা)-কে ইলাহ্ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আর তিনি তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, ইতিহাসের পাতায় এরূপ কোনো ঘটনা পাওয়া যায় না। ইসলামের প্রথম যুগে কোনো গোত্রকে পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনাও ঘটে নি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণও এরূপ কাজ করেন নি। এ প্রসঙ্গে আমি (প্রবন্ধকার) আল্লাহ তা‘আলার বাণী যা মূসার (আ) ভাষায় বলেছিলেন তা সংযুক্ত করতে চাই:

[২৩] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং: ২৬১২

﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴾

'মূসা বলল, হে আমার রব, আপনি যেহেতু আমার প্রতি নিয়া'মত দান করেন, তাই আমি কখনো আর অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।'[২৪]

অনুরূপভাবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এমন পদ্ধতিতে অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ, যাতে যোদ্ধা ও সাধারণ মানুষ এবং সামরিক লক্ষ্যমাত্রার বাইরে নির্বিচারে বেসামরিক জনগণ আক্রান্ত হয়। এ কারণেই প্রতিটি যোদ্ধার কর্তব্য হলো আক্রমণের পূর্বে দু'টি বিষয় নিশ্চিত করা:

ক. যোদ্ধা ও সাধারণ জনগণের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা, যাতে একমাত্র লক্ষ্য হয় যোদ্ধা।

খ. লক্ষ্য স্থির করার পূর্বে সামরিক ও বেসামরিক লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে নেয়া এবং নিজের নিশানা কেবল সামরিক বাহিনী হিসেবে স্থির করা। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও স্পষ্ট দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক যুদ্ধে কতিপয় লোককে এক জায়গায় একত্রিত হতে দেখে একজনকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, দেখে এসো, এ লোকেরা ওখানে কী করছে? সে ফিরে এসে জানায় যে, একজন নিহত নারী পড়ে আছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এ নারীতো যুদ্ধের জন্য আসে নি।' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বক্তব্য স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, রণাঙ্গনে সামরিক ও বেসামরিক লোকের মাঝে পার্থক্য করা এবং এমন অন্ধ পদ্ধতি অবলম্বন থেকে বিরত থাকা অনস্বীকার্য যা নির্বিচারে সবাইকে লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করে।

আক্রমণে এমন নীতি অবলম্বন করা থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারণ করেছেন, যার শিকার হতে পারে বেসামরিক মানুষ ও সাধারণ জনগণ। কোনো এক যুদ্ধে ঘটনাক্রমে মুসলিমদের আক্রমণের শিকার হয় কতিপয় অমুসলিম শিশু। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচন্ড রাগান্বিত হন এবং বলেন, এদের কী হলো যে, তারা হত্যার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করলো, এমনকি শিশুদেরকেও হত্যায় উদ্যত হলো?

এ কারণে মুসলিম যোদ্ধার জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে এমন পর্যায়ে যাওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, যে ক্ষেত্রে যোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের মাঝে পার্থক্য

---

[২৪] সূরাহ্ আল-কাসাস: ১৭।

নিরূপণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ইসলামী পরিভাষায় যোদ্ধা তাকেই বলা হয়, যে যুদ্ধ করার যোগ্যতা রাখে, চাই সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুক আর না করুক। বিশেষত: যখন প্রতিপক্ষের মাঝে কোনো বেসামরিক মুসলিম অবস্থান করে তখন মুসলিম যোদ্ধাকে অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে হয়; যাতে কোনো মুসলিম তার আক্রমণের শিকার না হয়। ফলে সে গোনাহে পতিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾

'(মক্কায় সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের অভ্যন্তরে) কিছু সংখ্যক বিশ্বাসী পুরুষ ও নারী না থাকলে, যাদের সম্পর্কে তোমরা জান না, (তাহলে যুদ্ধ হয়েই যেতো) কারণ এতে তোমরা তোমাদের অজ্ঞাতসারে তাদের হত্যা করে ফেলতে, ফলে তোমরা মানসিক গ্লানিতে আক্রান্ত হতে।'[২৫]

যোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের মাঝে পার্থক্য করার জন্য যোদ্ধারা বিশেষ পোষাক পরিধান কিংবা ব্যাজ ধারণ করতে পারে। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও যুদ্ধ অভিযানে '*আবায়াহ*' তথা হাতা বিহীন পশমের তৈরি এক ধরনের বিশেষ পোষাক পরিধান করতেন। তবে এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সময়ে যুদ্ধে সৈন্যদের পরিধেয় পোষাক নির্ধারণ সম্পর্কে লক্ষণীয় কোনো প্রয়াস ছিল বলে প্রমাণিত হয় না। সম্মিলিতিভাবে বদর যুদ্ধেই কেবল মুসলিম সৈন্যরা পশমী পোষাক পরিধান করেছিল। আল-তাবারী স্বীয় তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, '*বদরের দিন মুসলিমদের পরিধেয় বস্ত্র ছিল পশমের তৈরি।*'

আক্রমণের সময় লক্ষ্য নির্ধারণে সামরিক ও বেসামরিক এরিয়ার মাঝে পার্থক্য করার আবশ্যকীয়তার ক্ষেত্রে ইমাম শাফি'ঈ (রহ.)-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'কামান (পাথর নিক্ষেপণ যন্ত্র) তাক করার ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের দুর্গকে নিশানা বানাবে।' ইমাম শাফি'ঈর (রহ.) বক্তব্যে এ কথার-ই প্রতিধ্বনি হয়েছে যে, যতদুর সম্ভব বেসামরিক এরিয়াতে আক্রমণের চেষ্টা না করা, তবে অনন্যোপায় হয়ে আক্রমণ করা, যেমন বেসামরিক লোকদের বাড়িঘর রক্ষা করতে গেলে যুদ্ধের মূল লক্ষ্যই বিনষ্ট হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে লক্ষ্য স্থির করে আক্রমণ করা অনস্বীকার্য।

[২৫] সূরাহ্ আল-ফাত্হ: ২৫।

এটি অস্বীকার করা যাবে না যে, কেবল ধ্বংসের জন্য ধ্বংসযজ্ঞ চালানো ইসলামে নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ যখন এ ধারণা প্রবল হবে যে, বিজয়ের পর অধিকৃত ভূমি (জোর পূর্বক, সন্ধি কিংবা ক্ষমা প্রদর্শন অথবা অন্যান্য পদ্ধতি প্রয়োগের ভিন্নতায় ফকীহদের ব্যাখ্যা সাপেক্ষে) মুসলিমদের মালিকানায় চলে আসবে। মূলকথা, সামরিক বাহিনীর উপর নিষিদ্ধ কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করে আক্রমণ করা এক প্রকার সীমালঙ্ঘন এবং ইনসাফ বহির্ভূত কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ﴾

''আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক আমাকে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন।'[২৬] যারা ইনসাফ করে তাদের প্রতি ভালোবাসার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

'নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।''[২৭]

আল-কুরআনে ব্যবহৃত *'কিস্‌ত'* শব্দের অর্থ হলো *'ইনসাফ'*। এ অর্থ স্পষ্ট করতে আল-কুরআনের এ আয়াত পেশ করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾

'আর আমি কিয়ামতের দিন ইনসাফের পাল্লা প্রতিষ্ঠিত করব।'[২৮]

**খ. রণাঙ্গনে শত্রুর সঙ্গে ব্যবহার**

এখানে মূলতঃ প্রতিপক্ষের ব্যক্তিসত্তা ও তার অধিকৃত সম্পদের সাথে মুসলিম যোদ্ধাদের আচার-আচরণ কেমন হবে, সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে। সংক্ষেপে আমরা তা উল্লেখ করছি:

## শত্রুর ব্যক্তিসত্তার সাথে আচরণ

এ আচরণ কখনো সরাসরি প্রতিপক্ষ যোদ্ধাদের সাথে হতে পারে, আবার হতে পারে প্রতিপক্ষের অবস্থানরত এলাকায় বসবাসরত সাধারণ জনগণ ও

[২৬] সূরাহ্ আল-'আরাফ: ২৯।

[২৭] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ৯।

[২৮] সূরাহ্ আল-আম্বিয়া: ৪৭।

বেসামরিক মানুষের সাথে। প্রথমতঃ আমরা প্রতিপক্ষ যোদ্ধার সাথে সম্পর্কিত বিষয় দিয়ে শুরু করছি:

১. আন্তর্জাতিক মানবিক আইন প্রথম যে বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তা হলো, যদি প্রতিপক্ষ যোদ্ধা অস্ত্র সমর্পণ কিংবা আত্মসমর্পণ অথবা অনন্যোপায় হয়ে নিজেকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে চায়, তাহলে যোদ্ধাদের জন্য তাকে হত্যা করা, আঘাত করা কিংবা অন্য কোনো উপায় অবলম্বনে তাকে কষ্ট দেয়া যাবে না।

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে নিবন্ধিত বিধানাবলীর মধ্যে এটি অন্যতম, যা ১৯০৭ সালে সম্পাদিত ৪র্থ হেগ চুক্তির সংযুক্তপত্রের খ/২৩ ধারায় উল্লিখিত হয়েছে। ১৯৭৭ সালে ১ম সংযুক্তির ৪১ এবং ২য় সংযুক্তির ৪ নং ধারায় বিষয়টি আরো গুরুত্বসহ আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে ইসলামী আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে এ বিষয়ে অতিমাত্রায় জোর দেয়া হয়েছে। কারণ ইসলামী শরী'আতে এ বিষয় সম্পর্কিত বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিপক্ষ আমাদের সাথে সুন্দর ও নম্র আচরণ করবে আমরাও ততক্ষণ তার উত্তম প্রতিদান দেয়ার ব্যাপারে আদিষ্ট। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾

'অতঃপর যতদিন তারা তোমাদের জন্য চুক্তিতে স্থির থাকে তোমরাও তাদের জন্য স্থির থেকো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের ভালবাসেন।'[২৯]

আর যদি তারা সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে আগ্রহী হয় তাহলে তাদের সঙ্গে সে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

'আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সে দিকেই আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত।'[৩০]

অনুরূপভাবে প্রতিপক্ষের কেউ নিজেকে যুদ্ধের কার্যক্রম থেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নিলে কিংবা যুদ্ধ থেকে নিবৃত হলে মুসলিম যোদ্ধার জন্য তার উপর চড়াও হওয়া বৈধ নয়।

[২৯] সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্: ৭।

[৩০] সূরাহ্ আল-আনফাল: ৬১।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾

'অতঃপর তারা যদি তোমাদের থেকে পৃথক থাকে, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে সন্ধি করে, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ মুক্ত রাখেন নি।'[৩১]

হিশাম ইব্‌ন হাকীম বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'যারা দুনিয়াতে মানুষকে কষ্ট দেয় মহান আল্লাহ তাদেরকে আখিরাতে শাস্তি দেবেন।'

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'তোমরা মানুষকে ভালোবাস, তাদের প্রতি বিনম্র হও, তাদেরকে ইসলামী দা'ওয়াত না দেয়া পর্যন্ত তাদের উপর আক্রমণ করো না। ভূপৃষ্ঠে যত কাঁচা মাটির ঘর অথবা পশমের তাবু রয়েছে, এর সকলেই আমার নিকট মুসলিম হয়ে আগমন করুক যা তাদের পুরুষদের হত্যা করে নারীদেরকে বন্দী করে আমার নিকট নিয়ে আসা থেকে অতি উত্তম।'

সুতরাং এটিই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে রয়েছে বিনম্র যুদ্ধ, যা একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কোনো প্রাণ হত্যাকে বৈধ করে না।

২. পূর্বোক্ত ধারার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান হচ্ছে, প্রতিপক্ষের কাউকে হত্যা, কিংবা পাকড়াও করার জন্য বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় না নেয়া। এটি ১৯০৭ সালের হেগ আইনের খ/২৩-২৪ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম সংযুক্তির ২ নং ধারায় এটিকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবিক আইন এখানে কৌশল অবলম্বন ও বিশ্বাসঘাতকতার মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট করেছে এবং প্রথমটিকে সিদ্ধ ও দ্বিতীয়টিকে নিষিদ্ধ করেছে। প্রথম সংযুক্তির উল্লেখ অনুযায়ী '*গাদর*' শব্দের অর্থ হলো 'আস্থাকে নষ্ট' করে ফেলা'।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেও এ পার্থক্য স্বীকৃত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের পরিচয় দিয়েছেন '*কৌশল*' বলে। খন্দক যুদ্ধের সময় সাহাবী নু'আইম ইব্‌ন মাস'উদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে জানান, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমার গোত্র আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে জানে না, আপনি যা চান আমাকে নির্দেশ

[৩১] সূরাহ্ আন্-নিসা: ৯০।

দিন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আমাদেরই একজন। সুতরাং তুমি যতটা পারো আমাদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করতে থাকো, কারণ যুদ্ধ তো একটি কৌশল মাত্র।" এ জন্যই ক্ষেত্রবিশেষে অতর্কিত আক্রমণ করে শত্রুকে হত্যা করা বৈধ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন স্থানে কাফিরদের পরাজয়ের কথা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য লোক পাঠাতেন, যাতে শত্রুরা মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। ইমাম নববী (রহ.) বলেন, 'প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা কিংবা নিরাপত্তা দিয়ে তা নষ্ট করা ব্যতীত যে কোনো উপায় অবলম্বন ও কৌশল গ্রহণ করে কাফিরদেরকে পরাজিত করা বৈধ। এর উপর সকল 'আলিম ঐকমত্যে পৌঁছেছেন।' আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾

'আর তোমরা শপথকে মজবুত করার পর তা নষ্ট করে ফেলো না।'[৩২]

ইব্নু শাদ্দাদ রচিত '*নাওয়াদের সুলতানিয়্যাহ*' গ্রন্থে উদাহরণ স্বরূপ কৌশলের একটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে, 'প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করার জন্য জাহাজের উপরের অংশে সৈন্য বাহিনীর পরিবর্তে শুকর রেখে দেয়া।

বর্ণিত আছে, 'হাজ্জাজ ইব্ন আল্লাত আস-সুলামী নামক একজন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে খায়বার যুদ্ধে অংশ নেন। খায়বার জয়ের পর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মক্কায় আমার স্ত্রী উম্মু শায়বাহ বিন্ত আবী তালহার নিকট কিছু গচ্ছিত মাল এবং মক্কার অন্যান্য ব্যবসায়ীদের নিকট আমার কিছু সম্পদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেখানে গিয়ে তো আমাকে কিছু বলতে হবে (অর্থাৎ এমন কোন কৌশল অবলম্বন করতে হবে যাতে তারা আমার সম্পদগুলো দিয়ে দেয়। নতুবা তারা তা দিতে চাইবে না।) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। তিনি যখন মক্কায় আগমন করেন, লোকেরা তাকে দেখে খায়বারের সংবাদ জানতে চাইলে তিনি বললেন, মুহাম্মাদ এমন পরাজয় বরণ করেছে, যা সাধারণতঃ লোক মুখে শোনা যায় না। তার সাথীবর্গের কেউ নিহত হয়েছে আবার কেউ বন্দী হয়েছে। লোকেরা এ কথা শুনে বলতে লাগলো, আমরা তাকে [মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মক্কায় এনে দিবালোকে সবার সামনে হত্যা করব। মক্কাবাসীরা খুশি হলো আর তিনি এর সুযোগ নিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা মক্কায় ছড়িয়ে থাকা

[৩২] সূরাহ্ আন্-নাহ্ল: ৯১।

আমার সম্পদগুলো গুছিয়ে দাও। আমি দ্রুত খায়বার যেতে চাই এবং মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদের ফেলে যাওয়া সম্পদ কিনে নিতে চাই সেখানে অন্য কোনো ব্যবসায়ী পৌঁছার পূর্বেই। হাজ্জাজ ইবন আল্লাত বলেন, একথা শুনে তারা খুব দ্রুত আমার সম্পদ একত্রিত করে দেয়।' তবে ইসলাম কারো সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার অনুমতি দেয় না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'

আবূ জানদাল ইব্‌ন সুহাইল সবেমাত্র তার পূর্ব ধর্ম ত্যাগ করে মদীনাতে আগমন করেছেন এবং জানতে পারলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে কৃত চুক্তি অনুযায়ী তাকে মক্কায় ফেরৎ পাঠাবেন। তিনি মুসলিমদের মাঝে ঘুরে ঘুরে সবাইকে একই প্রশ্ন করতে লাগলেন, আমাকে কী আবার মুশরিকদের মাঝে ফেরৎ পাঠানো হবে? তাহলে তারা আমাকে আবার পরীক্ষায় ফেলে দেবে! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'আমরা এমন এক সম্প্রদায়, বিশ্বাসঘাতকতা যাদের জন্য শোভা পায় না।' এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মূলনীতির সূত্রপাত ঘটান যার মূল কথাই হলো, ইসলাম মুসলিমদের বৃহৎ স্বার্থেও বিশ্বাসঘাতকতা কিংবা কারো সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গের অনুমতি দেয় না, যদিও তা কোনো মুসলিমকে মুশরিকদের মাঝ থেকে উদ্ধারের মত স্পর্শকাতর বিষয়েও হয়।

'উমার (রা)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলো যে, একজন মুসলিম যোদ্ধা অন্য একজন পারসিক যোদ্ধাকে বলেছিল, তুমি ভয় পেওনা, শান্ত হও। অতঃপর সে আস্বস্ত হলে তাকে হত্যা করে ফেলে। 'উমর (রা) বাহিনীর প্রধানকে লিখে পাঠান, 'আমার কাছে এ কথা পৌঁছেছে যে, তোমাদের মধ্যে কিছু লোক পারস্য অথবা রোমীয় সৈন্যদেরকে ধাওয়া করতে করতে পাহাড়ে নিয়ে যায়। অতঃপর যখন পাহাড়ে উঠে থেমে যায় তখন মুসলিম সৈনিক তাকে নিরাপত্তা দেয়ার কথা বলে ধরে ফেলে এবং হত্যা করে ফেলে। ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ এমনটি করে, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেবো।'

এ ব্যাপারে ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) বলেন, *দারূল ইসলামে* মুসলিমরা যেটিকে হালাল মনে করে *দারুল হারবেও* (অমুসলিমদের রাষ্ট্র) সেটি হালাল বলে বিবেচিত হবে। অন্যদিকে *দারুল ইসলামে* যেটি হারাম বা নিষিদ্ধ সেটি দারূল হারবেও হারাম বলেই ধর্তব্য হবে। সুতরাং যদি কেউ *দারুল হারবে* এসে কোনো হারাম কাজে লিপ্ত হয় সেটি হারাম বলেই ধর্তব্য হবে। কেবল জায়গার ভিন্নতার কারণে হারাম-হালাল হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রভাব পড়বে না।

## ৩. একজন যোদ্ধার জন্য নিম্নোক্ত কাজগুলো নিষিদ্ধ

**ক.** প্রতিপক্ষকে গুড়িয়ে দেয়া, অথবা তাদেরকে গুড়িয়ে দেয়ার হুমকী প্রদান করা কিংবা নিরাপত্তা না দেয়ার ভয় দেখানো।

১৯০৭ সালে স্বাক্ষরিত হেগ চুক্তির ৪/২৩ ধারায় এটির উল্লেখ রয়েছে। আর এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে ১ম সংযুক্তির ৪০ নং ধারা এবং ২য় সংযুক্তির ৪ নং ধারায়। 'সুতরাং প্রতিপক্ষ যদি আত্মসমর্পণ করে কিংবা কোনোভাবে অপর পক্ষের নিকট ধরা পড়ে তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ। যেমনিভাবে দ্রুত আত্মসমর্পণের জন্য তাকে বাধ্য করাও আইনতঃ নিষিদ্ধ। ফলে প্রতিপক্ষের কেউ যদি কোনো শর্তের উল্লেখ ছাড়াই আত্মসমর্পণ করে তাকেও আশ্রয় দেয়া অপরের কর্তব্য। এ বিষয়ে ইসলামের অবস্থান খুবই স্পষ্ট। পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে উল্লিখিত সন্ধি প্রস্তাবে সাড়া দেয়া এবং প্রতিপক্ষ অস্ত্র ছেড়ে দিলে যুদ্ধকার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া এসব এর সুস্পষ্ট প্রমাণ।

ইসলামের ইতিহাসে শত্রুর পরাজয়ের পর তাদেরকে সম্মিলিতভাবে হত্যা করা কিংবা অন্য কোনো উপায়ে তাদের উপর ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর নযীর পাওয়া যায় না। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীদের সঙ্গে যে আচরণ করেছিলেন এটি তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। তিনি তাদেরকে মুক্ত ঘোষণা করেছিলেন, ইতিহাসে আজও তারা *তুলাকা* বা মুক্ত নামেই স্মরণীয় হয়ে আছে। বনী কুরাইযার ঘটনা অবশ্য অনেকের জন্য কিছু সন্দেহ সৃষ্টি করে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা ও প্রকৃত ইতিহাস এ সন্দেহকে নিমিষেই দূর করে দেয়। আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দক যুদ্ধে মুসলিমদের পিঠ বাচানোর জন্য বনী কুরাইযার উপর আস্থা রেখেছিলেন। এ যুদ্ধে মুসলিমদের অবস্থা কঠিন থেকে কঠিনতর হতে চলছিল, এমনকি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার এক তৃতীয়াংশ খেজুর বনী গাতফানকে দেয়ার প্রস্তাব করেন; যাতে তারা যুদ্ধ থেকে ফিরে যায়। অন্যদিকে বনী কুরাইযা মুসলিমদের সাথে কৃত চুক্তি ও ওয়াদার কথা ভুলে গিয়ে মুসলিমদের ক্ষতি সাধন ও তাদেরকে পরাজিত করার জন্য এ সময়কে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। পরিস্থিতি শান্ত হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আলীকে (রা) ডেকে তার হাতে পতাকা অর্পণ করেন এবং বনী কুরায়যার দিকে যাত্রা শুরুর নির্দেশ দেন। যখন 'আলী (রা) তাদের দুর্গের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি দুর্গের ভিতর থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর ব্যাপারে কারো কটুক্তি শুনতে পান। কিন্তু সর্বশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাঁকেই বিজয় দান করেন।

সকাল বেলায় আউস গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে জানান, হে আল্লাহর রাসূল! এরা তো আমাদের মিত্র, খাযরাজের নয়। অথচ আপনি আমাদের ভাইদের মিত্রদের সাথে গতকাল যা করেছেন তা আপনি-ই ভাল জানেন (তারা এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিচ্ছিল বনী কায়নুকা'কে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।) অবশেষে তারা তাদেরই (প্রাক্তন) গোত্র প্রধান সা'দ ইবনে মু'আয (রা)-এর সিদ্ধান্তের উপর আলোচনার ইতি টানে। তিনি তাদের মাঝে তাদের দ্বীন অনুযায়ী ফায়সালা করেন যে, এদের পুরুষদের হত্যা করা হবে, এদের মাল গনীমতের মাল হিসেবে বন্টন করা হবে এবং এদের নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ ফায়সালার কথা শোনেন এবং বলেন, তুমি তো সাত আসমানের উপর থেকে আল্লাহর ফায়সালা অনুযায়ী ফায়সালা করেছ। তা সত্ত্বেও এটি কোনো প্রতিপক্ষের বিরূদ্ধে কোনো ধ্বংসযজ্ঞ চালানো নয়; বরং এটি তাদের নির্বাচন করা একজন ফায়সালাকারীর ফায়সালা মাত্র, যেটিকে মেনে নিয়েই তারা তাকে নির্বাচিত করেছিল।

যুদ্ধ বন্দী ও সংরক্ষিত ব্যক্তিদের অনুকূলে গৃহীত ১৯৪৯ সালে জেনেভা চুক্তির নীতিমালার সঙ্গে এ সিদ্ধান্ত পুরোপুরো মিলে যায়। এটি কেবল ইসলাম ধর্মের বিধান নয়; বরং বিপক্ষ খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের গ্রন্থ বাইবেলের *আত-তাসনিয়াহ* বা দ্বিতীয় পাঠ নামক অংশেও এটিকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। ইসলাম ধর্মের প্রশংসার দিকটি হলো এ ধর্ম বিরূদ্ধবাদীদের রচিত কানূন ও নিয়ম-নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যদিও তারা প্রতি মুহূর্তে ইসলামের বিরুদ্ধে বিবিধ প্রোপাগাণ্ডায় লিপ্ত। এর বিপরীত বক্তব্য কী করে ইসলামের ব্যাপারে বলা যেতে পারে, অথচ গ্রীষ্মের দুপুরে রোদ্রের তীব্রতায় বন্দিদের অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'সাবধান! তোমরা তাদের উপর অস্ত্রের উত্তাপ এবং দুপুরের উত্তপ্ততার সম্মিলন ঘটাবে না। তোমরা তাদেরকে দুপুরে বিশ্রাম দাও আবহাওয়া শীতল হওয়া পর্যন্ত।' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য খেজুরের থোকা নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেগুলো তাদের সামনে ছড়িয়ে ছিল (তারা গাধার মত সামনের দাঁত দিয়ে সেগুলো কামড়ে ধরে বসেছিল)। এরপরও তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফয়সালা মানতে অপছন্দ করেছিল। অথচ আমরা জানি, ইতোপূর্বে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অপরাপর পড়শী বনী নযীর ও বনু কাইনুকা' গোত্র দু'টির ব্যাপারে কেবল অর্থের দ্বারা দণ্ড দিলেও প্রাণদণ্ডের কোনো সিদ্ধান্ত দেন নি।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌কে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছি,

قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ، فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ

পূর্বের যুগে কোনো নবীকে একটি পিঁপড়া কামড় দিয়েছিল। অতঃপর তিনি সে পিপড়ার বাসার সব পিঁপড়া আগুনে জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে (তার সিদ্ধান্তের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে) বলেন, মাত্র একটি পিপড়া কামড়ানোর দায়ে তুমি আমার তাসবীহ্‌রত একটি জাতিকে জালিয়ে দিলে!![৩৩]

আশ্রয় প্রদানের ব্যাপারে অবশ্য আল-কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾

''আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহলে তাকে আশ্রয় দেবে; যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। এটি এজন্যে যে, এরা জ্ঞান রাখে না।'[৩৪]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইব্‌নু কাছীর (রহ.) বলেন, 'আর কোনো মুশরিক (যাদেরকে হত্যা করার জন্য তোমরা আদিষ্ট হয়েছো এবং তাদের জান ও মাল তোমাদের জন্য বৈধ করে দেয়া হয়েছে।) যদি তারা নিরাপত্তা ও আশ্রয় কামনা করে, তাহলে তাদের ডাকে ও আহ্বানে সাড়া দাও, যাতে তারা তোমাদের আল-কুরআন পাঠ ও দ্বীনী আলোচনা শুনতে পায়। অতঃপর পরিস্থিতি শান্ত হলে তাদেরকে নিরাপত্তার সাথে তাদের আবাসভূমিতে পাঠানোর ব্যবস্থা কর। এটি এজন্যে যে এরা জ্ঞান রাখে না, অর্থাৎ আমাদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে তারা আল্লাহর দ্বীনের সঠিক মর্ম বুঝতে পারে এবং মহান আল্লাহর বান্দাদের মাঝে তার দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে।'

ইমাম আওযা'ঈকে-এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। প্রশ্নকারী বলেছিলেন, যদিও সে বলে আমার নিরাপদ এলাকা হচ্ছে কনস্টান্টিনোপোল। তিনি বললেন, তাহলে সেখানে অথবা তাদের অন্য কোনো নিরাপদ ঘাটিতে

৩৩ *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং: ৩০১৯

৩৪ সূরাহ্ আত্-তাওবা: ৬।

তাকে পৌঁছে দাও। আবার প্রশ্ন করা হয়, যদি রাস্তায় তারা অন্য কোনো মুসলিম বাহিনীর সামনে পড়ে? তিনি বলেন, তাদের কোনো অধিকার নেই যে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করবে। অনুরূপভাবে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এমন শত্রু বাহিনী সম্পর্কে যারা মুসলিমদের এলাকায় ঢুকে নিরাপত্তা চায়, তাহলে তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হবে কী? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তাদের এলাকার নিরাপত্তা সীমা যেমন তাদের এলাকার পাহাড় সেখানে পৌঁছা পর্যন্ত তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হবে। এমনকি যদি আবহাওয়া জনিত কারণে ফিরে এসে পুনরায় নিরাপত্তা চায়, তবুও আমি বলবো তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে।

নিরাপত্তা বিষয়ক আলোচ্য আয়াতটির উল্লেখ এ বিষয়ে কিছুটা আলোচনার দাবি রাখে। ইসলামের বিধি-বিধান অন্যান্য ধর্ম ও মতাদর্শ থেকে পার্থক্য করার অন্যতম একটি দিক হলো, ইসলামে শত্রুকে নিরাপত্তা প্রদানের এ অধ্যায়টি। ইসলামে কাউকে নিরাপত্তা দেয়া হলে তার দিকে হত্যার হাত প্রসারিত করা, ক্রীতদাসে রূপান্তর করা, বন্দী করা কিংবা তার মাল লুণ্ঠন করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যদিও নিরাপত্তাপ্রদানকারীর ক্ষেত্রে মুসলিম হওয়া, জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্য হওয়াসহ অন্যান্য কতিপয় শর্তের উপস্থিতি লক্ষণীয়। এর প্রয়োগ রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি থেকে শুরু করে একজন সাধারণ মুসলিমের জন্যও অবকাশ আছে। এক্ষেত্রে স্বাধীন ক্রীতদাস, পুরুষ-মহিলা সমান। তবে সাধারণ মানুষ কেবল একটি ছোট দল যার সংখ্যা ১০ জনের বেশি নয় কিংবা কম সংখ্যাবিশিষ্ট কোনো কাফেলাকে নিরাপত্তা দিতে পারবে। রাষ্ট্র প্রধান কিংবা আমীর বৃহৎ কল্যাণের সার্থে বড় দল বা বড় কাফেলাকে নিরাপত্তা দিতে পারবে, তাদের সদস্য সংখ্যা যতই বেশি হোক না কেন। প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের দেয়া নিরাপত্তায় কম-বেশি করা এবং বৃহৎ স্বার্থে নিরাপত্তাকে বাতিল করার ক্ষমতা রাষ্টপ্রধানের রয়েছে। যে কোনো বোধগম্য বাক্যের ব্যবহার, ইঙ্গিত, চিঠি-পত্র আদান প্রদানের মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রদান করা যাবে। যদি কোনো মুসলিম তার শত্রুকে বলে, *তুমি তোমার অস্ত্র ফেলে দাও, কিংবা তুমি ভয় পেয়ো না তাতেও সে নিরাপত্তা লাভ করবে।* শত্রুরা বিশেষ কোনো ইঙ্গিত পেয়ে যদি দুর্গ থেকে নেমে আসে তাহলেও তাদেরকে হত্যা করা বৈধ হবে না; বরং তাদেরকে তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে হবে।

**খ.** অপরাধী ও নিরপরাধ সবাইকে সাধারণ সম্মিলিত শাস্তি প্রদান নিষিদ্ধ; বিশেষত: প্রতিশোধমূলক শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে। এটি ১ম জেনেভা চুক্তির ৪৬ নং ধারা ও ২য় চুক্তির ৪৭ নং ধারা এবং ১ম সংযুক্ত প্রটোকলের ২০ নং ধারা থেকে গৃহীত।

এ সকল ধারার নির্দেশনা অনুযায়ী কোনো অসুস্থ, আহত, ডুবন্ত, সাধারণ ব্যক্তি, জাহাজ ও অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিসহ যাদেরকে চুক্তিতে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে তাদের উপর সাধারণ শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না।

সম্ভবত: আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের মানবিক প্রচেষ্টা এ বিষয়ে অপারগ হয়ে গেছে; আর তাই দেখা যায়, ১৯৪৮ সালে প্রণীত জাতিসংঘের চুক্তিতে এ মর্মে তারা স্বাক্ষর করেছেন যে, কোনো দল বা গোষ্ঠীর বংশ ধারা নষ্ট করার যে কোনো প্রয়াস অপরাধ বলে গণ্য হবে। ইতোপূর্বে আমি এটিকে *জারীমাতুল ইছখান* নামে আখ্যায়িত করেছি। (আরবী অভিধানে বলা হয়, اصطلمهم الدهر أو الموت أو العدو। অর্থাৎ কালচক্র, মৃত্যু অথবা শত্রু তাদেরকে মূলোৎপাটন কিংবা ধ্বংস করেছে।) এ চুক্তির দ্বিতীয় ধারায় নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ডকে প্রজন্ম ধ্বংসকারী কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে:

ক. কোনো গোষ্ঠীর লোকদের হত্যা করা।

খ. কোনো গোষ্ঠীর লোকদের শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি সাধন করার কারণ হওয়া।

গ. এমন অবস্থা তৈরি করা যাতে কোনো গোষ্ঠীর সবার বা কিছু লোকের জীবন বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়।

ঘ. কোনো গোষ্ঠীর প্রজন্মের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করার লক্ষ্যে সুপরিকল্পিতভাবে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালানো।

ঙ. জোর জবরদস্তি করে শিশুদের এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীতে নেয়ার অপচেষ্টা।

ইসলাম দলগত তথা সামষ্টিক শাস্তিকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করেছে। কারণ ইসলামের একটি মৌলিক বিধান হলো, 'কেউ কারো বোঝা বইবে না।' এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾

'আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না, সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা উপার্জন করে তা তার উপরই বর্তাবে।'[৩৫]

আমি (প্রবন্ধকার) নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে উল্লিখিত বিষয়সমূহকে ইসলাম সমর্থন করে এবং এর পক্ষে মত প্রদান করে। শুধু তাই নয় এগুলো আয়াতের তাফসীরেরই অংশ হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে।

---

৩৫ সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ২৮৬।

অন্যদিকে কারো থেকে প্রতিশোধ নেয়া বা শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি নিম্নলিখিত আয়াত গুলোতে বিধৃত হয়েছে,

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ "এবং মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ।"[৩৬] তিনি আরো বলেন, ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا﴾ "আর যারা মন্দ উপার্জন করবে, প্রতিটি মন্দের প্রতিদান হবে তারই অনুরূপ।"[৩৭] তিনি আরো বলেন,

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾

"আর যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে ঠিক ততটুকু শাস্তি দাও যতটুকু তোমাদের দেয়া হয়েছে। আর যদি তোমরা সবর কর, তবে তা-ই সবরকারীদের জন্য উত্তম।"[৩৮] মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾

'হারাম মাস হারাম মাসের বদলে এবং পবিত্র বিষয়সমূহ কিসাসের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে তোমাদের উপর আক্রমণ করেছে, তোমরা তার উপর আক্রমণ কর, যেরূপ সে তোমাদের উপর আক্রমণ করেছে। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।'[৩৯]

উল্লিখিত আয়াতসমূহে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়েছে, প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষেত্রে সমতা বিধান করতে হবে। তবে এখানে অনেকে সংশয় প্রকাশ করতে পারে যে, এ আয়াতগুলো মুসলিমদেরকে শত্রুবাহিনী থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সমআচরণের বৈধতা দিয়েছে। অর্থাৎ একজন প্রতিপক্ষ অমুসলিম অন্য একজন মুসলিমের সাথে যে আচরণ করবে, মুসলিমও তার সাথে অনুরূপ আচরণ করবে এটি কেমন? দু'টি কারণে এ অভিযোগ ভিত্তিহীন।

প্রথমত: এ প্রতিশোধ গ্রহণের দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ঐসব আইন বহির্ভূত কর্মকাণ্ড যা প্রতিপক্ষ প্রথমে সংঘটিত করে এরপর প্রথম পক্ষ তার বদলা নিতে অনুরূপ আচরণ করে। সুতরাং এখানে প্রতিশোধের অর্থ হলো, কোনো অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্য আরেকটি অন্যায়ের মাধ্যমে নেয়া। মুসলিম সৈন্য যে সত্যিকার

৩৬ সূরাহ্ আশ্-শুরা: ৪০।

৩৭ সূরাহ্ ইউনুস: ২৭।

৩৮ সূরাহ্ আন্-নাহল: ১২৬।

৩৯ সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯৪।

ইসলামের আনুগত্য করে তার ব্যাপারে শরী'আত বহির্ভূত কোনো কাজে লিপ্ত হওয়ার বৈধতা এতটুকু প্রমাণের উপর নির্ভর করতে পারে না যে, প্রতিপক্ষ প্রথমে ঘটনা সংঘটিত করেছে, এরপর সে প্রতিশোধ নিয়েছে।

দ্বিতীয়ত: ইসলামী শরী'আত সমআচরণের স্বীকৃতি প্রদান করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তারোপ করেছে যে, মুসলিম অমুসলিমদের মত বেআইনী কাজের অনুকরণ করবে না। এ প্রসঙ্গে শায়খ মুহাম্মদ আবু যাহরাহ *আল-'আলাকাতুদ দাওলিয়্যাহ ফীল ইসলাম* গ্রন্থে বলেছেন, মুসলিমদের যুদ্ধের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হবে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা, শুধু প্রতিশোধ নেয়া নয়। এজন্য আমরা বলি মুসলিম কর্তৃক পরিচালিত যুদ্ধ আসমানী বিধি-বিধান দ্বারা শর্তযুক্ত হবে। আর এ যুদ্ধ হবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের যুদ্ধ। যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ পরিচালনাকারীগণ তাদের প্রতিপক্ষের সীমালঙ্ঘনের শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রেও যুদ্ধসংশ্লিষ্ট সম্মানজনক আচরণবিধি বিনষ্ট করবে না। এজন্য মুসলামনদের পক্ষ থেকে পরিচালিত যুদ্ধের কার্যক্রম সর্বদাই শ্রেষ্ঠত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে যা কখনো লজ্জিত হবে না। এতে শত্রুপক্ষ যত বাড়াবাড়ি করুক না কেন। তারা যদি মুসলিমদের লাশ বিকৃতি করে ফেলে তারপরও তাদের সাথে অনুরূপ আচরণ করা যাবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা প্রতিশোধ পরায়ণ হওয়া থেকে সাবধান।' উহুদ যুদ্ধে মুশরিকরা হামযাকে (রা) শহীদ করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তাঁর লাশ বিকৃতি করেছিল। হামযা (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা। ফলে তাঁর কষ্টের শেষ ছিল না। তারপরও পরবর্তী যুদ্ধসমূহে কাফির- মুশরিকদের যারা-ই নিহত হয়েছে তাদের সাথে অনুরূপ আচরণ করা হয়নি। যদিও শত্রুরা মুসলিম সৈন্যদের বন্দি করে তাদেরকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফেলে রেখেছিল। এমনকি তারা বন্দিদের তৃষ্ণার্ত রেখে শহীদ করেছে অথচ শ্রেষ্ঠত্বের সৈন্যরা (মুসলিমরা) তাদের প্রতিপক্ষ সৈন্য বন্দিদের সাথে এরূপ মানবতা বিবর্জিত আচরণ করেনি। কেননা আল্লাহ তা'আলা বন্দিদেরকে সম্মান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে পিপাসার্ত রেখে হত্যা করা নিষেধ করেছেন।

২. আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মূলনীতি হলো, আহত ও অসুস্থদেরকে সম্মান করা ও তাদের সাথে মানবীয় আচরণ করা। এতদুদ্দেশ্যে বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তাদের সঠিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা। ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশনে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে এর সাথে আরো দুটি সংযুক্তি পত্র যোগ করা হয়েছে। আহত ও অসুস্থদের সম্মান ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণের সর্বোত্তম

উদাহরণ হলো, একবার প্রতিপক্ষের সবচেয়ে শক্তিশালী বীরযোদ্ধা রিচার্ড লায়নহার্ট অসুস্থ হয়ে পড়লে সালাহ উদ্দীন আয়্যূবী গোপনে তার কাছে যান এবং তার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন। অবশেষে তিনি সুস্থতা লাভ করেন। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, মুসলিমরা শুধু তাদের হস্তগত আহত ও অসুস্থ বন্দিদের সাথে এরূপ আচরণ করেনি; বরং শত্রুপক্ষের কেউ রণাঙ্গনে অসুস্থ হয়ে পড়লে তার চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করেছে। এটি যদি ইসলামী শিক্ষা না হত তাহলে সালাহ উদ্দীন আয়্যূবীর মত মহান ব্যক্তি তার শত্রুর সঙ্গে এমন আচরণ করতেন না।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হলো, উপরোল্লিখিত বিষয়টি স্থলযুদ্ধের ক্ষেত্রেই অধিক প্রযোজ্য। কারণ ইসলামের প্রাথমিক যুগে স্থলভাগেই বেশি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এক্ষেত্রে মুসলিমরা জলযুদ্ধকে দুর্গের সাথে তুলনা করেছে। সুতরাং বর্তমানে দুর্গের যে বিধান রয়েছে জলযুদ্ধের ক্ষেত্রে সে একই বিধান প্রযোজ্য হবে। এখানে একটি কথার পুনরাবৃত্তি করছি যে, আন্তর্জাতিক মানবিক চুক্তিগুলো এ বিষয়ে যেসমস্ত বিধি-বিধান নির্ধারণ করেছে তা ইসলামী শরী'আহ দর্শনে যুক্ত হয়ে ঐ বিধানগুলোর বাস্তব প্রয়োগের জন্য পারস্পরিক কাজ করতে পারে।

এবার যুদ্ধ ক্ষেত্রে বেসামরিক জনগণের সঙ্গে যোদ্ধাদের আচরণ কেমন হবে সে সম্পর্কে কিছু কথা বলা যাক। এ প্রসঙ্গে দু'টি মৌলিক বর্ণনা রয়েছে। একটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর। অপরটি আবূ বাকর সিদ্দীক (রা)-এর। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরামর্শমূলক নির্দেশ হলো,

انطلقوا بإسم الله وعلى بركة رسوله ولا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا صغيرا ولا إمرأة ولا تغلوا وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين.

'আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে বের হও। আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বরকত কামনা কর। অতিশয় বৃদ্ধদের হত্যা করবে না, শিশু ও মহিলাদের হত্যা করবে না, সীমালঙ্ঘন করবে না, গনীমতের সম্পদ চুরি করবেনা, সদ্ভাব বজায় রাখবে। মহান আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।' এ অর্থেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যুদ্ধের প্রাক্কালে) আরো বলেছেন,

سيروا باسم الله وقاتلوا أعداء الله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تنفردوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا.

'আল্লাহর নামে বের হও এবং আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, তবে সীমালঙ্ঘন করো না, বিশ্বাসঘাতকতা করো না, একাকী হয়ো না, প্রতিশোধ

পরায়ণ হয়ো না এবং কোনো শিশুকে হত্যা করো না।' কোনো এক যুদ্ধে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমর্মে লিখে পাঠিয়েছিলেন, "তুমি কোনো মহিলা ও যুদ্ধ বন্দিকে হত্যা করবে না।" তদ্রূপ আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) কোনো এক অভিযানে যাত্রাকালে সেনাপতি উসামার সামনে বলেছিলেন,

أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فأحفظوها عني لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا إمرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا الا لمأكل وسوف تمرون بأقوام فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان من الطعام فإذا أكلتم منها فاذكروا إسم الله عليه. وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رروسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا، اندفعوا باسم الله.

'হে সৈন্যরা তোমরা থাম? আমি তোমাদেরকে দশটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি এগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে। খিয়ানত করবে না, গনীমতের সম্পদ চুরি করবে না, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, অঙ্গ বিকৃতি করবে না, শিশুকে হত্যা করবে না, অতিশয় বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, মহিলাদের হত্যা করবে না, ফলজ বৃক্ষ কর্তন করবে না, খাওয়ার প্রয়োজন ব্যতীত গরু বা উট জবাই করবে না, তোমরা অচিরেই এমন সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে যারা নিজেদেরকে আশ্রমে উপাসনার জন্য নিয়োজিত রেখেছে, তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেবে। অনুরূপভাবে তোমরা এমন সম্প্রদায়কে অতিক্রম করবে, যাদের কাছে রয়েছে রকমারী খাবারের পাত্র যদি সেখান থেকে খেতে ইচ্ছে কর তাহলে তা মহান আল্লাহর নাম নিয়ে খাবে। তোমরা এমন এক সম্প্রদায়ের সম্মুখীন হবে যারা মাথার মধ্যভাগের চুলগুলো মুণ্ডন করে পার্শ্বচুলগুলোর ঝুটি রেখেছে (এসব লোক ছিল সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সন্ত্রাসী ব্যক্তি তারা এরূপ বেশ ধারণ করেছিল) তাদেরকে প্রচণ্ড আঘাত কর এবং মহান আল্লাহ্‌র নামে প্রতিরোধ কর।[৪০] আল্লাহর রাসূল ও তাঁর খলীফার পর অন্য কারোর কথার প্রয়োজন নেই।

উল্লিখিত বর্ণনায় পরিস্কার হয়ে উঠেছে যে, মুসলিম সৈন্যেদের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের হত্যা করা বৈধ নয়:

১. **অতিশয় বৃদ্ধ:** এখানে সে সব অসুস্থ ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত, যারা অসুস্থতার দরুণ লড়াইয়ের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। তবে এমন ব্যক্তি যদি কাফির

[৪০] ইবনু 'আসাকির, *তারিখু মাদীনাতি দিমাশক আল-কাবীর*, বাব: মা যাআ মিনান নুসূস ফী ফাদলি দিমাশক, হাদীস নং - ৯২১।

যোদ্ধাদের পক্ষ থেকে কোনো সুবিধা ভোগ করে তাহলে সে তাদের দলভুক্ত হিসেবে গণ্য হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾

'তাহলে তোমরা কুফরের নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, নিশ্চয় তাদের কোনো শপথ নেই, তারা যেন বিরত হয়।'[৪১]

আয়াতটি মক্কার মুশরিকদের শানে নাযিল হলেও এর হুকুম 'আম' বা সাধারণজ্ঞাপক। আবূ বাকর (রা) তাঁর ফরমানে বা ওসীয়তে এমন লোকদের সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তোমরা মাথা মুণ্ডনকারী এক শ্রেণির লোকদেরকে দেখতে পাবে। তোমরা তাদের মধ্য থেকে যারা শয়তানের মদদপুষ্ট ও সন্ত্রাসী তাদেরকে তরবারী দ্বারা আঘাত করবে। আল্লাহর কসম! তাদের একজনকে হত্যা করা অন্যান্য সত্তর জনকে হত্যা করার চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয়।

২. **শিশু ও মহিলা:** একদল ফিক্হবিদ মনে করেন তাদের হত্যা করা না করার বিষয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা না করার উপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক মানবিক আইনও তাই বলে। অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম মালিককে (রহ.) একবার শত্রুপক্ষের এমন নারী ও শিশু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যারা দুর্গ থেকে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করত, এদের হত্যা করা যাবে কীনা? উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

৩. **ব্যবসায়িক, পেশাজীবি, শ্রমিক ও কৃষকদের হত্যা করা নিষেধ:** কেননা এরা কোনভাবেই যুদ্ধের কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এরা সবাই আশ্রিতের হুকুমের অনুগামী হবে। এর কারণ হলো শ্রমিকরা শহরের দালান কোঠা তৈরিতে সবসময় ব্যস্ত থাকে। সুতরাং তাদেরকে হত্যা করলে নির্মাণ কাজে সংকট দেখা দেবে। এদিকে দৃষ্টি রেখে ইসলামের যুদ্ধনীতিতে এ ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কেননা ইসলামী যুদ্ধ কখনো দালান কোঠা এবং নির্মাতাদের নিশ্চিহ্ন করতে চায় না।

৪. **নিরপরাধ সাধারণ মানুষ, যাজক, বৈরাগী, সন্ন্যাসী ও গীর্জায় বসে ধ্যানরত এমন ব্যক্তিদের হত্যা করা নিষেধ:** ইমাম আওযা'ঈকে এদের এবং শিশু ও মহিলাদের সম্পর্কে এ মর্মে জিজ্ঞেস করা হলো যে, তাদের ব্যাপারে এরূপ আশংকা বা সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, তারা শত্রু পক্ষের গুপ্তচর বা সংবাদদাতা। তাহলে তাদেরকে হত্যা করা যাবে কী? ইমাম আওযা'ঈ

---

৪১ সূরাহ্ আত্-তাওবা: ১২।

(রহ.) জবাবে বললেন, সন্দেহের ভিত্তিতে কাউকে হত্যা করা যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না বিষয়টি সুনিশ্চিত হবে। আর তাদেরকে হত্যা না করার নির্দেশ এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে গীর্জা বা উপাসনালয়ে ধ্যানে মশগুল রয়েছে। আর যদি তারা উপসনালয় থেকে বের হয়ে যুদ্ধের দিকে ধাবিত হয় এবং সীমালঙ্ঘন ও ধবংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয় অথবা লোকদের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টিকরে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে। ইমাম সারাখ্সীর মতে, এসব ক্ষেত্রে কাউকে হত্যা করা বৈধ হবে না। কেননা হত্যা বৈধতার জন্য শর্ত হলো, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। আর যদি তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে তাহলে তাদের দ্বারা কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায়।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন, সেটি হলো শহরবাসীকে খাদ্য-পানীয় সরবরাহ বন্ধ করে কষ্ট দেয়া, যাতে তারা শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। এরূপ অবরোধকর্ম পরিচালানাকে ইসলাম সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করেছে। যেমনটি আবূ বাকর (রা)-এর ওসীয়তনামা থেকে জানা যায়, অপ্রয়োজনে কোনো হালাল প্রাণীকেই যবেহ করা যাবে না। নিরুপায় হয়ে খাবারের প্রয়োজনেই কেবল যবেহ করা যাবে। এছাড়া কোনো প্রাণীকে পুড়িয়ে মারা যাবে না কেননা এতে অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামরিক প্রয়োজনীয়তা ব্যতিরেকে চতুষ্পদ জন্তুকে হত্যা করতে নিষেধ করেন। এখানে সামরিক প্রয়োজনীয়তার অর্থ হলো, এসব জন্তু জানোয়ার দ্বারা যদি শত্রুপক্ষ আরো শক্তিশালী হয় তাহলে সেক্ষেত্রে প্রাণী হত্যা বৈধ হবে। একবার মুসলিমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে সুদীর্ঘ কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করতে লাগলো। পথিমধ্যে তারা পয়সা দিয়েও কোনো খাদ্য সামগ্রী কিনতে পারছেনা। অর্থাৎ লোকালয় থেকে স্থানটি দূরবর্তী হওয়ায় সেখানে খাদ্য ক্রয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই। এসময় তারা বাধ্য হয়ে জীবন বাঁচানোর জন্য লোকজন থেকে খাদ্য সামগ্রী ছিনিয়ে নেয়। জরুরী অবস্থায় এরূপ করা বৈধতার দাবি রাখে। শত্রুদের শক্তি খর্ব করার জন্য পানি সরবরাহ বন্ধ করা অথবা তাতে বিষ মিশানো যদিও বৈধ তথাপি এর উদ্দেশ্য হবে কেবল যোদ্ধা, বেসামরিক লোক নয়। তবে খুব প্রয়োজন ছাড়া সাধারণ অবস্থায় এরূপ করা বৈধ হবে না।

মুসলিম সৈন্যরা একস্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হলে এখানকার অবশিষ্ট খানা-পিনা নষ্ট করে ফেলা তাদের জন্য বৈধ নয়। তবে এসব দ্বারা যদি শত্রুপক্ষ উপকৃত হয় তাহলে ভিন্ন কথা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সময় তাঁর নিকট সংরক্ষিত আমানতের টাকা-পয়সা যথাযথভাবে পৌঁছে দেয়ার জন্য 'আলীকে (রা) মক্কায় রেখে গিয়েছিলেন অথচ

যাদের সম্পদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ছিল তাদের অনেকেই ছিল কাফির। হিজরতের ৬ষ্ঠ বছর ইয়ামামার সর্দার ছুমামা (রা) ইসলাম গ্রহণ করে এবং এমর্মে সিদ্ধান্ত নেয় যে, সে মক্কাবাসীদের নিকট পণ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেবে যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ অবস্থায় মক্কাবাসী খাদ্য সংকটে পড়ল এবং এ নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়ার আবেদন জানালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুমামাকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিতে বললেন। এমনকি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেও তাদের নিকট '*আজোয়া* খেজুর প্রেরণ করলেন। অথচ তারা সবাই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুশমন।

এবার শত্রুদের সম্পদ প্রসঙ্গে আসা যাক। এখানে খুবই সংক্ষেপে বলা যায় যে, মৌলিক বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন সেটি হলো, সামরিক অভিযানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং সামরিক ও বেসামরিক সম্পদ এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য তৈরি করা, যেন বেসামরিক সম্পদ নষ্ট না হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবচেয়ে নিকটতম, হেরা গুহার সাথী এবং তাঁর হিদায়াতের আলোকবর্তিকা আবূ বাকর (রা) সুস্পষ্টভাবে যুদ্ধ চলাকালীন সম্পদ নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। কতিপয় ফিক্‌হবিদ (যুদ্ধকালীন সময়) ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা ধবংস করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন, তাদের দলীল হলো:

﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾

১. নিম্নের আয়াতে খেজুর বৃক্ষ কর্তন করা বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়,
'তোমরা যে সব খেজুর গাছ কেটে ফেলেছ অথবা সেগুলোকে তাদের মূলের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছ তা তো ছিল আল্লাহর অনুমতিক্রমে, এবং যাতে তিনি ফাসিকদের লাঞ্ছিত করতে পারেন।'[৪২]

এ আয়াতে উল্লিখিত لِينَةٍ শব্দ দ্বারা খেজুর বৃক্ষকে বুঝানো হয়েছে।

২. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে বনূ নযীরের গৃহসমূহ মুসলিমরা গুড়িয়ে দিয়েছিল। বিষয়টি আল-কুরআনেই এসেছে এভাবে,

﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾

৪২ সূরাহ্ আল-হাশর: ৫।

'ফলে তারা তাদের বাড়ী–ঘর আপন হাতে ও মু'মিনদের হাতে ধ্বংস করতে শুরু করল। অতএব হে দৃষ্টিমান লোকেরা তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।'[৪৩]

৩. বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফে মালিক ইব্‌ন 'আউফের গৃহ ধ্বংস, ছাকীফ গোত্রের দুর্গে *মিনজানিক* দিয়ে পাথর নিক্ষেপ এবং তাদের আঙ্গুঁর বাগান নষ্ট করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। ছাকীফ গোত্র এতে বিস্মিত হয়েছিল এবং বলেছিল আঙ্গুর বাগান নষ্ট হলে আমরা কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করব।

শায়খ মুহাম্মদ আবূ যাহরাহ উল্লিখিত বর্ণনা অপনোদন করে বলেন, বর্ণিত দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, সাধারণভাবে সবকিছু ধ্বংস করে দেয়া বৈধ। কারণ আয়াতে لينة শব্দের অর্থ نخلة নয়; বরং এর অর্থ হলো, ثمرة বা ফল যা আয়াত দ্বারা مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ প্রতীয়মান হয়। আয়াতে যেহেতু গাছকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে অতএব لينة দ্বারা ফল উদ্দেশ্য। আর ফল কাটাকে ধবংস বুঝায় না। এরপর শায়খ আবূ যাহ্‌রাহ্‌ বনূ নযীরের গৃহ গুড়িয়ে দেয়ার বিষয়ে বলেন, ইয়াহুদীরা বাড়িটিকে দুর্গ বানিয়ে সেখান থেকে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করত এবং সেটিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তারা তীর নিক্ষেপ করত, সেজন্য সাহাবীগণ বাধ্য হয়ে প্রয়োজনের ভিত্তিতে বাড়িটির কিছু অংশ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। এরপর ইয়াহুদীরা সেখান থেকে চলে যাওয়ার সময় বাড়িটিকে একেবারে গুড়িয়ে দেয়। অতএব বলা যায় যে, মুসলিমরা নিরুপায় হয়ে বাড়িটির কিছু অংশ ভেঙ্গে দিয়েছিল বটে মূলতঃ ইহুদীরাই সেটিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। পাথর নিক্ষেপের বিষয়ে বলা যায় যে, যেহেতু বনু ছাকীফ এ বাড়ীটিকে দুর্গ বানিয়েছিল এবং তারা স্বভাবতই রুঢ় ও কঠিন প্রকৃতির লোক ছিল। সেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দুর্বল করার লক্ষ্যে মুসলিমদেরকে পাথর নিক্ষেপের অনুমতি দিয়েছিলেন। অপরদিকে আঙ্গুর বাগান কেটে ফেলার হুমকি দেয়া হয়েছিল কেননা তারা এ থেকে মদ তৈরি করত। কিন্তু কাটা হয়নি। যেন তারা আত্মসমর্পণ করে রক্তপাত বন্ধ করে। এখানে আমি (প্রবন্ধকার) এ অভিমতকে শক্তিশালী করার জন্য বলতে চাই, খায়বার যুদ্ধে ইয়াহুদী গোলাম আসওয়াদ মালিক তার চারিত পশুগুলোসহ মুসলিম হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি এসব পশুকে এমন একটি নিরাপদ স্থানে রেখে এসো, যেখান থেকে এ পশুগুলো সহজেই মালিকের বাড়ীতে যেতে পারবে।

[৪৩] সূরাহ্‌ আল-হাশর: ২।

অতএব আমার নিকট এটিই প্রতীয়মান হয়েছে যে, যারা আবূ বাকর (রা)-এর বর্ণনাকে বাহ্যিক অর্থে নিয়েছেন এবং যারা তাঁর নিষেধ করা কাজকে বৈধ বলে ব্যাখ্যা করেছেন উভয়ের লক্ষ্য একই। কারণ যারা বিষয়টিকে হারাম বলে আখ্যায়িত করেছেন তারা বর্ণনাটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। আর যারা এটিকে বৈধ বলে মনে করছেন, তারা সামরিক কল্যাণের প্রয়োজনীয় দিকগুলো সামনে এনে এটিকে বৈধ হিসেবে মতামত ব্যক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে একটি মূলনীতি রয়েছে সেটি হলো '*প্রয়োজন অবৈধতাকে বৈধতা দেয়।*'

এখানে আমি একটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই, আমি যা বলবো তার সাথে হয়তোবা এ দৃষ্টান্তের অপূর্ব মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। এরপরও আমি মনে করি যে, এর অর্থবহ একটি সার-নির্যাস রয়েছে। সেটি হলো, একমাত্র সামরিক প্রয়োজনীয়তা মুসলিম সেনাপতিকে কোনো অঞ্চলে অভিযান করতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। এরপর বিজিত অঞ্চলে তারা ট্যাক্সের বিনিময়ে জনগণের সুরক্ষা দিয়ে থাকে। আর যদি কোনো ট্যাক্স না দেয়া হয় তাহলে সেখানে তাদের নিরাপত্তা দানের বিষয়টি বিবেচিত হয় না।

## যুদ্ধ বন্দিদের সাথে আচরণ

এটি হলো মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত আসমানী হিদায়াত ও দিক নির্দেশনার এক সমুজ্জল আচরণবিধি। সমকালীন আন্তর্জাতিক কোনো বিধান ও কোনো চুক্তি এর তুল্য হতে পারে না। এ বিষয়ে প্রথম কথাটি হলো, যুদ্ধ বন্দিদের সাথে আচার-ব্যবহার সবকিছুই দেখভাল করবে সরকার। কোনো যোদ্ধা বা ব্যক্তি এর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে না। আল-কুরআনে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾

"অতএব তোমরা যখন (যুদ্ধের ময়দানে) কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত কর। পরিশেষে তোমরা যখন তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করবে তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে নাও। তারপর হয় অনুগ্রহ, না হয় মুক্তিপণ আদায় কর, যতক্ষণ না যুদ্ধ তার বোঝা রেখে দেয়।"[৪৪]

উল্লিখিত আয়াতে ততক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না মুসলিমদের বিজয় নিশ্চিত হয়। এরপর শত্রুদের বন্দি করার কথা বলা হয়েছে।

৪৪ সূরাহ্ মুহম্মদ: ৪।

শত্রুপক্ষ আটক হলে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। মুক্তিপণ দেয়া অথবা না দেয়া পর্যন্ত তাদেরকে মুক্তি দেয়া যাবে না। ইসলামী বিধান হলো, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ তখনই প্রদান করা হয় যতক্ষণ না শত্রুপক্ষকে আটক করা সম্ভব হয়। আটকের পর দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রপ্রধানের। বিচার হওয়া পর্যন্ত তারা সরকারের যিম্মাদারীতে-ই থাকবে। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের বন্দিকে হত্যা করতে উদ্যত না হয়।'

এ প্রসঙ্গে একটি রিওয়ায়াত দলীল হিসেবে উল্লেখ করা প্রয়োজন সেটি হলো, একবার 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আমির একজন বন্দিকে ইব্‌ন 'উমার (রা)-এর নিকট পাঠালেন, যেন তিনি তাকে হত্যা করেন। তিনি বললেন, বন্দি অবস্থায় আমি তাকে হত্যা করতে পারব না। কারণ এ অবস্থায় সকল দায়-দায়িত্ব রাষ্ট্র প্রধানের।' ফিক্‌হবিদরা একমত যে, বন্দিকে যদি হত্যা করা হয় তাহলে আটককারীকেই এর দায় নিতে হবে। তবে তার কী শাস্তি হবে এ ব্যাপারে তারা মতানৈক্য করেছেন। ইমাম আওযা'ঈ (রহ.) বলেন, আটককারী যদি বন্দিকে ইমামের নিকট পৌঁছানোর আগেই হত্যা করে তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। আর যদি পৌঁছানোর পর তাকে হত্যা করে তাহলে তাকে শাস্তি প্রদানসহ অর্থদণ্ড করা হবে। ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) বলেন, যদি শিশু অথবা মহিলাকে হত্যা করে তাহলে সেক্ষেত্রে কেবল অর্থদণ্ড করা যাবে।

বন্দি হওয়ার কারণে তাকে কোনো প্রতিপক্ষের যোদ্ধা বলা যাবে না এমনটি নয়। তবে তার যুদ্ধ করার ক্ষমতা তখন আর থাকে না। এজন্য কিছু একটা শাস্তি দিয়ে তার এ '*যোদ্ধা*' বিশেষণের পরিসমাপ্তি ঘটানো প্রয়োজন। অধিকাংশ ফকীহগণের মতামত হলো, রাষ্ট্রপ্রধান বন্দিকে চারটির কোনো একটি শাস্তি দেয়ার অধিকার রাখেন। ক. হয় তাকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়া, খ. মুক্তিপণ আদায় করে তাকে ছেড়ে দেয়া গ. হত্যা করা ঘ. অথবা তাকে বন্দি করে রাখা। উপরিউক্ত প্রথম দু'টির কথা আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। আর পরের দু'ধরনের শাস্তি তথা হত্যা করা অথবা বন্দি করা অতিরিক্ত। এ বিষয়ে অনেক মত রয়েছে।

আমার (প্রবন্ধকার) বিশ্বাস, নিঃশর্ত মুক্তি দেয়াকেই ইমাম প্রথমে বিবেচনায় নিয়ে আসবেন। এরপর অন্য দিকগুলো ভেবে দেখবেন, যদি তাতে মুসলিমদের কল্যাণ নিহিত থাকে। কারণ আয়াতে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়াকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এটিই অনুসরণ করা শ্রেয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেছেন,

﴿قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

'তোমাদের হাতে যে সব যুদ্ধবন্দি আছে, তাদেরকে বল, যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তরসমূহে কোনো কল্যাণ আছে বলে জানেন, তাহলে তোমাদের থেকে যা নেয়া হয়েছে, তার চেয়ে উত্তম কিছু দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, অধিক দয়ালু।'[৪৫]

আল্লাহ তা'আলা যেখানে বন্দিদের ক্ষমা ও উত্তম প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেখানে বান্দার উচিত তার উপর দয়াপরবশ হয়ে তাকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়াকে প্রাধান্য দেয়া।

বন্দিকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দেয়া তা শর্তযুক্ত ও শর্তমুক্ত দু'ভাবেই হতে পারে। শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দেয়া হলে বন্দির জন্য তা পালন করা বাধ্যতামূলক হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধে আবূ ইয্যাহ নামে জনৈক কবিকে এ শর্তে ছেড়ে দিয়েছিলেন যে, সে আর মুশরিকদের পক্ষ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে কুৎসামূলক কবিতা রচনা করবে না। কিন্তু সে শর্ত ভঙ্গ করে মুশরিকদের সাথে হাত মেলায়। এরপর আবার সে উহুদ যুদ্ধে বন্দি হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট মুক্তির দরখাস্ত করে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার আবেদন না মুঞ্জুর করে বলেন, আল্লাহর কসম! তুমি পুনরায় মুশরিকদের মাঝে গিয়ে বলবে, আমি দ্বিতীয়বার মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কুৎসা গেয়েছি, আর মু'মিন কখনোও একগর্তে দু'বার দংশিত হয় না। এরপর তিনি তার মস্তক কেটে ফেলার নির্দেশ দেন।

মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়ার কয়েকটি অবস্থা হতে পারে। এটি সম্পদ দ্বারা হতে পারে অথবা অন্য কিছুর বিনিময়েও হতে পারে। যেমন বদর যুদ্ধের বন্দিদের মধ্যে যাদের সম্পদ ছিল না তাদেরকে বলা হয়েছিল, তারা দশজন মুসলিম শিশুদের লেখাপড়া শেখাবে। বর্ণিত আছে যে, 'উমর ইব্ন 'আব্দিল আযীয (রহ.) বাইযানটাইন শহর প্রদর্শনকালে এক লক্ষ্য বন্দিকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। অনেক সময় বন্দি বিনিময়ও হয়ে থাকে। বন্দি বিনিময়ের ক্ষেত্রে ইসলাম কোনো সংখ্যা নির্ধারণ করেনি। উভয়পক্ষ বন্দির বিনিময় বন্দি দ্বারা অথবা অমুসলিম বন্দির বিনিময় মুসলিম বন্দিও হতে পারে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-উকায়লী নামক জনৈক বন্দি, যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাকে মুক্তি দেয়ার বিনিময়ে দু'জন বন্দিকে মুক্ত করে এনেছিলেন। ইসলাম শত্রুপক্ষকে তাদের সতীর্থ বন্দিদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ এবং আবাসস্থল পরিদর্শনের অনুমতি দেয়, যেন তারা তাদের স্বাস্থ্য ও সংখ্যার

---

[৪৫] সূরাহ্ আল-আনফাল: ৭০।

ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে পারে। এছাড়া ইসলাম বন্দিদের স্থানান্তরের সময় যথাযথ নিরাপত্তার ও নিশ্চয়তা দেয়।

বন্দিদের মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে ফকীহগণের একদল মতানৈক্য করেছেন। একদল মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে অপরদল বিপক্ষে। ইমাম জাস্‌সাস *আহকামুল কুরআন* গ্রন্থে বলেন, 'বন্দিদের মৃত্যুদণ্ড দেয়ার বৈধতার ব্যাপারে ফকীহগণ একমত হয়েছেন। এ বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে কোনো মতভেদ আছে বলে আমার জানা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্দিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন তা *মুতাওয়াতির* হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত। ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) ও আবূ ইউসুফ (রহ.) বলেন, বন্দিকে মৃত্যুদণ্ড তখনই দেয়া যেতে পারে যদি তাতে মুসলিমদের শক্তি বৃদ্ধি পায়, আর শত্রুদের মনোবল দুর্বল হয়।' সাধারণ অর্থে ইমাম জাস্‌সাস-এর মতটি বিশুদ্ধ নয়। কারণ ইমাম আবূ ইউসূফ *কিতাবুল খারাজ* গ্রন্থে বলেছেন, 'যখন হাজ্জাজ একজন বন্দিকে নিয়ে এসে 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা)-এর সামনে হত্যা করার জন্য পেশ করেন তখন ইব্‌ন 'উমর বললেন, আমরা হত্যা করার অনুমতি দিতে পারি না। কেননা আল্লাহ বলেছেন,

﴿فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾

'অতঃপর তাদেরকে শক্তভাবে বেধে নাও। তারপর হয় অনুগ্রহ না হয় মুক্তিপণ আদায় কর।'[৪৬]

হাসান বসরী ও আতা বন্দিদের হত্যা করাকে অপছন্দ করতেন। অপরদিকে কিছু কিছু ফকীহ যেমন মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন বন্দিকে হত্যা করা হারাম বলেছেন। তারা মনে করেন যে, উত্তম হলো, নিঃশর্ত মুক্তি দেয়া বা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া। যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধের বন্দিদের সাথে করেছিলেন। আর হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসূফ একজন বন্দি নিয়ে এসে 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমারকে বললেন, উঠুন! একে হত্যা করুন। এ কথা শুনে ইব্‌ন 'উমার (রা) বললেন, আমাদেরকে এ কাজ করতে নির্দেশ দেয়া হয়নি। এরপর তিনি *আয়াতুল মান্নি ওয়াল ফিদা* বা 'হয় অনুগ্রহ না হয় বিনিময়' আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

প্রকৃত সত্য হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীকে উভয়পক্ষ নিজ নিজ উপলব্ধি থেকে ব্যাখ্যা করে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'উকবা ইব্‌ন আবী মু'ঈত, নদর ইব্‌ন হারিছ ও কবি আবূ ইয্যাহকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি

[৪৬] সূরাহ্ মুহাম্মাদ : ৪।

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইব্‌ন আবীল হুকাইকের উপর এ মর্মে শর্তারোপ করেছিলেন যে, সে যদি কোনো কিছু গোপন না করে সব প্রকাশ করে দেয় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে না। কিন্তু যখন তার খিয়ানত প্রমাণিত হলো তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলাল ইব্‌ন আখতাল, মুকীস ইব্‌ন সাবাবা, 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবী সারাহকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন যদি তোমরা তাদেরকে কা'বার চাদরের আড়ালে পাও তারপরও তাদেরকে হত্যা করবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে (রা) খুযায়মা গোত্রের বন্দিদের হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন। যখন তারা বলেছিল *'আমরা দ্বীন পরিবর্তন করেছি, আমরা দ্বীন পরিবর্তন করেছি।'*

উল্লিখিত আয়াতেও বন্দিদেরকে হত্যার কথা উল্লেখ করা হয়নি। এজন্য মুফাসসিরগণ এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। অনেকের মতে আয়াতটি মানসূখ বা রহিত হয়েছে। আবার অনেকে রহিত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। আমার মতে বিষয়টি জটিল নয়। আবার সংশয়পূর্ণও নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী প্রেক্ষাপটে যে বন্দিদেরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের সংখ্যা খুবই সীমিত ও নগণ্য। আমরা যদি এদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে অনুসন্ধান করি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, সেখানে বন্দিদেরকে শাস্তি হিসেবে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়নি; বরং বন্দি হওয়ার পূর্বে তাদের কৃত অপরাধের কারণে তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কেননা বন্দিদেরকে এরূপ সাজা দেয়ার বিষয়টি ইমামের ইখতিয়ারভুক্ত ছিল না; বরং এটি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলামের কুৎসা এবং ষড়যন্ত্র করার অপরাধের শাস্তি। বন্দি হিসেবে শাস্তি নয়, যা তারা বন্দি হওয়ার পূর্বে যুদ্ধের ময়দানের বাইরে করেছিল। এরূপ বিষয় জেনেভা কনভেনশনের ৮৫ ধারায় উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, *'যুদ্ধবন্দিকে বন্দিদশায় পতিত হওয়ার পূর্বে তার কৃত অপরাধের কারণে রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী বিচারের সম্মুখীন করা যাবে। এক্ষেত্রে এ চুক্তির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদের প্রতি সুবিধা গ্রহণের অধিকার থাকবে।'*

সুতরাং রণাঙ্গনের বাইরে পূর্বের কোনো কৃত অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত ইমাম বা রাষ্ট্র প্রধান কোনো বন্দিকে হত্যার নির্দেশ দিতে পারবে না। এরূপ বন্দিকে ছেড়ে দিতেও বাধা নেই। কারণ যেসব বন্দি দ্বারা ইসলাম ও মুসলিমদের কোনো ক্ষতির আশংকা নেই তাদের ছেড়ে দিতে ইসলামে কোনো বাধা নেই। কিন্তু তাদেরকে মুক্ত করার কোনো পথ না থাকলে সেক্ষেত্রে

তাদেরকে রাজনীতির ভিত্তিতে মৃত্যুদ দেয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সকল সভ্য রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ব্যতিক্রমধর্মী ও গ্রহণযোগ্য নীতি হলো, *একান্ত প্রয়োজনীয়তা অবৈধকে বৈধতার স্বীকৃতি দেয়*।

একজন সাধারণ বন্দি ও অপরাধী বন্দির শাস্তির মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করার দলীল হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারিছের বোনের স্বীয় ভাইকে নিয়ে আবৃত শোকগাঁথা শুনে অঝোর নয়নে কাঁদছিলেন, এমনকি তাঁর দাড়ি মুবারক অশ্রুসিক্ত হয়েছিল। কবিতাটির প্রথম পঙ্‌ক্তি ছিলো,

يا راكبًا أنَّ الأثِيْلَ مَظَنَّةٌ * مِنْ صُبْحِ خَامِسَةٍ وَأَنْتَ مُوَفَّقٌ

'ও হে আরোহী! যার ধারণা ছিল যে পঞ্চম দিনের সকালে *আছীল* নামক স্থানে উপনীত হবে। আর আপনি তার ধারণার বাস্তব রূপ দিতে সক্ষম।'

এরপর হারিছের বোন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সম্বোধন করে বললেন,

أمحمد أولست ضن نجيبـــــة * في قومها والفحل فحل معرق
ما كان ضرك لو مَنَنْتَ وربما * مَنَّ الفتى وهو المغيظ المحنق
النضر أقرب من قتلت قرابـــة * واحقهم إن كان عتق يعتـــق
أو كنت قابل فدية فلنأتيـــــــن * بأعز ما يغلو لديك وينفـــــــق

'হে মুহাম্মাদ! আপনি সম্প্রদায়ের ভদ্র ব্যক্তি ও উচ্চ বংশীয় নেতার প্রতি কার্পণ্য করেননি কী? যদি আপনি তার প্রতি দয়াপরায়ণ হতেন তাহলে আপনার কোনো ক্ষতি হতো না। কখনো কখনো যুবকের আচরণ হয় ক্রোধ উদ্রেককারী (তবুও তার প্রতি যদি আপনি অনুগ্রহ করতেন তাতে আপনার কোনো ক্ষতি হতো না।) সে নদর ছিল অতি নিকটবর্তী (আপনজন) ও হকদার (মুক্তি পাওয়ার)। আর আপনি যদি মুক্তিপণ চাইতেন তাহলে আমরা আপনার নিকট পঞ্জীভূত মুক্তিপণের চেয়ে, উত্তম মুক্তিপণ নিয়ে উপস্থিত হতাম।'

শোকগাঁথাটি শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন যদি কবিতাটি তাকে হত্যার পূর্বে শুনতাম তাহলে তাকে মাফ করে দিতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে স্বীয় বানীতে عفو শব্দ ব্যবহার করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, অপরাধ সংঘটিত না হলে عفو শব্দের ব্যবহার হতো না। যুদ্ধ যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিধি-বিধান, রীতি-নীতি ও সীমারেখা শরী'আত সম্মত উপায়ে চলবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেটিকে ধরে নেয়া হবে যে, অপরাধের জন্য সে বন্দি হয়নি; বরং তার এ বন্দিত্ব সুরক্ষার উপায় হিসেবে

পরিগণিত হয়েছে। যুদ্ধ করার অক্ষমতার কারণে আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধে কোনো সেনাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত না যুদ্ধের সূচনা তার পক্ষ থেকে হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾

"অতঃপর তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা কর।" [৪৭]

সুতরাং বন্দিদের যে শাস্তি সেটি বন্দি হওয়ার অপরাধের শাস্তি নয়; বরং বন্দি হওয়ার পূর্বে তার দ্বারা সংঘটিত অপরাধের শাস্তি। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ ইউসুফের মন্তব্য যা এ বিষয়ে যুক্তিসম্মত ও প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন রণাঙ্গন থেকে কাউকে বন্দি করা হলে তাকে শুধু এ কারণে কোনো শাস্তি দেয়া যাবে না, তবে পূর্বের কোনো অপরাধ থাকলে, সে কারণে শাস্তি যোগ্য হতে পারে।' এর স্বপক্ষে আরো বড় প্রমাণ পাওয়া যায়। 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশের বাহিনী কুরাইশদের 'উসমান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ও হাকাম ইব্‌ন কাইসানকে বন্দি করলে কুরাইশরা *ফিদইয়া* দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) ও 'উতবা ইব্‌ন গাযওয়ান (রা)-কে যতক্ষণ ফিরিয়ে না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এদের কাউকে ফেরত দেব না। কারণ, তোমাদের নিকট আটককৃত আমার সাহাবী দু'জনের ব্যাপারে আমি আশংকা করছি। যদি তোমরা তাঁদেরকে হত্যা করে থাক তাহলে এদেরকেও হত্যা করা হবে। এরপর তারা দু' সাহাবীকে ছেড়ে দিলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এদেরকে মুক্ত করে দিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে যে সাবধান বানী উচ্চারণ করেছিলেন তা ছিল সমশাস্তি বিধানের ভিত্তিতে। যার দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বন্দিদের প্রাণের সংরক্ষণ। এর সাথে রাষ্ট্র প্রধানকে অর্পিত ইখতিয়ারের কোনো সম্পর্ক নেই। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূল বাহরী ইব্‌ন হিশামকে হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ সে মক্কায় তাঁকে [রাসূলুল্লাহকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কাফির মুশরিকদের কষ্ট দেয়া থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) উকবা ইবন আবী মু'ঈতকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। তখন সে রাসুলুল্লাহ (সা.) কে বললো হে মুহাম্মদ! তুমি কী কুরাইশদের সামনেই আমাকে হত্যা করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ (হে জনতা!) তোমরা কী জান, সে আমার সাথে কীরূপ আচরণ করেছে? আমি *মাকামে ইবরাহীমের পেছনে*

---

[৪৭] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯১।

সাজদাহ্‌রত ছিলাম, সে এসে তার দু'পা আমার ঘাড়ের উপর উঠিয়ে দেয়। কোনক্রমেই তা সরায় না। এতে আমার দু'চোখ ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। আবার অন্য একদিন এসে আমার মাথার উপর ছাগলের নাড়ী-ভুড়ি চাপিয়ে দিয়েছিল যা ফাতিমা (রা) এসে পরিস্কার করে দেয়। সুতরাং এখানে উকবার যে মৃত্যুদ  তা কেবলমাত্র বন্দির সাজা নয়; বরং পূর্বের কৃতকর্মের সাজা। অনূরূপভাবে নদর ইব্‌ন হারিছকেও একই কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। বদর যুদ্ধে বন্দিদের মধ্যে এ দুজনকেই শুধু হত্যা করা হয়েছিল। আর অন্যান্যদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়া হয়েছিল। যেমন, আবূল 'আস, রবী'উল উমূবী এবং কবি আবূ ইয্‌যাহ।

সত্যকথা হলো এই যে, *ফিতরাত* (সহজাত বৃত্তি) তথা ইসলামের দর্শন মুক্তিপণ ও অনুগ্রহ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রধানের অধিকার সংযুক্ত হোক তা গ্রহণ করে না। কেননা মুক্তিপণ অথবা অনুগ্রহ করে বন্দিকে মুক্তি দেয়া এটি তার শাস্তি হতে পারে না। হত্যা হলো এর একমাত্র শাস্তি কিন্তু বন্দি হওয়া অপরাধ নয়; বরং এটি যুদ্ধের ধারাবাহিক কার্যক্রমের মধ্যে একটি কার্যক্রম যা প্রতিপক্ষকে অক্ষম করার একটি কৌশল মাত্র। সুতরাং যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যায় তখন এ বন্দিত্বের যথাযথ উপযোগিতা আর অবশিষ্ট থাকে না। ফলে হত্যাও আর বন্দির অনুবর্তী হয় না। ফকীহগণ মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করলেও সকলে এ মর্মে একমত যে, কোনো বন্দি যদি মুসলিম হয়ে যায় তাহলে তার রক্তপাত হারাম। সূরাহ্ মুহাম্মাদ এ বর্ণিত বিষয়টি রহিত কী না? এ বিষয়ে আমার মত হলো এটি সঠিক নয়। রহিত হওয়ার প্রবক্তারা সূরাহ্ তাওবার নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন।

﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ﴾

'অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে* যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর।'[৪৮]

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক অধ্যয়ন করলে বুঝা যায়, যে সমস্ত ফকীহ আয়াতটি রহিত হওয়ার প্রবক্তা তাদের মত খুবই দুর্বল ও দূরবর্তী। আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুশরিকরা একটি চুক্তির অধীনে মুসলিমদের সাথে বায়তুল্লাহ্‌কে যিয়ারত করত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছে করলেন, তিনি বায়তুল্লাহ মু'মিনদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেবেন এবং মুশরিকদের নাপাকী থেকে মুক্ত রাখবেন। এ মর্মে

[৪৮] সূরাহ্ আত্-তাওবা : ৫।

* এখানে তৎকালীন মক্কার মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং তাদের ব্যাপারে উল্লেখিত বিধান বর্ণিত হয়েছে।

তিনি আয়াতটি নাযিল করেন এবং তাতে উক্ত চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় নির্ধারণ করা হয়। বলা হয় এরপর কোনো মুশরিক পবিত্র *হারামে মাক্কায়* প্রবেশ করলে তাকে হত্যা করা হবে। এছাড়া তাদেরকে ঘেরাও বা বন্দি করারও নির্দেশ দেয়া হয়। অতএব এ আয়াত বা অন্য কোনো আয়াতের সাথে তাদের নিঃশর্ত বা শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দেয়ার কোনো বিষয় যুক্ত করা সমীচীন নয়। এর স্বপক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদীছ উজ্জ্বল প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে বছর 'আলীকে (রা) অথবা আবূ বাকরকে (রা) হজ্জের চারটি বিষয়ে সতর্ক করে মিনায় ঘোষণা দিতে নির্দেশ দেন। জান্নাতে মু'মিন ছাড়া কেউ প্রবেশ করবে না, উলঙ্গ হয়ে কেউ বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ আছে তারা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ থাকবে। এ বছরের পরে আর মুশরিকরা মুসলামানদের সাথে হজ্জ করতে পারবে না।'

আমার (প্রবন্ধকার) মতে, যিনি উপরিউক্ত আয়াত মানসূখ হয়েছে বলে মতপোষণ করেন, তিনি উপরে বর্ণিত অপরাধের কারণে বন্দিকে হত্যা করা, দয়া-প্রদর্শন করা কিংবা মুক্তিপণ দেয়ার ক্ষেত্রে সুক্ষ্ম পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারেনি। তার শাস্তি বিধানের জন্য রাষ্ট্র ব্যক্তি নিয়োগ করবে এটি দোষনীয় নয়; বরং এটি প্রচলিত আন্তর্জাতিক রীতিকে জোরালো করে। ইসলামী ফিক্হের দৃষ্টিতে যুদ্ধাপরাধ বা মানবতা বিরোধী অপরাধে জড়িত হয়েছে এমন কোন বন্দিকে হত্যা করার অধিকার রয়েছে, এক্ষেত্রে আমি (প্রবন্ধকার) আপত্তি করি না।

যারা বন্দীকে সাধারণভাবে হত্যা করাকে বৈধ মনে করেন, তাদের কথা মেনে নিলে আমাদের চিন্তা করা উচিৎ যে, ইসলাম সম্পর্কে মানুষ কি বলবে? যদিও সালাহউদ্দীন আল-আয়্যূবী ক্রুসেডারদের বড় সংখ্যক সৈন্য বন্দী করার পর যখন দেখলেন যে, তাদেরকে আহার দেয়ার মত সামগ্রী তাঁর কাছে নেই তখন তিনি তাদেরকে ছেড়ে না দিয়ে হত্যা করলেন, অথচ তিনি পূর্বে বন্দীদের মুক্ত করে দিতেন। কারণ তিনি এ বড় সংখ্যক বন্দীকে মুক্তি দেয়ার ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন যে, যদি তাঁরা আবার সংঘবদ্ধ হয়ে যুদ্ধে যোগ দেয় তাহলে এটি মুসলিমদের জন্য বিপদের কারণ হবে। কিন্তু এখন আমি উল্লেখ করতে চাই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলিম সেনাপতির উপর যে বিষয়টি দেখা আবশ্যক তা হল মানবিকতাকে প্রচণ্ড ভাবে সম্মান করা। ফলে তাকে অবশ্যই বন্দীকে মুক্ত করে দিতে হবে। শত্রুকে যুদ্ধের মাঠে হত্যা করা যাবে, কিন্তু নিজ হাতে বন্দী অবস্থায় অভুক্ত রাখা যাবে না। আর বানূ কুরায়যার ঘটনায় তারা বন্দী ছিল না।

## বন্দিদের দাস বানানো

এ বিষয়ে ইসলামের সঠিক নির্দেশনা বুঝতে অনেকেই ভুল করে থাকে। ইসলাম কীভাবে একজন মানুষকে দাসে পরিণত করতে পারে? যেখানে আল-কুরআনে বলা হয়েছে মানুষ এতটাই সম্মানিত যে, ফিরিশতা তাকে সাজদাহ্ করে। ইসলামে একটি স্বীকৃত মূলনীতি হলো মানুষ সৃষ্টিগতভাবে সবাই স্বাধীন ও সমান। সেখানে 'আরব-অনারব এবং সাদা-কালো, বিবেচনায় কোনো তারতম্য বা শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তবে *তাকওয়ার* ভিত্তিতে এ শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করা হবে। দ্বীনের ব্যাপারে কোনো যবরদস্তি নেই এবং ঝগড়া-বিবাদ হবে উত্তম পদ্ধতিতে। বিষয়টির ব্যাখ্যা বিস্তৃত। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করেছি। জীবনের বাস্তবতা যখন আমাদেরকে শত্রুর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য করে, তখন আমরা আসমানী নির্দেশনা অনুযায়ী যুদ্ধে লিপ্ত হই। যুদ্ধের কারণে বন্দি করার সামাজিক প্রয়োজন সৃষ্টি হয়। বন্দিত্বের এ সাময়িক বিষয়টির একটি পরিসমাপ্তির প্রয়োজন। সুতরাং বন্দির শেষ পরিণতির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্যাবশ্যক। এ সিদ্ধান্তের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, বন্দি বানানোর বিষয়টি পতন যুগে ব্যর্থতার কারণে ইসলামের পেছন দরজা দিয়ে অনুপ্রবেশ করেছে এজন্য আল-কুরআনে বন্দির বিষয়ে অতীতকাল জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ঐ সময় আন্তর্জাতিক আইনে গোলাম বানানোর বিষয়টি প্রচলিত ছিল। মুসলমানদের অনেক বন্দিকে গোলাম বানিয়ে হাট বাজারে বিক্রয় করা হতো। ইবনু জুবায়র তার ভ্রমণ কাহিনীতে ইতালীর বাজারে মুসলিম নারী ও শিশু-বন্দীদের দুর্দশা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং সে সময় মুসলমানদের নিকট সমআচরণ ছাড়া অন্য কোন পথ ছিলনা। কিন্তু এ সমআচরণ শুধু গোলাম বানানোর বৈধতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা ইসলামে গোলাম বানানোর ক্ষেত্রে মানবিকতা ও শত্রুদের বর্বরতার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ইসলামে গোলাম বানানোর বিষয়টি একটি ইমারজেন্সি বিষয়। সুতরাং স্বভাবতই এর প্রয়োজনীয়তা ও কারণ চলে যাওয়ার সাথে সাথে বিধানটির পরিসমাপ্তি ঘটে। আজ যখন আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো গোলাম বানানোর বিষয়টিকে তিরোহিত করছে এবং এর স্বীকৃতি দিচ্ছেনা, সেহেতু বন্দিকে গোলাম বানানোর এখতিয়ার আর মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের নেই। সুতরাং বন্দিদেরকে গোলাম বানানো মুসলমানদের জন্য বৈধ নয়। আর যারা এরূপ কাজ করবে তারা দ্বীনের বিধান থেকে বেরিয়ে যাবে।

যখন দাস প্রথা বৈধ ছিল তখন ইসলাম তাদেরকে এমন মর্যাদা প্রদান করেছে যে, তারা দাস নয় তারা মনীব। তাদের দাস-দাসী না বলে যুবক, যুবতী, বালক বলে সম্বোধন করা হত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

'তোমরা তাদেরকে দাস দাসী বল না। যুবক, যুবতী বলে তাদের সাথে কথা বল। আল-কুরআনে এভাবে এসেছে,

﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾

'সে (বিবাহ করবে) তোমাদের মুমিন যুবতীদের মধ্য থেকে, তোমাদের হাত যাদের মালিক হয়েছে তাদের কাউকে।'[৪৯]

দাসকে ইমামতী করার ব্যাপারেও পরামর্শ দেয়া হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, 'আয়িশা (রা)- এর একজন দাস ছিল; সে তাঁর ইমামতি করতেন। দাসের সম্মানে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا[৫০]﴾

'খাদ্যের প্রতি আসক্ত থাকা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর ভালোবাসায় মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বন্দিদের সাথে উত্তম আচরণ কর।' বদরের বন্দিদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক এতটা উন্নতি হয়েছিল যে, তারা নিজে রুটি না খেয়ে তাদেরকে রুটি ও খেজুর খাওয়াতো। একদা আবূ যার (রা) কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কেন দাসদের মত কাপড়-চোপড় পরিধান করেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই বলতে শুনেছি 'তারা তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা যা খাও, পরিধান কর তাদেরকে তা-ই খাওয়াবে ও পরিধান করাবে। সাধ্যাতীত কোনো কিছু চাপিয়ে দেবে না, যদি এরূপ হয় তাহলে তুমি তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন, দাসদের খাওয়া-পরা সবকিছুর দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রের। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾

"তারা বলে, আমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের খাদ্য দান করি। আমরা তোমাদের থেকে কোনো প্রতিদান চাই না এবং কোনো কৃতজ্ঞতাও নয়।"'[৫১]

---

[৪৯] সূরাহ্ আন্-নিসা: ২৫।

[৫০] সূরাহ্ আদ্-দাহ্র: ৮।

[৫১] সূরাহ্ আদ্-দাহ্র: ৯।

যখন বদরের বন্দিদের নিয়ে আসা হলো তখন (বন্দিদের মধ্যে) আব্বাস (রা.)-এর গায়ে তেমন কোনো কাপড় ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উবাইয়ের কোর্তা পরিয়ে দিলেন।

ইসলাম দাসকে কষ্ট দেয়া থেকে নিষেধ করে। যদি কেউ এরূপ করে তাহলে তাকে কাফ্‌ফারা দিতে হবে। কাফ্‌ফারা হলো উক্ত দাসকে মুক্ত করে দেয়া, অথবা তার সাথে মুক্তি দেয়ার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾

"যাদের সাথে লিখিত চুক্তি করতে চাও তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর, যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে বলে জানতে পার।"[৫২] এছাড়াও কোনো দাসী যদি স্বীয় প্রভুর জন্য সন্তান জন্ম দিতে পারে তবে সে আযাদ হয়ে যায় এবং তাকে ام الولد বলা হয়। ইসলামে দাস-দাসীর বিষয়টি এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, কয়েক লাইনে এর বিধান লেখা সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে তারাও মানুষ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু শয্যায় উম্মতদের সাবধান করে বলেছেন, তোমরা দু'শ্রেণির দুর্বলদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে প্রথমত: নারী দ্বিতীয়ত: গোলাম।

বন্দিদের ব্যাপারে রায় ঘোষণার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রধানের যথেষ্ট সময় নেয়া দরকার। কেননা এতে তার অধিকার কিছুটা হলেও রক্ষিত হবে। এ সম্পর্কে কিছু কথা বলা উচিত।

**প্রথমত:** বন্দির ব্যক্তি মর্যাদা ও সম্মান অক্ষুণ্ন রাখা উচিত! তাকে কষ্ট দেয়া বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাদেরকে কষ্ট দেবেন দুনিয়াতে যারা মানুষকে কষ্ট দিয়েছে।' তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতিশোধ নেয়াকে নিষেধ করেছেন যদিও তা পাগল কুকুরের ক্ষেত্রেও হয়। বদর যুদ্ধে সুহায়ল ইব্‌ন 'উমর আল আমিরী-কে বন্দি করে নিয়ে আসা হয় (এ মুশরিক ছিল একজন বাগ্মী)। সে তার জ্বালাময়ী বক্তৃতা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে সবাইকে উসকানি দিত। 'উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে নির্দেশ দেন আমি তার সামনের দাঁত উপড়িয়ে ফেলব সে যেন ভবিষ্যতে কোনদিন আর আপনার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে উসকানি দিতে না পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি আমি বদলা নেই তাহলে মহান আল্লাহ আমার বদলা নেবেন যদিও আমি নবী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[৫২] সূরাহ্ আন্-নুর : ৩৩।।

ওয়াসাল্লাম বন্দিদের উহ্ আহ্ কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। তিনি কোনো এক বিনিদ্র রজনী যাপন করলেন, কিছুতেই তাঁর চোখে ঘুম আসছিল না। তাঁকে বলা হলো কেন আপনার চোখে ঘুম আসেনি হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, আব্বাসের আর্তনাদ। এসময় একজন সাহাবী তার বাধন খুলে দিলেন এবং সকল বন্দিদের সাথে একই আচরণ করলেন। একদা বিলাল (রা) দু'জন ইয়াহুদী নারী বন্দির পাশ দিয়ে গমন করছিলেন তারা যুদ্ধে নিহতদের স্মরণে কাঁদছিল। তাদের মধ্যে সে দু'জনের নিকটাত্মীয় ছিল। তাদের একজন এত বেশী বিলাপ করছিল যে, মাটি তুলে তুলে নিজ মাথায় ছিটিয়ে দিচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বিলাল! তোমার হৃদয় থেকে কী দয়া-মায়া ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে? তুমি এ দু'জন মহিলাকে অতিক্রম করলে অথচ তাদেরকে সমবেদনাও জানালে না।

চুক্তি পূরণকারী জিম্মাদার ব্যক্তিকে হত্যা করা বৈধ নয়। যদিও শত্রু মুসলিম পক্ষের কোনো জিম্মাদারকে হত্যা করে। এখানে الرهائن তথা জিম্মাদার দ্বারা তাদেরকে উদ্দেশ্য নয় যাদেরকে পাকড়াও করার ব্যাপারে সমসাময়িক আইনে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তারাই, যারা মুসলিমদের নিরাপত্তায় চুক্তি পূরণের জন্য আশ্রিত।

বন্দিদের মর্যাদা প্রসঙ্গে উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, গনীমতের মাল হিসেবে বন্টিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো মহিলা বন্দিদের সাথে দৈহিক মিলন হারাম। যদি কেউ এরূপ কাজে লিপ্ত হয় তাহলে তাকে *তা'যীরী* শাস্তি দিতে হবে এবং জরিমানা হিসেবে *মাহরে মেছাল* দিতে হবে। এরপর তাকে গনীমত হিসেবে পরিগণিত করা হবে। বন্দি হত্যা নিষিদ্ধের বিষয়ে আলোচনা এখানেই ইতি টানছি।

বন্দিদের ব্যাপারে মানবীয় মূলনীতি হলো, তারা একই পরিবারের সদস্য হলে তাদেরকে এক জায়গায় রাখা। ফকীহগণ একমত যে, সাত বছরের কম বয়সী বাচ্চাকে মা থেকে পৃথক রাখা যাবে না, তবে ক্রয়-বিক্রয় ও ভাগ করা পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীকে আলাদা রাখা যেতে পারে। যদি কোন বন্দি পরিবারের কাছে যদি পত্র প্রেরণ করতে চায় তাহলে তাকে সে অধিকার দিতে হবে।

যে কোনো কারণে বন্দিদের মাঝে মর্যাদাগত পার্থক্য সৃষ্টি করা যাবে না। ইসলামের বক্তব্য এ ব্যাপারে খুবই স্পষ্ট যে, আমরা সবাই আদম (আ) থেকে সৃষ্ট, আর আদম (আ) মাটি থেকে সৃষ্ট। ইসলাম সামাজিকভাবে সবাইকে সমভাবে মানবিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে চায়। এখানে মানবিক সমতার অর্থ সামাজিক সমতা নয়। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেন। নিম্নে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো,

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾

"আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না সে সবের, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের এক জনকে অন্য জনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।"[৫৩] অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾

"ঐ রাসূলগণ, আমি তাদের কাউকে অন্য কারোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"[৫৪] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾

"আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা করেন তার উপর তাঁর অনুগ্রহ নাযিল করেন।"[৫৫] অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

"আর আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের অনেককে অনেকের উপর মর্যাদা দিয়েছি।"[৫৬]

ইসলাম চায় আমরা আমাদের ধারণা স্বচ্ছ রাখি, বন্দিদের ব্যাপারে তাদের সামাজিক মর্যাদা, তাদের স্থান ও স্তরের কোনো দিকে না তাকিয়ে আমরা বন্দিদের মাঝে সমতার বিধান সুনিশ্চিত করি। মানবিকতার আবেদন ও দাবিকে সামনে রেখে আমরা তা পূরণে সচেষ্ট হই। আমরা আল-মাকরিযীর *আল-খুতাত* গ্রন্থে পড়ে থাকি, তৎকালীন মিসর অধিপতির কন্যার বন্দি হওয়া সম্পর্কে। সে সমস্ত রাজা বাদশাহর সন্তানদের বিশেষ মর্যাদা ছিল যা মুকাওকিসের অন্যান্যদের মর্যাদার মত নয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অপমানিত জাতির উপর রহম কর। ইব্‌ন আসাকির বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের নিকট কোনো সম্মানিত জাতি আগমন করলে তোমরা তাদের সম্মান কর।" জেনেভা কনভেনশনের ৪৪ ও ৪৫ ধারায় শুধু অফিসারদের মর্যাদা ও বয়স বিবেচনায়

[৫৩] সূরাহ্ আন্-নিসা: ৩২।

[৫৪] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ২৫৩।

[৫৫] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ৯০।

[৫৬] সূরাহ্ আল-ইসরা: ৭০।

বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। যদি কোনো বন্দি পালিয়ে যায় এবং নিজ বাড়িতে পৌঁছে যায় তবে সে আযাদ হয়ে যাবে। তবে তার সাথে কোনো চুক্তি সম্পাদিত হলে তা তাকে বাস্তবায়ন করতে হবে। কারণ ইসলাম খিয়ানত পছন্দ করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ "নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের পছন্দ করেন না।"[৫৭]

## উপসংহার

উপরিউল্লিখিত বর্ণিত আহকাম তথা বিধি-বিধান সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার যা আন্তর্জাতিক ও ইসলামী মানবিক আইন থেকে উৎসারিত। এগুলো একটি সাধারণ সুশৃঙ্খল বিধি-বিধান। আমীর বা রাষ্ট্র প্রধানের হুকুম ব্যতিরেকে কোনো মুসলিম এগুলোর বিরোধিতা বা অমান্য করতে পারে না। কেননা ইসলামী নীতি জ্ঞান মানুষ হিসেবে একজন যোদ্ধাকে মানবিক আইনের অনুগামী ও দায়িত্বশীল বানিয়ে দেয়। সুতরাং অবৈধ কাজে সৃষ্টির আনুগত্য করা বৈধ নয়। বর্ণিত আছে 'আলকামা ইব্‌ন মুযায্‌যাযকে *যুলকারদ* দিবসের পর কোনো এক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সৈন্যসহ তাকে ডেকে পাঠান এবং 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফা আশ-শামীকে অবশিষ্ট সৈন্যদের আমীর বানিয়ে সেখানে পাঠান। পথে তিনি আগুণ জ্বালান এবং বলেন, এখন আমি তোমাদের আমীর, আমার আনুগত্য তোমাদের করণীয়। আমি নির্দেশ দিচ্ছি তোমরা এ আগুনে ঝাপ দাও। এ নির্দেশ শুনে কিছু লোক ঝাঁপ দিতে প্রস্তুতি নেয়, তখন 'আব্দুল্লাহ হেসে বলেন, দাঁড়াও আমি শুধু মাশকারা করছিলাম। এ খবর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌঁছলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যখন আমীর কোনো অবৈধ কাজের নির্দেশ দেবে তোমরা তা পালন করবে না।

---

[৫৭] সূরাহ্‌ আল-আনফাল: ৫৮।

# ইমাম আল-আওযা'ঈ ও তাঁর মানবিক চিন্তাধারা*

ড. 'আমের আয-যামালী**

অনেক 'আরবী প্রাচীন গ্রন্থে শাম তথা সিরিয়া অধিবাসীদের ইমাম 'আব্দুর রহমান আল-আওযা'ঈ (রহ.) -এর আলোচনা বিবৃত হয়েছে। সেসব গ্রন্থের মধ্য থেকে আমরা ইবনু নাদীমের '*আল-ফিহরিস্ত*' এবং ইব্ন আবী হাতিম আর-রাযীর (মৃত্যু ৯৩৮) '*আল-জারহ ওয়াত তা'দীল*' এ দু'টি গ্রন্থের উল্লেখ করছি। আর এ বিষয়ে আধুনিক গ্রন্থপঞ্জি থেকে প্রখ্যাত লেখক ডক্টর সুবহী মাহমাসানী'র লেখা '*আল-আওযা'ঈ ওয়া তা'আলীমুহুল ইনসানিয়্যাহ্ ওয়াল কানূনিয়্যাহ্*' একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, যা ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে বৈরূত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে ইমাম আওযা'ঈর (রহ.) জীবনী এবং *সিয়ার* (যুদ্ধআইন) অভিজ্ঞানে তাঁর অবদান এবং শাসক ও শাসিতদের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মতামত উপস্থাপন করব।

## ১. ইমাম আওযা'ঈ (রহ.): ব্যক্তি ও সমসাময়িক সমাজ

নির্ভরযোগ্য মতে আবূ 'উমার 'আবদুর রহমান আল-আওযা'ঈ (রহ.) আনুমানিক ৮৮ হি./ ১০৭ খিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে *বা'লাবাক্কা* শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞান অনুসন্ধানের জন্য পূর্বাঞ্চলের শহরগুলোতে তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করেন। *ইয়ামামা, বসরা* ও *কূফার* অনেক বিদগ্ধ আলিমের নিকট তিনি হাদীস ও অন্যান্য জ্ঞানসমৃদ্ধ তথ্য শ্রবণ করেন। ইয়ামামা থেকে

---

* প্রবন্ধটি ১৯৮৮ সালে নভেম্বর মাসে রেড ক্রসের আন্তর্জাতিক জার্নাল, চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

** ড. 'আমের আয-যামালী আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বিশেষজ্ঞ একজন পণ্ডিত। তিনি তিউনিসিয়ায় আইন ও রাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনা করেন এবং আইনশাস্ত্রে ডিগ্রী অর্জন করেন। এর পর তিনি *জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের* আইন অনুষদ থেকে এম.এ ও ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৮৫ সাল থেকে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের মাঠ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৯০ সালে এ সংস্থার সদস্য হন। ১৯৯৬ সালে তিনি আম্মানে অবস্থিত আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির অফিসে আঞ্চলিক প্রধান হিসেবে কাজ করেন। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত তিনি কায়রোতে এ সংস্থার আঞ্চলিক প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি আরব, ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র ও অঞ্চলে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন। আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বিষয়ে তাঁর গবেষণাধর্মী অনেক গ্রন্থ ও নিবন্ধ রয়েছে। দ্রষ্টব্য: *iqbal.hypotheses. org/2860.*

* *প্রবন্ধটি ড. আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া অনুবাদ করেন যা আইসিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইন* গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। পৃ. ৬০-৭৩- প্রকাশক।

বসরার দিকে তাঁর সফরের পরবর্তী সময়ে তিনি দামিস্কে আগমন করেন এবং বৈরুতে অবস্থান করার উদ্দেশ্যে সেখানেই তাঁর সফরের পরিসমাপ্তি ঘটান। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বৈরূতে অবস্থান করেন এবং এখানেই আনুমানিক ১৫৭ হি./৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী ছিল ফিক্হী মাযহাবসমূহের সূচনা ও ক্রমবিকাশের যুগ। আর এযুগ ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃত রাজনৈতিক ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ঘটনা ছিল উমাইয়াদের কাছ থেকে আব্বাসীয়দের নিকট ক্ষমতা স্থানান্তরের ঘটনা। ইমাম আওযা'ঈ (রহ.) সে ঘটনাবহুল পরিবেশের মধ্যেই জীবনযাপন করেন এবং প্রশাসক ও খলীফাদের সাথে তাঁর যোগাযোগ ও সম্পর্ক সুবিস্তৃত করেন।

তৎকালীন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান নগরীসমূহের আলিমদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল তীব্র। কারণ প্রত্যেক নগরীর জন্য ছিল একাধিক ইমাম বা নেতা। এসময় 'ইরাক ও হিজাযে দুটি ফিক্হী মাদরাসার (গোষ্ঠীর) আত্মপ্রকাশ ঘটে। ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে এ মাদরাসা দুটির প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। মাদরাসা দুটির একটি হলো '*মাদরাসাতু আহলির রায়*' বা ব্যক্তিগত অভিমতের উপর নির্ভরশীল মাদরাসা। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) (৪০-১৫০ হি./৬৯৯-৭৬৭ খ্রি.) ছিলেন এ মাদরাসার নেতৃত্বে। অপর মাদরাসাটি ছিল '*মাদরাসাতু আহলিল হাদীস*' বা শুধু হাদীসের উপর নির্ভরশীল মাদরাসা, যার নেতৃত্বে ছিলেন মদীনার ইমাম মালিক (রহ.) (৯৩-১৭৯ হি../৭১২-৭৯৩ খ্রি.)। ইমাম আওযা'ঈ (রহ.) তাঁদের দু'জনের ছাত্র বা অনুসারী ছিলেন না; বরং তিনি নিজেই ছিলেন একটি মাযহাবের স্থপতি এবং সমসাময়িক যুগের শ্রেষ্ঠ ফকীহগণের অন্যতম। এর প্রমাণ হলো শামে (সিরিয়ায়) দু'শ বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁর মাযহাবের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা এবং তা পশ্চিম আরব থেকে মুসলিম স্পেন পর্যন্ত বনু উমায়্যার তৃতীয় খলীফা হিকাম ইবন হিশামের শাসনকাল পর্যন্ত (তাঁর খিলাফত: ১৮০-২০৭ হি./৭৯৬-৮২২ খ্রি.) সম্প্রসারিত হওয়া। কিন্তু দু'শতাব্দীরও অধিক কাল পরে সিরিয়ায় শাফি'ঈ মাযহাব প্রভাবশালী হয়ে উঠে এবং স্পেনে প্রভাবশালী হয় মালিকী মাযহাব। সে হিসেবে ইমাম আওযা'ঈ (রহ.) -এর মাযহাব স্পেনে নেতৃত্ব দিয়েছিল প্রায় চল্লিশ বছর। এ জন্য তাঁর মাযহাব বিলুপ্ত মাযহাবের মধ্যে গণ্য করা হয়। এসব কারণে ইমাম আওযা'ঈর (রহ.) যেসব গ্রন্থ আমাদের নিকট পৌঁছেছে সেগুলোর সংখ্যা খুবই নগণ্য। পরবর্তীকালে শান্ত পরিবেশে অন্যদের রচিত গ্রন্থসমূহের সাথে তা সংযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। অনুরূপভাবে সে সময় তাঁর ছাত্ররা তাদের শিক্ষকগণের ফিক্হকে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দেয়নি, যেমনটি অপরাপর মাযহাবের অনুসারীরা

নিজেদের ইমামগণের মতামত ছড়িয়ে দিয়েছিল। পরবর্তী কালে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসকগণ অন্যান্য মাযহাবের অনুসারীদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে সম্মানিত করেছেন। ইমাম আওযা'ঈর (রহ.) জীবনের বিভিন্ন স্তর বা পর্যায়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন করে জানা যায় যে, শাসক ও খলীফাগণের পক্ষ থেকে প্রস্তাব চাপিয়ে দেয়া সত্বেও তিনি বিচারক ও মন্ত্রীর মতো সরকারী পদে ক্ষমতাসীন হননি। তবে এটি শাসকের দায়িত্ব-কর্তব্য ও শাসিতদের অধিকারের প্রতি গুরুত্বারোপ করা থেকে তাঁকে বিরতও রাখেনি।

## ২. ইমাম আওযা'ঈ (রহ.) এবং শাসক ও শাসিতদের মধ্যে সম্পর্ক

ইমাম আওযা'ঈ (রহ.) ছিলেন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের অন্যতম। তিনি কথায় ও কাজে সুন্নাহ'র পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। তাঁর দুটি বিশেষ অর্থবোধক শব্দ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে তা তাঁর বহু উক্তিতে বিদ্যমান। শব্দ দুটি হলো, الراعي ও الرعية যা প্রসিদ্ধ হাদীস থেকে সংগৃহীত। হাদীসটি হলো,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।'[১]

ইব্‌ন আবী হাতিম আর-রাযী (রহ.) স্বীয় '*আল-জারহ ওয়াত তা'দীল*' গ্রন্থে ইমাম আওযা'ঈ (রহ.) কর্তৃক প্রশাসনিক দায়িত্বশীলদের নিকট প্রেরিত কিছুসংখ্যক পত্রের বিবরণ দিয়েছেন, সেগুলো সম্পর্কে অবহিত হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের যথাযথ ধারণা পাওয়া যাবে। ইমাম আওযা'ঈ (রহ.) বিশ্বাস করতেন যে, 'আলিমের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, যখন শাসককে জনগণের অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় ঠিক তখনই তাঁকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া, তাঁর সামনে নিজ মতামত প্রকাশ করা এবং সাধারণ বিষয় সম্পর্কে তাঁকে লিখিতভাবে অবগত করানো। আমরা ইমাম আওযা'ঈকে (রহ.) দেখি, তিনি উপকূলীয় এলাকার অধিবাসীদের জীবিকা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে সুপারিশ কল্পে খলীফার নিকট চিঠি প্রেরণ করেছিলেন। তিনি এ চিঠিতে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, 'ঐসব লোকজন আমীরুল মুমিনীনের প্রজা এবং তাঁকে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে। কারণ তিনি হলেন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। আর প্রত্যেক দায়িত্বশীলকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।' তিনি ঐ চিঠিতে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং এর কারণে পরিবারের ঋণগ্রস্ত হয়ে ব্যয়ভার

[১] *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং: ৮৯৩।

বহনের দুর্বিসহ অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। তিনি আরো ইঙ্গিত করেন যে, এ জন্য রাষ্ট্রের আবশ্যক হলো তাদের উপকারের জন্য (মূল্য নিয়ন্ত্রণে) হস্তক্ষেপ করা। আবূ বালাজ নামক এক গভর্নরের নিকট পাঠানো চিঠিতে ইমাম আওযা'ঈ যিম্মীদের পক্ষ সমর্থন করেন। তিনি গভর্নরকে হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে যিম্মীদের সাথে আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে ন্যায় ও ইনসাফের নীতি অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেন। হাদীসটি হলো,

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'সাবধান! যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কোনো ব্যক্তির প্রতি জুলুম করবে অথবা তার উপর সামর্থ্যের বাইরে অতিরিক্ত কোনো কাজ চাপিয়ে দেবে (কিয়ামতের দিন) আমি তার বিপক্ষে অবস্থান নেব।'[২]

অনুরূপভাবে লেবাননের পাহাড়ী অঞ্চলের খ্রিষ্টানদের উপর সাফ্ফাহ ও মানসূরের চাচা সালিহ ইবন 'আলী 'আব্বাসী অতিরিক্ত কর ধার্য করলে তারা গভর্নরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তিনি তাদের সে বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেন। এসময় ইমাম আওযা'ঈ খ্রিস্টানদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির অপরাধের কারণে ব্যাপক ধরপাকড় নীতি তিনি মেনে নিতে পারেননি। তিনি কঠোর ভাষায় সরকারের সমালোচনা করে বলেছিলেন, 'যাদেরকে তাদের বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে তারা দাস নয়, তারা স্বাধীন, তারা '*আহলুয যিম্মাহ*'। এমন ব্যক্তিবর্গকে রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব।

ইমাম আওযা'ঈর (রহ.) পত্রগুলোতে আমরা পদ অথবা বিশেষ সুবিধার মতো ব্যক্তিগত প্রয়োজনের কোনো আবেদন দেখতে পাই না; বরং যার মধ্যে সর্বসাধারণের কল্যাণ রয়েছে তিনি তার জন্য চেষ্টা সাধনা করাকে নিজের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব বলে মনে করতেন। অথচ তিনি নিজকে স্বীয় যোগ্যতা দ্বারা সর্বোচ্চ স্তরে আসন করে নিতে পারতেন। যখন আমীর 'আবদুল্লাহ 'আব্বাসী তাঁকে বিচারকার্য পরিচালনা করার প্রস্তাব দেন, তখন তিনি একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্বক উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, আপনার পূর্ববর্তীগণ আমাকে এ বিষয়ে কোনো কষ্ট দেননি এবং আমি আশা করি যে, তারা (আপনার পূর্ববর্তীগণ) আমার প্রতি যে ইহসানের সূচনা করেছেন আপনি তা পূর্ণতা দান করবেন।

ইমাম আওযা'ঈ (রহ.) ছিলেন সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রের জনহিতকর কাজ করার ক্ষেত্রে মূর্ত প্রতীক। তিনি অনুধাবন করতেন যে, রাষ্ট্রের

[২] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং : ৩০৫২।

স্তম্ভসমূহ সুদৃঢ়করণ এবং এর ক্ষমতাকে স্থায়ীকরণের ক্ষেত্রে এসবের রয়েছে বিরাট ভূমিকা। ইমাম আওযা'ঈ (রহ.) -এর সময়ে ইসলামী বিশ্বের সীমানা সম্প্রসারিত হয়েছিল পূর্ব দিকে পাঞ্জাব পর্যন্ত এবং পশ্চিমে স্পেন পর্যন্ত। সময় সময় রাষ্ট্রে বিভিন্ন মাত্রার ভয়াবহ অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দেখা দিত। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, 'আব্বাসীয়দের শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শক্তির জোরে এবং বাগদাদ হয়েছিল খিলাফতের রাজধানী, যাকে খলীফা আল-মানসূর ১৪৫ হিজরীতে/৭৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। এ অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা পুরোপুরিভাবে বন্ধ হয়ে যায়নি। অন্য রাষ্ট্রের সাথেও সম্পর্ক ভালো ছিল না, বায়জান্টাইনদের সাথে চলছিল নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ। ফকীহ্গণ কর্তৃক শান্তি, যুদ্ধ ও উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিধি বিধানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করার মূল নিয়ামক শক্তিরূপে *সিয়ারকে* বিবেচনা করা হয়। এসব বিধি বিধানের ক্ষেত্রে ফকীহগণ *'সিয়ার'* শব্দটি প্রয়োগ করেন। আধুনিক ভাষায় যা *আন্তর্জাতিক আইন* হিসেবে পরিচিত। এ পর্যায়ে *সিয়ার* শাস্ত্রে ইমাম আওযা'ঈর (রহ.) অবদান বিশ্লেষণ করা হবে।

## ৩. ইমাম আওযা'ঈ (রহ.) ও সিয়ার অভিজ্ঞান

### ক. সাধারণ দৃষ্টি আকর্ষণ

*'কিতাবুস সিয়ার'* নামক গ্রন্থটি ইমাম আওযা'ঈর (রহ.) সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এটি ফিক্হশাস্ত্র বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বড় ধরনের যুক্তিতর্কের সূচনা করেছে। গ্রন্থটির মূল পাঠের কোনো অস্তিত্ব নেই। এটি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর ছাত্র কাযী আবূ ইউসুফ (রহ.) (১১৩-১৮২ হি./৭৩১-৭৯৮খ্রি.)-এর *'আর-রাদ্দু 'আলা সিয়ারিল আওযা'ঈ'* নামক গ্রন্থের পাদটীকায় বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া ইমাম শাফি'ঈর (রহ.) *'আল-উম্মু'* নামক গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডের সাথে প্রকাশিত হয়েছে। বাস্তব কথা হলো, যুদ্ধের বিধি-বিধান সংকলনে *হানাফী মাদরাসাটি* ছিল সর্বাগ্রে। মুহাম্মদ ইবন হাসান আশ-শায়বানী (১৩২-১৮৯ হি./৭৪৮-৮০৪ খ্রি.)-এর মাধ্যমে এর অগ্রযাত্রা শুরু হয়। তিনি *'আস-সিয়ারুস সাগীর* নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। যখন ইমাম আওযা'ঈ গ্রন্থটির ব্যাপারে অবহিত হয়ে, বললেন, 'গ্রন্থটি কার?', জবাবে তাঁকে বলা হলো, মুহাম্মদ (আশ-শায়বানী) আল-ইরাকী'র। তিনি বললেন, এ বিষয়ে ইরাকবাসীর কী লেখা রয়েছে? কারণ তাদের তো *সিয়ার* বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের যুদ্ধসমূহ সংঘটিত হয়েছিল সিরিয়া ও হিজাযে, ইরাকে নয়। আর ইরাক বিজয় ছিল

সবচেয়ে নতুন বিষয়।[৩] ঠিক এসময়ে ইমাম আওযা'ঈ (রহ.) তাঁর *সিয়ার* (السير) নামক গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। কিন্তু আশ-শায়বানীকে ইমাম আওযা'ঈর কথা সন্তুষ্ট করতে পারেনি তাই তিনি *'কিতাবুস সিয়ার আল-কাবীর'* নামক আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন। সম্ভবত গ্রন্থটি তিনি চিন্তার পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির পরবর্তী ধাপেই সম্পন্ন করেছিলেন এবং আব্বাসীয় খলীফা হারুনুর রশীদের নিকট তা প্রেরণ করেছিলেন। এসময় ইমাম আওযা'ঈ (রহ.) জীবিত ছিলেন না। সে যাই হোক, ইমাম আওযা'ঈ (রহ.) ও তাঁর সমসাময়িক আলিমগণের জ্ঞানগর্ভ বিতর্ক থেকে পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে যে, ইমাম আওযা'ঈ (রহ.) ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রতিটি অধ্যায়ে মাস'আলা বর্ণনায় হাদীস, আছার এবং পূর্বসূরীদের মতামত অনুসরণ করেন। তিনি গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম যুগের কর্মকান্ডের শরণাপন্ন হতেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের যুগের প্রথম নীতিমালাকে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করেন। বস্তুতঃ ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি হয়েছিল পরবর্তীকালে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

ইমাম আওযা'ঈ (রহ.) -এর বর্ণনা অনুযায়ী ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুদ্ধসমূহ হয়েছিল হিজায ও সিরিয়া অভিমুখী। ইমাম আওযা'য়ীকে স্বীয় *'সিয়ার'* গ্রন্থ রচনায় উপরিউক্ত নীতিকেই পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করতে দেখা যায়। অন্যান্য মাদরাসার তুলনায় হানাফী মাদরাসাকে বিশেষ করে ইমাম শায়বানী'র পদ্ধতি অনুসরণে *'সিয়ার'* শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। ইমাম আওযা'ঈ ও তাঁর সমসাময়িক ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) সরাসরি ছাত্ররা, ইমাম মালিক (রহ.) ও অন্যান্য ইমামগণ ফিক্‌হ শাস্ত্রের এ শাখাতে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর চিন্তাধারাসমূহ অবশিষ্ট ফকীহগণের চিন্তাদর্শনের সাথে তুলনামূলক তর্কবিতর্ক ও আলোচনার ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) ইমাম আওযা'ঈর (রহ.) *'সিয়ার'* গ্রন্থের যুক্তি খণ্ডনের ক্ষেত্রে তাঁর উস্তাদ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও আওযা'ঈর (রহ.) মধ্যকার মতপার্থক্যের কারণসমূহ বর্ণনা করেছেন। তিনি এমন সব দলীল উপস্থাপন করেছেন যা দ্বারা তাঁর শায়খ (ইমাম আবূ হানীফা)-এর মতটিকে শক্তিশালী করা যায়। তিনি তাঁর নিজের মতটিকে বর্ণনা করেছেন যা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) -এর স্বীকৃত মতের কাছাকাছি। অন্যদিকে ইমাম শাফি'ঈ তাঁর

৩ বর্ণনাটি ইবনু কাছীর থেকে সংগ"হীত।

'*আল-উম্ম*' গ্রন্থে ইমাম আওযা'ঈর (রহ.) '*সিয়ার*' গ্রন্থের বক্তব্য সংরক্ষণ করেছেন। ইমাম শাফি'ঈ এ গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও ইমাম আওযা'ঈর মতামতগুলো বর্ণনা করেন। উপস্থাপিত বিভিন্ন মাস'আলা বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর নিজের মতটি ব্যক্ত করেছেন, আর অধিকাংশ মাস'আলায় তিনি ইমাম আওযা'ঈর (রহ.) অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

বৃহৎ চারটি মাযহাবের তৃতীয়টির প্রধান হচ্ছেন ইমাম শাফি'ঈ (১৫০-২০৪ হি./ ৭৬৭-৮২০খি.) তিনি রায় (সুচিন্তিত মতামত) ও হাদীস (শুধু হাদীসভিত্তিক মতামত) এ দু'পদ্ধতির মধ্যে মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তবে তিনি ইমাম আওযা'ঈর মতো অধিকাংশ সময় হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম তাবারী স্বীয় '*ইখতিলাফুল ফুকাহা*' গ্রন্থে যুদ্ধ সম্পর্কিত মাস'আলা বর্ণনায় অন্যান্য ফকীহ্গণের মতামত এবং এ বিষয়ে তাদের মতৈক্য ও মতানৈক্যের স্থানসমূহ নির্দেশ করেছেন। সেখানেও তিনি ইমাম আওযা'ঈর মতামতকে একজন পূর্ববর্তী বিদগ্ধ আলিমের মত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

যে ধরনের হোক না কেন সব ক্ষেত্রেই তিনি ইমাম আওযা'ঈ ফিক্হের নীতি গ্রহণ করেন। তিনি '*সিয়ার*' গ্রন্থে যুদ্ধের বিধি-বিধান সম্পর্কিত বর্ণিত মাস'আলাসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা আলোচনা করেছেন, তা হলো শত্রু ও তার ধনসম্পদ সম্পর্কে আচরণবিধি। আজও যখন আমরা দেখতে পাই যে, সসস্ত্র সংঘাতের আধুনিক নিয়মকানুনের এক বড় অংশ এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে, তখন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ইমাম আওযা'ঈর দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞা। তিনি ঠিকই বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে,'*মানুষ যুদ্ধের ময়দানেও মানুষ*। সুতরাং তাকে যুদ্ধ সামগ্রী হিসেবে বিবেচনার আগে মানুষ হিসেবেই বিবেচনা করা প্রয়োজন। এখানে ইমাম আওযা'ঈর এ গ্রন্থের আলোচনায় কিছু সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। কারণ তিনি গ্রন্থটিকে এমন কিছু নতুন বিষয় আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন, ইসলামের বিজয়ের ফলে যার সুত্রপাত ঘটেছিল। সেখানে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্কের পরিপূর্ণ রূপরেখা প্রণয়ন করেননি।

ইমাম আওযা'ঈ (রহ.) -এর *সিয়ার* গ্রন্থটিতে যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মাল ও এতদসংক্রান্ত বিধি-বিধান, শত্রুপক্ষের নারী ও শিশুদের বন্দি করা, কাফির পুরুষ অথবা নারী যোদ্ধাদের ইসলাম গ্রহণের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রভাব, *মুরতাদ* (স্বধর্মত্যাগী), নিরাপত্তার আশ্রয়প্রার্থী, যুদ্ধবন্দি এবং গুপ্তচরের অবস্থান সংক্রান্ত বিষয়াবলী স্থান পেয়েছে। যে যুগে ইমাম আওযা'ঈ জীবন-যাপন করেছেন (খ্রিস্ট্রীয় অষ্টম শতাব্দী) আমরা যদি ঐ যুগের শত্রুপক্ষের লোকজন ও তার ধনসম্পদ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহলে মানুষের প্রতি

তাঁর শ্রদ্ধাবোধের পরিমাণ এবং উদার নির্দেশনার অনুসরণের বিষয়টি স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

## খ. শত্রুপক্ষের লোকজন

* ইমাম আওযা'ঈর (রহ.) মতে, নারী অথবা শিশুকে হত্যা করা বৈধ হবে না যতক্ষণ না তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। আর তারা যদি যুদ্ধবন্দি হয় তথাপিও তাদেরকে হত্যা করা যাবে না।

* প্রথম খলীফা আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) (১১-১৩ হি./৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)-কর্তৃক সেনাপতিদেরকে প্রদত্ত নির্দেশনার উপর ভিত্তি করে ইমাম আওযা'ঈ (রহ.) যুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক, রাখাল, পাদ্রী ও অতিশয় বৃদ্ধকে হত্যা করা বৈধ বলে মনে করেননি। এটি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও তাঁর অনুসারীদের মতের অনুরূপ। এর আওতাভুক্ত হবে পাগল ও প্রতিবন্ধী লোকজন, যেমন অন্ধ ব্যক্তি।

* গুপ্তচর মুসলিম অথবা যিম্মী অথবা শত্রু হওয়ার দিক বিবেচনা করে তাদের অবস্থান বিভিন্ন রকম হবে।

* ইমাম আওযা'ঈকে (রহ.) মুসলিম গুপ্তচরের শাস্তি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনি বলেন, তাকে তওবা করতে বলা হবে। অতঃপর সে যদি তাওবা করে তাহলে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে; আর যদি তাওবা করতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে শাস্তি দেয়া হবে। আর এটিই হলো সাধারণভাবে ইমাম আবূ হানীফা ও শাফি'ঈর অভিমত। তাঁরা উভয়েই মুসলিম গুপ্তচরকে হত্যা করা বৈধ মনে করেন না।

* গুপ্তচর যদি এমন যিম্মী হয়, যে শত্রুকে মুসলিমদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে অথবা শত্রুর গুপ্তচরদের আশ্রয় প্রদান করে তাহলে সে এ কৃতকর্ম দ্বারা তার প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি ভঙ্গ করেছে বলে বিবেচিত হবে এবং সে তার নিরাপত্তার যিম্মাদারী থেকে বহির্ভূত বলে গণ্য হবে। ফলে শাসনকর্তার জন্য তাকে হত্যা করার অধিকার থাকবে। আর যদি সে (গুপ্তচর) সন্ধিচুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে সে মুসলিমদের (নিরাপত্তা সংক্রান্ত) যিম্মাদারীর অন্তর্ভুক্ত হবে না। নিম্নোক্ত আয়াতের উপর ভিত্তি করে তার সাথে কৃত সব চুক্তি তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ **"নিশ্চয় আল্লাহ চুক্তি ভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেন**

না।”[৪] কিন্তু ইমাম শাফি‘ঈ (রহ.) এ বিষয়ে অভিমত পেশ করেন যে, তাকে হত্যা করা হবে না; বরং তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে এবং তার সাথে কৃত অঙ্গীকারও ছিন্ন করা হবে না। এটি ইমাম আবূ হানীফার অভিমত।

* যদি গুপ্তচর এমন কোনো কাফির সশস্ত্র যোদ্ধা হয়, যে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য কোনরূপ নিরাপত্তার সনদ ছাড়াই *দারুল ইসলামে* প্রবেশ করেছে, তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেয়া হবে। অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) -এর সাথে আরো যোগ করে বলেন, তারপর যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার উপর থেকে এ শাস্তি প্রত্যাহার করা হবে। যদি সে ব্যবসা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নিরাপত্তার গ্যারান্টি নিয়ে প্রবেশ করে এবং তার গুপ্তচরবৃত্তি প্রমাণিত হয় তাহলে শাসনকর্তার উপর আবশ্যক হবে তাকে *দারুল ইসলাম* থেকে বহিষ্কার করে *দারুল হারব*-এর নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেয়া। আর যদি তার অনুপ্রবেশ ব্যবসার জন্য নিরাপত্তার গ্যারান্টি নিয়ে হয় এবং তার গুপ্তচরবৃত্তি প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। তারপর তাকে *দারুল হারব*-এ নিরাপদ জায়গায় পৌঁছেয়ে দেয়া হবে।

আমরা যদি এসব প্রাচীন ফিক্হী গবেষণাগুলোর সাথে আধুনিক যুগে প্রণীত শান্তি ও সংঘাত অবস্থায় গুপ্তচরের (গুপ্তচর রাষ্ট্রের প্রজাদের মধ্য থেকে হোক অথবা ভিন্ন রাষ্ট্রের অপরিচিত কেউ হোক) জন্য নির্ধারিত কঠোর বিধানসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা করি, তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, পূর্ববর্তী মুসলিম ফকীহগণ এসব বিষয়ে যে সমাধান দিয়েছেন তা কত সহজ, উদার ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তারা শুধু সম্পূর্ণ সীমিত অবস্থাতেই কঠোরতা অবলম্বন করেছেন।

* ইমাম আওযা‘ঈর (রহ.) অভিমত হলো, রাষ্ট্রপ্রধান নিম্নোক্ত সমাধানসমূহের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন, ১. যুদ্ধবন্দির নিকট ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করা অথবা তাকে হত্যা করা। ২. সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সে মুসলিমদের দাস হিসেবে পরিগণিত হবে। তার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা এবং তাকে মুসলিম যুদ্ধবন্দির বিনিময় করা। তার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণার জন্য মৌখিকভাবে لا إله إلا الله (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই) বলাই যথেষ্ট। ধরে নেয়া হবে যে, পরবর্তী কালে সে তার এ শিক্ষাটিকে পরিপূর্ণ করে নেবে। ইমাম শাফি‘ঈ (রহ.) এ অভিমত থেকে বেশি দূরে নন। তিনি মুসলিমদের সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষার আবশ্যকতার উপর জোর দিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও তাঁর কিছুসংখ্যক অনুসারীর

---

৪ সূরাহ্ আল-আনফাল: ৫৮।

> মতে, যুদ্ধবন্দিদেরকে হত্যা করা অথবা তাদেরকে দাস-দাসী বানানোর ব্যাপারে রাষ্ট্র প্রধানদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। আর এ ক্ষেত্রে তাঁর উচিত হবে, মুসলিমদের জন্য যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি মঙ্গলজনক সে দিকে লক্ষ্য রাখা। তিনি যদি হত্যা করার সিদ্ধান্ত দেন তাহলে এ সিদ্ধান্ত অতি বৃদ্ধ অথবা পঁঙ্গু, অন্ধ, আহত ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী, নারী ও শিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। তবে অধিকাংশ ফকীহ এবং ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) কিছুসংখ্যক অনুসারী রাষ্ট্রপ্রধানের সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতার বিষয়টিকে আরো ব্যাপক করার পক্ষে মত প্রদান করেছেন। জানা আবশ্যক যে, যুদ্ধবন্দির জীবন মুসলিম যোদ্ধাদের হাতে নয়। ইমাম আওযা'ঈ (রহ.) এ বিষয়ে অভিমত পেশ করেন যে, যুদ্ধবন্দির হত্যাকারীকে শাস্তি প্রদান করা হবে এবং তার উপর রক্তপণ ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে অধিকাংশ 'আলিমের মতে তার উপর রক্তপণ ওয়াজিব হবে না।

এখানে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ্য যে, আল-কুরআনে এমন কোনো বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত  হয়নি, যা যুদ্ধবন্দিদেরকে হত্যা করা অথবা দাস বানানোর সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে। কোনো সন্দেহ নেই যে, সকল ফকীহ শত্রুর ভূখণ্ডে মুসলিম বন্দিগণ যেসব কঠোর আচরণের সম্মুখীন হতো তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতেন না। বস্তুত: বন্দিদেরকে নির্যাতন, হত্যা করা এবং দাস-দাসী বানানো ছিল অষ্টম শতাব্দী ও তার আগে এবং পরের জাতিসমূহ ও জনগোষ্ঠীর নিকট প্রচলিত রীতিনীতি ও ঐতিহ্য। মুসলিম যুদ্ধবন্দিরা হত্যা অথবা গোলাম বানানোর শিকার হওয়ার পূর্বে (শত্রুদের হাতে) মারাত্মক অমানবিক আচরণ ও বর্বরতার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও ফকীহগণের মধ্যে কেউই শত্রুপক্ষের যুদ্ধবন্দিদের সাথে দুর্ব্যবহার করা বৈধ মনে করেননি; বরং তারা বন্দিদশার মধ্যে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, যেমনিভাবে তারা ঐকমত্য পোষণ করেছেন যুদ্ধবন্দি শিশু ও তার মাতাকে পৃথক না করার ব্যাপারে।

ইমাম আওযা'ঈ (রহ.) যুদ্ধবন্দির অবস্থান বা দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত তাত্ত্বিক প্রশ্নগুলো খন্ডন করেই ক্ষান্ত হননি; বরং যুদ্ধবন্দিদের সাথে সম্পৃক্ত বিশেষ অবস্থারও মুখোমুখি হয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তিনি মুসলিম যুদ্ধবন্দিদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য খলীফা আল-মানসূরের (৯৫-১৫৮ হি./৭১৩-৭৭৫ খ্রি.) নিকট চিঠি লিখেছেন, যারা আরমেনিয়ার অঞ্চল *কালীকালা* নামক স্থানে রোমবাহিনীর হাতে বন্দি হয়েছিল।

## গ. শত্রুর অর্থসম্পদ

এ বিষয়ে ইমাম আওযা'ঈর (রহ.) প্রসিদ্ধ উক্তি হলো, 'মুসলিমদের জন্য এমন কোনো কাজ করা বৈধ নয়, যা '*দারুল হারবে*'- ধ্বংস যজ্ঞের জন্ম দেয়। কারণ এটি হলো এক ধরনের গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা, আর মহান আল্লাহ্ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাকে পছন্দ করেন না।' আর এরূপ ধ্বংসযজ্ঞ শত্রুর সকল সম্পদকেই শামিল করে, যেমন গৃহপালিত পশু, গাছ-পালা, বসতবাড়ি ও উপাসনালয়। যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার সীমা অতিক্রম করা মুসলিম সৈন্যবাহিনীর অধিকার নেই। যুদ্ধলব্ধসম্পদ লুণ্ঠন করা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা নয়; বরং তা আহরণ ও বণ্টন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বেশ কিছু নীতিমালার অধীন। সাধারণ অনুসরণযোগ্য নিয়ম হলো গনীমতের মালকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা। এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের জন্য এবং অবশিষ্ট চার ভাগ যোদ্ধাদের জন্য।

ফকীহগণ নিম্নোক্ত আয়াতটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে গনীমতের মাল আত্মসাৎ করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী হলো: ﴿وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ "আর কেউ (অন্যায়ভাবে) কিছু গোপন করলে, কিয়ামতের দিন সে তা সাথে নিয়ে আসবে।"[৫]

যোদ্ধাদের জন্য গনীমতের মাল বণ্টন করার পূর্বে তা থেকে অংশবিশেষ গ্রহণ করা বৈধ হবে না। তবে '*দারুল হারবে*' অবস্থানকালে গনীমতের সম্পদ থেকে খাদ্য ও পশুখাদ্যের প্রয়োজনে যোদ্ধারা যা গ্রহণ করবে তা গ্রহণ করার বিষয়টি এ হুকুমের বাইরে থাকবে। আর ইমাম আওযা'ঈ যোদ্ধার জন্য এমন বস্তু গ্রহণ করাকে বৈধ মনে করেন, যার তেমন কোনো মূল্য নেই। গনীমতের মাল আত্মসাৎকারী ব্যক্তিকে তার অংশ থেকে বঞ্চিত করা এবং তার সম্পত্তি জ্বালিয়ে দেয়ার মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবে। এছাড়া যে যা আত্মসাৎ করেছে তা ফেরত দেবে অথবা তাকে জরিমানা করা হবে। গনীমতের কারণে সৈন্যবাহিনীর সারিতে যাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে আমরা ইমাম আওযা'ঈকে (রহ.) কঠোরতা অবলম্বনকারী হিসেবে দেখতে পাই। ফকীহগণ গনীমতের মাল চুরির ব্যাপারে যে বিধান প্রণয়ন করেছেন তা সাধারণ চুরির নির্ধারিত শাস্তির চেয়ে ভিন্নতর। তারা গনীমতের মাল আত্মসাৎকারী ব্যক্তির উপর শাস্তি প্রয়োগের ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। ইমাম আওযা'ঈ (রহ.) তার সম্পত্তি জ্বালিয়ে দেয়ার ব্যাপারে যে মত পেশ করেছেন ইমাম আবূ হানীফা, মালিক ও শাফি'ঈ (রহ.) সে মতকে সমর্থন করেননি।

---

[৫] সূরাহ্ আলে-'ইমরান: ১৬১।

যখন মুসলিমরা এমন কোনো বস্তু ফেরৎ চাবে, যা শত্রুরা তাদের কাছ থেকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং বণ্টনের পূর্বেই উক্ত সম্পদের মালিক তা সনাক্ত করে, তাহলে ফকীহগণের ঐক্যবদ্ধ রায়ের ভিত্তিতে সে তা গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু যদি গনীমতের মাল বণ্টনের কাজ সমাপ্ত হয়ে যাবার পর তা ফেরৎ চাওয়া হয় তাহলে সেটার বিনিময় পরিশোধ করা আবশ্যক হবে।

স্বভাবতই ফকীহগণ গনীমতের বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং এর সাথে শত্রুর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের বিধান বর্ণনার বিষয়টিকেও সংযুক্ত করেছেন। ইমাম আওযা'ঈ (রহ.) ছিলেন তাঁদের অন্যতম, যাঁরা সর্বপ্রথম এর সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেকটি মাস'আলার ব্যাপারে আল-কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে *ফতোয়া* দিয়েছেন।

## উপসংহার

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, ইমাম আওযা'ঈ (রহ.) ছিলেন হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর (খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর) শ্রেষ্ঠ ফকীহগণের অন্যতম। আর এ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকেই তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের অগ্রগতির ধাপগুলো পর্যবেক্ষণ করেন এবং নিরপেক্ষ আলিমের অবস্থান গ্রহণ করেন। ফলে তিনি প্রস্তাবিত কোনো সরকারী পদ গ্রহণ করেন নি, চাই তা বনূ উমায়্যার শাসনামলে হোক অথবা বনু 'আব্বাসের শাসনামলে হোক। আর প্রস্তাবিত পদসমূহের মধ্যে বিচারকের পদ ছিল সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। ঠিক তেমনিভাবে তিনি প্রত্যেকটি মাস'আলার ক্ষেত্রে হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের 'আমলকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আওযা'ঈর অনেক *ফাতওয়া* আমাদের নিকট সংকলিত অবস্থায় পৌঁছেনি। আর তাঁর ফিক্হ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তা তাঁর জ্ঞানের গভীরতা প্রমাণ করে। নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ইমাম আওযা'ঈর (রহ.) রচনাবলির মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলো তাঁর *সিয়ার* গ্রন্থ। গ্রন্থটি কলেবরে ছোট হলেও বেশ উপাদেয় ও উপাদান সমৃদ্ধ। *সিয়ার'* শাখাটি '*ফিক্হ'* শাস্ত্রের এমন শাখা-প্রশাখাসমূহের অন্তর্ভুক্ত যাতে যুদ্ধ, সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিদের বিষয়ে অনেক বিধি-বিধান স্থান পেয়েছে। বস্তুতঃ ইমাম আওযা'ঈ (রহ.) ও অন্যান্য ফকীহদের চিন্তাধারা ইতিহাসে প্রতিস্থাপন করা জরুরি। এছাড়া এতে অন্য কোনো ফকীহ অথবা ইসলামী সেনাপতির আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যিনি তাঁর মানবিক মূল্যবোধ ও নীতিসমূহের কারণে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। ইমাম আওযা'ঈ (রহ.) -কে সে কাঙ্খিত ব্যক্তি হিসেবে

নির্বাচন করার জন্য পর্যাপ্ত কারণ বিদ্যমান রয়েছে। কেননা তিনিই ফকীহগণের মধ্যে প্রথম যুগের ফকীহ। তিনি যুদ্ধের নীতিমালার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে মানবিকতা ব্যক্ত করেছেন। যদিও তাঁর সামান্য কিছু পূর্বে হানাফীগণ *সিয়ার* প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। অপরদিকে লেবাননে প্রতিটি পরিবেশ-পরিস্থিতিতে মাজলুমদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য ইমাম আওযা'ঈর (রহ.) বিশেষ অবদান ছিল। ইমাম আওযা'ঈর (রহ.) অবস্থান ছিল বৈরূতে যা সর্বজনবিদিত এমনকি আজকের এই দিন পর্যন্ত। আজকে লেবাননবাসী অন্যদের চেয়ে তাঁর মতো লোকজনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করছে।

# ইসলাম ও প্রচলিত আইনের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন*

**ড. মুহাম্মদ সা'ঈদ আদ্-দাক্কাক****

গবেষণা নিবন্ধের শুরুতে একথা বলা প্রয়োজন যে, ইসলামী শরী'আত যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মানব জীবনের 'আমলী দিকটির বাস্তবতা উপলব্ধি করা। মানব আচরণের এ প্রকাশ্য দিকটি অস্বীকার করে না যে, তার মধ্যে প্রতিস্থাপিত অন্যতম সহজাতবৃত্তি হলো লড়াইয়ের প্রতি দূর্বলতা। তাই বলে এটিকে একেবারে শর্তমুক্তভাবে মেনে নেয়া যায় না। এ কারণে ইসলামী শরী'আত মানুষের অন্যান্য গুণ ও স্বভাবের ন্যায় লড়াইয়ের মানসিকতাকে পরিশিলিত ও সুন্দর করার পরামর্শ দিয়েছে, যাতে প্রতিটি মানুষ তার এ মানসিকতার ক্ষতিকর দিককে এড়িয়ে যেতে পারে ও নির্ধারিত ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পারে। ফলে সে এর মাধ্যমে মানবীয় গুণের উচ্চ স্থানে নিজেকে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে এবং সমাজের জন্য কল্যাণ ও উপকার বয়ে আনতে পারবে। (যুদ্ধের ক্ষতিকারক দিকসমূহ চিহ্নিত করে ইসলাম সেগুলোকে ভয়াবহতার রূপ থেকে বের করে এনে একে সামাজিকতার মানে উন্নিত করার জন্য একটি গ্রহণযোগ্য নীতির উদ্ভাবন করেছে যা বিবেকসম্মত ও সর্বজনীন।)

প্রফেসর তাহা বাদাবী তাঁর গবেষণায় যুদ্ধ ও শান্তির সম্পর্ক ব্যাখ্যায় কয়েকটি অপরিহার্য ব্যবহারিক নীতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে যুদ্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করেন, হত্যা বা নিধন হলো যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া যুদ্ধের আনুষঙ্গিক কার্যক্রম অতিরিক্ত। প্রাচীন যুগে মহিলাদেরকে বন্দি এবং পুরুষদেরকে দাস বানানোর জন্য যে সব যুদ্ধ সংঘটিত হতো সে সব যুদ্ধ প্রকৃতিগত দিক দিয়ে আজকের যুগে অর্থনৈতিক অধিক সুবিধা এবং *স্ট্রাটেজি*

---

* আন্তর্জাতিক রেড ক্রস গবেষণা পত্রিকা, ১২তম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল ১৯৯০।

** ড. সা'ঈদ আদ্-দাক্কাক ১৯৪২ সালে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় আইন বিষয়ে পড়াশুনা করেন। এরপর ১৯৬৩ সালে ইতালি, টরেনটো বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফ্রান্সের নার্সি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে *النظرية العامة لقرارات المنظمات الدولية* শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনা করে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। সে সময় থেকে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অনুষদে প্রফেসর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি মানবাধিকার আইন কেন্দ্রের ডাইরেক্টর। তিনি আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার এবং মানবিক আইন সম্পর্কে অসংখ্য গবেষণামূলক নিবন্ধ ও গ্রন্থরচনা করেন।

অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে আধুনিক সমরাস্ত্রের মাধ্যমে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের মতই।[১]

প্রফেসর তাহা বাদাবী মনে করেন যে, যুদ্ধ মানুষের সহজাত বৃত্তিগুলোর মধ্যে একটি। কেননা যুদ্ধ নামক এ বৃত্তি জীবন্ত মানুষকে ভয়ংকর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। মানুষের এ বৃত্তি ছোট ছোট ইস্যুকে কেন্দ্র করে যুদ্ধকে কখনো কার্যকর আবার কখনো অকার্যকর ক্রিয়ারূপে সমতার বেড়াজালে আবদ্ধ করে। এ বৃত্তিগুলোর সাথে মানবিক অবস্থার সংযুক্তি রয়েছে যা যুদ্ধের সময় মানুষের কার্যক্রমকে আন্দোলিত করে তোলে।

ইসলামী শরী'আতের মূল উদ্দেশ্য হলো, মানবিক আচরণের মূলতত্ত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট দৃশ্যমান বৃত্তিগুলোকে যুদ্ধবৃত্তির ভয়াবহতা থেকে স্থানান্তর করে একটি সুশৃংঙ্খল মানসম্মত আচরণের দিকে ধাবিত করা। সুতরাং বিশেষ অবস্থান ব্যতীত কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হবে না। কেবল বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে এমন বিশেষ নীতিমালা ও মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে যুদ্ধ সংঘটিত হতে পারে যা ইসলামী শরী'আত এক নির্দিষ্ট কাঠামোতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। যখন কোনো যুদ্ধের দামামা বেজে উঠবে তখন মুসলিম যোদ্ধাদের জন্য আল-কুরআন ও সুন্নাহ্ প্রদত্ত যুদ্ধনীতির অনুসরণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়বে। অপরদিকে আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌য় যে সমস্ত নীতির বিস্তারিত বিবরণ বিধৃত হয়নি সেক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আত আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে যুদ্ধ সম্পর্কে যে সমস্ত নীতি বিধিবদ্ধ করেছে সেগুলো মুসলিম যোদ্ধাদেরকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। কারণ, এগুলো হলো ইসলামী শরী'আত প্রণীত আইন। আর যে এ নীতির অনুসরণ করবে সে কেবল ইসলামী যোদ্ধা হিসেবে বিবেচিত হতে পারবে, আর যে এর বিপরীত কাজ করবে সে ইসলামী সীমারেখা থেকে বাইরে অবস্থান করবে। এ বিষয়ে প্রফেসর ড. হামিদ সুলতান পাঁচটি নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো নিম্নরূপঃ

১. ন্যায় নীতি

২. সাম্যনীতি

৩. পরামর্শ নীতি

---

[১] মুহাম্মদ ত্বহা বাদাবী, ফুরূদুন 'আমালিয়্যাহ্ ফী 'আলাকাতিল হারব ওয়াস্-সালাম (বৈরূত: আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৭৪ খ্রি.), পৃ. ৯ থেকে তৎপরবর্তী।

৪. প্রতিশ্রুতি পুরণ পদ্ধতি ও নীতি

৫. সম-আচরণ নীতি।[২]

আমরা একথা সুস্পষ্ট করতে চাই যে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কিছু মৌলিক চিন্তাধারাকে অন্তর্ভুক্ত করে। নিম্নে এগুলো উল্লেখ করা হলো:

**প্রথম:** আন্তর্জাতিক আইনের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ হলো, এ মানবিক আইনের নীতিমালা কেবল সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এ দৃষ্টিভঙ্গি দীর্ঘকালব্যাপী প্রচলিত আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অনুসৃত ধারা থেকে কিছুটা ভিন্নতর। এ বিষয়ে দু'টি দিক উল্লেখযোগ্য:

প্রথম দিক হলো, যুদ্ধের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী এ নীতি অনুসরণের জন্য যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া জরুরী নয়। অর্থাৎ এটি জরুরী নয় যে, যখন প্রকাশ্যে যুদ্ধ শুরু হবে তখনই কেবল এ নীতি বা আইনের প্রয়োগ হবে এর পূর্বে নয়। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো যুদ্ধের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকুক আর না থাকুক সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে কেবল দু'টি পক্ষ যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি হলেই এ যুদ্ধনীতি বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।[৩] ড. সালাহ 'আমেরের বক্তব্য মতে যুদ্ধে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী দু'টি পক্ষ হওয়া অথবা পরস্পর অস্ত্র ধারণ না করলেও এরূপ পরিস্থিতিকে যুদ্ধ অবস্থা বলে গণ্য করা হবে। পক্ষান্তরে উপরিউক্ত ধারণা অনুযায়ী দু'টি পক্ষ পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হলেও তা বিধিসম্মতভাবে যুদ্ধ হিসেবে গণ্য হবে না যদি যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া না হয়।

দ্বিতীয় দিক হলো যুদ্ধের প্রকৃতি নির্ধারণে প্রচলিত যুদ্ধ আইন থেকে আন্তর্জাতিক ইসলামী মানবিক আইন কিছুটা ভিন্নতর। সেটি হলো, যুদ্ধ আইন প্রযোজ্য হওয়ার জন্য যুদ্ধটি অবশ্যই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সংঘটিত হতে হবে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ কোনো দল বা গোষ্ঠী সংঘর্ষে লিপ্ত হলে তা যুদ্ধ হিসেবে গণ্য হবে না। তবে এ সংঘর্ষ গৃহ যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করলে সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইন প্রযোজ্য হবে।

১৯৪৯ সালে ৪র্থ জেনেভা কনভেনশন সম্পাদনের পূর্ব পর্যন্ত প্রচলিত যুদ্ধ আইনের কোনো উৎকর্ষ সাধিত হয়নি। উক্ত কনভেনশনে প্রচলিত যুদ্ধ আইনের

---

২ *Sultan H. La, Conception Islamique du Droit International Humanaitaire,* Vol. 34 (Rev. Egyptienne du Droit International, 1978), PP6-7.

৩ সালাহ্ 'আমের, আত্-তা'রীফ বিল কানূন আদ্-দাওলী আল-ইনসানী, ১৯৮২ সালে নভেম্বর মাসে কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মানবিক আইন সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ, যা আন্তর্জাতিক রেড ক্রস সোসাইটি কর্তৃক জামঈয়্যাহ আল-মিসরিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত, পৃ. ১৬।

স্থলে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনকে প্রতিস্থাপন করা হয় এবং তা সশস্ত্র সংঘাতে লিপ্ত সকল পক্ষের ক্ষেত্রে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মানব সমাজ ও সম্পদের সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি *আন্তর্জাতিক মানবিক আইন* পরিভাষাটি যথাযথভাবে প্রয়োগ করে। এ নতুন পরিভাষাটির প্রয়োগ জেনেভা কনভেনশনের আলোকে শুধু যুদ্ধাক্রান্তদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়; বরং যুদ্ধ প্রক্রিয়া সহজীকরণ, যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সকল চুক্তি স্মারক ও নীতিমালা এর অন্তর্ভুক্ত।[৪]

অবশেষে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত সকল পক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আন্তর্জাতিক প্রচলিত আইনও একাত্মতা ঘোষণা করে।

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আওতায় রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে সংঘর্ষরত সকল দলকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণ হলো এই যে, ইসলামের উষালগ্নে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না, যেমন আজকে রাষ্ট্রের ধারণা রয়েছে। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি এমন এক সর্বজনীন দাওয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট যা স্থান-কালের পরিবৃত্তে বেষ্টিত নয়। এজন্য এ দৃষ্টিভঙ্গিই স্থান-কালভেদে সংঘর্ষরত সকল পক্ষের উপর প্রয়োগযোগ্য।

**দ্বিতীয়ঃ** আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি একটি বুনিয়াদী নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত। সেটি হলো, মুসলিম যোদ্ধাদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা থেকে নিষেধ করা এবং তাদেরকে মহান আল্লাহ্‌র হুকুম মোতাবেক ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দেয়া। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমা লংঙ্ঘন করো না। আল্লাহ্ সীমালংঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।'[৫]

যদি আমরা এ আইনটি আধুনিক আইনের সাথে তুলনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশনের সাথে সংযুক্ত ৩৫ নং ধারার প্রথম প্রটোকলের প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে যে, সশস্ত্র সংঘর্ষে কোনো পক্ষই অবাধ যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার এবং মানবতার বিপরীত কুট-কৌশল গ্রহণ করতে পারবে না।

[৪] আশ-শায়বানী, *কিতাবুস্-সিয়ার আল-কাবীর*, ১ম খণ্ড, তাহ্‌কীক : সালাহ্ উদ্দীন আল-মুনাজ্জিদ, ১৯৫৮ খ্রি., পৃ. ১১০।

[৫] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯০।

**তৃতীয়ঃ** ইসলামের বুনিয়াদী মূলনীতিসমূহের অন্যতম একটি নীতি হলো, মানুষের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন। মৃত্যুর পর তার লাশ যেন কোনভাবেই অসম্মানিত না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এজন্য ইসলামে যুদ্ধের সুশৃংঙ্খল পদ্ধতি কাউকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেয়া অথবা তার সাথে মানবিক মর্যাদা বহির্ভূত আচরণ করা অথবা তার মৃত্যু বা নিহত হওয়ার পর তার লাশকে বিকৃতি করতে মুসলিম যোদ্ধাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাশ বিকৃতি করতে নিষেধ করেছেন, যদিও তা হিংস্র কুকুর হয়। এমনিভাবে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের লাশ দাফন করতে নির্দেশ দেন। অনুরূপভাবে আবূ বকর (রা) তার নিকট শত্রু বাহিনীর কমান্ডারের মস্তক নিয়ে আসতে নিষেধ করেন। তিনি মুসলিম সেনাপ্রধানদের কাছে লিখে পাঠান, 'আমার নিকট যেন কারো খণ্ডিত মস্তক না নিয়ে আসা হয়। যদি এরূপ করা হয় তাহলে তা নিছক তোমাদের সীমালংঙ্ঘন ও বিদ্রোহিতা বলে গণ্য হবে। আর আমার জন্য মহান আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ্ই যথেষ্ট।' আবূ বাকরের (রা) উপরিউক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ্-শায়বানী (রহ.) লিখেছেন যে, নিহত ব্যক্তির মস্তক খণ্ডন করে তা শাসকের দরবারে নিয়ে আসা কোনভাবেই বৈধ নয়। কেননা তা মৃতদেহ। আর মৃতদেহ থেকে কষ্ট দূর করার একমাত্র পথ দাফন করা। অপরদিকে দেহ থেকে মস্তক খণ্ডিত করা লাশ বিকৃতির শামিল। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাশ বিকৃতি করতে নিষেধ করেছেন যদিও তা হিংস্র কুকুরের হয়।

আবূ বকর (রা) স্বীয় বক্তব্য দ্বারা এটিই বুঝিয়েছেন যে, লাশ বিকৃতি একটি জঘন্য কাজ। এটি জাহিলী যুগের কার্যকলাপ। আর আমাদেরকে জাহিলীযুগের প্রচলিত কার্যকলাপের অনুরূপ কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। জেনেভা কনভেনশনের প্রথম প্রটোকলের ৭৫ নং ধারায় একই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, বর্তমান-ভবিষ্যত স্থান-কাল পাত্রভেদে সকল ক্ষেত্রে মানুষের জীবন অথবা তাদের সুস্থতা অথবা তাদের দৈহিক বা মনস্তাত্ত্বিক নিরাপত্তার বিপরীত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। চাই তা বেসামরিক অথবা সামরিক বাহিনী করুক না কেন।

**চতুর্থঃ** রণপদ্ধতি ও রণকৌশলের ব্যাপারে প্রচলিত আইন এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের ইসলামী দৃষ্টিকোণের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রচলিত আইন যুদ্ধ সংক্রান্ত ইতিবাচক কর্ম প্রণয়নের পরিবর্তে শুধু নিষিদ্ধ আইনগুলোই প্রণয়নে বেশি জোর দিয়েছে। এ আইনগুলো কোনো বিশেষ যুদ্ধ পদ্ধতিকে সত্তাগতভাবে নিষিদ্ধ করেনি, এমন কি

যুদ্ধের পরিসীমা সংক্রান্ত এমন কোনো ইতিবাচক বিষয় সংযুক্ত করেনি যেখানে গিয়ে রণাঙ্গনে যোদ্ধারা থেমে যাবে অথবা উক্ত সীমা লংঙ্ঘন যুদ্ধকে অবৈধ বলে ঘোষণা দেবে। কিন্তু ইসলামী শরী'আহ্ আইন এর ব্যতিক্রম। এ বিষয়ে ইসলামী শরী'আহ্ আইন স্পষ্টভাবে ইতিবাচক ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে।[৬] আমরা যদি প্রথম প্রটোকলের ৩৫ নং অনুচ্ছেদ পাঠ করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, যুদ্ধ সংক্রান্ত একটি বুনিয়াদী নীতি। সেখানে বলা হয়েছে, 'কোন সশস্ত্র লড়াইয়ে কোনো পক্ষই অবাধ অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে না।' অনুরূপভাবে আমরা যদি রাসূলের (সা.) বাণী পাঠ করি সেখানে দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে মুসলিম যোদ্ধাদেরকে ইসলামী আচরণবিধি অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

تالفوا الناس وتأنوا بهم ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم فما على الأرض من أهل مدرٍ ووبر إلاّ ان تأتوني بهم مسلمين أحب إلى من أن تأنوني بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا رجالهم.

'তোমরা লোকদের প্রতি কোমল হও, সদয় হও, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দা'ওয়াত না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের উপর আক্রমণ করবে না। কেননা এ পৃথিবীতে কাঁচা-পাকা বাসস্থানে বসবাসকারীদেরকে যদি তোমরা মুসলিম বানিয়ে আমার নিকট নিয়ে আসতে পার তাহলে তা আমার কাছে তাদের সন্তান ও স্ত্রীদেরকে গ্রেফতার এবং তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করার চেয়ে বেশি পছন্দনীয়।'

যুদ্ধের শিষ্টাচার সম্পর্কিত ইসলামী বুনিয়াদী নীতি সাধারণ প্রচলিত আইন থেকে অনেক উদার ও স্পষ্ট। প্রচলিত আইন এমন যুগে রচিত হয়েছে, যে যুগে মানবীয় বিশ্বাস যুদ্ধ প্রতিহত করার ব্যাপারে নেতৃত্ব দিত এবং সংঘর্ষ মিটানোর জন্য এক শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি সন্ধি করার প্রতি উৎসাহিত করত। এ সময় রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানের জন্য কোনো অবস্থায় যুদ্ধকে কোনো মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি।

এখন আমরা প্রচলিত আইনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ভিত্তিক কিছু আহ্কাম এবং ইসলামী শরী'আতের সাথে যুক্ত কিছু বিষয়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করব। এগুলোর মধ্যে বিশেষ বিষয়গুলো হলো, যুদ্ধ-কৌশল ও মাধ্যম, যুদ্ধে অপারগ শত্রুর সুরক্ষা, এবং যুদ্ধচলাকালীন বেসামরিক জনগণ এবং স্থাপনা সম্পর্কিত বিধান।

[৬] হামিদ সুলতান-এর প্রবন্ধ, (পূর্বোক্ত) পৃ. ৫।

## এক: যুদ্ধের শিষ্টাচার ও বিশেষ পদ্ধতি: বিশ্বাসঘাতকতা হারাম এবং চতুরতা বৈধ

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও ইসলামী শরী'আহ্ আইন অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, এ দু'টি আইন রণাঙ্গনে বিশ্বাসঘাতকতা নিষিদ্ধ এবং চতুরতা বৈধতার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে।

জেনেভা কনভেনশনের প্রথম প্রটোকলের অতিরিক্ত পরিচ্ছেদে ৩৭ নং ধারায় স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে, ধোকা বা বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে হত্যা করা অথবা তাদের আক্রমণ করা অথবা তাদেরকে বন্দি করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। আর যে সমস্ত কাজ ধোকা বা বিশ্বাসঘাতকতার পর্যায়ভুক্ত তা হলো প্রতিপক্ষের এমন ভাব-ভঙ্গি প্রদর্শন করানো যা তাদেরকে এ বিশ্বাসে উপনীত করবে হয়তোবা আর কোনো আক্রমণ হবে না অথবা প্রতিপক্ষকে এটি বুঝানো যে, সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত সকলেই যুদ্ধনীতি অনুসরণ করবে। বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়ে প্রতিপক্ষের উপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ করাই হলো প্রহসন বা ধোকাবাজির অন্তর্ভুক্ত।

এটিই হলো সাধারণ নীতি যা উল্লিখিত ধারায় বিধৃত হয়েছে। এবার আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে ইসলামী শরী'আত কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ অনুসন্ধান করলে দেখতে পাই যে, একমাত্র ইসলামী শরী'আত-ই সর্বপ্রথম রণক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾

'আর যদি তুমি কোনো জাতি থেকে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা কর, তাহলে (তাদের চুক্তি) তাদের দিকে সোজা নিক্ষেপ কর, নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের পছন্দ করেন না।'[৭]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে আমাদের সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'যে তোমার কাছে আমানত রেখেছে তুমি তার আমানত আদায় কর। আর যে তোমার সাথে খিয়ানত বা প্রতারণা করেছে তুমি তার সাথে কখনো খিয়ানত করবে না।'

---

৭ সূরাহ্ আল-আনফাল: ৫৭।

উল্লিখিত বিষয়ের ধারাবাহিকতায় উদাহরণ হিসেবে রণাঙ্গনে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক কয়েকটি কাজ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক. অস্ত্র বিরতি অথবা আত্মসমর্পণের জন্য পতাকা উত্তোলন করে আলোচনার ভাব দেখানো।

খ. আহত অথবা রোগগ্রস্ত হওয়ার ভান করে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অপারগতা প্রদর্শন।

গ. অ-যোদ্ধা বেসামরিক লোকদেরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহারের ভান করা।

ঘ. বিশেষ আলামত বা পোষাক ব্যবহার করে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি চাওয়ার ভান করা। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ বা সংঘর্ষে লিপ্ত নয় এমন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রতীক ব্যবহার করা।

ইসলামী যুদ্ধসমূহের ঐতিহাসিক তথ্যাবলী সাক্ষ্য দেয় যে, ইসলাম রণক্ষেত্রে কখনো তার শত্রুবাহিনীর সাথে প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নেয়নি; বরং এরূপ প্রতারণাকে গুনাহ্ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এর উদাহরণ হলো কোনো মুসলিম যোদ্ধা-শত্রুবাহিনীর কাউকে এ মর্মে নিরাপত্তা প্রদান করে যে, যখন সে আত্মসমর্পণ করবে তখন তাকে হত্যা করা হবে না। ‘উমারের (রা) নিকট এ মর্মে একটি সংবাদ আসে, কিছু কিছু মুসলিম যোদ্ধা পারসিকদের সাথে যুদ্ধের সময় প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক কিছু কাজ করেছে। এ সংবাদ পেয়ে ‘উমার (রা) সাথে সাথে মুসলিম সেনাপতিকে ভর্ৎসনা করে লিখে পাঠান যে, ‘আমার নিকট খবর এসেছে, তোমাদের কতিপয় যোদ্ধা পারসিক কোনো যোদ্ধাকে ধাওয়া করলে ঐ যোদ্ধা দৌঁড়ে গিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় আত্মগোপন করে। এরপর উক্ত মুসলিম সেনা তাকে অভয় দেয় এবং পরে তাকে হত্যা করে। আল্লাহ্র শপথ! যার হাতে আমার জীবন, এরপর যদি কোনো মুসলিম সেনা এরূপ করে তাহলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেবো।’

ইসলাম শত্রুবাহিনীর পলায়নকারী কোনো সৈন্যকে হত্যা করতে নিষেধ করে। এছাড়া প্রতিপক্ষের কোনো সৈন্যকে পাকড়াও করার জন্য তাকে নিরাপত্তাদানের কথা বলে নিকটে নিয়ে এসে হত্যা করতেও নিষেধ করে। কেননা নিরাপত্তাদানের ক্ষেত্রে শরী‘আতের মূলনীতি হলো, কোনো মুসলিম যোদ্ধা শত্রুবাহিনীর কোনো যোদ্ধা অথবা তাদের কোনো এক দলকে নিরাপত্তা দিতে পারে। একজনকে নিরাপত্তাদানের ফলশ্রুতিতে তাদের সকলেই মুসলিমদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে। এরপরে তাদের কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা অথবা হত্যার চেষ্টা করা বৈধ নয়। আর মুসলিমদের মধ্য থেকে কেউ যদি

এরূপ করে তাহলে সে হত্যাকারী হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তার উপর *কিসাস* গ্রহণ অত্যাবশ্যক হয়ে যাবে।[৮]

যেহেতু যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতারণা ও ধোকাবাজি পরিহারযোগ্য একটি নীতি সেহেতু মুসলিমদের এর অনুসরণ অত্যাবশ্যক, চাই তা মুসলিমদের পারস্পরিক ব্যাপারে হোক অথবা অমুসলিমদের ব্যাপারে হোক। কেননা ইসলামী আইনে ধার্যকৃত নীতি হলো, মহান আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ; শত্রুদের ভূমিতেও তা নিষিদ্ধ। এটি ব্যক্তি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।[৯] এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফি‘ঈ (রহ.) বলেন, ‘মুসলিমরা সকলে ঐকমত্য হয়ে যে বিষয়কে হালাল হিসেবে গ্রহণ করেছে তা যেমন *দারুল ইসলামে* হালাল হিসেবে বিবেচিত হবে, তেমনি তা *দারুল হারবে*ও হালাল হিসেবে গণ্য হবে। আর যেটি *দারুল ইসলামে* হারাম সেটি *দারুল হারবেও* হারাম। সুতরাং যে হারাম কাজ করবে সে মহান আল্লাহ্ কর্তৃক উক্ত হারাম কাজের শাস্তির উপযুক্ত হবে। দারুল *হারব* তথা কাফিরদের দেশেও অপরাধী ব্যক্তি এ সাজা থেকে পরিত্রাণ পাবে না।’[১০]

যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে উপরে আলোচনা হয়েছে যা ইসলামী আইন ও প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে হারাম নয়। এর প্রমাণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الحرب خدعة ‘যুদ্ধ একটি কৌশল ও চালবাজি মাত্র’। সুতরাং এর অর্থ কখনো এরূপ নয় যে, শত্রুদের সাথে এমন চাল চালানো যাবে, যা ধোকা ও বিশ্বাসঘাতকতার পর্যায়ভুক্ত।

জেনেভা কনভেনশনের প্রথম প্রটোকলের ৩৭ নং ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলামী বিধানাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেখানে বিধৃত হয়েছে যে, যুদ্ধে কৌশল বা চালবাজি অবৈধ নয়। যুদ্ধ-কৌশল বলতে রণাঙ্গনে ঐ সময়ের কর্মকাণ্ডকে বুঝায়, যা প্রতারণা ও ধোকার পর্যায়ভুক্ত নয়।

## দুই: যুদ্ধে অপারগ ব্যক্তি এবং শত্রুর প্রতিরক্ষামূলক বিশেষ নীতি

জেনেভা কনভেনশনের অতিরিক্ত সংযুক্তি ৪০ থেকে ৪২ নং অনুচ্ছেদে শত্রুবাহিনী এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণে অপারগ সেনাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করতে

---

৮ ‘আলী মানসূর, আশ্-শারী‘আতিল ইসলামিয়্যাহ্ ওয়াল কানূন আদ্-দাওলী আল-‘আম (কায়রো : আল-মাজলিসুল আ‘লা লিশ্-শূ‘উন আল-ইসলামিয়্যাহ্, ১৯৬৫ খ্রি.), পৃ. ৩২৫।

৯ মুহাম্মাদ আবূ যাহ্রাহ্, “নাযরিয়্যাতুল হারব ফিল ইসলাম”, আল-মাজাল্লাতুল মিসরিয়্যাহ্ লিল কানূন আদ্-দাওলী, ১৯৫৮ খ্রি., পৃ. ৩০।

১০ সূরাহ্ ‘আবাসা: ১-১১।

নিষেধ করা হয়েছে। এমনকি অপারগ হওয়ার আগে যদিও সে সুস্থ-সবল সৈনিক ছিল। প্রটোকলে বিধিবদ্ধ এ ধারা ১৯০৭ সালে হেগ চুক্তির ২৩ নং ধারায় ১ নং সংযুক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানকে আরো সুদৃঢ় করে।

যুদ্ধ সক্রান্ত বিষয়ে এ বিধান প্রবর্তনের কারণ হলো, যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষের শক্তি ধ্বংস করা, তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করা নয়। সুতরাং ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক এ উদ্দেশ্য যখন সফল হবে তখন আর শত্রুকে হত্যা করা অথবা তাকে শাস্তি দেয়া বৈধ হবে না। প্রচলিত এ বিধান ইসলাম প্রবর্তিত যুদ্ধনীতির সম্পূর্ণ পরিপূরক। আর এটিই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে এভাবে, "أنا نبي المرحمة وأنا نبى الملحمة" "আমি রহমতের নবী এবং সংগ্রামের নবী।"[১১]

শত্রুবাহিনীর পরাজয়, যুদ্ধাস্ত্র বিনষ্ট হওয়া অথবা তাদের আত্মসমর্পণ হলেই যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা আর অবশিষ্ট থাকে না। অস্ত্র ফেলে দেয়া অথবা এককভাবে কোনো সৈন্যের আহত হওয়া অথবা বন্দি হওয়ার কারণে সমরাভিযানে অংশগ্রহণ করা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ইসলাম বন্দিদের সাথে সদাচরণের যে বিধান প্রবর্তন করেছে সে বিধান আহত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হওয়াটাই বেশি যুক্তিযুক্ত। সুতরাং ইসলাম যখন বন্দিদের সাথে সদাচরণ করতে নির্দেশ দিয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে আহত হওয়ার কোনো শর্তারোপ করেনি, তাহলে বন্দি ও আহতদের প্রতি সদাচরণের বিষয়টি আরো বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

আল-কুরআন যুদ্ধবন্দিদের বিধান নিম্নোক্ত আয়াতে সীমিত করেছে,

﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾

'অতএব যখন তোমরা (যুদ্ধের ময়দানে) কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাদের গ্রীবাদেশে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে কষে বেঁধে রাখবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ, যতক্ষণ না যুদ্ধ এর অস্ত্র নামিয়ে ফেলে।'[১২]

উপরিউক্ত আয়াতে যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে দু'টি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে তৃতীয় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ নেই। উক্ত আয়াতে

[১১] ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং-৩৯৫।

[১২] সূরাহ্ মুহাম্মদ: ৪।

বন্দিদেরকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়ার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে যা مَنًّا শব্দটি দ্বারা অনুমিত হয়। অথবা তাদেরকে মুক্তিপণ বা শত্রুর হাতে বন্দি সৈন্যের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে এটি *বন্দি বিনিময় আইন* নামে পরিচিত।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কিছু বন্দির শাস্তি দেয়া হয়েছিল মৃত্যুদণ্ড। এজন্য কতিপয় ফকিহ্ মনে করেন যে, বন্দির শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। অপরদিকে অন্যান্য ফিক্হী মাযহাবের অভিমত এর বিপরীত। তাদের মতে মুক্তিপণ অথবা বন্দি বিনিময়ের মাধ্যমে বন্দিদেরকে মুক্তি দেয়া যেতে পারে। তাদের এ মতের পক্ষে বন্দিদের ব্যাপারে সাহাবীগণের অনুসৃত নীতি সমর্থন যোগায়। বর্ণিত আছে যে, একদা হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ এক যুদ্ধবন্দিকে ইব্ন 'উমারের (রা) সামনে নিয়ে এসে বললেন, 'আমি একে হত্যা করব। তখন ইব্ন উমার (রা) হাজ্জাজের এ মত অস্বীকার করে বললেন, 'আল্লাহ্ আমাদের বন্দিকে হত্যা করার নির্দেশ দেননি। অতঃপর তিনি ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

যুদ্ধ-বন্দিদের ব্যাপারে আমাদের নিকট অগ্রাধিকার প্রাপ্ত রায় বা অভিমত হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে যে সমস্ত বন্দিকে মৃত্যুদরাধী সাজাযোগ্য অপরাধ করেছিল।[১৩] বন্দি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাধারণ 'আমল থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দিদেরকে মুক্তি দিতেন। তবে অধিকাংশ সময়ে তিনি (সা.) বিনা মুক্তিপণে তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। যেমনটি ইয়ামামাবাসীদের নেতা ছুমামা ইব্ন আছাল, হাতিম তাঈয়ের কন্যা এবং মক্কা বিজয়ের পর মক্কাবাসীকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, اذهبوا فانتم الطلقاء "তোমরা চলে যাও! আজ থেকে তোমরা মুক্ত।"

'*বন্দির শাস্তি মৃত্যুদণ্ড*'-এর একটিমাত্র উদাহরণ পাওয়া যায়। আর সেটি হলো আবূ উমামা 'আমর ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ আল-জুমাহীর মৃত্যুদণ্ড। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এশর্তে ছেড়ে দিয়েছিলেন যে, সে আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরোধিতা করবে না। কিন্তু সে মক্কায় ফিরে এসে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। অতঃপর যখন সে উহুদ যুদ্ধে বন্দি হয়ে আসে তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেন।

---

[১২] সূরাহ্ মুহাম্মদ: ৪।

[১৩] মুহাম্মাদ তালা'আত আল-গুনায়মী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬।

ইসলাম বন্দিদের সাথে সদাচরণকে পূণ্যের কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করে। আল্লাহ্ তা'আলা পূণ্যবান মু'মিনদের বিশেষণ বর্ণনায় বলেন,

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾

'আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে।'[১৪]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্দিদের সম্পর্কে বলেন, اسْتَوْصُوا بِالأَسَارَى خَيْرًا "তোমরা বন্দিদেরকে সদুপদেশ দাও।"[১৫]

## তিনঃ বেসামরিক লোক ও তাদের স্থাপনা সুরক্ষার বিশেষ নীতিমালা

প্রথম প্রটোকলের চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যুদ্ধকালীন বেসামরিক জনগণ ও তাদের সম্পদ রক্ষায় কতিপয় বিশেষ বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। জেনেভা কনভেনশনের ৫০ নং ধারায় বেসামরিক (المدنيون) শব্দের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, বেসামরিক লোক (المدنيون) বলতে ঐ সমস্ত লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, ১৯৪৯ সালে তৃতীয় জেনেভা কনভেনশন অথবা ১৯৭৭ সালে স্বাক্ষরিত এ চুক্তির ৪৩ নং ধারায় যাদের উপর যোদ্ধা শব্দটি প্রযুক্ত হয়নি। এছাড়া যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি অথবা যাদের সাথে যুদ্ধের কোনো বিষয় সংশ্লিষ্ট নয়। এক কথায় বেসামরিক নাগরিককে *আল-মাদানীয়ূন* বলা হয়ে থাকে। এধরনের বেসামরিক নাগরিকের জন্য যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে নিরাপত্তাদানের লক্ষ্যে সুরক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে। এ সুরক্ষা ঐ সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা যোদ্ধাদের বিশেষণে বিশেষায়িত হবে। কেননা উক্ত কনভেনশনের ৫১ নং ধারার ৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে যে, বেসামরিক লোকদেরকে এ অনুচ্ছেদের অধীনে সুরক্ষা দেয়ার জন্য সাধারণভাবে যে বিধান দেয়া হলো তা তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। আর তারা যদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাহলে তাদেরকে সুরক্ষা দেয়ার বিধানটি কার্যকর হবে না।

বেসামরিক স্থান দ্বারা ঐ সমস্ত স্থানকে বুঝানো হয়েছে, যেখানে সামরিক কার্যাবলী অথবা সামরিক সহায়কের কোনো সংযোগ নেই। এ স্থানগুলোকে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা থেকে বাঁচানোর জন্য সুরক্ষা দেয়া হবে। এটিই প্রথম প্রটোকলের ৪ নং ধারায় নির্দেশিত হয়েছে।

---

[১৩] মুহাম্মাদ তালা'আত আল-গুনায়মী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬।

[১৪] সূরাহ্ আদ্-দাহ্র: ৮।

[১৫] তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হাদীস নং ১৮৪১০; তাবারানী, *আল-মু'জামুস্-সাগীর*, হাদীস নং ৪১০।

যুদ্ধে প্রতিরক্ষা বিষয়ে ইসলামে যে সমস্ত আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে সেগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যে সমস্ত ব্যক্তি বা স্থান যুদ্ধের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় সে সমস্ত ব্যক্তি বা স্থানের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দেয়ার ব্যাপারে ইসলামে বিধিবদ্ধ আইন বেশি অর্থবহ ও অগ্রগামী। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ইসলামের দর্শন হলো, কোনো তুচ্ছ কারণে যুদ্ধ নয়; বরং যে ক্ষেত্রে যুদ্ধ না করা ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো পথ নেই, কেবল সে ক্ষেত্রে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয় ইসলাম। তবে এক্ষেত্রে অবশ্য লক্ষণীয় বিষয় হলো, যুদ্ধ কার্যক্রম যেন কখনো সামরিক প্রয়োজনীয়তার সীমা অতিক্রম না করে। সুতরাং যারা যোদ্ধা বা সৈনিক নয় এবং যে স্থান সামরিক কার্যাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট নয় সে সমস্ত ব্যক্তি বা স্থান অবশ্যই সামরিক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হবে না এবং সেগুলোর নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমা লংঙ্ঘন করো না। আল্লাহ্ সীমা লংঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।'[১৬]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, ﴿فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ "যদি তারা বিরত থাকে তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৭]

অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾

'সুতরাং যে-কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করলে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে থাকেন।'[১৮]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেনা প্রধানদেরকে যুদ্ধে গমনের পূর্বে এমর্মে নির্দেশ দিতেন যে,

انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى بركة رَسُولِ اللَّهِ وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَغُلُّوا وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

[১৬] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯০।

[১৭] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯২।

[১৮] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯৪।

‘তোমরা আল্লাহ্‌র নামে, তাঁর সাহায্যে এবং রাসূলের বরকতে সামনে অগ্রসর হও। আবাল, বৃদ্ধ-বণিতাকে কখনো হত্যা করবে না। গনীমতের মাল চুরি করবে না, গনীমতের মালকে একস্থানে একত্রিত করবে। পরস্পর সংশোধন হও; অনুগ্রহ প্রদর্শন কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অনুগ্রহ প্রদর্শনকারীদেরকে ভালবাসেন।’[১৯]

এরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে বলেন, لَا تَقْتُلَ ذرِّيَّةَ وَلَا عَسِيفًا "তুমি শিশু ও কৃষককে হত্যা করবে না।"[২০] অনুরূপভাবে আবূ বাক্‌রও (রা) তার প্রধান সেনাপতিকে নির্দেশ দেন,

إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ فِى الصوامع فَذَرْهُمْ وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ وَلَا تَحْرِقَنَّ نَحْلًا وَلَا تُغَرِّقَنَّهُ وَلَا تَغْلُلْ وَلَا تَجْبُنْ

‘যদি তোমরা এমন কিছু লোকদেরকে দেখতে পাও যারা নিজেদেরকে উপাসনালয়ে আল্লাহর জন্য আটকে রেখেছে তোমরা তাদেরকে ছেড়ে দেবে। আমি তোমাদেরকে ১০টি বিষয়ের উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা মহিলা, শিশু, আবাল-বৃদ্ধ বণিতাকে হত্যা করবে না, ফলদার বৃক্ষ কর্তন করবে না, দালান-কোঠা নষ্ট করবে না, গরু-ছাগল জবাই করবে না, তবে খাওয়ার প্রয়োজন হলে দু’একটি জবাই করতে পার। খেজুর বৃক্ষ জ্বালাও পোড়াও করবে না, কাউকে পানিতে ডুবাবে না, গনীমতের মাল আত্মসাৎ করবে না, কাপুরুষতা প্রদর্শন করবে না।’[২১]

আবূ বাকরের (রা) এ বক্তব্য থেকে এটিই প্রতিভাত হয় যে, ইসলাম মুসলিম যোদ্ধাকে যুদ্ধে প্রয়োজনীয়তার সীমারেখায় আবদ্ধ করেছে, যেন যুদ্ধের ভয়াবহতা সাধারণ বেসামরিক লোকদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে। ইসলামে যুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, শত্রু-বাহিনীর শক্তি খর্ব করা এবং তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া। প্রতিশোধ গ্রহণ, ধ্বংসাত্মক কাজ করা বা নিহত ব্যক্তির লাশ বিকৃতি করা যুদ্ধের উদ্দেশ্য নয়।[২২]

১. তাই ইসলাম যুদ্ধ চলাকালীন ধর্মীয় লোকদের সুরক্ষা দিয়েছে। কেননা যুদ্ধের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এ বিষয়ে ইমাম সারাখসী বলেন,

---

[১৯] *সুনানু আবী দাউদ*, হাদীস নং ২২৪৭।

[২০] *মুসনাদু আহ্‌মাদ*, হাদীস নং ১৬৯৫০; তাবারানী, *আল-মু‘জামুল কাবীর*, হাদীস নং ৩৪১১; *সহীহ ইব্‌ন হিব্বান*, হাদীস নং ৪৮৭৭।

[২১] *আল-মুওয়াত্তা*, হাদীস নং ৮৫৮; আল-বায়হাকী, *মা‘রিফাতিস্‌-সুনান*, হাদীস নং ৫৬৪১।

[২২] মুহাম্মাদ আবূ যাহ্‌রাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩।

'এ সমস্ত (বেসামরিক) লোকদেরকে হত্যা করা তখনই বৈধ হবে যখন তারা যুদ্ধের জন্য অগ্রগামী হবে। সুতরাং তারা যখন কোনো মাধ্যম ছাড়া অথবা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণের দরজা বন্ধ করে দেয় তখন তাদেরকে শাস্তি দেয়া কোনভাবেই যুক্তিযুক্ত হবে না। আর যদি তাদের থেকে যুদ্ধের ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ পায় তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ হবে। এ মর্মে 'উমার (রা) থেকে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি *ইলইয়া* তথা *বায়তুল মাকদিসে* চুক্তির জন্য গমন করে একটি ইয়াহুদী উপাসনালয় দেখতে পান, রোমানরা উক্ত উপাসনালয়কে মাটি দিয়ে বিকৃত করে দিয়েছে। তখন তিনি তার সৈন্যের সাহায্যে উক্ত উপাসনালয় থেকে মাটিগুলো সরে ফেলে দিলেন, যাতে করে ইয়াহুদীরা সেখানে ইবাদাত করতে পারে।

২. ইসলাম শিশু, মহিলা ও বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদের উপর আক্রমণ করতে নিষেধ করেছে। এর কারণ হলো, তারা তো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। এ নিষেধাজ্ঞার দলীল হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের খোঁজ খবর নিতে গিয়ে দেখতে পেলেন, একজন মহিলা নিহত হয়েছে। এতে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাগান্বিত হয়ে বললেন, এ মহিলা তো যুদ্ধ করেনি।' তিনি আরো বলেন, 'তোমরা কৃষক ও শিশুদেরকে হত্যা করবে না।' যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কারণে তাদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে মহিলা ও শিশু যদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাহলে তাদেরকে হত্যা করা যাবে কি না? এ বিষয়ে ইমাম মালিকের (রহ.) মত হলো নেতিবাচক। তিনি নিজ মতের স্বপক্ষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ولا تقتلوا النساء والاطفال

"তোমরা মহিলা ও শিশুদের হত্যা করবে না।" ইমাম আওযা'ঈ (রহ.) বলেন, কোনো অবস্থায় শত্রু বাহিনীর মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা করা যাবে না। যদিও শত্রুপক্ষ তাদেরকে সামনে রেখে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। তিনি এ মতের সমর্থনে আবূ বাক্‌রের (রা) ফরমান উল্লেখ করে বলেন, তিনি ('আবূ বাক্‌র (রা)) সেনাপ্রধানদের এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, *দারুল হারবে* তথা অমুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালানো কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয়।[২৩] কেননা এটি ফাসাদ বা বিপর্যয়। আর মহান আল্লাহ্ ফাসাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টি করা মোটেই পছন্দ করেন না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

[২৩] মুহাম্মাদ তালা'আত আল-গুনায়মী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫।

﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾

'যখন সে ফিরে যায় তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি এবং শস্য ক্ষেত্র ও জীব-জন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে; কিন্তু আল্লাহ্ অশান্তি পছন্দ করেন না।'[২৪]

এরূপভাবে ইসলাম দিনমজুর ও মজদুর ব্যক্তিদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছে। কেননা তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে সবসময় দিন-মজুরীর কাজে ব্যস্ত থাকে। অনুরূপভাবে যারা সৈনিকদের সাথে থাকে কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না, যেমন ব্যবসায়ীদেরকেও হত্যা করতে ইসলাম নিষেধ করেছে। কেননা তারা সৈনিকের সাথে থাকলেও তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যবসা অথবা শহরে নির্মাণ কাজে পরিব্যস্ত থাকা। আর ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো স্থাপনা ধ্বংস করার জন্য নয়; বরং পৃথিবী থেকে বিপর্যয় দূরীভূত করার জন্যই যুদ্ধ।[২৫]

ইসলাম যুদ্ধকালীন শহরের যে-কোন ধরনের সম্পদ ধ্বংস করতে নিষেধ করেছে। সম্ভবতঃ খেজুর বা অন্যান্য বৃক্ষ কর্তন করা অথবা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়ার নিষেধাজ্ঞার কারণ এটিই। আবূ বকর (রা) সেনাপতিদেরকে এ ধরনের কর্মকাণ্ড না করতে নির্দেশ দেন। তবে হ্যাঁ যদি খুব ঘন গাছ-গাছালীর আড়ালে শত্রুবাহিনী লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা থাকে তাহলে প্রয়োজনের ভিত্তিতে গাছ কাটা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আতের একটি নীতি হলো প্রয়োজনের তাগিদে অনেক সময় নিষিদ্ধ বস্তু মুবাহ্ (বৈধ) হয়ে যায়। তবে এ বৈধতা প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। যেমন মহান আল্লাহ্‌র বাণী,

﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾

'তোমরা যে খেজুর বৃক্ষগুলো কর্তন করেছ এবং যেগুলো কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে।'[২৬]

এ আয়াত থেকে এরূপ বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা সঠিক নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা শুধু খেজুর বৃক্ষ কেটে ফেলার অনুমতি দিয়েছেন। কেউ কেউ আয়াতে ব্যবহৃত اللينة শব্দ দ্বারা খেজুর বৃক্ষ বুঝিয়েছেন। তবে اللينة দ্বারা খেজুর বৃক্ষ না বুঝিয়ে খেজুরকে বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাখ্যা আমাদের নিকট অগ্রগণ্য। প্রফেসর আবূ যাহ্‌রাহ্ এ ব্যাখ্যাকে শব্দটির আভিধানিক অর্থের কাছাকাছি বলে মনে করেন। সাহাবীগণের আমল এ ব্যাখ্যাকে আরো শক্তিশালী করে। তারা যুদ্ধে খেজুর

[২৪] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ২০৫।

[২৫] মুহাম্মাদ তালা'আত আল-গুণায়মী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।

[২৬] সূরাহ্ আল-হাশর: ৫।

কেটে ফেলত কিন্তু বৃক্ষ নয়। আর আয়াতে খেজুর বৃক্ষকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, সে সময় এমন কিছু বস্তু ও স্থান বিশেষ গুরুত্বের বস্তু হিসেবে স্বীকৃত ছিল, যার প্রতিরক্ষা খুবই প্রয়োজন ছিল। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরবর্তী খলীফাগণ এ সমস্ত বস্তু ও স্থান ধ্বংস করতে নিষেধ করেছেন।

এ নিবন্ধের সারাংশ হলো সামরিক ও বেসামরিক লোকদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে তাদের প্রতিরক্ষায় প্রচলিত নীতি এবং বহুপূর্বে গৃহীত ইসলামী বিধিবদ্ধ আইনকে সুসামঞ্জস্য ও ভারসাম্যপূর্ণ করা। মানবতার সুরক্ষায় এ দু'টি নীতিমালার মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। ইসলামী যুদ্ধ আইনে বেসামরিক লোক তথা মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, আহত, রোগাক্রান্ত এবং ধর্মীয় পেশায় নিয়োজিত লোকদের সুরক্ষার জন্য বিশেষ বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। এছাড়া ইসলামে যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ স্থান, বস্তু ও শহরের স্থাপনাসমূহকে ধ্বংসলীলার আওতা বর্হিভূত করা হয়েছে। ইসলামের এ যুদ্ধনীতিকে প্রচলিত আইন সমর্থন করে। এরই আঙ্গিকে শহরের ভবন ও স্থাপনাসমূহকে ভয়াবহ সামরিক কার্যক্রম থেকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য আইন তৈরি করা হয়েছে।

## উপসংহার

উপরে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন এবং ইসলামী আইন পর্যালোচনা করে কী ফলাফল নিঃসৃত হলো তা দেখা প্রয়োজন। এ গবেষণা নিবন্ধের আলোকে আমরা একথা বলতে পারি যে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে ইসলামী রূপ এবং প্রচলিত আইনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যতা না থাকলেও উভয়ের মধ্যে বড় ধরনের কোনো মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয় না। আর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের আইন ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফলে এটি মুসলিম দেশগুলোতে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মৌলিক নীতিগুলো প্রচার করার ক্ষেত্রে অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। ঐ রাষ্ট্রগুলোর আইন সংস্কৃতির এক বড় অংশ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিশ্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে ইসলামী আইনের মূল ভিত্তি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

# আন্তর্জাতিক ইসলামী আইনে মানবিকতার ধারণা*

ড. ইমানুয়েল স্ট্যাভরাকি**

## আন্তর্জাতিক জার্নাল সম্পর্কে প্রাক-কথন

নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক জার্নালের পাঠকগণ অবশ্যই ইসলামী শরী'আত এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সাথে এর সংযোগ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন। এ জার্নালের বিগত সংখ্যাগুলোতে এ বিষয়ে কয়েকজন আরবীয় পণ্ডিতের বেশ কিছু নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এর দ্বারা আলোচ্য বিষয়টির বিশ্লেষণ ও সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। আজকের এ অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে এ জার্নালে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের মানবিকতার ধারণা সম্পর্কে সংস্কৃতিমনা একজন ল্যাটিন মহিলার লেখা প্রকাশিত হয়। লেখিকা বহিঃদর্শকের দৃষ্টিতে নতুন পদ্ধতিতে মানবিক আইনের এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি এ নিবন্ধে লিখেছেন যে, ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন, যা বৈরী কার্যক্রম সহজ করার জন্য এবং যুদ্ধবন্দি ও বেসামরিক লোকদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আচরণবিধি প্রয়োগ করে থাকে। তার এ আলোচনা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আন্তর্জাতিক ইসলামী মানবিক আইন বিভিন্ন গোত্র ও গোষ্ঠীর মাঝে সম্প্রীতি রক্ষা এবং তাদের মাঝে মানবিক নীতির প্রসার ও ভবিষ্যতে সন্ধি ও শান্তি-চুক্তির পথ খুলে দেয়।

## ভূমিকা

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন এক বিশ্বচিন্তার আন্দোলনের ফসল। এর সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত আছে ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট

---

* প্রবন্ধটি ১৯৯১ সালে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস পত্রিকায় জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারি মাসের ১৭তম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

** ড. ইমানুয়েল স্ট্যাভরাকি ১৯৫৭ সালে গ্রীসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি *তাসালুনিকিতে* আইন শিক্ষা করেন। ১৯৭০ সালে প্যারিসের *সরবন বিশ্ববিদ্যালয়* থেকে মাস্টার্সসহ ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তার গবেষণার শিরোনাম ছিল, "*আল-ইত্তিফাকিয়্যাহ্ বিশানী হিমাইয়াতিল 'আয়ান ওয়াছ্-ছাকাফিয়্যাহ্ ফী হালাতিন নিযা'ইল মুসাল্লাহ্: ইত্তিফাকিয়্যাতু লিল কানূনিদ্-দাওলী আল-ইনসানী*"। তিনি ১৯৮৪ সালে *ইউনিসকো* থেকে আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

বিভিন্ন বিষয়, যা আমরা এ সংক্ষিপ্ত গবেষণা নিবন্ধে ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও বিশ্লেষণের চেষ্টা করবো। আল-কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের ইসলামী ধারণার পরিস্ফুটনের মধ্যেই আমাদের এ গবেষণা সীমিত থাকবে।[১] এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইসলামী শরী'আতের ঐ সকল মূলনীতিমালার গভীর পর্যালোচনা করা যা ৬ষ্ঠ শতাব্দি হতে অদ্যাবধি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইনকে ব্যাখ্যা করে আসছে। এ সকল নীতিমালা বিংশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে মানবিক চুক্তিসমূহ প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আর এ কারণেই এ প্রবন্ধে সশস্ত্র সংঘাতের বাস্তবতা, বৈরী কার্যাক্রমের সহজীকরণ, পাশাপাশি সামরিক ও বেসামরিক নাগরিকের সাথে আচরণ সম্পর্কিত আদর্শিক কিছু পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা। এ চেতনার সাথেই আমরা ইসলামী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করব। আমরা আশা করব এ আইনের সম্যক ধারণা মানবিকতার নীতির সম্প্রসারণ এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রেরণা যোগাবে।

## প্রথম পরিচ্ছেদ : সশস্ত্র সংঘর্ষে ইসলামী দৃষ্টিকোণ

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সশস্ত্র সংঘর্ষের ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আহ আইন সমভাবে প্রযোজ্য। বৈরী কার্যক্রম সহজীকরণের জন্য এ আইনের রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা যা সকল অবস্থায় যুদ্ধের প্রভাব হ্রাস করার জন্য প্রণীত হয়েছে।

## এক. সশস্ত্র সংঘর্ষের প্রকৃতি ও জিহাদের আত্মরক্ষারূপ

ইসলামী শরী'আত নীতিগত দিক দিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তা মূলক আইন। ইসলাম যে শান্তির ধর্ম তা এ (ইসলাম) শব্দটির উৎসরূপ বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয়। যেমন আল-কুরআনে বলা হয়েছে: ﴿هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ﴾ "তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, নিরাপত্তাদানকারী।"[২] আল-কুরআনের অসংখ্য

[১] বিষয়টি এমন উৎসের সাথে সম্পর্কিত যা কুরআন ও সুন্নাহ্য় বিধৃত হয়েছে। আর আল-কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকেই ইসলামের নতুন নীতির বুনিয়াদ যেমন, ইনসাফ, সাম্যবাদিতা, পরামর্শ, চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন সমআচরণ ইত্যাদি বিষয় উৎসারিত হয়েছে। এছাড়া আরো অনেক বিষয় রয়েছে যা বলার অপেক্ষা রাখে না, সেগুলো এখান থেকেই নিসৃত। দ্রষ্টব্য: হামিদ সুলতান, *আল-মাফহুমুল ইসলামী ফী আল-আব'আদ আদ্-দাওলিয়্যাহ্ লিল-কানূন আল-ইনসানী*, Sultan Hamed, "Les dimensions internationales du droit Humanitaire, pedone, Institut Henry dunant, UNESCO 1986, p.51;

[২] সূরাহ্ আল-হাশর: ২২।

আয়াত[৩] ও হাদীস থেকে এর প্রমাণ মিলে। আমরা প্রথমে আল-কুরআন থেকে নিম্নলিখিত আয়াতগুলো উল্লেখ করছি:

আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾

"আর তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না তা সংশোধনের পর।"[৪]

তিনি আরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾

"হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর"[৫]

সশস্ত্র সংঘর্ষ সূচনাকারী দল যদি সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর সন্ধি চুক্তির দিকে এগিয়ে আসে তাহলে মুসলিম বাহিনীর উচিত, যুদ্ধ বন্ধ করে সন্ধি চুক্তির দিকে ফিরে আসা।[৬] এরূপভাবে সূরাহ্ শূরার ১৫ নং আয়াত সংঘর্ষে লিপ্ত দল দু'টির মধ্যে পারস্পরিক সংশোধনের দিকে আহ্বান করে। অনুরূপভাবে সূরাহ্ হুজুরাতের ১৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, সকল মানুষ এক নর-নারী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পারস্পরিক পরিচিতির জন্য তাদেরকে বিভিন্ন দল ও গোত্রে পরিণত করা হয়েছে।[৭] অপর দিকে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলিমদের উচিত শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার আশা না করা; বরং আল্লাহ্‌র নিকট শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য দু'আ করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, ক্ষুধার্তকে আহার দান এবং সমস্ত মানুষের মধ্যে *সালাম* তথা শান্তির বার্তার প্রচার-প্রসার ঘটানো-ই হলো উত্তম ইসলাম। সুতরাং ইসলামের মূল উদ্দেশ্যই হলো শান্তি, যুদ্ধ নয়। ইসলাম কেবল বিশেষ কারণ ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জিহাদের

---

৩ উদাহরণ স্বরূপ দেখুন : وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ দ্রষ্টব্য: সূরাহ্ ইউনুস : ২৫, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ দ্রষ্টব্য: সূরাহ্ আল-'আনকাবুত: ৪৬, فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ দ্রষ্টব্য: সূরাহ্ আলে-'ইমরান :২০, ও ১০৩।

৪ দ্রষ্টব্য: সূরাহ্ আল-আরাফ: ৫২।

৫ সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ২০৮।

৬ যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ দ্রষ্টব্য: সূরাহ্ আল-আনফাল : ৬১।

৭ যেমন আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ দ্রষ্টব্য: সূরাহ্ আল-হুজুরাত : ১৩।

স্বীকৃতি দেয়। কোনো কোনো সময় জিহাদের এ ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে যে, এটি একটি সশস্ত্র সংঘর্ষ অথচ এর চেয়ে জিহাদ অনেক বিস্তৃত বিষয়। এর কয়েকটি দিক রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে সশস্ত্র সংঘর্ষ ব্যতীত নাফসের কুমন্ত্রণা বা প্রবৃত্তি দমন করার প্রবণতা জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য যুদ্ধচলাকালীন মুসলিম সৈন্যদের উপর ওয়াজিব ন্যায় পরিপন্থী সকল কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করা এবং কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ না করা। অপরদিকে অকাট্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপক্ষকে নির্বাক করে দেয়াকে *জিহাদ বিল লিসান* বা মৌখিক জিহাদ বলা হয়েছে। এটিই হলো জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ রূপ। এছাড়া জিহাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, হাত (শক্তি) ও অন্তর দিয়ে জিহাদ করা।[৮]

এ গবেষণায় *জিহাদ আল-আসগার* (ছোট জিহাদ)-এর সীমারেখা ও এর কিছু বিষয়ের বর্ণনার মধ্যে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে। যেমন এর কতগুলো নির্দিষ্ট শর্ত রয়েছে। জিহাদ সীমিত সময়ের জন্য হয়ে থাকে এবং এর বৈধতার কারণগুলো ইসলামী শরী'আত সম্মত হতে হবে। এরূপভাবে জিহাদ শুরু করার পূর্বে শত্রুপক্ষকে জিহাদের ঘোষণা জানিয়ে দেয়া। এতদসক্রান্ত বিষয়ে আল-কুরআনের অনেক আয়াতে নির্দেশনা রয়েছে।[৯] এ সমস্ত নির্দেশনা সকল অবস্থায়[১০] পূর্ণ করা ওয়াজিব। আর জিহাদের এ ঘোষণার উদ্দেশ্য হলো, শহরে বসবাসরত শত্রু পক্ষকে যুদ্ধকার্যক্রম শুরুর পূর্বে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া যে, ইসলাম কেবল দ্বীনী কারণেই যুদ্ধ করে। মুসলিমরা তাদের বাস্তব কার্যক্রমে জিহাদের কার্যক্রমকে বিশেষ সর্তকতার সাথে গ্রহণ করে থাকে। তারা যুদ্ধ বা জিহাদের ঘোষণা দেয়ার পর তিন দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকে, যাতে শত্রুপক্ষ যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে পারে অথবা প্রতিপক্ষের সাথে শান্তি চুক্তি করার সুযোগ খুঁজে বের করতে পারে।[১১]

---

৮ Shahi Aga, *The Role of Islam in the Contemporary International Relations*", in "L'Islam dans les relations internationales", Actes au ive colloque franco-pakislanais, paris 14-15 mai 1984, EDISUD 1986, p19. গ্রন্থকার এখানে মূলতঃ একটি হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যার মূলকথা হচ্ছে, তোমাদের মধ্য হতে কেউ গর্হিত কর্ম দেখলে সে যেন হাত দ্বারা তা বন্ধের চেষ্টা করে। আর যদি হাত দ্বারা বন্ধ করতে না পারে তাহলে কথা দ্বারা বন্ধের চেষ্টা করবে। তাতেও অক্ষম হলে সে মনে মনে এর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করবে। আর এটিই ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।

৯ সূরাহ্ আশ-শুরা: ১৫, সূরাহ্ আন্-নাহ্ল: ১২৫, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا "আর আমি রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দিইনা।"দ্রষ্টব্য: সূরাহ্ আল-ইসরা: ১৫।

১০ এ বিষয়ে কার্যকর মূলনীতি হলো, যে এলাকায় মুসলমানদের শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করা হয় কিংবা অতর্কিত আক্রমণের প্রবল সম্ভাবনা থাকে, সে এলাকায় পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই যুদ্ধ শুরু করা বৈধ।

১১ আমরা নমুনা স্বরূপ কাদিসিয়া যুদ্ধের পূর্বে আরব এবং পারসিকদের পারস্পরিক আলোচনা, মিসর বিজয়ের পূর্বে আরব ও মিসরীয়দের মাঝে দ্বি-পাক্ষিক আলাপ-আলোচনা, বাইজান্টাইনদের সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধ-পূর্ব বিভিন্ন কথা-বার্তার বিষয়গুলো সামনে আনতে পারি। যুদ্ধ-পূর্ব দ্বি-পাক্ষিক এ আলোচনার ফল হিসেবে নিরাপত্তা চুক্তি এবং বন্দি বিনিময়ের মত গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর বাস্তবায়ন হতে আমরা দেখেছি।

যখন জিহাদের ঘোষণা হবে তখন তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমিত হবে। সম্মানিত মাসে যুদ্ধ থেকে সরে থাকা এক প্রকার যুদ্ধ বিরতি।[১২] কেবল নির্যাতন, নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জিহাদ সংঘটিত হবে। এছাড়া প্রতিরক্ষা, 'আকীদা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক শৃঙ্খলা সংরক্ষণের জন্য জিহাদ করা যাবে, অন্যথায় নয়।[১৩]

## ক. সীমালঙ্ঘন, নির্যাতন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বৈধ প্রতিরক্ষা

ইসলামী শরী'আত অন্যায়, নির্যাতানের বিরুদ্ধে এবং প্রতিরক্ষা ছাড়া অন্য কোনো কারণে যুদ্ধের অনুমতি দেয় না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী:

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

---

[১২] সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্: ৩৬; সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ২১৭।

[১৩] ঐ আয়াতসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন, যেগুলো অ-মুসলিমদের প্রতি নিরাপত্তা ও শান্তি চুক্তির আহ্বান করছে। উদাহরণস্বরূপ: وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ "আর লড়াই কর আল্লাহর জন্য তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"দ্রষ্টব্য: সূরাহ্ আল-বাকারাহ্ : ১৯০; ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ "আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়।" সুরা আন্-নাহ্ল : ১২৫। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনের শেষ দিকে অবতীর্ণ হওয়া ঐ সকল আয়াতগুলো দেখুন, যেগুলো এমন সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে যখন ইসলাম শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। নমুনা স্বরূপ: فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ "অত:পর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে (মক্কার) মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"দ্রষ্টব্য: সূরাহ্ আত্-তাওবা:৫; وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ "আর তোমরা তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে। ফিতনা হত্যার চেয়ে জঘন্য। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে তাহলে তাদেরকে হত্যা কর। এ হলো কাফিরদের শাস্তি।" দ্রষ্টব্য: সূরাহ্ আল-বাকারাহ্ : ১৯১; قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ "(শরীয়ত নির্দেশীত পন্থায়) তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে (যদি তারা তোমাদেরকে আক্রমণ করে) যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না, আল্লাহ তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম মনে করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া (কর) প্রদান করে।" সূরাহ্ আত্-তাওবা: ২৯। নিশ্চয় এ আয়াতগুলো মুমিনদেরকে শরীয়াহ অনুমোদিত পদ্ধতিতে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা ও দ্বীনের উপর সকল আঘাত প্রতিরোধে সাহসী করে তোলে। এ একই পদ্ধতি রাসূল (সা)-এর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সকল হাদীসের সঙ্গে মিলে যায়। এগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের সকল যুদ্ধই কেবল প্রতিরক্ষামূলক ছিল, আক্রমণাত্মক ছিল না।

‘আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।’[১৪]

উপরিউক্ত আয়াতে বর্ণিত এ মন্তব্য ইসলামী শরী‘আতের মৌলিক নীতির অন্তর্ভুক্ত। কেননা এ নীতির মাধ্যমে যোদ্ধা ও অ-যোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হয় এবং সীমালঙ্ঘন ও আইনভঙ্গ করাকে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়। গধৎঃরহং পষধঁংব-এর বহু পূর্বে এ নীতি ইসলামে উদ্ভাবিত হয়েছে।

আল-কুরআনের অনেক আয়াতে শত্রু বাহিনীর সাথে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে শর্তগুলো উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে,

﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾

‘কেবল তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যারা মানুষের উপর জুলুম করে এবং যমীনে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে।’[১৫] মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

‘যারা তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে বাধা প্রদান করেছে, তাদের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সীমালঙ্ঘনে কখনো প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না।’[১৬] মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾

‘অতঃপর যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব দেয়, তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ রাখেননি।’[১৭]

ইসলামী শরী‘আত শুধু প্রাণ রক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেনি; বরং নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত মানুষের রক্ষার জন্য গুরুত্ব আরোপ করেছে। যেমন আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾

---

১৪ সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯০।

১৫ সূরাহ্ আশ্-শূরা: ৪২।

১৬ সূরাহ্ আল-মায়িদা: ২।

১৭ সূরাহ্ আন্-নিসা: ৯০।

'আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যে পর্যন্ত না ফিতনা (সন্ত্রাস) নির্মূল হয়ে যায় এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে জালিমরা ব্যতীত (কারো উপর) কোনো কঠোরতা নেই।'[১৮]

অনুরূপভাবে ইসলাম অত্যাচারিত মানুষদের রক্ষার জন্যও নির্দেশ দিয়েছে। আল-কুরআন ঘোষণা করেছে:

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

'এমন লোকদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে, যারা নির্যাতিত। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে বিজয়দানে সক্ষম।'[১৯]

কোন নির্যাতিত ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর এ অধিকার রয়েছে যে, সে বা তারা নির্যাতনের রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ন্যায় সঙ্গতভাবে অপরাপর ব্যক্তি বা সম্প্রদায় থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে পারে।[২০] যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾

'আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না? অথচ দুর্বল পুরুষ নারী ও শিশুরা বলছে, হে আমাদের রব। আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে, যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।'[২১]

এসব আয়াত থেকে প্রতিভাত হয় যে, যুদ্ধ শুধু অত্যাচার ও সীমালংঘনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিবর্গের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়; বরং তা জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং ভাষাভেদে বিভিন্ন জাতির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। এসব আয়াত থেকে আরো প্রতীয়মান হয় যে, মানবিক আইনের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি এমন আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘর্ষের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে থাকে যেখানে কোনো জাতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অথবা বৈদেশিক বিজয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। (উল্লেখ্য যে, বংশগত বৈষম্য, মানবজাতির

---

১৮ সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯৩।

১৯ সূরাহ্ আল-হাজ্জ: ৩৯।

২০ আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থা ও. আই. সি থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ সালে আন্তর্জাতিক মানবিক বিষয়ক প্রকাশিত জার্নালের ২য় ধারা দ্রষ্টব্য, যার পুরোটাই ছিল পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্নির্ভর।

২১ সূরাহ্ আন-নিসা: ৭৫।

ঐক্য এবং সমস্ত মানুষের মাঝে[২২] সাম্যবাদী নীতি[২৩] প্রয়োগের মধ্যে কোনো প্রভেদ সৃষ্টি না করার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে এ আইন প্রবর্তিত হয়েছে।)

## খ. ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতিরক্ষা

ইসলাম ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রবক্তা।[২৪] এজন্য ইসলাম মুসলিমদেরকে যারা ঈমান-আকীদার উপর আঘাত হানে তাদের বিরুদ্ধে কেবল যুদ্ধ বা জিহাদ করার অনুমতি দিয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾

'তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে; যাদেরকে আক্রমণ করা হয়েছে, কারণ তাদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দানে সক্ষম। যাদেরকে তাদের নিজ বাড়ী-ঘর হতে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে বের করে দেয়া হয়েছে যে, তারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ'।'[২৫]

এরূপভাবে ইসলাম অন্যান্য মুসলিমদেরকে (যারা মাযলুম নয়) অত্যাচারিত মুসলিম জনতাকে সাহায্য করতে আহ্বান জানায়। অপরদিকে ইসলাম অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করারও নির্দেশ দেয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾

"কেউ ইচ্ছা করলে সে ঈমান আনবে আর কেউ ইচ্ছা করলে সে (ঈমান না এনে) কুফরী করবে।"[২৬] আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾

---

[২২] মানুষের সম্মানের বিষয়টি সূরাহ্ আত্-তীন: ১-৪; সূরাহ্ আল-ইসরা: ৭০; সূরাহ্ আল-'আ'রাফ: ১২-১৪ এবং সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ৩ থেকে গৃহীত।

[২৩] সকল শ্রেণীর মানুষের মাঝে সাম্যের সূচনা হয় সূরাহ্ আল-কাসাসের ৪ নং আয়াত থেকে, যাতে আল্লাহ তা'য়ালা ফিরআউনের নিন্দা করেছেন, যেহেতু সে মানুষকে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছিল। অনুরূপভাবে সূরাহ্ আল-হুজুরাতের ১৩ নং আয়াত, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (নিশ্চয় তোমাদের মধ্য হতে অধিক তাক্ওয়া অবলম্বনকারীই আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত।) সকলকে এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে। এ বিষয়ে রাসূলের হাদীস আরো স্পষ্ট ভাষায় এর প্রতি আহ্বান জানায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "চিরুনীর দাঁতের মত মানুষেরা সকলেই সমান। অনারবের আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, যেমনিভাবে আরবের উপর কোনো অনারবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সাদার উপর কালোর এবং কালোর উপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তবে শ্রেষ্ঠত্বের মূল কথা হচ্ছে তাক্ওয়া।

[২৪] ১৯০৭ সালে চতুর্থ হেগ চুক্তির ৪৬ নং ধারা, ৩য় জেনেভা চুক্তির ৩৪-৩৬ নং ধারাসমূহ, ৪র্থ জেনেভা চুক্তির ৩৭ ও ৩৯ নং ধারা দুটি, ১ম সংযুক্তির ৭৫ নং ধারা এবং ২য় সংযুক্তির ৪ নং ধারা দ্রষ্টব্য।

[২৫] সূরাহ্ আল-হাজ্জ: ৩৯-৪০।

[২৬] সূরাহ্ আল-কাহাফ: ২৯।

"তোমাদের দ্বীন তোমাদের; আমার দ্বীন আমার।"[২৭] এর এরূপ ব্যাখ্যাও করা যেতে পারে। এ পৃথিবীতে সমগ্র মানুষর উপর একই ধর্ম আবশ্যিক করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾

"যদি তোমার রব চাইতেন, তবে সকল মানুষকে এক জাতিতে পরিণত করতেন, কিন্তু তারা পরস্পর মতবিরোধকারী রয়ে গেছে।"[২৮] অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾

'আর যদি তোমার রব চাইতেন, তাহলে যমীনের সকলেই ঈমান আনত। তবে কি তুমি মানুষকে বাধ্য করবে, যাতে তারা মুমিন হয়?'[২৯]

অনুরূপভাবে কাউকে ধর্মান্তরিত করা মুসলিমদের উপর হারাম করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾

'দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্ঠতা থেকে।[৩০]

সুতরাং যখন ধর্মীয় বিশ্বাস পরিবর্তনের জন্য যুদ্ধ নিষিদ্ধ তখন মুসলিমদের উপর অপরিহার্য হয়ে পড়বে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে *জিহাদে আকবর* পরিচালনা করা যদি মুসলিমরা তাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। আর এ নির্দেশ নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে পরিব্যক্ত হয়েছে,

﴿فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾

---

২৭ সূরাহ্ আল-কাফিরূন: ৬।

২৮ সূরাহ্ হুদ: ১১৮।

২৯ সূরাহ্ ইউনুস: ৯৯।

৩০ সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ২০২।

"সুতরাং (হে রাসুল) তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি আল-কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম কর।"[৩১] মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾

"তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর।"[৩২] মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

"আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করো না।"[৩৩]

পরিশেষে এ বিষয়ে আমি অমুসলিমদের প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মান ও উদার নীতি উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬২৩ খ্রিস্টাব্দে এক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, যা ছিল আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রথম শান্তি-চুক্তি। এ চুক্তি ছিল অমুসলিমদের প্রতি সহমর্মিতা ও তাদের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন।[৩৪] এ চুক্তি ছিল মদীনায় বসবাসরত বিভিন্ন জাতি, গোত্র (ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, মুসলিম ও মুশরিক)-এর সাথে। এ চুক্তি প্রকাশ্যভাবে সকলের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়। এছাড়া পারস্পরিক সদ্ভাব-সম্প্রীতি বজায় এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যে-কোন ধরনের সীমালঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুসংহত করে এ চুক্তি।

## গ. সামাজিক আইন-শৃঙ্খলার সংরক্ষণ

ইসলামী শরী'আতের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, ভ্রাতৃত্ববোধ। সূরাহ্ আল-হুজুরাতের ১০ নং আয়াত[৩৫] এবং সূরাহ্ আলে-'ইমরানের ১০৩ নং আয়াত[৩৬] অনুযায়ী সকল মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই। তারা বিভিন্ন দল উপদলেও বিভক্ত

[৩১] সূরাহ্ আল-ফুরকান: ৫২।

[৩২] সূরাহ্ আন্-নাহ্ল: ১২৫।

[৩৩] সূরাহ্ আল-'আনকাবূত: ৪২।

[৩৪] আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থা ও. আই. সি-থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ সালে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক প্রকাশিত জার্নালের ১২ নং ধারা দ্রষ্টব্য; "L'Islam aujord'hui" UNESCO, 1984.

[৩৫] আয়াতটি হলো: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

[৩৬] আয়াতটি হলো: وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

হতে পারে না। ভ্রাতৃত্ববোধের এ চিন্তাধারা দ্বীনী বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'মিনদেরেক এ ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখার প্রতি বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মু'মিনদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, তাঁর ইন্তিকালের পর তারা যেন আবার কখনো মুর্তিপূজার দিকে ফিরে না যায় এবং নিজেরা পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। ফলে বিষয়টি ইসলামী কার্যক্রমের তিনটি মূলনীতির একটি নীতি হিসেবে নির্ধারিত হয়। সুতরাং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে গৃহযুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

যদি মুসলিমরা পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। যেমন, বিদ্রোহ, ফিতনা বা ধর্মান্তর, যেগুলো ধর্ম বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিরোধী অপরাধ। এমতাবস্থায় যে সমস্ত মুসলিম এ ধরনের সংঘর্ষ বা ফিতনায় জড়িয়ে পড়েনি তাদের দায়িত্ব হলো সংঘর্ষরত দু'টি দলের মধ্যে এ ধরনের শত্রুতামূলক কার্যক্রম নিঃশেষ করে দেয়া এবং তাদের মধ্যে শান্তি ও ঐক্য ফিরিয়ে আনা। এ সম্পর্কে সূরাহ্ আল-হুজুরাতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, ইসলামী শরী'আত যুদ্ধের দু'টি প্রকারের মধ্যে পার্থক্য করে থাকে। তথা যে যুদ্ধ প্রতিরক্ষামূলক নয় তা অবশ্যই হারাম। আর যে যুদ্ধ শরী'আতের নীতিমালা অনুযায়ী কেবল প্রতিরক্ষার জন্য সংঘটিত হয় তা মুবাহ্।

## দুই: যুদ্ধ সক্রান্ত কার্যক্রমের সহজীকরণ

যুদ্ধ সক্রান্ত কার্যক্রমের সহজীকরণ সম্পর্কে ইসলামী শরী'আতের মূলনীতি সূরাহ্ আল-বাকারার ১৯০ নং আয়াতে[৩৭] উল্লিখিত হয়েছে। আমরা এটি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এ নীতি মারটেন নীতির বহুপূর্বে প্রবর্তিত হয়েছে। এ নীতির আলোকে যুদ্ধে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি বৈধ নয়। এরূপভাবে সূরাহ্ আল-মায়িদার ২ নং আয়াতে[৩৮] আইনের ভুল প্রয়োগ বা অপব্যবহার নিষেধ করা হয়েছে। এ সূরাহ্র ৮ নং আয়াতে[৩৯] শত্রুদের সাথে ন্যায়নানুগ আচরণ করতে

[৩৭] আয়াতটি হলো: وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ

[৩৮] আয়াতটি হলো: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

[৩৯] আয়াতটি হলো: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

মুসলিমদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল-কুরআনের এ মূলনীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا

'আল্লাহ্র রাস্তায় আল্লাহ্র নাম নিয়ে যুদ্ধ কর। আল্লাহকে যারা অস্বীকার করে তাদের সাথে লড়াই কর। (যদি তারা তোমাদেরকে আক্রমণ করে) তোমরা যুদ্ধ কর, খিয়ানত করবে না, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না, লাশ বিকৃতি করবে না এবং শিশুদের হত্যা করবে না।'[৪০]

বাড়াবাড়ির নিষেধাজ্ঞায় অনর্থক কষ্ট দেয়ার নিষেধাজ্ঞাও অন্তর্ভুক্ত, চাই এ কষ্ট শারিরীক অথবা মনস্তাত্ত্বিক হোক।[৪১] আল-কুরআন এ ধরনের কার্যক্রমকে সরাসরি নিষেধ করেছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ 'আর ফিতনা (সন্ত্রাস) হত্যার চেয়েও বড় জঘন্য।'[৪২]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ্ও এ ধরনের কষ্টদায়ক কর্মকাণ্ডকে নিষেধ করে। সে সময় যুদ্ধে শত্রুদের লাশ বিকৃতি এবং মস্তক খন্ডন করা হত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবতাবিরোধী এ জঘন্য কাজকে নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি এ মর্মে একটি সাধারণ হুকুম জারী করেন যে, 'যদি যুদ্ধের ময়দানে কাউকে হত্যা করতেই হয় তাহলে সম্মানজনক পদ্ধতিতে তা কর।' এমনিভাবে তিনি যুদ্ধ বন্দিদেরকে ক্ষুধার্ত অথবা রৌদ্রে রেখে শাস্তি দেয়াকে কঠোরভারে নিষেধ করেন। এ পর্যায়ে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'অস্ত্রের গরমের সাথে মৌসূমের গরমকে যুক্ত কর না।' এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে বন্দি মহিলাদেরকে তাদের বাচ্চাদের থেকে আলাদা রাখতে এবং তাদের সামনে তাদের আত্মীয় স্বজনদের লাশ নিয়ে যেতে নিষেধ করেন। এ সমস্ত বিধি-বিধান থেকে প্রতিভাত হয় যে, ইসলামে এলোপাতাড়ি হামলা বা আক্রমণ করা এবং ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ।

---

[৪০] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৩২৬১; *সুনানু আবী দাউদ*, বাবু ফী দু'আইল-মুশরিকীন, হাদীস নং ২২৪৬; *সুনানু ইব্ন মাজাহ্*, হাদীস নং ২৮৪৯; J.P. Charnay: "Principes de strategies arabes", L'Herne, Paris 1984, p. 305.

[৪১] আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থা ও. আই. সি কর্তৃক ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ সালে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক প্রকাশিত জার্নালের ১২ নং ধারা দ্রষ্টব্য। ধারাটি হচ্ছে, "কোন ব্যক্তিকে আত্মিক কিংবা শারীরিক শাস্তি প্রদান, অপমান করা, কোনো কিছুর ভয় দেখিয়ে ভীতি প্রদর্শন করা, জোরপূর্বক স্বীকারোক্তির জন্য চেষ্টা করা অথবা এমন কোনো কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না, যা তার জন্য ক্ষতিকারক।" সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে তা কুরআন ও সুন্নাহ্য় বর্ণিত আলোচনার সম্পূরক। ১৯৪৮ সালের ঘোষণায় ৫ নং ধারা এবং ১৯৬৬ সালে বেসামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘটিত দু'টি চুক্তিতে শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক অথবা ক্ষতিকারক কোনো শাস্তির বিধান উল্লেখ নেই।

[৪২] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ২১৭।

সপ্তম শতাব্দীর সূচনা থেকে মুসলিমদের জন্য জ্বালাও-পোড়াও, পানিতে ডুবে মারা, কুয়া-হ্রদ অথবা পানির উৎসস্থলে বিষাক্ত বস্তুর ব্যবহার অথবা বিষযুক্ত অস্ত্রের প্রয়োগ এবং ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের ব্যবহার সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৪৩] অনুরূপভাবে খাদ্য অবরোধকেও হারাম করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম ও মক্কাবাসীদের মধ্যে যুদ্ধ চলাকালীন মক্কায় খাদ্য সরবরাহের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন।

আন্তর্জাতিক ইসলামী আইনের এ মূলনীতি জেনেভা কনভেনশনের ৩৫ ও ৩৭ নং ধারায় বিধৃত আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ। আর এ মূলনীতি আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে ঐ সমস্ত বিধিবদ্ধ ধারার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে[৪৪], যা সাধারণ হত্যা, প্রতিশোধমূলক কার্যক্রম, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, ধোকাবাজী, বিশেষ সামরিক চিহ্ন ব্যবহার, যুদ্ধের সাথে সম্পর্কহীন স্থানসমূহ এবং চিকিৎসাজনিত কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

## ক. গণহত্যার বিধান

ইসলামী শরী'আত গণহত্যা কঠোরভাবে নিষেধ করেছে এবং এর বিপরীত সকল মুসলিমকে যুদ্ধকার্যক্রম শেষ হওয়ার পর শত্রুপক্ষের এক বা একাধিক ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও তাদের জীবনের সুরক্ষা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়, যাকে منح الأمان *নিরাপত্তা দান* বলা হয়ে থাকে। প্রতিপক্ষকে নিরাপত্তা দানের এ বিষয়টি সূরাহ্ তাওবার ৬ নং আয়াত[৪৫] থেকে গৃহীত হয়েছে। পরবর্তীকালে ক্রুসেডরা এটিকে (নিরাপত্তাদানের পদ্ধতি) মুসলিমদের থেকে গ্রহণ করেছে।[৪৬] শত্রু পক্ষকে নিরাপত্তাদানের বিষয়টি সূরাহ্ তাওবার ৬ নং আয়াতে বিধৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾

---

৪৩ A. Arabi: "Le Prophete Mohamed et les lois de la guere", these, Lausanne, 1954, p. 63.

৪৪ ১ম সংযুক্তির নিম্নোক্ত ধারাগুলো দ্রষ্টব্য। ২৭-৪১ বিশ্বাসঘাতকতা, যুদ্ধ থেকে অপারগ শত্রুকে রক্ষা করা সম্পর্কিত ধারাসমূহ; চিকিৎসক ইউনিট, ধর্মীয় সংস্থার সাথে জড়িত ব্যক্তি নিরাপত্তা প্রদান সম্পর্কিত ১৫ ও ১৬ নং ধারা প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ হওয়া এবং মৌলিক নিরাপত্তা ও জামানত সম্পর্কিত ২০ ও ৭৫ নং ধারা দ্রষ্টব্য।

৪৫ আয়াতটি নিম্নরূপ:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ

৪৬ খ্রিষ্টানরা যুদ্ধের বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন, সৈন্যদের মধ্যে গনীমতের মাল বন্টন করা, যুদ্ধ বন্দীদের নিরাপত্তা প্রদান ও মুক্ত করে দেয়াসহ অন্যান্য পদ্ধতিগুলো মুসলমানদের কাছ থেকে অর্জন করেছে। মুসলমানরা মধ্য যুগে যুদ্ধের আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছে। দ্রষ্টব্য: Boisrad, M. A.: "On the probable influence of Islam on western public and international law" in international Journal of Middle East Studies, New York, vol. 11, 1980, p. 442.

'আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহলে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনে, অতঃপর তাকে পৌঁছিয়ে দাও তার নিরাপদ স্থানে। তা এই জন্য যে, তারা এমন এক জাতি, যারা জানে না।'

উপর্যুক্ত আয়াতে দেখা যায় যে, 'আরবদের রীতিতে আশ্রয় দেয়ার বিধান অনেক পূর্ব থেকে প্রচলিত। ব্যক্তি সংরক্ষণের পাশাপাশি ইসলামী শরী'আত রাষ্ট্রপ্রধানকে এই এখতিয়ার বা ক্ষমতা দিয়েছে যে, তিনি যুদ্ধকালীন কোনো কেল্লা বা দূর্গ, শহর বা বসতিতে বসবাসরত শত্রুপক্ষের লোকদের জীবন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। অনুরূপভাবে তিনি দূত ও ব্যবসায়ীদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান সুনিশ্চিত করবেন।

## খ. প্রতিশোধমূলক কার্যক্রম এবং সামষ্টিক শাস্তি

ইসলামপূর্ব যুগে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবণতা ব্যাপকতা লাভ করেছিল।[৪৭] ইসলামের আগমনের পর ইসলামী শরী'আত প্রচলিত এ রীতি গ্রহণ না করতে শুধু উৎসাহিত করেনি; বরং এ রীতিকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾

'এবং মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। আর যে ক্ষমা করে দেয় এবং আপোস করে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ যালিমদের পছন্দ করেন না।'[৪৮]

---

[৪৭] কুরআন কিসাস সম্পর্কিত অনেক বিধান নিয়ে আলোচনা করেছে যেমন, فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ "বস্তুত: যারা তোমাদের উপর জবরদস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি করেছে তারা তোমাদের উপর।" দ্রষ্টব্য: সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯৪, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের তোমাদের প্রতি নিহত ব্যাপারে কিসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়।" দ্রষ্টব্য: সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৭৮। এ আয়াতসমূহের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে, সকল প্রকার তর্ক-বিতর্ক এবং ঝগড়া-ঝাটির পথ বন্ধ করে দেয়া, যাতে মানুষ এ সকল কুকর্মের দিকে হাত বাড়াতে না পারে। আর এটি মানুষের অধিকারের প্রতি সচেতন হওয়া এবং তা যথাযথভাবে আদায় করার সাথে শর্তযুক্ত। এ ছাড়া কতিপয় আয়াত অন্যের প্রতি দয়াদ্র ও কোমল হওয়ার প্রতি স্পষ্ট আহ্বান জানায়। উদাহরণ স্বরূপ; সূরাহ্ শুরা, আয়াত নং–৪০ ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু হওয়ার দিকে আহ্বান করে; এ সূরাহ্র ৩৭ ও ৪৩ নং আয়াত এবং সূরাহ্ আল-'আরাফের ২৮ নং আয়াত আহ্বান করে ক্ষমার দিকে। কতিপয় আয়াত বিকল্প পদ্ধতির মাধ্যমে কিসাস ও অন্যান্য হদ্দ রহিতকরণের আহ্বান জানায়, দ্রষ্টব্য: সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৭৮।

[৪৮] সূরাহ্ আশ্-শূরা: ৪০।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾

"আর যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে ঠিক ততটুকুশাস্তি দাও যতটুকু তোমাদের দেয়া হয়েছে। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর, তবে তা-ই ধৈর্যধারণকারীদের জন্য উত্তম।"[৪৯]

এ সূরাহ্ প্রতিশোধমূলক যুদ্ধের বিরুদ্ধে হুকুম দেয়। সূরাটি অবতীর্ণ হয় উহুদ যুদ্ধের পর। এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা হামযার লাশকে নির্মমভাবে বিকৃত করা হয়েছিল। এ সূরাহ্র বিধান অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্দের বদলা মন্দ গ্রহণ করেননি; বরং ধৈর্যধারণকে অগ্রাধিকার দেন। অপরদিকে বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহিলীযুগে প্রচলিত প্রতিশোধ নেয়ার প্রবণতা যা একশো বছর পর হলেও তারা গ্রহণ করত সে প্রথা সম্পর্কে ঘোষণা দেন যে, "জাহিলীযুগের সকল প্রথা, হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার প্রবণতা আজকে পদদলিত করলাম।" অর্থাৎ সকল প্রতিশোধ গ্রহণ হারাম।[৫০] এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বাণীতে ফুটে উঠেছে, ان الولد لا يوخذ بجرم أبيه "পিতার অপরাধে ছেলেকে পাকড়াও করা যাবে না।"[৫১] ইসলাম ব্যক্তি দায়িত্বের মূলনীতি প্রবর্তন করেছে। (যে কাজে ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতা থাকে) এজন্য ইসলাম লোকদেরকে এমন অপরাধের শাস্তি দেয়ার প্রবক্তা নয়, যে অপরাধ তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়নি। অনুরূপভাবে ইসলাম সামষ্টিক শাস্তি দেয়া নিষিদ্ধ করেছে।[৫২]

---

[৪৯] সূরাহ্ আন্-নাহ্ল: ১২৬।

[৫০] Doi V. A: "*Non Muslims under Shariah*". (Islamic law), TAHA Pubilshers Ltd., London, 1983, P. 91, গ্রন্থকার এখানে একটি হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করছেন, যে হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মানুষকে ভাল কাজের বিনিময়ে ভাল, খারাপের বিনিময় অনূরূপ দ্বারা দেয়ার কথা বলেছেন। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভাল বিনিময়ে ভাল ও খারাপের বিনিময় খারাপ দিতে বারণ করতেন। অর্থাৎ অধিকার থাকলেও এমনটি না করার প্রতি তিনি মানুষকে উৎসাহ প্রদান করতেন। Cf. *Non Muslims under Shariah*". (Islamic law), p. 44.

[৫১] প্রাগুক্ত।

[৫২] যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى "আর কোনো নাফস অন্য কারো পাপের বোঝা বহন করবে না।" দ্রষ্টব্য: সূরাহ্ আল-আন'আম : ১৬৪, فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا "এমন যে কেউ সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়, সে পথ প্রাপ্ত হয় স্বীয় মঙ্গলের জন্য আর যে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকে, সে স্বীয় অমঙ্গলের জন্য বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরতে থাকবে।"দ্রষ্টব্য: সূরাহ্ ইউনুস: ১০৮। Boisard : "*L'Islam aujourd'hui*", op. cit., UNESCO, paris, 1984, pp. 83-84.

## গ. বিশ্বাসঘাতকতা ও খিয়ানত করা

আন্তর্জাতিক ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে বিশ্বাসঘাতকতা হারাম। হাদীসের আলোকে বিশ্বাসঘাতকতার জবাব বিশ্বাসঘাতকতার পরিবর্তে নয়; বরং প্রতিশ্রুতি পূরণের মাধ্যমে হওয়াই উত্তম। যদিও যুদ্ধে ধোকার আশ্রয় নেয়া বৈধ। কেননা *যুদ্ধ-ই ধোকাবাজী এবং সামরিক কৌশলের অন্তর্ভুক্ত*। তবে এটি মনে রাখতে হবে যে, খিয়ানত সর্বতোভাবে হারাম। মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ্ খিয়ানতকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"[৫৩]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যা করার ক্ষেত্রে যে সম্মানজনক পদ্ধতি অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন তা শুধু শাস্তির কষ্ট লাঘব করার জন্য নয়; বরং খিয়ানতের নিষেধাজ্ঞার কারণে, যদিও প্রতিপক্ষ খিয়ানতের আশ্রয় নেয়।[৫৪]

## ঘ. বিশেষ চিহ্ন ও প্রতীকের ব্যবহার

মুসলিম সৈনিকরা রাতের অন্ধকারে আলোর চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহার করত। পরবর্তীকালে ক্রুসেডরা মুসলিমদের অনুসৃত এ পদ্ধতি গ্রহণ করে। ইসলামের প্রাথমিক যুদ্ধগুলোতে মুসলিম যোদ্ধাদের এ ধরনের বিশেষ প্রতীক ব্যবহার বাধ্যতামূলক ছিল। মুসলিম ও অমুসলিম যোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের নিমিত্তে মুসলিম যোদ্ধাদের জন্য মাথায় টুপি পরার পর পাগড়ী বাঁধা ছিল আবশ্যকীয়।

## ঙ. যুদ্ধের আওতা বর্হিভূত স্থানসমূহ ও চিকিৎসাকর্মী

যুদ্ধের সাথে সম্পর্কহীন স্থান সম্পর্কে আলোচনায় আমরা এমন একটি স্থানের দিকে ইঙ্গিত করছি তা হলো পবিত্র কা'বা। ইসলামী শরী'আত *মসজিদুল হারাম* (কা'বা) যা প্রত্যেক মুসলমানের ইবাদতখানা ও আশ্রয়স্থল, সেখানে এবং তার নিকটবর্তী স্থানসমূহে লড়াই করা কঠোরভাবে নিষেধ করেছে।'[৫৫]

---

৫৩ সূরাহ্ আল-আনফাল: ৫৮।

৫৪ Boisard : *"L'humanisme de I'Islam"*, paris, Albin Michel, 1979, 3rd ed., p. 260.

৫৫ সূরাহ্ আল-বাকারাহ্ : ১৯১।

আমরা লক্ষ্য করি যে, ইসলাম যুদ্ধে অংশগ্রহণে অপারগ এমন শত্রুর সুরক্ষার জন্য চিকিৎসাজনিত কার্যক্রমেরও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এমনিভাবে এ বিষয়ে *পৃথকীকরণ নীতিও* প্রবর্তন করেছে।[৫৬] ইসলাম সেনাদেরকে[৫৭] আর্থিক সুবিধা দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ নীতির অনুসরণ করে।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: লোকদের সাথে আচরণ এবং সম্পদের ব্যবহার

ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে যুদ্ধবন্দি সুরক্ষা এবং সম্মান পাওয়ার যোগ্য। এরূপভাবে ইসলামী শরী'আত বেসামরিক জনগণ এবং তাদের সম্পদ ও স্থাপনা যুদ্ধের কবল থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক করেছে।

## ক. যুদ্ধবন্দি ও বেসামরিক লোকদের সাথে আচরণ

যুদ্ধবন্দিদের[৫৮] সম্পর্কে আমরা ইঙ্গিত দিতে চাই যে, ইসলাম তাদেরকে জীবন, স্বাধীনতা এবং মানবীয় আচরণের অধিকার দিয়েছে। বিশেষ করে সূরাহ্ আল-মায়িদার নিম্নোক্ত আয়াতে যুদ্ধবন্দিদের জীবনের অধিকার[৫৯] বিবৃত হয়েছে এভাবে:

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

'কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল।'[৬০]

---

৫৬ চিকিৎসা পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য দেখুন: Boisard "*On the probable influcnce*", .. op.cit., p. 44.

৫৭ লক্ষ্যণীয় যে, পূর্ব যুগেও ইসলামী সৈন্য বাহিনী পেশাগত দিক, শৃঙ্খলা ও বাহ্যিক শক্তির দিক থেকেও মজবুতভাবে গঠিত হতো, বিশেষত: উমাইয়া ও আব্বাসী যুগে। পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদ, নিয়ম-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলোও গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হতো। ১ম প্রটোকল সংযুক্তির ৪৩ নং ধারা দ্রষ্টব্য।

৫৮ এখানে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলামের অবস্থা সমকালীন অন্যান্য মানবিক আইনের মতই। (অতিরিক্ত ১ম প্রটোকল ৪৬ ও ৪৭ নং ধারা দ্রষ্টব্য) কারণ, ইসলামও বেতনভুক্ত যুদ্ধ বন্দি এবং গুপ্তচর ব্যক্তিদেরকে অবকাশ দেয় না। দ্রষ্টব্য: সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ১২।

৫৯ দেখুন "কোন নবীর জন্য এটি শোভনীয় নয় যে, তার নিকটে বন্দী থাকবে, এখনো যাদের রক্ত প্রবাহিত করা হয়নি।" দ্রষ্টব্য: সূরাহ্ আল-আনফাল: ৬৭। এ কথা বলা যাবে না যে, এ সূরাহ্ যুদ্ধ বন্দিদের হত্যার অথবা তাদেরকে দাসে পরিণত করাকে আবশ্যক করে। এটি মূলতঃ যুদ্ধ বন্দিদের বন্দিত্ব দীর্ঘ না হয়ে যায় তার একটি সমাধান মাত্র। নতুবা নিয়ম থাকার পরও যুদ্ধ বন্দীদের সমূলে হত্যা করার কোনো দৃষ্টান্ত নেই। তবে দু'জন বন্দির ব্যাপারে বলা হয় যে, তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। সেটি ছিল ব্যতিক্রমী একটি ঘটনা এবং মুসলমানদের সাথে দুর্ব্যবহার ও অতি ঘৃণ্য কাজে জড়িত হওয়ায় তাদের সঙ্গে এ আচরণ করা হয়েছিল।

৬০ সূরাহ্ আল-মায়িদা: ৩২।

এমনিভাবে সূরাহ্ আল-ইসরায় ঘোষিত হয়েছে,

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

“আর সঙ্গত কারণ ছাড়া তোমরা সে প্রাণকে হত্যা করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন।”[৬১]

সূরাহ্ মুহাম্মাদের ৪ নং আয়াতে[৬২] বিধৃত হয়েছে যে, যুদ্ধবন্দিদেরকে নিঃশর্ত অথবা মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দেয়া অনস্বীকার্য। (আর এ বন্দি এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হবে)। এটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ্ আল-কুরআনের এ আইনের সাথে ঐকমত্য। বদর যুদ্ধ শেষে যারা বন্দি হয়ে এসেছিল তারা ছিল তিন শ্রেণিভূক্ত। এক শ্রেণির বন্দি ছিল সম্পদশালী। মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। আরেক শ্রেণি ছিল দরিদ্র, কিন্তু তারা লেখাপড়া জানত। তাদেরকে দশ জন মুসলমানের দশ সন্তানের লেখাপড়া শিক্ষা দেয়ার বিনিময়ে মুক্তি দেয়া হয়। অপর এক শ্রেণি ছিল গরীব ও নিরক্ষর। তাদেরকে ‘*আর মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনদিন অস্ত্র ধারণ করবে না*’ এ শর্তে মুক্তি দেয়া হয়। হুনায়নের যুদ্ধে ১০ হাজার লোক বন্দী হয়। যুদ্ধ থেকে তাদেরকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়া হয়।[৬৩]

যুদ্ধ বন্দিদের স্বাধীনতার অধিকার[৬৪] সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়া প্রয়োজন। যে যুগে সকলেই যুদ্ধবন্দি এবং বিজিত অঞ্চলের জনগণকে দাস বানানো[৬৫] একটি নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করেছিল। সে সময় ইসলাম এমন এক নিয়ম প্রবর্তন করে, যা দাস বানানোর পূর্ব নিয়ম-প্রথাকে বাতিল করে দেয় এবং সাথে সাথে দাসদের স্বাধীনতা লাভের ব্যবস্থাও করে।

---

৬১ সূরাহ্ ইসরা: ৩২।

৬২ আয়াতটি নিম্নরূপ:

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

৬৩ যুদ্ধ বন্দিদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সর্বশেষ যে অবস্থান ও নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং যার উপর মুসলমানদের কার্যকরী অনুশীলন চলে আসছে, সেটি হলো, তাদেরকে নিঃশর্ত মুক্ত করে দেয়া। উদাহরণস্বরূপ, আমরা সুলতান সালাহ্ উদ্দীন আয়্যুবী (র)-এর কথা বলতে পারি। ব্যয়ভার বহন করতে না পারায় তিনি অসংখ্য খ্রিস্টান বন্দিদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এর ৭০০ বছর পর একই ভূমির (ফিলিস্তিন) উপর একই অভিযোগে নেপোলিয়ান অসংখ্য সিরীয় বন্দিদেরকে হত্যা করেছিল। দ্রষ্টব্য: আবূ যাহরাহ, মাফহুমুল হারব ফিল ইসলাম, আল-মাজলিসুল ‘আলা লিশ্-শূ‘উনিল ইসলামিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৬২, পৃ. ৬৩।

৬৪ আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থা ও. আই. সি. কর্তৃক ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ সালে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক প্রকাশিত জার্নালের ২ নং ধারা দ্রষ্টব্য। ধারাটি হচ্ছে, ‘প্রতিটি মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করেছে, কাউকে ক্রীতদাসে পরিণত করা কিংবা অন্য কোনো উপায়ে বশ্ করা নিষিদ্ধ ও গোনাহের কাজ।

৬৫ লক্ষণীয় যে, যখন থেকে যুদ্ধ সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনীর দায়িত্বে অর্পিত হয়েছে বিশেষত: উমর (রা)-এর যুগ থেকে বেসামরিক ও সাধারণ জনগণকে গনীমত বন্টনের নিয়মের অধীন মনে করা হয় নি।

ইসলাম বাস্তব কর্মক্ষেত্রে দাস বানানোর ছয়টি উৎস বা কারণ চিহ্নিত করেছে। যেমন জরিমানা এবং এর বদলা, ঋণ, বংশীয় সরদারের হুকমে গোলাম বানানো, স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দাস কিংবা ওয়ারিশসূত্রে অথবা যুদ্ধের কারণে দাস বানানো। সুতরাং ইসলাম উপর্যুক্ত উৎসগুলোর মধ্যে দু'টি উৎস অবশিষ্ট রাখে। এক. উত্তরাধিকারী দাস দুই. যুদ্ধের কারণে দাস (আর অবশিষ্ট উৎসগুলো বন্ধ করে দেয়)।

আল-কুরআন যুদ্ধবন্দিদেরকে দাস বানাতে নির্দেশ দেয়নি; বরং তাদেরকে বিনাশর্তে অথবা মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দিতে নির্দেশ দিয়েছে।[৬৬] এছাড়া আল-কুরআনের অসংখ্য আয়াতে দাসদের মুক্তি দেয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যদি কোনো মু'মিন অপর কোনো মু'মিনকে ভুলবশতঃ হত্যা করে[৬৭] অথবা ইচ্ছাক্রমে কসম ভঙ্গ করে[৬৮] অথবা স্বীয় স্ত্রীকে শরী'আত বহির্ভূত পন্থায় তালাক দেয়[৬৯] তাহলে এগুলো প্রত্যেকটি কাজের জন্য তাকে কাফ্ফারা স্বরূপ *একটি গোলাম আযাদ* করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ্ থেকে এটিই প্রতিভাত হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দোযখ থেকে মুক্তিদানকারী এবং জান্নাতে প্রবেশকারী 'আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, '*গোলাম আযাদ করা*'।[৭০]

অপরদিকে ঐ যুগে ক্রীতদাস সম্পর্কিত প্রচলিত আইনের বিপরীত ইসলাম ক্রীতদাসের মুক্তি এবং তার স্বাধীনতা ফিরে দেয়ার জন্য *মুকাতাবা* তথা স্বাধীন হওয়ার চুক্তি করা[৭১] এবং *সাদাকাহ্*[৭২]-এর মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পথ খোলা রাখে। সুন্নাহ্র আলোকে দাস মুক্তির জন্য এক বিশেষ পদ্ধতি চালু করা হয়। সেটি হলো দাসী যখন তার প্রভুর জন্য সন্তান প্রসবের চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ হয় তখন তার সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে সে দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে। তাদের জন্য সুন্দর জীবন যাপন এবং স্বাধীন অধিকার প্রবর্তন ছাড়াও ইসলাম তাদের সাথে সকল অবস্থায় মানবিক আচরণ করতে নির্দেশ দিয়েছে।

---

৬৬ সূরাহ্ মুহাম্মাদ: ৪।

৬৭ সূরাহ্ আন্-নিসা: ৯২।

৬৮ আল-মায়িদা: ৮৯।

৬৯ আল-মুজাদালাহ্: ৩।

৭০ আয়ায ইব্ন 'আশুর, '*আল-ইসলাম ওয়াল কানূনুদ্-দাওলী আল-ইনসানী*', আন্তর্জাতিক রেড ক্রস জার্নালে প্রকাশিত নিবন্ধ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল, ১৯৮০।

৭১ সূরাহ্ আন্-নূর: ৩৩।

৭২ সূরাহ্ আত্-তাওবা: ৬০; সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৭৭।

প্রকৃতপক্ষে শত্রুর সাথে সর্বনিম্ন যে আচরণ করা হবে তা হবে ন্যায়বাদিতা।[৭৩] যেমন এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾

"কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ কর, তা খোদাভীতির নিকটতর।'[৭৪] এ হুকুম ঐ অবস্থায় আবশ্যিক রূপে গণ্য হবে যখন এর ফলাফল মুসলিম অথবা তাদের নিকটবর্তী লোকদের জন্য সুবিধাজনক হবে না।[৭৫] এভাবে আল-কুরআন মুমিনদেরকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বন্দিদের সাথে সদাচরণ, তাদেরকে সাহায্যকরণ এবং আহারদানের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে।[৭৬]

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, মুসলিম সিপাহ্সালাহদের প্রতি রাসূললুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত শিক্ষা আল-কুরআনের এ শিক্ষাকে আরো সুদৃঢ় করে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

استوصوا بالأسرى خيرا هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولاتكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموه فأعينوهم.

'তোমরা বন্দিদের সাথে সদাচারণ কর।' এরা তোমাদের ভাই ও বন্ধু। মহান আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। তোমাদের কোনো ভাই কারো অধীনস্থ হলে তার উচিৎ হবে, সে যা খাবে তাকে তা খাওয়াবে, সে যা পরবে তা তাকেও পরাবে। আর তোমরা তার উপর এমন কাজ চাপিয়ে দিও না, যা তার ক্ষমতার বাইরে। যদি তোমরা তাকে এরূপ কাজ চাপিয়ে দাও তাহলে তাকে সাহায্য কর।'[৭৭]

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন যুদ্ধ বন্দিদের সাথে সদাচারণের জন্য যে আইন প্রণয়ন করেছে তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলাম প্রবর্তিত আইনের সাথে মিলে যায়।

৭৩ এরেকসূসী, 'আল-কুরআনুল কারীম ওয়া ইতিফাকিয়্যাতুল ইনসানিয়্যাহ, *আন্তর্জাতিক রেড ক্রস জার্নালে* প্রকাশিত নিবন্ধ সংখ্যা, নভেম্বর, ১৯৬০।

৭৪ সূরাহ্ আল-মায়িদাহ্: ৮।

৭৫ সূরাহ্ আন্-নিসা: ১৩৫।

৭৬ সূরাহ্ আল-ইনসান: ৮-৯।

৭৭ বাইজান্টাইনদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে সৈন্যদলকে পাঠিয়েছিলেন, তাদেরকে তিনি বিশেষ দশটি উপদেশ দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার সার-সংক্ষেপ এই: প্রতিশোধ গ্রহণের সময় সীমালঙ্ঘন করবে না, যাতে তোমার আক্রমণে বেসামরিক লোকদের কোন ক্ষয় ক্ষতি সাধিত হয়। মহিলাদের দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। অসুস্থ ও স্তন্যদায়ী মাদের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখবে। মানুষের ঘরবাড়ি ধ্বংস করা, তাদের জীবন ধারণের অন্যান্য উপায়-উপকরণ, গাছ-গাছালি নষ্ট করা থেকে বিরত থাকবে। Cf. *Non Muslims under Shariah*, op.cit., pp. 94-95.

এ ছাড়া এ আইনের দৃষ্টিতে যারা যুদ্ধ চলাকালীন নিহত হয় তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের লাশ দাফন করা অতীব জরুরী। বেসামরিক জনগণের বিষয়ে ইসলামী শরী'আত এক বিশেষ নীতি অবলম্বন করেছে, যা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মৌলিক নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেটি হলো যোদ্ধা এবং অ-যোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে আলাদা আলাদা বিধান প্রবর্তন করা। এ বিধান অবশ্য জেনেভা কনভেনশনের প্রথম পরিশিষ্টের ৪ নং ধারায় সন্নিবদ্ধ হয়েছে। আজ থেকে বহুবছর পূর্বে আল-কুরআন ঘোষণা দিয়েছে,

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾

"তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।" জন রুশো খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে ইসলামের এ মূলনীতিকে গ্রহণ করে বেসামরিক জনগণের উপর আক্রমণ নিষিদ্ধ বলেছেন এবং তাদেরকে যুদ্ধের প্রভাব থেকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণকে আবশ্যক মনে করেছেন। বেসামরিক জনগণকে সাধারণ সুরক্ষা দেয়ার পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের উপর ভিত্তি করে বিশেষ শ্রেণির (মহিলা, শিশু, বয়োবৃদ্ধ, অসুস্থ এবং ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব) জন্য এক বিশেষ সুরক্ষাদানের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। পূর্ববর্তী খলীফাগণ এ নীতি অনুসরণ করেন এবং এটিকে ইসলামের মানবিক চেতনা হিসেবে রূপদান করেন। যেমন আবূ বাকর (রা) সিরিয়া আক্রমণের পূর্বে মুসলিম সেনাদের নিকট প্রেরিত এক ফরমানে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন, তারা যেন প্রতিটি মুহূর্তে এ ধ্যানে মগ্ন থাকে যে, মহান আল্লাহ্ তাদেরকে দেখছেন, তারা মৃত্যুর নিকটবর্তী। তিনি তাদেরকে দশটি উপদেশ দিয়ে নির্দেশ দেন, 'তারা যখন যুদ্ধ করবে তখন তারা যেন পুরুষের মতো লড়াই করে, তাদের হাত যেন মহিলা, শিশু বৃদ্ধ-বণিতার রক্তে রঞ্জিত না হয়। যেন তারা খেজুর বৃক্ষ না কাটে, ফসল না জ্বালায়, ফলদার বৃক্ষ না কাটে, চতুস্পদ জন্তু-জানোয়ারকে হত্যা না করে, আর যে সমস্ত লোক উপাসনালয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করছে তাদের সম্মুখীন যেন তারা না হয়, তাদেরকে ছেড়ে দেয়া উচিৎ এবং কোনো উপাসনালয় বা গীর্জা যেন ভাঙ্গা না হয়।'[৭৮]

অনুরূপভাবে 'উমার (রা) সৈন্যদেরকে একই শিক্ষা দেন যে, 'তারা যেন অত্যাচার থেকে বিরত থাকে। কেননা আল্লাহ্ যালিমদেরকে পছন্দ করেন না।' তিনি তাদেরকে ভীরুতা, কাপুরুষতা এবং বিজয় লগ্নে গনীমতের মাল চুরি করা

---

[৭৮] হামিদ সুলতান, "আল-মাফহুমুল ইসলামী লিল কানূনিদ্-দাওলী আল-ইনসানী ফিল মুনাযা'আত আল-মুসাল্লাহা" *আল-মাজাল্লাতুল মিসরিয়্যাহ্ লিল কানূনিদ্-দাওলী*, ৩৪তম খণ্ড, কায়রো, ১৯৭৮ খ্রি., পৃ. ১৫ ও তৎপরবর্তী।

থেকে বিরত থাকতে এবং সংযম অবলম্বন করতে নির্দেশ দেন। অনুরূপভাবে তিনি আক্রমণ অথবা যুদ্ধ চলাকালীন বৃদ্ধ-বণিতা, মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন।'

এ নির্দেশনামা মুসলিম সৈন্যদের জন্য আন্তর্জাতিক ইসলামী আইনে একটি বুনিয়াদী নীতি প্রবর্তন করে। আর এ নীতি আধুনিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অন্তর্ভুক্ত। (এডিশনাল প্রথম প্রটোকলের ৪৮-৫১ এবং ৭৬-৭৮ ধারা দ্রষ্টব্য)

## দ্বিতীয়: ধন-সম্পদের ব্যবহার

সে যুগে *গনীমত* বা *যুদ্ধলব্ধ* সম্পদ লাভ এবং লুটতরাজের জন্য বিনা প্রয়োজনে যুদ্ধ ও ধ্বংসযজ্ঞ অবস্থা সৃষ্টি করা হত। আন্তর্জাতিক ইসলামী আইন এ ধরনের যুদ্ধ ও বাড়াবাড়ি কে অবৈধ ঘোষণা করেছে এবং গনীমতের মালের ব্যাপারে এমন শক্ত আইন প্রবর্তন করেছে, যার উদ্দেশ্য হলো অবৈধ পন্থায় ধন-সম্পদ ছিনতাই কঠোর হস্তে দমন করা। রাসূলুল্লাহ্‌র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা অনুযায়ী লুটেরা, ছিনতাইকারী এবং এসবের উৎসাহদাতা মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইসলামে সর্বপ্রকার চুরি ও লুটতরাজকে হারাম করা হয়েছে। অপরদিকে যুদ্ধে প্রাপ্ত সকল স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ যুদ্ধ শেষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। *সূরাহ্ আল-আনফালের ৪১* নং আয়াত[৭৯] অনুসারে এর এক পঞ্চমাংশ সাধারণ জনহিতকর কাজে ব্যয় করা হবে। আর জমি, ভবন বা অস্থাবর সম্পদ বা স্থাপনা স্ব-স্ব মালিকের মালিকানায় থাকবে এবং এগুলোর পরিবর্তে তাদের কাছ থেকে *খারাজ* বা ভূমি কর আদায় করা হবে।

আন্তর্জাতিক ইসলামী আইন আরেকটি মূলনীতি স্পষ্ট করে। সেটি হলো, বেসামরিক ও সামরিক উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা, (যা প্রতিধ্বনিত হয়েছে জেনেভা কনভেনশনের অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকলের ৪৮ নং ধারায়) এবং উপাসনালয় ও জীবন ধারণের উপাত্ত এবং মাধ্যমগুলোর বিশেষ সুরক্ষা দেয়া।

---

৭৯ আয়াতটি নিম্নরূপ:

﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

উপাসনালয় সংরক্ষণের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে পরিব্যক্ত হয়েছে এভাবে,

﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾

'আর আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা দমন না করতেন, তবে বিধস্ত হয়ে যেত খৃস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ-যেখানে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে।'[৮০]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে ইবাদাত করার স্থানসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য জোর তাগিদ এসেছে।[৮১] এছাড়া মিসরের সিনাই পর্বতে অবস্থিত *স্যান্ট ক্যাথরিন* আশ্রমের যাজকদেরকেও উপাসনালয়গুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা এ চুক্তিতে বিধৃত হয়েছে। যুদ্ধ প্রাক্কালে সেনাবাহিনীদেরকে নির্দেশ করার ক্ষেত্রে খলীফা আবূ বাকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নীতি অবলম্বন করেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত সরকারী ফরমানে বলেন, তারা (সৈন্যরা) যেন কোনো উপসনালয় ও আশ্রম ধ্বংস না করে। অনুরূপভাবে 'উমার (রা)ও *বায়তুল মাকদিসের* অধিবাসীদের সাথে এ মর্মে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন যে, তাদের গীর্জা যেন ধ্বংস না করা হয় অথবা এ গীর্জা থেকে কোনো জিনিস যেন লুট করা না হয়।

জীবন ধারণের উপাত্ত ও উপযোগের সংরক্ষণনীতি যা সূরাহ্ আল-বাকারার ২০৫ নং আয়াতে[৮২] বর্ণিত হয়েছে, সে অনুযায়ী শস্য ও চুতষ্পদজন্তুর ধ্বংস সাধন সর্বতোভাবে হারাম। অনুরূপভাবে হাদীসে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম তথা ফলদার বৃক্ষ এবং খেজুরগাছ ধ্বংস করা কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।[৮৩]

---

৮০ সূরাহ্ আল-হাজ্জ: ৪০।

৮১ Cf. *Non Muslims under Shariah*, op.cit., p.77; মসজিদ কিংবা মুসলমানদের গৃহ নির্মাণ করার জন্য খ্রিষ্টানদের গির্জা ধ্বংস করা আইন সিদ্ধ নয়। খৃষ্টানদের গির্জা নির্মাণ বা সংস্কারসহ অন্যান্য ধর্মীয় কর্মকা সম্পাদনে মুসলমানদের দায়িত্ব হলো তাদেরকে সহযোগিতা করা।

৮২ আয়াতটি নিম্নরূপ:

﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾

৮৩ লক্ষণীয় যে, এটি এ সকল শিক্ষার বিপরীত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনী নাযীরের খেজুর বাগান ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বটে কিন্তু কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এটি ছিল একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। দ্রষ্টব্য: সূরাহ্ আল-হাশর: ৫।

আর এ নীতিই আবূ বাকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর সেনাদলকে এ বলে নির্দেশ দেন,

لا تقطعن شجراً مثمراً، ولا نخلاً، ولا تحرقنها، ولا تخربنَّ عامراً، ولا تعقِّرن شاه، ولا بقرةً إلا لمأ كلة.

'কখনো কোনো ফলদার বৃক্ষ কর্তন করবে না, খেজুর গাছ কাটবে না এবং তা জ্বালিয়ে দেবে না, কোনো ভবন ধ্বংস করবে না, খাওয়ার প্রয়োজন ব্যতিরেকে ছাগল বা গরু জবাই করবে না।'

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটিই প্রতিভাত হয় যে, বেসামরিক সম্পদ, স্থাপনা সংরক্ষণ ও সুরক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনে যে বিধান প্রবর্তিত হয়েছে (অতিরিক্ত প্রথম প্রটোকলের পরিশিষ্টে বর্ণিত ৫২-৬০ নং ধারা) তা মূলতঃ আন্তর্জাতিক ইসলামী আইনের মূলভিত্তির আলোকে প্রণীত হয়েছে এবং এর বাস্তবায়ন পদ্ধতিও অনুসৃত হয়েছে।

## উপসংহার

এ সংক্ষিপ্ত নিবন্ধের সারমর্ম হলো এই যে, ইসলাম শুধু নৈতিক মূল্যবোধ সর্বস্ব একটি ধর্ম নয়; বরং ইসলাম হলো ব্যাপক আইন-দর্শন ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এছাড়া এ জীবন ব্যবস্থায় রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্মীয় বিশ্বাস, বিবিধ আইন-কানূন এবং শিষ্টাচার ও আচরবিধি, যা সমাজের সদস্য হিসেবে একজন মানুষের অর্জন করা অনস্বীকার্য।[৮৪] ইসলাম যে আইন-দর্শন প্রবর্তন করেছে তা বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিমণ্ডিত। এটি বৈরী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে শাস্তির নীতিমালা নির্ধারণ করেছে। ইসলাম বৈধ কারণ ছাড়া সবসময় সামষ্টিক যুদ্ধের বিরোধিতা করে আসছে। মোটকথা, ইসলাম সাধারণতঃ যুদ্ধকে অপছন্দ করে। শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধান সুনিশ্চিতকরণের হাতিয়ার হলো ইসলাম। এছাড়া এটি মানবিক মর্যাদার শীর উন্নত করার জন্য মানবীয় অন্তরে প্রতিশ্রুতি ও চুক্তির প্রবণতা সৃষ্টিকারী একটি আন্দোলন। একথা মনে রাখতে

---

[৮৩] লক্ষণীয় যে, এটি এ সকল শিক্ষার বিপরীত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনী নাযীরের খেজুর বাগান ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বটে কিন্তু কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এটি ছিল একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। দ্রষ্টব্য: সূরাহ্ আল-হাশর: ৫।

[৮৪] টেইলর কর্তৃক সভ্যতার সংজ্ঞা নিম্নোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, Habib Chatty, "Prospero et Caliban" in "*Islam aujourd'huiœ*, op.cot., p36.

হবে যে, ইসলামে মানবিকতার নীতি প্রচলিত আইনের সাথে শুধু সংগতিপূর্ণই নয়;[৮৫] বরং এটি যুগপরিক্রমায় মানবিক আইন উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন অপেক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।[৮৬]

---

৮৫ কিছু কিছু বিষয়ে সমকালীন আন্তর্জাতিক আইনের সাথে ইসলামী শরী'আতের সংঘাতের সৃষ্টি হবে। কারণ, এগুলোর মধ্যে এমন কিছু বিষয় এসেছে, ইসলামের সূচনাকালে যার অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায়নি।

৮৬ ক্রসেড যুগে ইসলামী শরী'আত আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। ফলে ইতালি, জার্মান, এ দু'টি দেশে তাদের সংস্কৃতির সাথে ইসলামী সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটে। অনেক ইউরোপীয় লেখক ইসলামী শরী'আত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যুদ্ধ আইন বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, E. Nys: "*Lws origines du droit international*", Beuxelles, 1894, vittoria, de jure Belli, Baron Michel de Taube, et Thomas الذي يأخذ قائمة الأشخاص المحميين من الشريعة الإسلامية Aquinas. Las Casas. En outre, Suarez, (Disputation Xlll – De Bello, French Bacon, Rene Descartes et Grotius Dejure belli et pacisl).

والأخير يعتبر مؤسس القانون الدولي العام. ويبدو أن جميع هؤلاء المؤلفين كانوا مطلعين على الشريعة الإسلامية.

أنظر Boisard M. A.: "On the probable in fluence of Islam on Islam on western public and Interanitional law" in international Journal of Middle East Studies, New York, vol. 11, 1980, p. 442.

# তথ্যসূত্র


1. Algase, Roger. C.: "*Protection of civilian lives in warfare: a comparison between Islamic law and modern international law concerning the conduct of hostilities*", Revue de droit penal militaire et de droit de la guere (Bruxelles) XV1-2-3, l977, pp.245-26l.

2. Arabi, Abdul-Rabman: *Le prophéte Mohamed et les lois de la guerre*, these, Lausanne. 1954.

3. "*L'avenir du droit international dans un monde multiculturel*", Académie de droit international de La Haye, université des Nations Unies. Colloque (La Haye, 17-19 novembre 1983) édité par René- Jean Dupuy, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague. Boston, London 1984.

4. Azzam, Abd-al-Rahman: *The eternal message of Muhammad, Quarter Books, Londoit Melbourne*, New York, l984, pp.l27-l74

5. Boisard, M.A.: *L'humanisme de l'islam*, Paris, Ablin Michel, 1979, 3 edition, p436.

6. Boisard, M.A. "*On the probable influence of Islam on western public and international law.*" International Journal of Middle East Studies, New York, vol. II, 1980, pp. 429-450

7. Boisard, M.A.: *L'Islam aujourd'hui*, UNESCO, Paris, 1984. Charnay, Jean-Paul: Principles de strategies Arabes, Classique de la strategic.

8. L'Herne, Paris, 1984.

9. "*Declaration islamique universelle des Droits de iHomme*", du 10 septembre 1981, in BOISARD, L'Islam ajuourd'hui, UNESCO, 1984.

10. DOT, ABdur Rahman: *Non Muslims under Shariah*, Islamic Laws, TA.HA,Publishers Ltd., London 1983, l48p.

11. DRAZ, Mohamed Abdalla: "*Le droit international public et l'Islam*", Revue internationale de la Croix-Rouge, 34 année, mars 1952, pp.194-209.

12. EREKSOUSSI, M.K.: "*Le Coran et les conventions humanitaires*", Revue internationale de la Croix-Rouge, 42 année, Novembre 1960, pp.641-650.

13. GABER, Mohamed Hosny Mohamed: *The early Islamic State with special reference to the evolution of the principles of Islamic*

*International law*, (632-750 AD, The American University, PhD 1962, Political Sciences, International law and relations.

14. GARDET, Louis: La cite musulmane, *vie sociale et politique*, Etudes musulmanes, Librairie philosophique J.Vrin, Paris, 1981, 4 edition, pp. 273-329.

15. HAMIDULLAH, Muhammad: 'Contribution musulmane au droit international', in L'islam dans les relations internationales, Actes du IV Colloque franco-pakistanais, Paris 14-15 mai 1984, Edisud, 1986.

16. LIslam, *la philosophies et les sciences*, UNESCO, Paris, 1986.

17. L'Islam dans les relations internationales, Actes du IV Colloque franco-pakistanais, Paris, 14-15 mai, 1984, Edisud, 1986.

18. Khaddouri, Majid: War and peace in the law of Islam, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1955, p321.

19. Khaddouri, Majid: "*Islamic law and international law, in"* L'avenir du droit international dans un monde multiculturel", Académie de droit international de La Haye, Université des Nations Unies. Colloque La Haye 17-19 Novembre 1983, édité par René-Jean Dupuy, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, Boston, London, 1984.

20. Mahmassani, Sobhi: "*Principles of international law in the light of the Islamic doctrine*', *'Recueil des cours de l'Académie de droit international*", 1966, tome 117, Vol. I, pp.205-328.

21. Massignon, Louis: 'Le respect de la personne humaine en Islam et la priorité du droit d'asile sur le devoir de juste guerre", *Revue internationale de la Croix-Rouge*, 34 année, no. 402, Juin 1952, pp.445-468.

22. Peters, Rudolph: "*Islam and colonialism - the doctrine of Jihad in modem history*", Mouton Publishers, Paris, New York, The Hague, 1979, 2A5p.

23. Pipes, Daniel: "*Slaves soldiers and Islam: the genesis of military system*" New Haven, Yale University Press, 1981, xxx + 246p.

24. Qutb, Sayyed: "Islam and Universal peace" 3 ed., Indianpolis. Indiana: American Trust Publications 1983, XII +8lp.

25. Rechid, Ahmad: "L'Islam et le droit des gens*", Recueil des Cours de 1'Académie de droit international*, Sijthoff, Leyden, 1937, vol. II, tome 6O,pp. 375-504.

26. SHAHI, Agha, "The role of Islam in Contemporary International Relations", *in "L'Islam*

27. *dans les relations internationles*", Actes du IVe Colloque franco-pakistanis, Paris, 14.

28. 15 mai 1984, EDISUD, 1986.

29. Sultan, Hamed: "La conception islamique" in "Les dimensions internationales du droit humanitaire", Pedone, Institut Henry-Dunant, UNESCO, l986,p.47-60.

29. أبو زهرة، محمد ، *مفهوم الحرب في الإسلام*، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة ، ١٩٦٢، ص: ٦٩١
عياض بن عاشور، *الإسلام والقانون الدولي الإنساني*، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مارس/آذار–أبريل/نيسان ١٩٨٠ صدر بالعربية عن المجلة الدولية للصليب الأحمر.

31. عرقسوسي، م.ك، *القرآن الكريم والاتفاقيات الإنسانية*، المجلة، الدولية للصليب الأحمر، نوفمبر/تشرين الثاني، ١٩٦٠ الطبعة العربية.

32. حامد سلطان، *المفهوم الإسلامي للقانون الدولي الإنساني في المنازعات المسلحة*، المجلة المصرية للقانون الدولي، القاهرة، ١٩٧٨، المجلة ٣٤، الصفحات ١-١٩.

# ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে যুদ্ধবন্দিদের মানবাধিকার*

ড. 'আব্দুস্ সালাম মুহাম্মদ শরীফ*

## ভূমিকা

ইসলাম মানবিক শিষ্টাচার ও উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে এমন সব মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যারা মানবিকতার মৌলিক বিশ্লেষণের ধারক। এর সাথে সাথে ইসলাম আইন ও জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য সামাজিক ও চারিত্রিক উন্নত আদর্শ বাস্তবায়নের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। ইসলাম মানুষের জীবনের সুরক্ষা দেয়। এতদুদ্দেশ্যে ইসলাম মানবিক জীবন প্রবাহে সীমা লঙ্ঘনকারীর সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান সুনিশ্চিত করেছে এবং মানুষের জীবন, ধর্ম, ঈমান-সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এরূপভাবে ইসলাম কখনো স্বীয় ভাষ্য দ্বারা আবার কখনো মানবিক আইনের সংরক্ষণকারী এবং এর বাস্তবায়নে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা এমন আইন সংরক্ষণ করেছে যা সামাজিক আচরণকে সুসংহত করে। আর এ নীতিকে ইসলাম ধর্ম-বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছে।

আমরা এ নিবন্ধে আল-কুরআনের ভাষ্য, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের চারিত্রিক আচরণ থেকে উদ্ভাবিত এমন এক আদর্শ ও উন্নত পন্থা প্রদর্শনের চেষ্টা করব যেখানে এটিই দৃশ্যমান হয়ে উঠবে যে, ইসলামের মানবিক ও চারিত্রিক নীতি আন্তর্জাতিক মানবিক আইনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে। সত্যের সেবা ও ইসলামী আখলাকের উন্নত নমুনা, যার থেকে জন্মলাভ করেছে এ সমাজে মানুষের অধিকার পাওয়ার চেতনা। এ উন্নত আদর্শ প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে আমাদের জন্য করণীয় হলো এই যে, আমরা ঐতিহাসিক নযীরের উপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। তাহলে আমরা

---

* প্রবন্ধটি ১৯৯১ সালে মে-জুন সংখ্যায় রেড ক্রস আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

* ড. 'আব্দুস সালাম মুহাম্মদ শরীফ ১৯৪২ সালে লিবিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হলেন প্রফেসর, গবেষক, প্রাবন্ধিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি তিউনিসিয়ার *যাইতুন* বিশ্ববিদ্যালয় থেকে *তুলনামূলক ফিক্হ* বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিক্হ বিষয়ে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি লিবিয়ায় বেনগাযীতে অবস্থিত *কারী ইউনুস বিশ্ববিদ্যালয়ের* আইন অনুষদের শরী'আহ বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি আন্তর্জাতিক বহু সেমিনার ও কনফারেন্সে যোগদান করেন। এছাড়া রেড ক্রস লিবিয়া কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারগুলোতে তিনি অংশগ্রহণ করে আন্তর্জাতিক ইসলামিক মানবিক আইন বিষয়ে অনেক নিবন্ধ পাঠ করেন।

দেখতে পাব নযীরগুলো কীভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং মানুষকে মানুষ বানানোর জন্য কী ভূমিকা পালন করেছে। আমরা এ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী তা বুঝানোর জন্য এর বিষয়বস্তুকে নিম্নোক্ত শিরোনামে অধিভুক্ত করেছি:

১. ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
২. ইসলামী মানবিক আইন, মানবিক সম্মান ও শ্রদ্ধানীতি
৩. ইসলামী মানবিক আইনে যুদ্ধবন্দি
৪. ইসলামী মানবিক আইনে যুদ্ধবন্দির মানবিক অধিকার
৫. আন্তর্জাতিক মানবিক আইন
৬. আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে যুদ্ধবন্দি
৭. উপসংহার।

## ১. ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

আল-কুরআন একমাত্র আসমানী গ্রন্থ যা সাধারণভাবে সকল মানব সন্তানকে সম্বোধন করেছে। এ মহাগ্রন্থের অসংখ্য আয়াতে[১] আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে। নিম্নে এর বিস্তারিত বিবরণ বিধৃত হলো:

### ক. মানবিক সাম্যবাদী চেতনা

ইসলাম এ মর্মে ঘোষণা দিয়েছে যে, মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে সকল মানুষ সমান। তারা অধিকার ও দায়িত্বে সমান। মানুষ এ পৃথিবীর যে কোনো স্থানে বাস করুক না কেন তার বড় পরিচয় হলো সে একজন মানুষ। তার উৎস ও নির্গমনস্থল এক ও অভিন্ন। আল-কুরআন সকল মানুষকে সম্বোধন করে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দেয় এভাবে,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

---

[১] প্রবন্ধে উল্লিখিত আয়াত ছাড়াও বিষয় সংশ্লিষ্ট আরো অনেক আয়াত রয়েছে। এ বিষয়ে আল-কুরআনের সূরাহ্ আল-মুমতাহানার ৯ নং আয়াত দেখা যেতে পারে। আয়াতটি হলো নিম্নরূপ,

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

আয়াতটি ইসলামী সংবিধানে অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের আচরণবিধির একটি ধারা।

‘হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নাফ্স থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা কর। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।’[২]

মানুষকে এক সত্তা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ সূত্রে সব মানুষ-ই এক। আর মানুষের মধ্যে যোগ্যতা ও শক্তিমত্তার যে তারতম্য রয়েছে তা মহান আল্লাহ্‌র কুদরাতের নিদর্শন এবং জীবন প্রকৃতির একটি বৈশিষ্ট্য। তাই স্থান কাল পাত্রভেদে সকল অবস্থায় মানুষের সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত কল্যাণ পাওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকেরই পারস্পরিক সাহায্যের প্রয়োজন।

মানবিক জীবনের উদ্দেশ্য হলো, মানুষ একে অপর থেকে দূরে সরে না গিয়ে অথবা লড়াই বা হানাহানি না করে পারস্পরিক পরিচিতির মাধ্যমে একে অপরের নিকটবর্তী বা ঘনিষ্ট হওয়া। এজন্য আল-কুরআন বিশ্ব সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে ঘোষণা দিয়েছে,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. ﴾

‘হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।’[৩]

মানুষের মধ্যে ধর্ম-বিশ্বাস, ভাষা ও দলগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বহু শতাব্দী পূর্বে ইসলাম তাদের মাঝে সাম্যবাদের গোড়াপত্তন করে। আইন-দর্শনের চরম উৎকর্ষ সাধন এবং মানবিকতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক রাষ্ট্র ও বিশ্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্যবাদনীতি আজও স্বীকৃতি লাভ করেনি। ফলে আজও তাদের মধ্যে জাতি, ধর্ম ও বর্ণগত বৈষম্য বিরাজমান।

[২] সূরাহ্ আন্-নিসা: ১।

[৩] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ১৩।

## খ. শান্তি

মানবিক ঐক্য ও সাম্যবাদের ঘোষণা মানুষের মধ্যে সম্পর্কের বুনিয়াদ হিসেবে শান্তি ও নিরাপত্তাকে আবশ্যকীয় করে তোলে। সুতরাং সামাজিক জীবনের উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একে অপরের সাথে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করার উত্তম পথ হলো শান্তি যুদ্ধ নয়। শান্তির ধর্ম ইসলাম সবসময় মানুষকে শান্তি ও নিরাপত্তার দিকে আহ্বান করে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইসলামে তথা শান্তিতে পুরোপুরিভাবে প্রবেশ কর।"[৪] আর السَّلام (শান্তি) মহান আল্লাহ্‌র নামগুলোর একটি। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ. ﴾

"তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক।"[৫] এ আয়াত তখনই অবতীর্ণ হয় যখন সমাজে ছিল বহুবিধ ধর্ম বিশ্বাস। কেউ কেউ খোদাকে *যুদ্ধের খোদা* হিসেবে ডাকত। সে সময় একমাত্র ইসলাম السَّلام শব্দটিকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রচার করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো জাতি বা গোষ্ঠীকে দেখা যায় না যে, তারা তাদের ছেলে, শহর বা দরজার নামকরণ করেছে *সালাম*। কিন্তু ইসলাম এমন শান্তিময় জীবন ব্যবস্থা যে, তার ছেলে-সন্তানদের নাম রেখেছে '*আব্দুস সালাম*, শহরের নাম দিয়েছে *দারুস সালাম* এবং বিভিন্ন স্থান ও ফটকের নাম দিয়েছে باب السَّلام (শান্তির দরজা)। এটিই প্রমাণ করে যে, ইসলাম পৃথিবীতে শান্তি প্রসারের জন্য ছেলে সন্তানদের নাম থেকে শুরু করে দরজার নাম পর্যন্ত রেখেছে । السَّلام দুনিয়া ও আখিরাতে মুসলিমদের জন্য সাদর সম্ভাষণমূলক বাক্য হলো *আস্-সালাম* (السَّلام)। আর মুত্তাকীদের জন্য যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সে জান্নাতের নাম দেয়া হয়েছে, دَارُ السَّلام । যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾

---

[৪] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ২০৮।

[৫] সূরাহ্ আল-হাশর: ২৩।

"তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে শান্তির আবাস।"[৬] আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, ﴿تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ "তথায় তাদের অভিবাদন হবে '*সালাম*'।"[৭] অর্থাৎ সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে السَّلام বাক্য দিয়ে। ইসলামে শান্তি রক্ষায় জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে জিহাদের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। সশস্ত্র যুদ্ধের বিধান থাকা সত্ত্বেও সেখানে শান্তির সর্বশেষ উদ্দেশ্য হিসেবে সন্ধি ও শান্তি চুক্তির বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. ﴾

"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ্ সীমা লঙ্ঘনকারীদের ভালবাসেন না"[৮]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহিলী যুগে নিজ চাচাদের সাথে মিত্রসংঘে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি সে সম্পর্কে বলেন, ولو دعيت به فى الإسلام لأجبت "যদি ইসলামেও এর দাওয়াত দেয়া হতো তাহলে আমি তা গ্রহণ করতাম।"[৯] এ সংঘটির নাম ছিল '*হিলফুল ফুযূল*'। এর উদ্দেশ্য ছিল, আরবীয় গোত্রগুলোর মধ্যে বিরাজমান যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটানো এবং সন্ধিচুক্তির জন্য এমন নীতি প্রবর্তন করা যা চুক্তিভুক্ত প্রত্যেক দলই অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিত ব্যক্তির সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অধিকার আদায়ে কাজ করবে। আমাদের যুগে এমন কেউ আছে কী, যে দল-গোষ্ঠীর মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বানে সাড়া দেবে?

### গ. ন্যায়বাদিতা এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া

ইসলাম সর্বপ্রকার জুলুম নির্যাতন হারাম করেছে এবং শত্রু-মিত্র সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে ইনসাফ কায়েম করতে নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ﴾

---

[৬] সূরাহ্ আল-আন'আম: ১২৭।

[৭] সূরাহ্ ইবরাহীম: ২৩।

[৮] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯০।

[৯] আবুল হাসান আলী আন্-নদভী, *আস্-সিরাতুন্-নাবাবিয়্যাহ্* (কায়রো: মানশূরাতুল মাকতাবাতিল 'আসরিয়্যাহ্, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ১২৭।

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে সদা দণ্ডায়মান হও। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ কর, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং মহান আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, মহান আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।'[১০] অর্থাৎ কোনো গোষ্ঠীর শত্রুতা যেন তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে বাধা না দেয়। সুতরাং ইসলাম আমাদেরকে শত্রুদের সম্মান করতে আদেশ দিয়েছে এবং ধোকাবাজী, প্রহসন ও সীমালঙ্ঘন করাকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে।

### ঘ. চুক্তির প্রতি সম্মান ও তা পূরণ করা ওয়াজিব

ইসলামে চুক্তির প্রতি সম্মান দেখানো হয়েছে এবং চুক্তি অনুসরণ করাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। চুক্তি করার পর তা ভঙ্গ করাকে হারাম বলা হয়েছে। যদি মুসলিমরা তাদের শত্রুবাহিনীর সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তাহলে উক্ত চুক্তি মেনে চলা মুসলিমদের উপর আবশ্যকীয় হয়ে পড়বে। এ চুক্তির কারণে তাদের কোনো সমস্যা হোক বা না হোক সে দিকে কর্ণপাত করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. ﴾

'আর তোমরা যখন অঙ্গীকার কর তখন আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর। তোমরা পাকাপোক্ত অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করো না এবং প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজেদের জন্য আল্লাহকে জিম্মাদার বানিয়েছ। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন, যা তোমরা কর। আর তোমরা সে নারীর মত হয়ো না, যে তার পাকানো সূতো শক্ত করে পাকানোর পর টুকরা টুকরা করে ফেলে। তোমরা তোমাদের অঙ্গীকারকে নিজেদের মধ্যে প্রতারণা হিসেবে গ্রহণ করছ (এই উদ্দেশ্যে) যে, একদল অপর দলের চেয়ে বড় হবে।' এ দ্বারা আল্লাহ শুধু তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ কিয়ামতের দিন অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন যে বিষয়ে তোমরা কলহ করতে।'[১১]

---

[১০] সূরাহ্ আল-মায়িদা: ৮।

[১১] সূরাহ্ আন্-নাহাল: ৯১-৯২।

আল-কুরআনের এ বিধান প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি পুরণ করাকে আবশ্যক করে। সাথে সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং চুক্তি পরিপন্থী কাজ করাকে নিষিদ্ধ করে। যে সমস্ত লোক চুক্তি করার পর তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না এবং উক্ত চুক্তি বাস্তাবায়নকে আবশ্যক মনে করে না আল-কুরআন তাদেরকে আহম্মকদের সাথে তুলনা করেছে। আল-কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করা এবং তা বাস্তবায়ন আবশ্যক মনে না করা অথবা প্রতারণার আশ্রয় নেয়া গর্হিত অপরাধ। একমাত্র আহম্মক ব্যক্তি ছাড়া কেউই এ ধরনের কাজ করতে পারে না। প্রতিশ্রুতি বা চুক্তির প্রতি সম্মান দেখানো শুধু চিরন্তন মানবিক নীতি-ই নয়; বরং এটি মুসলিমদের জীবনে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি বাস্তবসম্মত আচরণ। চুক্তির প্রতি সম্মান দেখানো এবং তা পূরণ করার প্রতি অব্যাহত প্রচেষ্টার উৎকৃষ্ট উপমা ও প্রমাণ হলো, আবূ বাশীর[১২] (রা) ও আবূ জানদাল[১৩] (রা)-এর ঘটনা। আবূ বাশীর হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মক্কা থেকে চলে গেলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,

يا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصلح في ديننا الغدر، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المسلمين فرجًا ومخرجًا.

"হে আবূ বাশীর! আমরা ঐ সম্প্রদায়ের সাথে চুক্তি ও সন্ধিতে আবদ্ধ যা তুমি জান। আমাদের এ ধর্মে ধোকা বা প্রহসনের কোনো অবকাশ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমার ও তোমার সাথে মুসলিমদের জন্য একটি পথ বের করে দেবেন।"[১৪] অনুরূপভাবে আবূ জানদাল হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মক্কাবাসীদের অত্যাচারের ভয়ে পলায়ন করে আসলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন, أنا لا يحل لنا في ديننا الغدر "আমাদের ধর্মে আমাদের জন্য বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা বৈধ নয়।"[১৫]

মুসলিমরা সন্তুষ্টচিত্তে যে অঙ্গীকার বা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে তা পূর্ণ করা তাদের জন্য অত্যাবশ্যক কিন্তু কাউকে জোর-জবরদস্তি করে কোনো চুক্তিতে সম্মত করালে তা চুক্তি হিসেবে গণ্য হবে না। চুক্তির পরিবৃত্ত থেকে এ ধরনের চুক্তি অবশ্যই বহির্গত চুক্তি হিসেবে স্বীকৃত হবে, তা পূরণ করা আবশ্যক নয়।

---

[১২] আবূ বাশীর: ওত্বাহ্ ইব্ন উসায়িদ।

[১৩] আবূ জানদাল ইব্ন সুহায়ল ইব্ন 'আমর।

[১৪] বায়হাকী, আস্-সুনানুল-কুবরা, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২২৭।

[১৫] *মুসান্নাফু ইব্ন আবী শায়বাহ্*।

## ২. ইসলামী মানবিক আইন ও মানুষের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শননীতি

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রণাঙ্গনে মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন এবং মৃতদেহ বিকৃতি করা নিষিদ্ধ করেছেন। সাফওয়ান ইব্ন আস্সাল বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ক্ষুদ্র এক বাহিনীর সাথে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন,

سِيرُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا.

'তোমরা আল্লাহ্র নামে আল্লাহ্র রাস্তায় অগ্রসর হও, যারা আল্লাহকে অস্বীকার* করে তাদের সঙ্গে লড়াই কর। তোমরা লাশ বিকৃতি করবে না এবং শিশুদের হত্যা করবে না।'

যারা যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল তাদের সাথে লড়াই করার নির্দেশ দিয়েছেন। চাই তারা পুরুষ হোক অথবা মহিলা হোক। কোনো এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রণাঙ্গনে একটি মহিলার লাশ পড়ে থাকতে দেখলে তিনি বললেন, এ মহিলাতো আর যুদ্ধ করেনি, তাকে কেন হত্যা করা হলো? এরপর তিনি মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করলেন।[১৬]

যদি মহিলা এবং শিশুরা তাদের সম্প্রদায়ের সাথে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আর তাদের এ অংশগ্রহণ কর্ম অথবা অভিমত দ্বারা হয় তাহলে এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে হত্যা করার যথোচিত কারণ বিদ্যমান থাকায় তাদেরকে হত্যা করা অথবা বন্দি করা বৈধ। কেননা সংঘর্ষ দু'পক্ষের মধ্যেই সংঘটিত হয়ে থাকে। একপক্ষ থেকে কখনো সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় না।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্রম বা উপাসনালয়ে আশ্রিত লোকদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। যেমন ইব্ন 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ

'তোমরা শিশুদের এবং উপাসনালয়ে অবস্থানরত লোকদেরকে হত্যা করবে না।' সুতরাং মহিলা, শিশু ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব যেমন পুরোহিত, আলিম এবং বেসামরিক লোক যারা সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি তাদেরকে হত্যা করা যাবে

[১৬] আশ্-শাওকানী, *নায়লুল আওতার*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৭১।

* এখানে আল্লাহকে অস্বীকার করার অর্থ হলো, কুফরীর ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করা এবং মুসলমানদের উপর আক্রমণ করা।

না এবং তাদেরকে বন্দি করাও যাবে না।[১৭] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিরোধানের পর আবূ বাকর (রা) মুসলিম খলীফার দায়িত্ব পেলেন। এ সময় উসামা ইব্‌ন যায়দের নেতৃত্বে এক সেনাদল সিরিয়া অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আবূ বাকর (রা) তাদের উদ্দেশ্যে এমন এক অভিনব সমরনীতি বর্ণনা করলেন, যা স্থান কাল পাত্রভেদে উচ্চ মানবিকতার দাবি রাখে। এ নীতিমালায় ছিল দুর্বলদের প্রতিরক্ষায় এক বিশেষ বুনিয়াদী আইন যা মানুষের জীবন ও ধনসম্পদের নিরাপত্তা বিধান সুনিশ্চিত করে। এতে ভিন্ন ধর্মমতালম্বীদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে এমন কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রণাঙ্গনে ধর্মীয় যাজক-পুরোহিত বৃদ্ধ, মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়। লাশের আকৃতি, বিকৃতি করতে নিষেধ করা হয়, এমনকি যদি তা একটি পাগল কুকুরেরও হয়। সরকার প্রধান হিসেবে আবূ বাকরের (রা) এ বক্তৃতা প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক সিপাই বা সৈন্য হবে ইসলামী মহানুভবতার এক মূর্তপ্রতীক। তিনি সেনাপতি উসামাকে সম্বোধন করে বললেন,

لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم

‘তোমরা খিয়ানত করবে না, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, লাশ বিকৃতি করবে না, শিশু, বয়ো-বৃদ্ধ লোক ও মহিলাকে হত্যা করবে না, খেজুর গাছ কাটবে না, জ্বালাও পোড়াও করবে না, ফলদার বৃক্ষ কাটবে না, খাওয়ার প্রয়োজন ব্যতীত উট, গরু, বকরী জবাই করবে না এবং যে সমস্ত লোক আশ্রমে উপাসনারত তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেবে (হত্যা করবে না)।’[১৮]

ইসলামী যুদ্ধআইন যুদ্ধের ময়দানে নিহত ব্যক্তির লাশ বিকৃতি, ক্ষেত-খামার পোড়ানো, ফলদার বৃক্ষ কর্তনে (যা খাদ্যের মূল উৎস) নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ পরিস্থিতিতে মদীনার বনূ নাযীর গোত্রের *আজোয়া* ছাড়া অন্যান্য খেজুর বৃক্ষ কর্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর অন্যতম কারণ হলো এই যে, একমাত্র খেজুর ছিল বনী নযীরের শক্তি-নির্ভর। তাই এ বৃক্ষ কর্তন তাদের জন্য মহাক্ষতিকর বস্তুতে পরিণত হতে পারে। তারা বলত, তোমরা দাবি কর যে, তোমরা বিপর্যয় পছন্দ কর না। আর তোমাদের এরূপ কর্মকাণ্ড ই হলো ফাসাদ বা বিপর্যয়। বিজয়ীদের

---

[১৭] *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ২৫৯২; আত্-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হাদীস নং ১১৩৯৬।

[১৮] ইবনুল আছীর, *আল-কামিল ফিত্-তারীখ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬২।

জন্য খেজুর গাছ ছেড়ে দাও। বনূ নাযীরের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এরূপ আচরণের বৈধতাদানে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন,

﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ. ﴾

'তোমরা যে সব নতুন খেজুর গাছ কেটে ফেলছ অথবা সেগুলোকে তাদের মূলের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছ, তা তো ছিল আল্লাহর অনুমতিক্রমে'[১৯]

উপর্যুক্ত আয়াত উক্ত বৃক্ষগুলো কর্তন যে বৈধ ছিল তার প্রমাণ বহন করে। এছাড়া এও প্রমাণ করে যে, উক্ত বৃক্ষগুলো কর্তন না করলেও কোনো অসুবিধা ছিল না। বিশেষ প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যে এ বৃক্ষগুলো কর্তন করা হয়েছিল। তবে যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ে ইসলামের সাধারণ নিয়ম হলো, জ্বালাও পোড়াও এবং সম্পদ ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকা। আবূ বাকর (রা) ও 'উমার (রা) সেনাপতিদেরকে এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজ করতে নিষেধ করেছেন।[২০] ইসলাম শুধু যুদ্ধ ক্ষেত্রে উন্নত আচরণবিধি প্রবর্তন করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং চতুর্দিক থেকে তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আবূ বাকর (রা) এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে বিজয়ের সুসংবাদ বহনকারী সেনাপতি 'উতবা ইব্‌ন 'আমের আল-জুহানীর মধ্যে কৃত সংলাপ আমাদের সামনে ন্যায়ের অনুসরণ, সীমালঙ্ঘন, বিশ্বাসঘাতকতা এবং নির্যাতন বন্ধে ইসলামে গৃহীত পদক্ষেপের একটি মূর্তছবি অংকন করেছে। উক্ত সংলাপের কিয়দংশ হলো নিম্নরূপ, 'রণাঙ্গন থেকে ফিরে এসে সেনাপতি 'উতবা আল-জুহানী খলীফা আবূ বাকরের (রা) দরবারে সমুপস্থিত। আবূ বাকর (রা) তাঁকে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। সেনাপতি ভিতরে প্রবেশ করে খলীফাকে সালাম দিলেন এবং যুদ্ধ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলেন। এক পর্যায়ে সেনাপতি আবেগ-আপ্লুত হয়ে বলে ফেললেন, উত্তপ্ত রণাঙ্গনে আমি শত্রুবাহিনীর সেনাপতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং তাকে হত্যা করলাম। আমি আপনার দরবারে তার খণ্ডিত মস্তক নিয়ে এসেছি। একথা শোনার পর খলীফার চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করল এবং তিনি ভীষণ রাগান্বিত হয়ে পড়লেন। এরপর তিনি চীৎকার করে বলতে লাগলেন,

إنها مثلة وقد نهيتكم من المثلة

"এটিতো লাশ বিকৃতি। আমি তোমাদেরকে লাশ বিকৃতি করতে নিষেধ করেছিলাম।" সেনাপতি 'উতবা উত্তর দিলেন তারা আমাদের নিহত ব্যক্তিদের

---

[১৯] সূরাহ্ আল-হাশর: ৫।

[২০] ইব্‌ন রুশ্‌দ, *আল-বায়ান ওয়াত্-তাহসীল*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৭-৫৪৮।

সাথে এরূপ আচরণ করেছে। তারা আমাদের লোকদেরকে হত্যা করার পর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের বাদশাহ্‌র দরবারে নিয়ে গিয়েছে। এরপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন,

﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾

'সুতরাং যে তোমাদের উপর আক্রমণ করেছে, তোমরা তার উপর আক্রমণ কর, যেরূপ সে তোমাদের উপর আক্রমণ করেছে।'[২১] আবূ বাকর (রা) বললেন, তোমাদের অন্তর থেকে আল্লাহ্‌র ভয় কোথায় গিয়েছে? কোনো মুসিলম বর্বর পাষ শত্রুর মত কাজ করুক আমি তা চাই না। আমার পক্ষ থেকে সেনাপতিদেরকে রাষ্ট্রীয় ফরমান পাঠিয়ে দাও, কেউ যেন আমার কাছে খণ্ডিত মস্তক আর না নিয়ে আসে। আমার এ নির্দেশনা পৌঁছার পর কেউ যদি এরূপ কাজ করে সে বিদ্রোহী হিসেবে পরিগণিত হবে। জেনে রাখ! আমার জন্য চিঠি বা খবরই যথেষ্ট।'

আমরা শত্রুদের সাথে এমন আচরণ করব যা তারা আমাদের সাথে করেছে। এটি ন্যায়বাদিতার পরিপন্থী নয়। শত্রুদের সাথে আচরণের মূল উদ্দেশ্য হলো, অন্যায়ের মূলোৎপাটন করা। আর মহান আল্লাহ্‌র বাণী,

﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾

'সুতরাং যে তোমাদের উপর আক্রমণ করেছে, তোমরা তার উপর আক্রমণ কর, যেরূপ সে তোমাদের উপর আক্রমণ করেছে।'[২২] এ আয়াত এবং আবূ বাকর (রা)-এর ব্যাখ্যা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, এটি খোদাভীতির সাথে শর্তযুক্ত। সুতরাং ইসলামে সুবিচার হবে মানবিক ও করুণাময়ী যা মর্মস্পর্শী অনুভূতি ও অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। আর এ সুবিচারের নিরিখে কেবল হত্যাকারীকে হত্যা এবং অপরাধীকে কৃত অপরাধের যথাযথ শাস্তি সুনিশ্চিত করা হবে। অন্যদেরকে নয়। সুবিচার কখনো মৃত ব্যক্তির চেহারা বিকৃতির স্বীকৃতি দেয় না এবং লোমহর্ষক ও বর্বর কাজে সংশ্লিষ্ট হতে দেয় না। যদিও শত্রুপক্ষ এরূপ কাজে প্রবৃত্ত হয়।

---

[২১] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯৪।

[২২] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯৪।

# ৩. ইসলামী মানবিক আইনের দৃষ্টিতে যুদ্ধবন্দি

যুদ্ধ-বন্দিদের মানবিক অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে ইসলামে বন্দির স্বরূপ এবং বন্দি করার বৈধতা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

### বন্দির সংজ্ঞা

যুদ্ধে আটককৃত পুরুষ মহিলাকে أسير বা বন্দি বলা হয়। যেমন বলা হয়, رجل أسير وامرأة أسيرة। কেননা فعيل ওযনটি যদিও إسم فاعل কিন্তু এখানে তা مفعول অর্থে ব্যবহৃত হবে। তাই এক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলা সমান হবে। সুতরাং موصوف উল্লেখ না করার সময় শুধু تذكير ও تأنيث-এর আলামত যথেষ্ট হবে। যেমন বলা হয় قتلت أسيرة। অনুরূপভাবে বলা হয় رأيت القتيلة অর্থাৎ আমি নিহত মহিলাকে দেখেছি। أسير শব্দের বহুবচন হলো أسرى বা أسارى।[২৩]

الأسير-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে,

الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء

"মুসলিম যোদ্ধারা কাফির বাহিনীর যুদ্ধরত যে সমস্ত পুরুষ সৈন্যদেরকে যুদ্ধের ময়দান থেকে জীবিত অবস্থায় পাকড়াও করতে সফল হয়েছে তাদেরকে الأسير বা বন্দি বলা হয়।"

এ সংজ্ঞায় যুদ্ধরত মহিলা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ফলে বাস্তবতার দিক দিয়ে أسير-এর প্রথম সংজ্ঞাটি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। ফকীহ্গণ বন্দির সংজ্ঞায় পুরুষ ও মহিলা বন্দির মাঝে পার্থক্য দেখিয়েছেন। তারা পুরুষ বন্দিদেরকে أسرى এবং মহিলা বন্দিদেরকে سبى বলেছেন।[২৪] আমার মতে "ফকীহ্গণ প্রদত্ত পুরুষ ও মহিলা বন্দিদের মাঝে পার্থক্যটি কোনো শক্ত বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কেননা سبى এবং أسر শব্দ দু'টি কেবল বন্দিদের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে।[২৫]

আল-কুরআনের সরাসরি ভাষ্য থেকে বন্দি করার বিষয়টি প্রমাণিত। যেমন মহান আল্লাহ্র বাণী ﴿ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ ﴾ "তোমরা তাদেরকে পাকড়াও কর ও বন্দি কর।"[২৬] মহান আল্লাহ্র বাণী," ﴿فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ﴾ তোমরা তাদেরকে শক্তভাবে বন্দি কর।"[২৭] এ আয়াতগুলোতে বন্দি করার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

---

[২৩] সা'দ আবূ জীব, *আল-কামূসুল ফিক্হী* (বৈরূত: দারুল ফিক্র, তা. বি.), পৃ. ৩০।

[২৪] মুহাম্মাদ রাওয়াশ কা'লাজী, *মাওসূআতু ফিক্হ 'আব্দিল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস* (মক্কা: উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, তা. বি.), পৃ. ১৭৪।

[২৫] আল-জাওহারী, *আস্-সিহাহ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (বৈরূত: দারুল 'ইলম লিল-মালাইঈন, তা. বি.), পৃ. ২৩৭১।

[২৬] সূরাহ্ আত্-তাওবা: ৫।

[২৭] সূরাহ্ মুহাম্মাদ: ৪।

কেননা বন্দিদেরকে শক্ত করে বেধে নিয়ে আসা হয় যাতে তারা পালিয়ে যেতে না পারে।

বন্দি রণাঙ্গনের এক সাময়িক অবস্থার নাম। এর দ্বারা এমন কিছু লোকদেরকে বুঝানো হয়ে থাকে, যারা যুদ্ধকালীন প্রতিপক্ষের হাতে ধৃত হয়। ইসলাম বন্দিদেরকে মুক্ত করে দেয়ার ব্যাপারে জোর দিয়েছে এবং এ হুকুমও দিয়েছে যে, বন্দিরা মুক্তিপণের বিনিময়ে নিজেদেরকে মুক্ত করে নিতে পারে অথবা নিরক্ষরতা দূরীকরণের মাধ্যমে তারা নিজেদের বিদ্যা ছড়িয়ে দিয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। এটিই হবে তাদের জন্য মুক্তিপণ। আর ইসলামের পক্ষ থেকে এটি হবে তাদের মান-মর্যাদার দলীল বা প্রমাণ।[২৮]

## ৪. ইসলামী মানবিক আইনে বন্দিদের মানবাধিকার

### ক. শর্তহীন সমতা

ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের সংঘটিত ন্যায়ানুগ যুদ্ধসমূহের অত্যাবশ্যকীয় ফলাফল হিসেবে যুদ্ধবন্দির প্রচলন ঘটে। যখন বদর যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় হলো এবং অনেক যুদ্ধবন্দিকে মদীনায় নিয়ে আসা হলো তখন 'উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি এ সমস্ত বন্দির ব্যাপারে কী ফায়সালা দেবেন? এদের মধ্যে তো আপনার নিকটাত্মীয় তথা চাচাদের ছেলেরা এমনকি শ্বশুর সম্পর্কের আপনার জামাইও রয়েছেন? রাসূলুল্লাহ্‌র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

يعامل كل أسرى معاملة واحدة

"সকল যুদ্ধবন্দির সাথে একই আচরণ করা হবে।" অতঃপর তিনি বিষয়টি পরামর্শের জন্য ছেড়ে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে 'উমার! এ বিষয়ে তোমার পরামর্শ কী? 'উমার (রা) তাদেরকে হত্যা করার পরামর্শ দিলেন। আবূ বাক্‌র (রা) মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দিতে বললেন। অধিকাংশ সাহাবী আবূ বাক্‌রের (রা) মতকে সমর্থন করলেন।[২৯]

রাসূলুল্লাহ্‌র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবূয়্যাতের আবেদন ছিল ইসলাম ও মুসলিমদের বিজয় সুনিশ্চিত করার পূর্বে কাউকে বন্দি না বানানো। আর

---

২৮ মাহমুদ আল-বাজী, মাসালু 'উলইয়া মিন খালকিল ইসলাম, পৃ. ৭৭।

২৯ মুস্তাফা আর-রাফি'ঈ, আল-ইসলাম নিযামুল ইনসানিঈন (বৈরূত: মানশূরাতু দার মাকতাবাতিল হায়াত, তা. বি.), পৃ. ১৯২-১৯৩।

মুক্তিপণ গ্রহণ ছিল এর পরিপন্থী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ﴾

'কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয় যে, তার নিকট যুদ্ধবন্দি থাকবে (এবং পণের বিনিময়ে তিনি তাদেরকে মুক্ত করবেন) যতক্ষণ না তিনি যমীনে (তাদের) রক্ত প্রবাহিত করেন। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা করছ, অথচ আল্লাহ চাচ্ছেন আখিরাত। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।'

উপর্যুক্ত আয়াতটির অর্থ এরূপ নয় যে, বন্দিদেরকে আবশ্যিকভাবে হত্যা করা। কেননা ইসলাম বন্দিদেরকে হত্যা করার অনুমতি দেয় না। আর বদর যুদ্ধের বন্দিদের সাথে কার্যতঃ যা করা হয়েছিল তা ছিল তাদেরকে হত্যা না করে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া। আয়াতে যে সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে এর কারণ ছিল, সে সময় হত্যা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ বা উপায় ছিল না যেমনটি প্রচলিত ছিল পারস্য, রোমান ও ইয়াহুদীদের কাছে।[৩০]

শর'ঈ বিধি-বিধান অবতীর্ণের ধারাবাহিকতার এক পর্যায়ে আল-কুরআন যুদ্ধ বন্দিদের ব্যাপারে নির্দেশ দেয়,

﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. ﴾

"তারপর হয় অনুগ্রহ না হয় মুক্তিপণ আদায়, যতক্ষণ না যুদ্ধ তার বোঝা রেখে দেয়।"[৩১]

এ আয়াতের ভিত্তিতে ইসলামে যুদ্ধ বন্দিকে হত্যা করা নিষেধ করা হয়েছে। যুদ্ধবন্দির বাপারে দু'টি বিষয়ে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে, হয় তাদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে অথবা মুক্তিপণ ব্যতীত ছেড়ে দেয়া। এটি 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা), হাসান আল-বাস্‌রী (রহ.) ও 'আতা (রহ.) -এর অভিমত।[৩২]

ইহ্‌সান বা অনুগ্রহকে المن বলা হয়। অর্থাৎ দয়া বা অনুগ্রহ করে যুদ্ধবন্দিদেরকে ছেড়ে দেয়া। এটিকে উন্নত ও কল্যাণকর মানবিক কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীদের উপর দয়াপরবশ হয়ে বলেছিলেন, إذهبوا فأنتم الطلقاء "তোমরা

৩০ ড. ওয়াহ্‌বাহ্ আয্-যুহায়লী, *আসারুল হারব ফিল ফিক্‌হিল ইসলামী*, পৃ. ৪০৬।

৩১ সূরাহ্ মুহাম্মাদ: ৪।

৩২ ইব্‌ন রুশ্‌দ, আল-বায়ান ওয়াত্-তাহসীল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৮; আল-মুকাদ্দামাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬২।

চলে যাও। আজ হতে তোমরা মুক্ত।” অনুরূপভাবে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাওয়াযিন গোত্রের ছয় হাজার বন্দিকে যুদ্ধ-জরিমানা ব্যতীত মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

الفداء অথবা المفادة -এর অর্থ হলো, বন্দি বিনিময় অথবা কোনো কিছুর বিনিময়। দাউদী স্বীয় ‘*আল-আমওয়াল*’ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, ইমাম মালিকের অধিকাংশ শিষ্য সম্পদের বিনিময়ে যুদ্ধ-বন্দির মুক্তিপণ অপছন্দ করেন। তাঁরা বলেন, এটি বদর যুদ্ধের বন্দিদের ব্যাপারে নির্দিষ্ট ছিল। তবে তাঁরা মুসলিম বন্দিদের বিনিময়ে প্রতিপক্ষের বন্দিদেরকে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন।[৩৩] সাহেবা‘ইনের (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ) মতে, বিশেষ জরুরী অবস্থায় বন্দিদের বিনিময় অথবা সম্পদের বিনিময় বৈধ। এ বিষয়ে তারা বদর যুদ্ধের বন্দিদের ঘটনা দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করে থাকেন। অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম *সহীহ* গ্রন্থে *রিওয়ায়াত* করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুশরিককে মুক্তি দেয়ার বিনিময়ে দু’জন মুসলিমকে মুক্ত করিয়ে নিয়েছিলেন।[৩৪] এরূপভাবে একজন মহিলাকে আযাদ করার বিনিময়ে মক্কায় আটককৃত মুসলিম বন্দিদেরকে মুক্ত করিয়ে নেয়া হয়। বদর যুদ্ধ এবং এর পরবর্তী সময়ে বন্দিদের বিনিময় মূল্য ছিল চার হাজার দিরহাম, অন্যথায় তাকে মুক্তিপণ হিসেবে শিশুদেরকে লেখা-পড়া শিক্ষা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হতো। হানাফীদের মতে অনুগ্রহ পূর্বক শর্তহীন অথবা শর্তযুক্তভাবে বন্দিদেরকে ছেড়ে দেয়া বৈধ।[৩৫]

## খ. সদাচরণ

ইসলাম বন্দিদের সাথে আটককালীন সুন্দর আচরণ, তাদের প্রতি দয়াদ্র হতে এবং অন্ন, বাসস্থান ও পরিধেয় পোষাক-পরিচ্ছদসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে নির্দেশ দেয়ার মাধ্যমে মানবিকতা ও স্নেহ বাৎসল্যতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে।[৩৬] বন্দির সময় বা মেয়াদ খুবই সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। এজন্য বন্দি ইসলামী সমাজে একজন অতিথি হিসেবে আবির্ভূত হয়ে থাকে। এখানে তার অবস্থা হয় ইয়াতিম মিসকীনদের মত। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾

---

৩৩ ইব্‌ন রুশ্‌দ, *আল-মুকাদ্দামাত*, ১ম খণ্ড (দারুল গারব আল-ইসলামী. তা. বি.), পৃ. ৩৬৮।

৩৪ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (র) রিওয়ায়াত করেছেন এবং এটিকে হাসান ও সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। দ্র. যায়লা‘ঈ, নাসবুর রায়াহ্ লি আহাদীসিল হিদায়াহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৪।

৩৫ যায়লা‘ঈ, নাসবুর রায়াহ্ লি আহাদীসিল হিদায়াহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৩।

৩৬ আশ্-শাওকানী, নায়লুল আওতার, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৪৭।

'খাদ্যের প্রতি আসক্ত থাকা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর ভালবাসায় মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে। তারা বলে, আমরাতো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের খাদ্য দান করি। আমরা তোমাদের থেকে কোনো প্রতিদান চাই না এবং কোনো কৃতজ্ঞতাও নয়।'

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্দিদের মুক্ত করে দেয়ার সময় সাহাবীদেরকে বলতেন, استوصوا بالاسارى خيراً "তোমরা বন্দিদের প্রতি ভাল আচরণ করার ব্যাপারে আমার অসিয়ত গ্রহণ কর।"[৩৭]

সুতরাং আল-কুরআন ও সুন্নাহ্ বন্দির ব্যাপারে এই নির্দেশ দেয় যে, বন্দির সাথে সুন্দর আচরণ করতে হবে। তাদেরকে যেন কোনো প্রকার কষ্ট দেয়া না হয়। কেননা মানুষ হিসেবে বন্দিদের তো অধিকার আছে। এটি হলো বন্দিদের বিষয়ে ইসলামের সুমহান উদার নীতি যা যুদ্ধ ও সন্ধি উভয় অবস্থায় মানবিক মর্যাদা ও সম্মানকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে।

ইসলামে মানবিক আচরণ সব সময় কথা ও কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। তাই বন্দিদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দেয়ার ব্যাপারে আল-কুরআন ও হাদীসের যে নির্দেশনামা রয়েছে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়ে থাকে। এ কথার সাক্ষী হলো আবূ 'আযীয ইব্ন 'উমায়র ইব্ন হাশিম। তার বক্তব্য হলো, আমি আনসারীদের এক দলের সাথে ছিলাম। যখন আমাকে বদর যুদ্ধে আটক করা হলো তখন তারা সকালে, দুপুরে ও রাত্রের খাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিদায়াত ও নির্দেশ মোতাবেক আমাদেরকে রুটির ব্যবস্থা করে দিত, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর *ওয়াসিয়াত* অনুযায়ী তারা আমাদেরকে খেজুরও দিত।[৩৮] এভাবে একজন যুদ্ধবন্দি মুসলিমদের সম্মান মর্যাদা ও তাদের প্রতি সদাচরণের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। সুতরাং বন্দিদের মান-সম্মান, তাদের খোরপোষ, পোষাক, পরিচ্ছদসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় নিশ্চিতকরণে ইসলাম সবসময় অগ্রগামী।

## গ. বন্দি-মুক্তি

ইসলাম বন্দিদেরকে মুক্তিদান এবং অবরুদ্ধ জীবন থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার নির্দেশ দেয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ

৩৭ সুনানু ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং-৪১০

৩৮ আবুল হাসান 'আলী আন্-নাদভী, *আস্-সীরাতুন্-নাবাবিয়্যাহ্*, পৃ. ২৫৪।

"ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে অন্নদান কর, অসুস্থ ব্যক্তির সেবা কর এবং বন্দিকে ছেড়ে দাও।"[৩৯]

হাদীসে উল্লিখিত الْعَانِيَ শব্দের অর্থ হলো বন্দি। তার সামাজিক অধিকার হলো তাকে বন্দিশালা থেকে মুক্ত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা। তাকে মুক্তিপণের পথ অথবা প্রতিপক্ষের কাছে আটককৃত বন্দির মুক্তির বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া। এক্ষেত্রে তাকে আটককারী রাষ্ট্র থেকে অর্থের বিনিময়ে ছেড়ে নেয়ার ব্যবস্থা করবে বন্দির রাষ্ট্রপক্ষ। আর তাকে ছেড়ে নিতে যে অর্থ ব্যয় হবে সে অর্থ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সংগৃহীত হবে। যদি কোনো কারণে যুদ্ধ বন্দিকে প্রতিপক্ষ রাষ্ট্র থেকে ছেড়ে আনতে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অর্থের সংকুলান সম্ভব না হয় তাহলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন সে পরিমাণ অর্থ সমাজের সকল জনগণের উপর মাথাপিছু হারে ধার্য করা হবে। ইচ্ছাকৃত অথবা ভুলবশতঃ হত্যার পণ আদায়ের উপর কিয়াস করে বন্দিকে তাদের একজন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যদি রাষ্ট্র বন্দিদেরকে মুক্ত করে আনতে অপারগ হয় এবং সাধারণ জনগণও তাদের উপর এতদসংক্রান্ত ধার্যকৃত অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে বন্দিদের মধ্যে যারা প্রাচুর্যের অধিকারী তারা প্রত্যেকেই স্বচ্ছ সম্পদ থেকে নিজেকে মুক্ত করিয়ে আনার ব্যাপারে খরচ করবে। কেননা তাদের জন্য এটি বৈধ হবে না যে, তারা নিজের অর্থ বাঁচানোর জন্য শত্রুদের বন্দিশালায় অবরুদ্ধ জীবনের উপর সন্তুষ্ট থাকবে।[৪০] এমর্মে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাহলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা যয়নব (রা) ও মক্কাবাসীর অন্যান্যদের মত নিজ স্বামী বদর যুদ্ধে মুসলিমদের হাতে বন্দি হলে তাঁকে ছাড়ানোর জন্য জোর প্রচেষ্টা চালান। তিনি (যয়নব) মুক্তিপণ হিসেবে তাঁর সম্পদ ও অলংকার দিয়ে স্বামীকে ছাড়িয়ে নিলেন। অথচ নিজ স্বামীর জন্য ক্ষমার কোনো দরখাস্ত দেননি। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বন্দিদের মধ্যে সাম্যনীতি কার্যকর কল্পে মুক্তিপণ ব্যতিরেকে তাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য সামান্যতম চেষ্টাও করলেন না।[৪১] যখন মক্কাবাসীরা বন্দিদেরকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিপণ পাঠিয়ে দিল তখন যয়নবও বন্দী স্বামীর মুক্তিপণ হিসেবে একটি হার পাঠিয়েছিলেন যা তাঁর মা খাদীজা (রা) তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হার দেখলেন, তখন প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজার স্মৃতিগুলো তাঁর মনের গহিন

[৩৯] *আল জামি'উস-সহীহ*, হাদীস নং ৪৯৫৪, ৫২১৭; *সুনানু আবী দাউদ*, হাদীস নং ২৬৯৯; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ১৮৬৯৬।

[৪০] ইব্‌ন হায্‌ম, আল-মুহাল্লা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৭।

[৪১] *মাহমূদ আল-বাযী, মাসালু 'উলইয়া মিন খালকিল ইসলাম, পৃ. ৭২।*

আঙ্গিনায় ভেসে উঠল। দূরে অবস্থানরতা স্বীয় কন্যার ভালোবাসা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্তরকে বিগলিত করতে লাগল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃদু সুরে সাহাবীদেরকে বললেন,

إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا فَفْعَلُوْا

'তোমরা যদি মনে কর তাহলে তার (যয়নবের) স্বামীকে ছেড়ে দিতে পার এবং এ হার তাকে ফিরিয়ে দিতে পার।'[৪২] সাহাবীগণ বললেন, এটিই উত্তম হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এরপর তারা যয়নবের স্বামীকে মুক্ত করে দিলেন এবং মুক্তিপণ হিসেবে যে হারটি পাঠানো হয়েছিল তা যয়নবের (রা) কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে যয়নবের মুক্তিপণ ক্ষমা করেননি; বরং তা সাহাবীগণের অভিমতের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন, ইচ্ছে করলে তারা তাকে মুক্তি দিতেও পারেন আবার নাও দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে রাষ্ট্র প্রধান অথবা বিজয়ী সেনাকমান্ডার হিসেবে নিজ ক্ষমতা ব্যবহার করেননি।

## ৫. আন্তর্জাতিক মানবিক আইন

জেনেভা কনভেনশন মানবিক অধিকার ও নৈতিক মূল্যবোধের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এ কনভেনশনে অধিভুক্ত ধারাগুলো মানুষের গভীর উচ্ছ্বাস ও আকাঙ্খাকে বাস্তব রূপদানে সক্ষম হয়েছে। কারণ এগুলো আসমানী শরী'আত, মানবিক মূলনীতি, আন্তর্জাতিক চুক্তি, এবং মানবিক আবেদনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।[৪৩] এ চুক্তি এতটাই মানবিক যে, এটি মানবিক অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার প্রয়োজনীয়তার দিকে সর্বতোভাবে আহ্বান করে। এমনকি এটি যুদ্ধ চলাকালীন বিপন্ন মানবতাকে রক্ষার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণেও কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং নিরাপদ সময়ে মানব মর্যাদার প্রতি সম্মান এবং যুদ্ধের মানবিক বিপর্যয় ও বিপন্নতাকে হালকা করার নিমিত্তে পরিচালিত প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের জন্ম হয়। এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এ মানবিক সংগঠনটি নিরবচ্ছিন্নভাবে মানবতার উৎকর্ষ সাধন ও ক্রমোন্নতির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সুতরাং জেনেভা কনভেনশন মানবিকতার ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে চেষ্টা করে যাচ্ছে। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, সংগঠনটির মহৎ উদ্দেশ্য

[৪২] *সুনানু আবী দাউদ*, হাদীস নং ২৩১৭; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ২৫১৫৮।

[৪৩] যায়দান মারীবূত, *মাদখাল ইলাল কানূনিদ্-দাওলী আল-ইনসানী*, *পৃ. ১০৮; বাহসুন দিমনা দিরাসাত হাওলাল ওয়াসাইক আল 'আলামিয়্যাহ্ ওয়াল ইকলিমিয়্যাহ্ লি হুকূকিল ইনসান*, ২য় খণ্ড (বৈরূত : দারুল 'ইল্ম লিল মালা'ইঈন, তা. বি.), পৃ.।

হলো, 'মানুষের জন্য সকল উপকারী কাজ করে যাওয়া।' তাই এ উদ্দেশ্যে সংগঠনটি তার প্রধান অভীষ্ট লক্ষ্য হিসেবে মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন ও পর্যুদস্ত মানবতা এবং মানবিক সকল দুঃসময়ে মানবতার পার্শ্বে দাঁড়ানোকে অপরিহার্য করে নিয়েছে।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি, রেড ক্রস ও হেলাল আল-আহমার আন্দোলনের প্রচেষ্টায় ও সহযোগিতায় এ চুক্তিগুলো বিধিবদ্ধ হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে। আর এ কমিটিকে এ মানবিক আইন বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। অর্পিত এ গুরু দায়িত্ব নিয়ে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি মানবিক মৌলনীতির সম্মানার্থে স্বেচ্চাসেবক ও বিশ্বস্ত নৈশ প্রহরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং বহির্বিশ্বের আনাচে-কানাচে যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত বিপন্ন মানবতার পাশে দাঁড়িয়েছে এবং সহযোগিতা ও সুরক্ষার হস্ত সম্প্রসারিত করছে। শুধু এ সংগঠন দুস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত নয়; বরং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মানবতার সেবায় নিয়োজিত আরো অনেক সংগঠন রয়েছে।[৪৪] তবে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি এমন এক সংগঠন যা মাঠে-ময়দানে তার বিশেষত্ব প্রমাণে সক্ষম হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মৌলনীতি সম্প্রসারণে জনগণ ও জনগোষ্ঠীকে এ নীতিমালার প্রতি সমর্থন, সম্মান প্রদর্শন ও তা বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

## ৬. আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে যুদ্ধ-বন্দির আচরণবিধি

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধ বন্দিদের সাথে যে নির্মম, বর্বর ও অমানবিক আচরণ করা হয়েছে তারই প্রেক্ষিতে বন্দিদের সব দিক বিবেচনা করে তাদের ব্যাপারে আলাদাভাবে চিন্তা ও গবেষণা করতে লোকদেরকে বাধ্য করা হয়েছে।[৪৫] ১৯৪৯ সালে জেনেভা চুক্তির প্রথম ধারা ছিল যুদ্ধের ময়দানে আহত ও অসুস্থ সৈনিকদের সুরক্ষা দেয়া সম্পর্কে। দ্বিতীয় চুক্তিতে ছিল নৌ-যুদ্ধে আহত, অসুস্থ ও ডুবন্ত সৈনিকদের সুরক্ষা দেয়া সম্পর্কিত। তৃতীয় চুক্তি ছিল যুদ্ধবন্দি সম্পর্কিত এবং চতুর্থ চুক্তি ছিল যুদ্ধকালীন বেসামরিক লোকদের সংরক্ষণ সম্পর্কে।

---

৪৪ লুয়াই নূনাস, *মাফহূমুন লি তানমিয়াতিল হারাকাতিদ্-দাওলিয়্যাহ্ লি-সালীবিল আহ্মার ওয়াল হিলালিল আহমার*, আল-মাজাল্লাতুদ্-দাওলিয়্যাহ্ লিস্-সালীবিল আহ্মার, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মে-জুন ১৯৮৮, পৃ. ৭০-৭১।

৪৫ *যায়দান মারীবূত, মাদখাল ইলাল কানূনিদ্-দাওলী আল-ইনসানী, পৃ. ১০২।*

আইনের উৎকর্ষ সাধনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭৭ সালে এ চুক্তিগুলোর সাথে দু'টি অতিরিক্ত চুক্তি সংযোজিত হয়; যা প্রথম দফা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মূলনীতি উপর জোর দেয় এবং মানবিক মর্যাদা সংরক্ষণের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা রাখে। এ চুক্তিগুলো যুদ্ধবন্দিদের সাথে সদাচরণ করতে আহ্বান জানায় এবং এতদসম্পর্কে একটি নীতিমালার ঘোষণা দেয় যে, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি যে প্রতিপক্ষের কাছে বন্দি হয়ে আছে তার অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে এবং তার সাথে সদাচরণ করতে হবে। জেনেভা কনভেনশনের প্রথম প্রটোকলে ৭৫ নং ধারায় বিধৃত হয়েছে যে, যুদ্ধের ময়দানে সন্দেহজনকভাবে কাউকে আটক করলে সেও বন্দির হুকুমের আওতাভুক্ত হবে এবং তার সাথে অন্যান্য বন্দির মত ভাল আচরণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়বে।

জেনেভা কনভেনশনের ৩ নং ধারা মানবতার ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে জাতি-বর্ণের উর্ধ্বে পবিত্র বন্ধন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এছাড়া এটি জাতি, ধর্ম-বিশ্বাস, বর্ণ, স্থান-কাল, পাত্র, সম্পদ সবকিছুর উপর সর্বাবস্থায় মানবিক আচরণের প্রতি নির্দেশ করে।[৪৬] অধিকন্তু এর ৩ নং ধারা বন্দিদের গাফিলতি অথবা তাদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় এমন বস্তুকে নিষিদ্ধ করেছে। এভাবে তাদের উপর এমন সব রোগ বা ঔষধের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যাবে না, যা কোনো মেডিক্যাল বোর্ড উক্ত পরীক্ষা চালানোর অনুমতি দেয়নি।[৪৭] এ চুক্তি বন্দিদের আটক অবস্থায় অন্ন, বস্ত্র, আবাসন ও চিকিৎসার জন্য বিস্তারিত নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।[৪৮] সুতরাং এ চুক্তি এমন কিছু বিশেষ নিয়মনীতি গ্রহণ করেছে, যা অনুসরণে উত্তম আচরণের যোগ্য হওয়া যায়।[৪৯] এ চুক্তি বন্দিদের মধ্যে তারতম্য নীতিও গ্রহণ করেছে। অপর দিকে এর বিপরীতে ইসলাম বন্দিদের স্বাস্থ্য বিষয়ে সাধারণ বন্দি অপেক্ষা নতূন কিছু নিয়মনীতি প্রবর্তন করেছে।

জেনেভা কনভেনশনের ১৬ নং ধারায় বন্দিদের মধ্যে সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠা করার কথা পরিব্যক্ত হয়েছে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সমতা বিধান নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে সে ক্ষেত্রে ঐ একই ধারায় কিছু নীতিকে সীমিত করা হয়েছে। এ কনভেনশন বন্দিদের আত্মিক প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে ধর্মীয় বিষয়গুলো সংরক্ষণের জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন করেছে।[৫০]

---

[৪৬] জেনেভা চুক্তি, ধারা নং ৩।

[৪৭] *তৃতীয় চুক্তি, ধারা নং ১৩।*

[৪৮] তৃতীয় চুক্তি, ধারা নং ১৫-২৫-২৬-২৭-২৮-২৯-৩০।

[৪৯] তৃতীয় চুক্তি, ধারা নং ১৬।

[৫০] তৃতীয় চুক্তি, ধারা নং ৩৪-৩৫।

এ কনভেনশন বন্দিদের থেকে সেবা নেয়া অথবা কাজ করে নেয়ার পন্থা সুসংগঠিত করেছে এবং ঘোষণা দিয়েছে যে, তাদের দ্বারা এমন কোনো কাজ করে নেয়া যাবে না যা অমানবিক। তাদের উপর কোনো অনৈতিক কাজ অথবা কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো জঙ্গী তৎপরতায় তাদের অংশগ্রহণকে বাধ্যতামূলক করা যাবে না।[৫১] এ চুক্তি বন্দিদেরকে সেবামূলক কাজে নিয়োগ করার বৈধতা দেয়, যদিও তা বন্দিদের স্বভাব-চরিত্র পরিপন্থী। তথাপি বিশেষ অবস্থায় সাময়িকভাবে তাদের থেকে সেবা গ্রহণ করাকে বৈধ করা হয়েছে। এ চুক্তি সবেমাত্র বন্দিশালায় ঢুকেছে এমন বন্দিদেরকে তাদের আত্মীয়-স্বজন অথবা যারা হারিয়ে গিয়েছে তাদের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য কোনো এজেন্সিকে জেলখানা থেকে সরাসরি পত্র লেখার সুযোগ দিয়েছে।[৫২] প্রথম প্রটোকল শিশু ও মহিলা বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলাদের জন্য অনেক নীতি সংযোজন করেছে।[৫৩]

যুদ্ধ বন্দিদের সম্পর্কে এ চুক্তি ন্যায়-নীতির নিরিখে প্রয়োজনীয় শর্ত যুক্ত করেছে এবং স্বীকৃতি দিয়েছে যে, বন্দিদেরকে বন্দি করার কারণ সম্পর্কে এবং তাদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সত্য কী মিথ্যা তা তাদের মৌখিক স্বীকারোক্তির মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না। আসামীদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ তদন্তকালে তাদের উপর কঠোরতা অথবা অমানবিক কোনো আচরণ করা যাবে না। কয়েদি বা আসামীর অধিকার হলো তার ডিফেন্সের জন্য সে নিজে অথবা তার পছন্দমতো কোনো উকিলের মাধ্যমে মামলা পরিচালনা করতে পারে। এ চুক্তিতে বন্দির অধিকার সম্পর্কিত আলোচনায় বিধৃত হয়েছে যে, মামলা তদন্ত এবং কোর্টে মামলা চলাকালে মামলাটি রায় হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছলে মানবতার নিরিখে তার সকল কার্যক্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার সাথে সদাচরণ করা অতিশয় জরুরী। জেলখানা থেকে বন্দিদের তাদের বাসস্থানে ফিরে আসার ব্যাপারে এ চুক্তির বক্তব্য সুস্পষ্ট। যদি কঠিন রোগ অথবা ক্ষুধার কারণে কোনো বন্দির স্বাস্থ্যের অবনতির আশংঙ্কা দেখা দেয় তাহলে দ্রুত তাকে দেশে পাঠাতে হবে।[৫৪] এটিই হলো আন্তর্জাতিক মানবিক আইন, যা মানুষের উপকারের জন্য সকল কর্মে উৎকর্ষতার নীতি অব্যাহত রাখছে। আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের এটি একটি বিরাট সফলতা।

---

[৫১] তৃতীয় চুক্তি, ধারা নং ৪৯-৬৮।

[৫২] তৃতীয় চুক্তি, ধারা নং ৬৯-৭১।

[৫৩] ১৯৭৭ সালে প্রথম প্রটোকল, ধারা নং ৭৬-৭৮।

[৫৪] তৃতীয় চুক্তি, ধারা নং ৯৯-১০৮।

## ৭. উপসংহার

ইসলাম আন্তর্জাতিক মানবিক আইনকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। মানবিক মূল্যবোধের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সুপ্রতিষ্ঠিত ও অপরিবর্তনীয়। কেননা ইসলামে মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তি দয়া ও উদার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যা আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা.)–এর জীবনচরিত থেকে উৎকলিত। সুতরাং ইসলামী মানবিক আইন শুধু সে যুগে নয়; বরং সকল যুগের অগ্রদূত। কেননা ইসলামই সর্বপ্রথম যোদ্ধাদের জন্য মানবিক আইনকে সুক্ষাতিসূক্ষভাবে শ্রদ্ধা করা আবশ্যিক করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে যুদ্ধ আক্রান্তদের সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিভিন্ন স্তর খুব দ্রুত বিকশিত হয়েছে। কিন্তু তা বাস্তবায়নের জন্য মানবিক আইনের চুক্তিগুলো অনুবাদ ও তা বহুল প্রচারের প্রতি গুরুত্বারোপ অতীব প্রয়োজন। এছাড়া আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের ভাষ্যগুলোকে উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে সিলেবাসভূক্ত করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। অনুরূপভাবে মুসলিম বিশ্বে আইন বিশেষজ্ঞদের নিকট ইসলামী মানবিক আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি তাদের শুধু অধ্যয়ন করলেই চলবে না; বরং প্রচলিত সকল ভাষায় এর অনুবাদ ও প্রচার করা তাদের কর্তব্য। কেননা যুদ্ধ ও সন্ধি সক্রান্ত ইসলামী শিক্ষা এবং নৈতিক মূল্যবোধ বিষয়ক বিধিবদ্ধ আইন ও অনুপম আদর্শ অনুধাবন আজ বিশ্ব সমাজের জন্য অতীব প্রয়োজন।

# সশস্ত্র সংঘর্ষে যোদ্ধা ও আক্রান্তদের অধিকারঃ আরবীয়-ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি*

**কর্নেল (অব) সাইয়েদ হাশিম****

## ভূমিকা

যোদ্ধা ও সশস্ত্র সংঘর্ষে আক্রান্তদের অধিকার নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য। আন্তর্জাতিক মানবিক আইন সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনের একটি শাখা। এর মূল উৎস হলো সাধারণ আন্তর্জাতিক আইন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক তথা আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিভিন্ন সশস্ত্র সংঘাত হলো এ আইনের আলোচ্য বিষয়।

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন যে সশস্ত্র সংঘর্ষ নিয়ে আলোচনা করে ইতোপূর্বে তা সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনে '*যুদ্ধ নীতির*' অন্তর্ভুক্ত ছিল। আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ সম্প্রতি সংঘর্ষ-সংঘাত বন্ধ করার জন্য শক্তি প্রয়োগকে নিষিদ্ধ করেছে। আর তা জাতিসংঘের সনদে নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে একজন আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ যুদ্ধ আইন বিষয়ে মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক আইনের আলোকেই উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতেও শক্তি প্রয়োগ বা যুদ্ধ করা বৈধ নয়। তবে বাস্তবতা হলো, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সশস্ত্র সংঘর্ষ ব্যাপকতা লাভ করেছে। ফলে সীমাহীন ক্ষতি সত্ত্বেও সংগঠিত শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা কোনভাবেই উপেক্ষা করা যাচ্ছে না। সুতরাং বিষয়টি এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, বাস্তবতা ও প্রচলিত আইনের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। যেমনটি প্রফেসর সালাহ্ উদ্দীন 'আমির স্বীয় '*মুকাদ্দামাতুন লি-দিরাসাতি কানূনিন্-নাযা' আতিল মুসাল্লাহা*' গ্রন্থে বলেন, যুদ্ধ আইন গবেষকগণ 'গঠনগত ধারণার দিক দিয়ে যুদ্ধ বিধি বহির্ভূত' একথা মেনে নেয়ার পর শুধু যুদ্ধের বাহ্যিক ধারণা অর্থাৎ সশস্ত্র সংঘর্ষ বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গিকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত প্রথম থেকেই এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সুতরাং ১৯২৩ সালে মুবালডন সমস্যার কারণে পোল্যান্ড ও

---

* প্রবন্ধটি ১৯৯১ সালে মে-জুন সংখ্যায় আন্তর্জাতিক রেড ক্রস গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

** কর্নেল সাইয়েদ হাশিম একজন মিসরীয় আইনবিদ। তিনি ১৯৫৯ সালে আইন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর মিসরীয় সামরিক শক্তি কমিশনে আইনবিদ হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দেশ-বিদেশের অনেক আইন সংস্থার সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বিষয়ে তার অসংখ্য প্রবন্ধ ও গবেষণাধর্মী গ্রন্থ রয়েছে।

রাশিয়ার মধ্যে সংঘঠিত যুদ্ধের বিবরণে আন্তর্জাতিক আদালত এ পরিভাষাটি প্রয়োগ করেছে।[১] বাস্তবতা হলো এই যে, যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, আন্তর্জাতিক সনদ ও চুক্তিসমূহে আন্তর্জাতিক সংঘাত বন্ধে সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধ। কিন্তু বর্তমান বিশ্ব নিয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই দেখতে পাবে যে, সাম্প্রতিককালে অসংখ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ দামামা বাজিয়েই চলেছে, যার কিছু আন্তর্জাতিক পরিসরে আবার কিছু আঞ্চলিক পর্যায়ে। যেমন, আরব-ইসরাঈল যুদ্ধ, ইরান-ইরাক যুদ্ধ, ইরাকের কুয়েত দখল পরবর্তী উপসাগরীয় অঞ্চলের যুদ্ধ, লেবানন, দক্ষিণ সুদান ও পশ্চিম সাহারা অঞ্চলের মরক্কোসহ বিবিধ সংঘাত-সংঘর্ষ। এছাড়া আরব অঞ্চল বহির্ভূত যুদ্ধ, যেমন, আফগান যুদ্ধ, ল্যাটিন আমেরিকান রাষ্ট্রসমূহ, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রসমূহ, যুগোস্লোভিয়া, প্রভৃতি অঞ্চল বা রাষ্ট্রের যুদ্ধবিগ্রহ। এ যুদ্ধসমূহ প্রফেসর ফাইসাল নাহুমকে এ কথা বলতে বাধ্য করেছে যে, 'মানুষ স্বভাবত-ই যুদ্ধবাজ'।[২] আমরা বলতে পারি যে, সশস্ত্র সংঘর্ষ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানবতার প্রকাশকে বাধাগ্রস্থ করেছে। সাথে সাথে আমরা এ কথাও বিবেচনায় রাখছি যে, আজকে অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈরিতে জ্ঞানগত ও প্রায়োগিকদিক দিয়েই শক্তি প্রয়োগের উপকরণের চরম উন্নতি সাধিত হয়েছে। এ অস্ত্র-শস্ত্রের কার্যকারিতা, ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার যে কোনো স্থানে এগুলোর স্থানান্তর এবং বহনও সহজতর হয়েছে। এ কারণেই এ ধরনের অস্ত্র প্রয়োগের ক্ষেত্র শুধু সেনাবাহিনীর মধ্যে সীমিত রাখা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এর বড় প্রমাণ হলো উপসাগরীয় যুদ্ধ (১৯৯০-১৯৯১)।[৩]

## আন্তর্জাতিক মানবিক আইন-এর সংজ্ঞা

'আন্তর্জাতিক মানবিক আইন'-এর সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে আমরা বলতে পারি, '*এটি এমন কিছু বিধানের সমষ্টি যা সশস্ত্র সংঘর্ষে ভুক্তভোগীদের অধিকার নির্ধারণ করে এবং যোদ্ধাদের সামরিক শক্তি প্রয়োগের উপকরণসমূহের সীমা নির্ধারণ করে এবং এর প্রয়োগ অন্য কারো উপর নয় শুধু সামরিক বাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার বিধান প্রণয়ন করে*। সশস্ত্র সংঘর্ষে অক্রান্ত বলতে সাধারণতঃ

[১] ড. সালাহুদ্দীন 'আমের, *মুকাদ্দিমাতুন দিরাসাতি কানূনিন্ নাযা' আতিল মুসাল্লাহা* (বৈরূত: দারুল ফিক্‌র আল-'আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ৯০।

[২] ড. ফয়সাল নাহুম, ১৯৮২ সালে ক্যামেরুনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে সেমিনারে দ্বিতীয় সেশনে প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন।

[৩] কর্নেল সাইয়্যেদ হাশেম, *মুকাদ্দামুতন ফিল কানূনিদ্ দাওলী আল-ইনসানী* (কায়রো: আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি প্রকাশনা, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ৫।

তাদেরকে বুঝায়, যারা স্থল, নৌ ও আকাশ পথে যুদ্ধের কারণে নিহত হয়েছে, ডুবে মারা গিয়েছে অথবা আহত, অসুস্থ কিংবা বন্দী হয়েছে। পাশাপাশি অধিকৃত অঞ্চলে যারা আটকা পড়েছে এবং আইনতঃ সুরক্ষা পেয়েছে।[৪]

## বিষয়ের গুরুত্ব

একটি সাপ্তাহিকীতে প্রকাশিত এ প্রবন্ধে সমসামায়িক বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক ও প্রখ্যাত ফকীহ মুহাম্মাদ আল-গাযালী বলেন 'আরব অঞ্চল যুদ্ধ উপদ্রুত জনপদে পরিণত হয়ে পড়েছে। মুসলিম অধ্যুষিত স্থানের অবস্থাও অনুরূপ।'

এ অভিমত বর্তমান রূঢ় বাস্তবতার সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ, যে বাস্তবতা নিয়ে আজ আরব ও মুসলিমরা দিন কাটাচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আরব ও তাদের প্রতিবেশিদের মধ্যে এমনকি আরবদের নিজেদের দেশের মধ্যেই যুদ্ধ লেগে আছে। ফলে একথা বলা যায় যে, সাধারণতঃ অধিকাংশ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সশস্ত্র সংঘর্ষের এক পক্ষ হয় আরব কিংবা অন্য মুসলিমরা। আর এ সকল যুদ্ধে অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। যার ফলে মানুষ যেমন আহত ও নিহত হচ্ছে অনুরূপভাবে ঘর-বাড়ীর ধ্বংস সাধিত হচ্ছে।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে আরব ঐতিহ্য এবং ইসলামের সুমহান শিক্ষা অনেক প্রাচীন। কিন্তু লক্ষ্য করা যায় যে, যুদ্ধরত আরব ও মুসলিমরা আন্তর্জাতিক সনদতো দূরের কথা উপর্যুক্ত ঐতিহ্য এবং মহান শিক্ষার প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করে না। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আরব ও মুসলিমদের এ নীতির কারণে বর্তমান প্রেক্ষাপটে উপরিউক্ত ঐতিহ্যের অনুপস্থিতিই সশস্ত্র সংঘর্ষের প্রচ তা বাড়িয়ে দেয়। যার ফলে আমাদের সম্পদ ধ্বংস হয়েছে, মর্যাদা বিনষ্ট হয়েছে এবং আমরা পথহারা হয়েছি।

ইসলামী ঐতিহ্য নিয়ে যিনিই গবেষণা করবেন তিনিই দেখতে পাবেন যে, এ ঐতিহ্য বর্তমান সময়ের সনদসমূহের বর্ণিত শক্তি প্রয়োগ নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যখন যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে তখন প্রয়োজন পূরণ পর্যন্তই তা পরিচালনা করা হবে এটি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি। ইসলামে যুদ্ধ দয়া ও মর্যাদার বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। সুতরাং নিয়মতান্ত্রিকভাবে ঘোষণা কিংবা (যদি বন্ধুত্বের কোনো চুক্তি থাকে) চুক্তি প্রত্যাখ্যান না করা পর্যন্ত যুদ্ধের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না। যুদ্ধকালীন নারী ও শিশুদের হত্যা করা যাবে না এবং নিহতদের দেহ বিকৃত করা যাবে না।

---

৪ পূর্বোক্ত।

সেনাপতির দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছিলেন, তা আমাদের অধ্যয়ন করা উচিৎ। তা হলো,

انطلقوا بإسم الله وعلى بركة رسوله ولا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا صغيرا ولا إمرأة ولا تغلوا وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين.

'আল্লাহর নামে এবং তাঁর রাসূলের বরকতে এগিয়ে যাও। তোমরা বৃদ্ধ, শিশু ও নারীকে হত্যা করো না, খেয়ানত করো না; বরং পরিশুদ্ধ থেকো এবং মানুষের প্রতি দয়াপরবশ হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অনুগ্রহকারীকে ভালবাসেন।'[৫]

প্রথম খলীফা আবূ বাকর (রা)-এর দিক নির্দেশনা উপরিউক্ত নির্দেশের পরিপূর্ণতা দান করে। তিনি বলেন,

ولا تقطعوا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا الا لمأكله. وسوف تمرون على قوم فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له.

'তোমরা খেজুর বৃক্ষ কাটবে না, জ্বালাও পোড়াও করবে না, ফলদার বৃক্ষও কাটবে না। আহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যতীত গরু-ছাগল ও উট জবাই করবে না। তোমরা শীঘ্রই এমন সম্প্রদায়ের নিকট উপনীত হবে যারা একনিষ্ঠভাবে গীর্জায় সময় কাটায়, তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। আরো একটু এগিয়ে গিয়ে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবী সুফিয়ানকে বলেন, 'আহত ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করো না, কেননা তার অঙ্গহানি ঘটেছে।'[৬] এ সকল দিক নির্দেশনা থেকে ফকীহগণ অনেক মাস'আলা উদ্ভাবন করেছেন এবং এর বিস্তারিত পর্যালোচনায় ব্রতী হয়েছেন।[৭] ইমাম মালিক ও আল-আওযা'ঈর মতে, কোনো অবস্থাতেই শত্রুপক্ষের নারী ও শিশুকে হত্যা করা যাবে না, এমনকি শত্রুপক্ষ যদি তাদেরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহারও করে। অর্থাৎ নিজেদেরকে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা ও মুসলিমদের আক্রমণ থেকে বাচাঁর জন্য তাদেরকে সামনে ঠেলে দেয়।

উপদেষ্টা 'আলী আল-মানসূর তাঁর বিখ্যাত '*আশ্-শারী'আহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ্ ওয়াল কানূনুদ্-দাওলী আল-'আম্*' ও '*উসূলুল ফিক্হ*' গ্রন্থসমূহ হতে এ ধরনের অনেক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত গ্রন্থে ইব্‌ন কুতায়বাহ-এর '*উয়ূনুল আখবার*' গ্রন্থের যুদ্ধ অধ্যায় পৃ. ৮৮ থেকে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করা আমরা প্রাসঙ্গিক মনে করেছি:

---

৫ আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, হাদীস নং ১৬৬৯৮।

‘ইনতাকিয়া যুদ্ধে যখন মুসলিমরা রোমান বাহিনীকে পরাজিত করল, তখন রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস তার সভাসদকে ডাকলেন এবং তাদের মধ্যে যে সংলাপ হয়েছিল তা ছিল নিম্নরূপঃ

তোমরা যাদের সাথে যুদ্ধ করেছ, বলতো তারা কারা? তারা কী তোমাদের মত মানুষ নয়?

জি হ্যাঁ।

সংখ্যায় কী তারা বেশি ছিল, না কী তোমরা?

প্রতিটি পর্যায়েই আমরা তাদের চেয়ে বহুগুণ বেশি ছিলাম।

তোমাদের ধক্ষংস হোক! তাহলে যখনই তোমরা তাদের মোকাবেলা কর, তখনই কেন পরাজিত হও?

তখন তাদের মধ্য থেকে এক প্রবীণ বললেন, হে বাদশাহ! কেন আপনার বাহিনী পরাজিত হলো সে সম্পর্কে আমি আপনাকে কিছু বলতে চাচ্ছি। তা হলো, আমরা যখন তাদের উপর আক্রমণ করি তখন তারা ধৈর্য্য ধারণ করে এবং তারা যখন আমাদের উপর আক্রমণ করে তখন তারা সত্যের আশ্রয় নেয়। কিন্তু আমরা যখন তাদের উপর আক্রমণ করি তখন আমরা মিথ্যার আশ্রয় নেই এবং তারা যখন আমাদের উপর আক্রমণ করে তখন আমরা বিচলিত হয়ে পড়ি।’ হিরাক্লিয়াস এর অন্তর্নিহিত কারণ জানতে চাইলে তিনি তা স্পষ্ট করে বললেন যে, ‘কেননা ঐ সম্প্রদায় (মুসলিমরা) দিনে রোযা পালন করে, রাতে সালাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, অঙ্গীকার যথাযথভাবে পালন করে, সৎকাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে এবং যখন বিচার-ফায়সালা করে তখন কারো উপর জুলুম করে না।’[৮]

অন্যান্যদের দৃষ্টিতে এটিই ছিল আরব ও মুসলিমদের মূল্যবোধ। কিন্তু আজ আরব ও মুসলিমদের মধ্যে এ ঐতিহ্য অনুপস্থিত থাকায় তাদের মর্যাদা ও মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ঘটেছে। তাই আধুনিক যুদ্ধ আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো থেকে তাদের আচরণ ও কর্মকাণ্ড অনেক দূরে।

---

[৬] তারিখু মাদীনাতিল দিমাশক আল-কাবীর, পূর্বোক্ত, হাদীস নং-৯২১

[৭] আল-মুশতাসার আলী মানসূর, আশ্-শারী‘আহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ্ ওয়াল কানূনুদ্ দাওলী আল-‘আম (কায়রোঃ আল-মাজলিসুল ‘আলা লিশ্-শূ‘উনিল ইসলামিয়্যাহ্, ১৯৭১ খ্রি.), পৃ. ৩০৫।

[৮] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৬।

## আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে আরবীয় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

আরবরা বেদুইন জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলেও তাদের রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল। তন্মেধ্যে প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, পারস্পরিক শক্তির প্রয়োগ। সশস্ত্র সংঘর্ষ সংক্রান্ত আধুনিক আইনের অন্যতম স্তম্ভ হলো মধ্যযুগীয় বীর পদাতিক বাহিনীর উৎস আরব।[৯] তেমনিভাবে অঙ্গীকার পালন ও অসহায়ের সাহায্যে এগিয়ে আসা প্রভৃতি ইসলামপূর্ব আরবীয় সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আরব উপদ্বীপে যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর রিসালাতের ওহী অবতীর্ণ হল, তখন প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে ইসলামী দাও'য়াত প্রসারের পন্থা গ্রহণ করা হয়। জোরপূর্বক এ ধর্ম গ্রহণ করানোর কোনো পন্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে শায়খ মুহাম্মাদ ফারাজ আস্-সানহুরী বলেন, দ্বীন হলো বিশ্বাস ও অন্তরের স্থিরতা বা প্রশান্তি। এক্ষেত্রে জোর-জবরদস্তি কোনো কাজে আসে না। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যে অহী অবতীর্ণ হয়েছে তা হলো:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾

'দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্ত পথ থেকে।'[১০]

অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾

'তবে কি তুমি মানুষকে বাধ্য করবে, যাতে তারা মুমিন হয়?'[১১]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পরবর্তীতে খুলাফা-ই রাশিদূন পরিচালিত সকল যুদ্ধেই মুসলিমরা বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করেছে। মুসলিমরা যে সকল যুদ্ধ করেছে সবগুলোই ছিল প্রকাশ্য শত্রুতা প্রতিহত করার লক্ষ্যে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ; কিংবা পরিকল্পিত পরিচালিত শত্রুতা থেকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ। ফকীহগণ জিহাদ ও এর আবশ্যকীয়তা সম্পর্কে যা বলেছেন তা অনেকেই

৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭; এ গ্রন্থের লেখক সিডিউব প্রণীত *হাদারাতুল 'আরব* গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "পাশ্চাত্যে পদাতিক বাহিনীর গঠন 'আরবদেরই ধারণা থেকে উদ্ভূত হয়েছে।"

১০ সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ২৫৬।

১১ সূরাহ্ ইউনুস: ৯৯।

বুঝতে ভুল করেছেন। প্রকৃতপক্ষে জিহাদ হলো সীমালঙ্ঘনকারী ও মুসলিমদের ক্ষতিসাধনের জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।[১২]

একথা সত্য যে, একটি পরিপূর্ণ মানবিক বিধান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আধুনিক মানবিক আন্দোলনের অনেক শতাব্দী পূর্বেই ইসলামী শরী'আত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। ফকীহগণ *সিয়ার, ইজতিহাদ* ও *তাফসীরের* গ্রন্থসমূহে শক্তি প্রয়োগের ইসলামী বিধি-বিধানসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সুতরাং একান্ত প্রয়োজন ছাড়া যুদ্ধ করা যাবে না এবং এর জন্য পূর্ব ঘোষণা প্রদান করতে হবে। যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে তখন বৃদ্ধ শিশু, নারী কিংবা বন্দীদের হত্যা করা যাবে না। মৃতদেহের অবমাননা বা বিকৃতি সাধনও করা যাবে না। এমনিভাবে শত্রু সেনাদের হত্যা করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িও করা যাবে না। এর প্রমাণ স্বরূপ আমরা আধুনিক যুগের কিছু চুক্তি-সনদ ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের কিছু বিধি-বিধান পর্যালোচনা করব এবং ইসলামী শরী'আতের বিধানের সাথে এগুলোর তুলনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপন করব:

## এক. যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া

প্রচলিত যুদ্ধআইনের একটি অন্যতম বিধান হলো, যুদ্ধ শুরুর পূর্বে অবশ্যই তার ঘোষণা দিতে হবে। এ আবশ্যকীয়তা এজন্য যে, যুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধরত রাষ্ট্রসমূহ বিশেষকরে যুদ্ধরত রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের পারস্পরিক কিংবা বন্ধু রাষ্ট্রের মধ্যে এ সময় বিশেষ কিছু নিয়ম অনুসরণ করা জরুরী হয়ে পড়ে। পাশাপাশি জনসাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিদের সম্পদ, স্বদেশীদের অধিকার এবং উপদ্রুত অঞ্চলের যুদ্ধরত দেশ ও অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিবাসীদের অধিকারের উপর এর প্রভাব পড়ে। ১৯০৭ সালে স্বাক্ষরিত হেগ চুক্তির প্রথম ধারায় যুদ্ধের ঘোষণা সংক্রান্ত বিধান এ ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে যে, *যুদ্ধের কার্যক্রম ততক্ষণ পর্যন্ত আরম্ভ করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধের কারণ সম্বলিত কোনো ঘোষণা প্রদান না করা হবে, অথবা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে দাবি পূরণের আল্টিমেটাম দেয়া না হবে।* অর্থাৎ এ বিষয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জবাব চাওয়া হবে অন্যথায় *যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল মর্মে* ঘোষণা দেয়া হবে। তবে যদি দু'টি দেশের মধ্যে কার্যত: যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তবে তা যুদ্ধকালীন সময় হিসেবে গণ্য হবে এবং এর প্রভাব সংক্রান্ত বিধি-বিধান এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এ সময় যুদ্ধের ঘোষণা প্রদান করা হয়েছিল কী না সেদিকে দৃষ্টি দেয়া হবে না। কারণ অধিকাংশ সময়ে যুদ্ধরত

[১২] *আশ্-শারী'আহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ্ ওয়াল কানূনুদ্ দাওলী আল*-'আম, পৃ. ৮।

দেশগুলো কোনো প্রকার ঘোষণা বা সতর্কতা প্রদর্শন ব্যতীত হঠাৎ যুদ্ধ করে থাকে। ফলে ঘোষণা বা সতর্ক করা এবং আন্তজাতিক রীতি ব্যতীতই এরূপ যুদ্ধের সূচনাকে স্বীকৃতি দেয়া হবে। এ বিষয়ে ইসলামী শরী'আতের উন্নত আদর্শের আলোকে তৈরি একটি উজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে, যা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা প্রাপ্তির যোগ্য।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম বিজয় বা রাজ্য বিস্তৃতির জন্য আক্রমণাত্মক কোনো যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না; বরং ইসলাম শুধু জুলুম প্রতিরোধ বা দাও'য়াত সম্প্রসারণের বাধা দূর করার জন্য সীমিত আকারে যুদ্ধের অনুমোদন দেয়। নির্দিষ্ট কিছু শর্তে যুদ্ধ শুরুর অনুমতি প্রদানের সাথে সাথে ইসলামী শরী'আত মুসলিম সেনাবাহিনী ও সেনাপতিকে যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই শত্রু পক্ষকে তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটি গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাউকে সেনাপতি হিসেবে মনোনীত করতেন তখন তাকে বিশেষভাবে মহান আল্লাহকে ভয় করতে এবং মুসলিম বাহিনীর সাথে ভাল আচরণের নির্দেশ দিতেন। তিনি বলতেন,

أغزوا باسم الله وفى سبيل الله ، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولاتمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا إمرأة ولا مدبرا. وإذا لقيت عدوك فادعه أولا الا احدى خصال ثلاث : ادعه الى الإسلام فيكون منا، وإن أبوا الإ البقاء على دينهم فأسألهم الجزية فإن رضوا فاجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه وكف عن قتالهم وإن أبوا الجزية فاستعن بالله وقاتلهم.

'আল্লাহর নামে ও আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর, যুদ্ধ করবে কিন্তু খেয়ানত করবে না, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, মৃতদেহ বিকৃতি করবে না, এবং শিশু, নারী ও বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, যখন শত্রুর মুখোমুখি হবে তখন তাকে তিনটি বিষয়ের কোনো একটি গ্রহণের আহ্বান জানাবে, প্রথমে তাকে ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের দলভুক্ত হওয়ার আহবান জানাবে। যদি শত্রুরা তা অস্বীকার করে স্বীয় ধর্মে অবিচল থাকে তাদের কাছে জিযিয়া দাবি করবে, যদি তারা এতে সম্মত হয়, তবে আল্লাহ ও তাঁর নবীর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদান করবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে। আর যদি জিযিয়া প্রদান অস্বীকার করে তবে আল্লাহর সাহায্য কামনা করে তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।[১৩]

যুদ্ধ ঘোষণারীতি লঙ্ঘন করার জন্য আন্তর্জাতিক আইনে কোনো শাস্তির বিধান রাখা হয়নি, কিন্তু ইসলামী শরী'আত এ মৌলিক রীতির বিরোধিতার জন্য শাস্তির বিধান নির্ধারণ করেছে। সুতরাং যুদ্ধ ঘোষণা কিংবা উপরে বর্ণিত তিনটি

[১৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৬।

বিষয়ের সুযোগ প্রদান ব্যতীত মুসলিমগণ শত্রুদের উপর আক্রমণ করলে শত্রু সদস্যদের প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের জন্য মুসলিমদের জন্য দিয়াত (রক্তপণ) প্রদান করা বাধ্যতামূলক হবে। ইমাম শাফি'ঈর মতে, এক্ষেত্রে রক্তপণ মুসলিম হত্যার রক্তপণের সমান।

## দুই. চুক্তিরক্ষা

আধুনিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিধি-বিধান প্রধানত: তিনটি চিন্তাধারা বা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত: '*প্রয়োজন নীতি*'। এটি যুদ্ধরত পক্ষগুলোকে শক্তি প্রয়োগ সীমিতকরণে বাধ্য করে। দ্বিতীয়ত: '*মানবতার নীতি*'। এটি যুদ্ধরত সৈন্যদের মধ্যে সামরিক শক্তি প্রয়োগ সীমাবদ্ধ রাখার নীতি। তৃতীয়ত: '*বীরত্ব প্রদর্শন নীতি*'। অর্থাৎ যুদ্ধোপকরণ ও যুদ্ধকৌশল এমনভাবে প্রয়োগ করা, যাতে যুদ্ধরত পক্ষগুলোর মধ্যে বিশ্বাসের ঘাটতি না হয়। এমনকি যাতে সংঘর্ষে লিপ্ত পক্ষগুলোর পক্ষ থেকে রেড ক্রস এবং রেডক্রিসেন্টের প্রতীকের প্রতি ও সম্পাদিত চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন নিশ্চিত হয়। এছাড়া যে সকল মধ্যস্থতাকারীদের বিষয়ে উভয়পক্ষ ঐকমত্য পোষণ করেছে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাও করা যাবে না। এক কথায় বলা যায় যে, সাধারণভাবে কোনো প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা কিংবা প্রচলিত রীতি, সম্পাদিত চুক্তি-সনদ ও সংঘর্ষে লিপ্ত উভয় পক্ষের সমঝোতা কোনটিতেই এমন কোনো কাজ করা যাবে না যাতে পারস্পরিক আস্থা নষ্ট হয়। কারণ আক্রান্ত ব্যক্তি ও বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষায় এ গুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।[১৪]

আমরা বলতে পারি যে, ১৮৬৪ সালে অনুষ্ঠিত জেনেভা কনভেনশন সর্বপ্রথম উপরিউক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে রেড ক্রস আন্দোলনের প্রচেষ্টায় যুদ্ধকালীন আহত ও অসুস্থ নাগরিকদের সাথে কীরূপ আচরণ করা হবে সে বিষয়ে ১৮৬৪ সালেই সুইজারল্যান্ডে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে আহত ও অসুস্থদের রক্ষায় একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর সাথে এ্যাম্বুলেন্স ও সামরিক হাসপাতালগুলোর নিরপেক্ষতা বজায় রাখার বিষয়টিও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৬৮ সালের *সেন্ট পিটার্সবার্গ* ঘোষণা এবং ১৮৭৪ সালের *ব্রাসেলস ঘোষণার* মাধ্যমে উক্ত সনদে ছুটে যাওয়া বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে একে পূর্ণতা প্রদান করা হয়। অতঃপর ১৮৯৯ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম হেগ সম্মেলনে অনেকগুলো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ১৯০৭ সালে

১৪ *মুকাদ্দামুতন ফিল কানূনিদ্ দাওলী আল-ইনসানী*, পৃ. ৬।

অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় হেগ সম্মেলনে আরো কিছু সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৪৯ সালে অনুষ্ঠিত ৪র্থ জেনেভা সম্মেলনে এতে অনেকগুলো ধারার অন্তর্ভুক্তি হয় এবং ১৯৭৭ সালে আরো দু'টি প্রটোকল সংযোজন করে উপরিউক্ত চুক্তির পূর্ণতা দেয়া হয়।[১৫]

আধুনিক মানবিক আইন প্রণয়নের দশ শতাব্দীর পূর্বে ইসলামী শরী'আত যুদ্ধকালীন অঙ্গীকার পালন সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছে। যতটুকু সম্ভব বিষয়টি তিনটি স্তরে নিম্নে উপস্থাপন করছি:

### ক. বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কায় সন্ধি প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা প্রদান

যদি মুসলিমদের সাথে অন্য কোনো পক্ষের চুক্তি বা সন্ধি থাকে এবং তাদের কার্যকলাপ সন্ধি বা চুক্তি ভঙ্গ, খেয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতার ইঙ্গিত বহন করে তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বৈধ নয়, যতক্ষণ তাদের সাথে চুক্তি বা সন্ধি ভঙ্গের ঘোষণা প্রদান তাদের নিকট পৌঁছানো না হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾

'যদি তুমি কোনো সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভঙ্গের আশংকা কর তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথ বাতিল করবে; আল্লাহ্ বিশ্বাস-ভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেন না।'[১৬]

শত্রুপক্ষের খেয়ানত এক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা, কিন্তু ইসলামের অনুপম আদর্শ হচ্ছে কখনো অবহিত না করে মুসলিমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। এ নীতি অনুশীলনের অনেক ঘটনা মুসলিমদের ইতিহাসে রয়েছে। তবে আমরা তন্মধ্যে 'উমার (রা)-এর শাসনামলে সংঘটিত একটি ঘটনা উল্লেখ করব, তা হলো নিম্নরূপ:

'উমায়র ইব্ন সা'দ (মদীনায়) এসে খলীফা 'উমার (রা)-কে জানালেন যে, 'মুসলিম সাম্রাজ্য ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী *আরবসূস* শহরের অধিবাসীরা আমাদের গোপন সংবাদ আমাদের শত্রুদের (রূমকদের) নিকট পৌঁছে দেয়, কিন্তু রোমানদের কোনো গোপন খবর আমাদের নিকট পৌঁছায় না। সুতরাং তাদের আচরণে বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পাচ্ছে। 'উমার (রা) তাঁর জবাবে বললেন, 'তুমি তাঁদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে সুযোগ দেবে যে, তুমি তাদের একটি ছাগলের স্থলে দুটি, একটি গরুর পরিবর্তে দু'টি এবং প্রত্যেকটি

---

[১৫] *মুকাদ্দিমাতুন দিরাসাতি কানূনিন্ নাযা'আতিল মুসাল্লাহা*, পৃ. ৩১।

[১৬] সূরাহ্ আন্‌ফাল, ৫৮।

জিনিসের পরিবর্তে দু'টি জিনিস প্রদান করবে। এতে তারা সম্মত হলে তাদেরকে তা দিয়ে উক্ত জনপদ থেকে উচ্ছেদ করবে। আর তারা যদি সম্মত না হয়, তাহলে প্রথমে তাদের সাথে চুক্তি প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা দেবে এবং এক বছর তাদেরকে সুযোগ বা ছাড় দেবে। অতঃপর তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।'

## খ. সম্পাদিত চুক্তি ও সনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

'আলী (রা) স্বীয় গভর্নর আল-আশতার আন্-নাখ'ঈর নিকট যে পত্র লিখেছিলেন, তা ছিল চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি উত্তম দলীল। তিনি লিখেছিলেন, 'তুমি যখন শত্রুর সাথে কোনো চুক্তি সম্পাদন করবে কিংবা তোমার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদান করবে, তখন তোমরা অঙ্গীকার যথাযথভাবে পালন করবে এবং নিরাপত্তা প্রদানের প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখবে। তুমি তোমার অঙ্গীকার ভঙ্গের আচরণ থেকে প্রবৃত্তিকে বিরত রাখবে। কারণ, মানুষের মধ্যে নানা মত ও পথ থাকা সত্ত্বেও মহান আল্লাহ্ ঘোষিত ফরযসমূহের মধ্যে অঙ্গীকার পালনের (চেয়ে অন্য কোনো ফরয-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে সবাই ঐকমত্য পোষণ করতে পারেনি) প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। সুতরাং প্রদত্ত যিম্মাদারীর ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং তোমার অঙ্গীকারও ভঙ্গ করো না। উপরিউক্ত নির্দেশনায় বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ 'আলী (রা) আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর অনুসরণ করেছেন:

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾

'তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর, যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর এবং তোমরা আল্লাহকে তোমাদের যামিন করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা জানেন। তোমরা সেই নারীর মত হয়ো না, যে তার সূতা মযবূত করে পাকানোর পর তার পাক খুলে নষ্ট করে দেয়। তোমাদের শপথ তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চণা করার জন্য ব্যবহার করে থাক, যাতে একদল অন্যদল অপেক্ষা অধিক লাভবান হয়। আল্লাহতো এর দ্বারা কেবল তোমাদরেকে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তা নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে।'[১৭]

[১৭] সূরাহ্ আন্-নাহ্ল, ৯১-৯২।

## গ. দূত ও সংবাদ বাহকদের নিরাপত্তা দান

ক্রুসেডরা মুসলিম দূতদের হত্যা করত। কিন্তু সালাহ্ উদ্দীন আয়্যূবী সুমহান দ্বীনের বিধান অনুসরণ করে অনুরূপ আচরণ থেকে বিরত ছিলেন। তিনি কীভাবে ক্রুসেডারদের চরিত্র গ্রহণ করবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বিশ্বাসঘাতকতার বদলায় বিশ্বাসঘাতকতা না করে এর পরিবর্তে অঙ্গীকার পালন অতি উত্তম'। ১৯৪৯ সালে চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনে এবং ১৯৭৭ সালে গৃহীত দু'টি পরিপূরক প্রটোকলে উপরিউক্ত বিধানের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়, অথচ ইসলাম দশ শতকেরও অনেক পূর্বে এ বিধান প্রবর্তন করে।

এপ্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোলাম আবূ রাফি'-এর ঘটনা স্মৃতিতে ধরে রাখা উচিৎ। কুরাইশরা তাঁকে একটি পত্র দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রেরণ করেছিল। তিনি এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখার সাথে সাথেই তার অন্তরে ঈমান প্রবিষ্ট হলো। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, 'আমি আর কুরাইশদের নিকট ফিরে যাব না, আমি মুসলিম হয়ে আপনার নিকটই অবস্থান করব। 'এসময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পাদিত চুক্তি ও স্বীয় উন্নত আদর্শের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তাকে জবাব দিলেন, 'আমি চুক্তি ভঙ্গ করতে পারব না। সুতরাং তুমি নিরাপদে ফিরে যাও পরবর্তীতে যদি তুমি তোমার অন্তরে আজকের এ অনুভুতি অনুভব কর তাহলে আবার চলে এসো।'

ইসলামের প্রাথমিক যুগে খুলাফায়ে রাশেদার খিলাফাতকালে এবং দীর্ঘকাল ধরে মুসলিম সেনাপতিগণ এ নীতিতে অবিচল ছিলেন। আল-বালাযূরী রচিত '*ফুতূহুল বুলদান*' গ্রন্থ থেকে এখানে ইসলামের ইতিহাসের একটি ঘটনা উদ্ধৃত করছি, সেখানে মুসলিম নেতৃবৃন্দের উপরিউক্ত নীতিতে অবিচল থাকার প্রমাণ রয়েছে। ঘটনাটি হলো, একদা সমরকন্দবাসীরা খলীফা 'উমার ইব্ন 'আবদিল 'আযীয-এর নিকট একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে অভিযোগ করল যে, বিশ্বাসঘাতকতা করে কুতায়বা ইব্ন মুসলিম তাদের শহরে প্রবেশ করে মুসলিমদেরকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তখন খলীফা 'উমার পার্শ্ববর্তী প্রদেশের গভর্নরের নিকট পত্র লিখে এ মর্মে নির্দেশ দেন, তিনি যেন এ অভিযোগগুলো কাযীর নিকট উত্থাপন করেন। যদি তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে যেন মুসলিমদেরকে সমরকন্দ থেকে বের করে দেন। সত্য সত্যই কাযী জুমাই ইব্ন খাতির এ বিষয়ের সত্যতা যাচাই করে সমরকন্দ থেকে মুসলিমদের বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

ইসলামের এ উদারতা ও বিচারকের ন্যায় পরায়ণতা দেখে সমরকন্দবাসীরা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়।[১৮]

তোমার কী মনে হয়, সশস্ত্র সংঘর্ষের যে সকল মৌলিক নীতি পূর্বসূরী মুসলিমরা অনুসরণ করতো তা পরবর্তী মুসলিমরা আকঁড়ে ধরে আছে কী? আরব ও ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অঙ্গনে তাদের বাস্তব কর্মকা প্রমাণ করে যে, তারা এ নীতি থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। তাঁরা যে পথহারা হয়ে পড়েছে এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। কারণ যখন তারা মুসলিম ফকীহগণের কথা অবজ্ঞা করেছে তখনই তারা উন্নত মূল্যবোধের ধারক ইসলামী ঐতিহ্য থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

আধুনিক মানবিক আইনের বিধি-বিধানের ভিত্তি *'বীরত্ব প্রদর্শনের'* ক্ষেত্রে এ ঘটনাগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। আধুনিক আন্তর্জাতিক স্মারক এবং নীতি প্রবর্তন ও সংকলনের এক হাজার বছরেরও অনেক পূর্বে ইসলামী শরী'আত তা প্রবর্তন করে। আজ আমাদের সে দিনগুলো স্মরণ করা কতই না প্রয়োজন।

## ৩. সশস্ত্র সংঘর্ষে আক্রান্তদের অধিকার

সশস্ত্র সংঘর্ষে আক্রান্তদের অধিকার দু'ধরনের আইনী বিধানে ফুটে উঠেছে।

**প্রথম:** *'হেগ আইন'* যোদ্ধাদের যুদ্ধাস্ত্র প্রয়োগ সীমিতকরণের বিধান পরিষ্কারভাবে ১৮৯৯ সালে প্রথম হেগ শান্তি সম্মেলন, ১৯০৭ সালে দ্বিতীয় সম্মেলনে এবং পরবর্তীতে স্বাক্ষরিত স্মারকসমূহে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

**দ্বিতীয়:** *'জেনেভা আইন'* এ আইনে আহত, নিহত ও বন্দী নির্বিশেষে সশস্ত্র সংঘর্ষে সকল আক্রান্তদের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এমনিভাবে যোদ্ধা ও অ-যোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য করা আবশ্যক ধরে নিয়ে অন্য কারো উপর নয় শুধু যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে। এমর্মে ১৯২৯ ও ১৯৪৯ সালে গৃহীত জেনেভা কনভেনশনে বিভিন্ন ধারায় এ সকল বিধি-বিধান বিধৃত হয়েছে। অতঃপর ১৯৪৯ সালের *জেনেভা কনভেনশনের* চারটি ধারার পরিপূরক দু'টি প্রটোকল উপরিউক্ত আইনের এ শাখা দু'টিকে একত্রে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ফলে তা

[১৮] আল-কাযী ফাদিল দাওলান, আছারুল হারব ফিত-তাশরী'ঈল ইসলামী ওয়াল কানূনিদ্ দাওলী আল-'আম (বাগদাদ : জম'ঈয়্যাতুল হিলাল আল-আহ্মার আল-'ইরাকিয়্যাহ্, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১৭।

> আক্রান্তদের রক্ষার ক্ষেত্রে উদারতা দেখিয়ে প্রভেদ দূরীভূত করে এবং শক্তি প্রয়োগ সীমিতকরণ বাধ্যতামূলক করে দেয়।[১৯]

আমরা যে বিধি-বিধান নিয়ে আলোচনা করছি, তা আন্তর্জাতিক সমাজ ১৯ শতকের শেষভাগে ও বিশ শতকে প্রণয়ন করেছে। আল-কুরআনের অবতরণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফা-ই রাশিদূনের তা বাস্তবায়ন, ফকীহদের ইজতিহাদ এবং সাধারণ বিধি-বিধানের প্রতিষ্ঠা সত্বেও সশস্ত্র সংঘর্ষে আক্রান্তদের রক্ষায় ইসলামী শরী'আত এমন কিছু সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, যা ধরণ, গঠন ও পরিমাপের দিক দিয়ে আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের বিধি-বিধানের অগ্রদূত বলে বিবেচিত হয়েছে।

নিম্নে আক্রান্তদের রক্ষার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা হলোঃ

## ক. সামরিক ও বেসামরিক লোকদের মধ্যে পার্থক্যকরণ

এ পার্থক্যকরণের উদ্দেশ্য হলো, সামরিক শক্তি প্রয়োগকে শুধু সৈন্যবাহিনী ও রাজ কর্মকর্তাদের মধ্যে সীমিতকরণ। ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশনের চারটি ধারায় ও পরিপূরক প্রটোকল দু'টিতে এ বিষয় সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্মভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অথচ অনেক পূর্বেই সেনাপতিদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

প্রথম খলীফা আবূ বাকর (রা) এক সেনাপতির উদ্দেশ্যে তাঁর বাণীতে এ বিষয়টি আরো সুক্ষভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

إنى موصيك بعشر لا تقتلن إمرأة ولا صبيا ولا هرما ولا جريحا ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا نخلا ولاتحرقنها ولاتخربن عامرا ولاتبقرن شاة ولا بقرة ولا تجبن ولاتغلل.

'আমি তোমাকে দশটি বিষয়ে নির্দেশনা দিচ্ছি, নারী, শিশু, বয়োবৃদ্ধ ও আহত ব্যক্তিকে হত্যা করবে না, ফলজ বৃক্ষ ও খেজুর গাছ কর্তন করবে না, জ্বালাও পোড়াও করবে না, কোনো গৃহ ধ্বংস করবে না, ছাগল ও গরু হত্যা করবে না, কাপুরুষতা প্রদর্শন করবে না এবং খেয়ানতও করবে না।'[২০]

---

[১৯] কর্ণেল সাইয়্যেদ হাশিম, *হিমাইয়াতুল মাদানিঈন ফিল আরাদিল মুহ্তাল্লাহ্* (কায়রো: মাতবা'আতুল লাযনা আদ্-দাওলিয়্যাহ্ লিস্-সালীবিল আহ্মার, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ৯।

[২০] তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্ক আল-কাবীর, পূর্বোক্ত, হাদীস নং ৯২১

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেসামরিক মজদুরদের উপর আক্রমণ করতে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদকে বারণ করেছেন। তিনি বলেন, إنه لا يصح قتل العسفاء 'মজদুরদের হত্যা করা বৈধ নয়'।[২১] অনুরূপভাবে তিনি লুটপাট করতে নিষেধ করে বলেন,

ليس منا من انتهب او سلب أو أشار بالسلب

'যে ব্যক্তি লুট করে, সম্পদ হরণ করে এবং এগুলো গর্হিত কাজের নির্দেশনা দেয় সে আমার দলভুক্ত নয়।'[২২]

### খ. শক্তি প্রয়োগ সীমিতকরণ

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, প্রয়োজনের তাগিদে ইসলাম যুদ্ধের অনুমোদন দেয়। যুদ্ধ শুধু শত্রুতা নিরসনের জন্য। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যতটুকু শক্তি প্রয়োগ প্রয়োজন তার মধ্যেই সীমিত রাখা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে কোনো বাড়াবাড়ি করা যাবে না। আধুনিক মানবিক আইনের পরিভাষায় এটি '*শক্তি প্রয়োগ সীমিতকরণ নামেই*' পরিচিত। এ নীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়েই 'উমার (রা) সেনাপতির পদ থেকে খালিদ ইব্নুল ওয়ালীদকে অপসারণ করে তদস্থলে আবূ 'উবায়দাহ ইব্নুল জার্‌রাহকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। কারণ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, খালিদের হাতে বিশাল সংখ্যক শত্রু নিহত হচ্ছে, এ প্রসঙ্গে তাঁর বাণী প্রসিদ্ধ হয়ে আছে 'নিশ্চয়ই খালিদের তরবারীতে অনেক শক্তি রয়েছে,' অন্যদিকে 'উমার (রা) 'আমর ইব্নুল আসের মিসর জয়ের যুদ্ধকে পছন্দ করেছেন। আমর ইব্নুল 'আস তাঁর সেনাবহিনীকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের সাথে চুক্তি করার জন্য ভাগ করে দিয়েছিলেন। তারা কোনো যুদ্ধ করেননি। এ প্রসঙ্গে 'উমার (রা) বলেন, تعجبني حرب بن العاص إنها حرب رقيقة 'ইব্নুল 'আসের যুদ্ধ আমাকে মুগ্ধ করেছে। নিশ্চয়ই এটি বিনম্র যুদ্ধ।'

শক্তি প্রয়োগ সীমিতকরণ যুদ্ধকৌশল পর্যন্ত প্রলম্বিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত বাক্য الحرب خدعة 'যুদ্ধ ধোকা স্বরূপ' যথার্থ। তবে ইসলাম যে ধোকা প্রদান বৈধ করেছে তার আওতায় কখনো প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা অন্তর্ভুক্ত হবে না। স্থল যুদ্ধে বৈধ কৌশল ও অবৈধ কৌশলের পার্থক্যকরণের বিষয়টি ১৯০৭ সালে স্বাক্ষরিত হেগ চুক্তিতে

[২১] ইমাম বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ৮ম খণ্ড ০২, পৃ.৩০২

[২২] ইমাম তারারানী, আল-মু'জামূল কাবীর, হাদীস নং ১২৬১২

২৪ ধারায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু এ বিষয় ইসলাম সহস্রোর্ধ বছর পূর্বে আলোচনা করেছে। এর প্রমাণ স্বরূপ আমরা পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুসলিম সেনাপতির নিকট 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) যা লিখেছিলেন তা উল্লেখ করছি। তিনি বলেন, 'আমার নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, তোমাদের কেউ কেউ আলাজ নামক জনৈক পারসিক নেতাকে খোঁজ করছিল। সে যখন পলায়ন করে দুর্গম সুরক্ষিত পাহাড়ে আশ্রয় নিল, তখন তোমাদের কোনো একজন তাকে বলেছে, ভয় পেয়ো না। অতঃপর সে আশ্বস্ত হয়ে নেমে আসে। বাগে পেয়ে তখন সে তাকে হত্যা করেছে। সে সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যে ব্যক্তি এ কাজ করেছে তার পরিচয় জানার সাথে সাথে আমি তার ঘাড় উড়িয়ে দেবো।'

এটিই হচ্ছে অবৈধ কৌশল, যা প্রতিপক্ষকে আশ্বস্ত করে আক্রমণ করার মত প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। ইসলাম এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে। অতঃপর এক হাজারেরও বেশি বছর পরে হেগ চুক্তির মাধ্যমে তা নিষিদ্ধ করা হয়। বানূ কুরাইযাহর ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রসিদ্ধ গাতফান গোত্রের জনৈক ব্যক্তির সাথে এ বৈধ কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যার মাধ্যমে বৈধ কৌশল এবং প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কৌশলের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব।

## গ. আহত ও রুগীদের অধিকার

ইসলাম আহত ও রুগীদের সাথে সদাচরণ বাধ্যতামূলক করেছে। সুতরাং আহত ও রুগীদের উপর আক্রমণ বৈধ নয়; বরং তাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন এবং তাদের চিকিৎসা প্রদান করা একান্ত আবশ্যক। ক্রুসেড যুদ্ধ খুব দূরের নয়, এতে সালাহ্ উদ্দীন আয়্যূবীর ভূমিকা আমাদের সবার মনে আছে। এ ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, শত্রুপক্ষের সংঘটিত অপরাধের বদলায় অনুরূপ আচরণ ইসলাম হারাম করেছে। সুতরাং মৃতদেহ বিকৃতি করা বৈধ নয়, যদিও তা একটি পাগল কুকুরের মৃতদেহ হোক, যেমনটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। এ প্রসঙ্গে ইসলামের নীতি হলো, যে ব্যক্তি আত্মসমর্পন করেছে, সে যেহেতু আর যুদ্ধরত নয় সুতরাং তার উপর আক্রমণ করা বৈধ নয়। কারণ যুদ্ধরত নয় এমন ব্যক্তির উপর আক্রমণ করা ইসলাম বৈধ মনে করে না। অনুরূপভাবে শত্রুপক্ষের কেউ যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করলে তাকেও হত্যা করা বৈধ নয়। কারণ সে আর যুদ্ধরত নয়। যুদ্ধ আইনের এ ধরনের ব্যতিক্রম বিধান এখন পর্যন্ত আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

## ঘ. নিহতের লাশের ব্যাপারে করণীয়

১৯৪৯ সালের *জেনেভা কনভেনশন* অনুযায়ী নিহত ও পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণকারীর মৃতদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আবশ্যক করা হয়েছে। লাশ বা এর গোপন অঙ্গের অবমাননা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমনিভাবে নিহত ব্যক্তির বিস্তারিত পরিচয় জানা, তার নিজস্ব ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ এবং তার বিস্তারিত বর্ণনা, স্বদেশে প্রেরণ পূর্বক তাকে দাফনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় একান্ত আবশ্যক করেছে।

ইসলামপূর্ব যুগে আক্রমণের সময় ‘আরবে লাশ বিকৃতকরণ ও ক্রোধ চরিতার্থ করার প্রচলন ছিল। কিন্তু বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতদেহসমূহ দাফনের নির্দেশ দেন। অতঃপর ইসলামী শরী‘আতের বিধান অনুযায়ী যুদ্ধের রীতিতে যুদ্ধবিরতির প্রচলন যোগ হয়। যাতে উভয় পক্ষ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাদের আহত ও নিহতদের নিয়ে যেতে পারে। মুসলিম শহীদদের গোসল ব্যতীত শাহাদতের সময় পরিধেয় কাপড় ছাড়া অন্য কোনো কাফন না পরিয়ে দাফন করা হয়। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়, তা হলো একবার উতবাহ ইব্‌ন আমর আল-জুহানী খলীফা আবূ বাকরের দরবারে জনৈক মুশরিকের একটি খণ্ডিত মস্তক নিয়ে উপস্থিত হন, এতে খলীফা রাগ হয়ে যান এবং তাঁর সেনাপতির কাছে লিখে পাঠান, আমার সামনে কোনো মাথা আনবে না। যদি তোমরা এ নির্দেশ না মান তাহলে তোমরা অন্তর্জ্বালা মিটানোর জন্য এ সীমালঙ্ঘন করেছ। আমার নিকট শুধু চিঠি বা সংবাদ প্রেরণ করলেই যথেষ্ট।[২৩]

মুহাম্মাদ ইব্‌নুল হাসান আশ্‌-শায়বানী এ ঘটনার টীকায় লিখেন যে, মাথা যেহেতু লাশেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং এটি নিঃসন্দেহে লাশ বিকৃতির নামান্তর। কষ্ট দূরীকরণার্থে এটিও দাফন করা কর্তব্য। এটিই যথার্থ কাজ, কারণ আল্লাহ্‌ তা‘আলা বলেন,

﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾

‘যে-কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর।’[২৪]

সুতরাং আল্লাহর ভয়ই আমাদেরকে প্রতিহিংসা ও শত্রুর সাথে আচরণের কদর্যতা থেকে মুক্ত রাখবে।

---

[২৩] মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ্‌-শায়বানী, *আস্‌-সিয়ারুল কাবীর* (কায়রো: কায়রো ইউনির্ভারসিটি প্রেস, তা. বি.), পৃ. ২৭৭।

[২৪] সূরাহ্‌ আল-বাকারাহ্‌ : ১৯৪।

### ঙ. বন্দীদের অধিকার ও তাদের সাথে আচরণপদ্ধতি

প্রাচীনকালে বন্দীদের হত্যা করা হতো, তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হতো এবং তাদের অঙ্গহানি করা হত। পরবর্তী পর্যায়ে মানুষের মনে তাদের দ্বারা সেবা নেয়ার চিন্তা আসে। ফলে তাদেরকে দাসে পরিণত করা হতো। জাস্টানিয়ানের আইনসমগ্র পড়লে যে কেউই জানতে পারবে, দাস প্রথার উৎস হলো বন্দীকরণ।[২৫] যুদ্ধবন্দীদের সাথে দাস সুলভ আচরণের পরিবর্তে মানবিক আচরণ প্রতিষ্ঠার পেছনে ফকীহ ও মনীষীদের লিখনীর সুস্পষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা জন জ্যাক রুশো স্বীয় গ্রন্থে *সামাজিক বন্ধন* সম্পর্কে যা লিখেছেন তা উল্লেখ করছি,

'যুদ্ধের উদ্দেশ্য যেহেতু শত্রুরাষ্ট্র ধ্বংস করা; তাই এতে বাধাদানকারী সশস্ত্র ব্যক্তিদের হত্যা করা বৈধ। কিন্তু তারা যখন যুদ্ধাস্ত্র পরিত্যাগ করবে কিংবা আত্মসমর্পণ করবে, তখন তারা দাপটহীন ও জীবনের নিরাপত্তাহীন সাধারণ মানুষে পরিণত হবে। এ অবস্থায় তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার বদৌলতে দাস বৃত্তিতে বাধ্য করা কোনভাবেই বৈধ নয়।'

এ মূলনীতিসমূহ প্রাকৃতিক নিয়ম থেকে উৎসারিত এবং বিবেকের উপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে ১৯৪৯ সালের তৃতীয় জেনেভা স্বারক যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচার-আচরণ, বন্দীদের অধিকার, সাধারণ নাগরিককে রক্ষা এবং যুদ্ধবন্দীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় করণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে। বিষয়টি ব্যাপক হওয়ায় ১৯৭৭ সালের জেনেভা স্বারকচতুষ্ঠয় এবং পরিপূরক প্রথম প্রটোকলে বন্দী সংক্রান্ত আরো বিধি-বিধান সংযোজিত হয়েছে।

ইসলাম আগমনের প্রাক্কালে বন্দীদের হত্যা করা, প্রচণ্ড শাস্তি প্রদান ও দাসবৃত্তিতে বাধ্য করার মধ্যেই বন্দিনীতি সীমাবদ্ধ ছিল। তখন বন্দীদের বিষয়ে ইসলাম কী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছিল? নিম্নে দু'টি প্রধান শিরোনামে বিষয়টি আমরা উপস্থাপন করব। ক. শত্রু-বন্দীদের সাথে মুসলিমদের আচরণ খ. বন্দী-মুক্তি বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি।

### ক. শত্রু-বন্দীদের সাথে মুসলিমদের আচরণ

সৎকার মুসলিমদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾

[২৫] কর্নেল সাইয়্যেদ হাশিম, *মু'আমালাতু আসারিল হারাব ফী যিল্লি আহ্কামিল ইত্তিফাকিয়াতি জানীফ* (কায়রো: মাতবা'আতুল লাজনাহ্ আদ্-দাওলিয়্যাহ্ লিস্-সালিবিল আহ্মার, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ২।

'খাদ্যের প্রতি তাদের আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে।'[২৬]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'বন্দীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর।' এভাবেই হাজার বছরেরও আরো পূর্বে বন্দীদের সাথে ভাল আচরণ করার জন্য মুসলিমদের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, যখন বন্দীদের হত্যা করা হত, কষ্ট দেয়া হত, অঙ্গহানি করা হত পরিশেষে দাস বৃত্তিতে বাধ্য করা হত। আমাদের সৎ পূর্বসূরীগণ শত্রুর ভূমিকা যা-ই হোক না কেন তাদের বন্দীদের প্রতি ভাল আচরণ করার নীতি গ্রহণ করেছেন।

বন্দী হত্যার ক্ষেত্রে তারা মুশরিকদের সমরনীতি গ্রহণ করেনি। রিচার্ড শারদিল নিরাপত্তা প্রদান করেও যখন তিন হাজার মুসলিমকে বায়তুল মাকদিসের সামনে হত্যা করল, তখনও সালাহ্ উদ্দীন আয়্যূবী ইসলামী শরী'আতের বিধি-অনুসরণ করে একজন বন্দীকেও হত্যা করেননি, কিংবা তাদের সাথে খারাপ আচরণও করেননি; বরং মুসলিমরা আল-কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ী তাদের হাতে বন্দীদের সাথে ভাল ব্যবহার করেছে। মুসলিমরা পানাহারের সময় বন্দীদেরকে প্রাধান্য দিয়েছে।

## খ. ইসলামের আলোকে বন্দী মুক্তি

ইসলামে বন্দীমুক্তি বিষয়ে ইতোপূর্বে অনেক আলোচনা হয়েছে। তবে কেউ কেউ মৌলিক বিধি-বিধানের স্থলে বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত ঘটনার প্রতি বেশি মনোনিবেশ করেন। এখানে আমরা গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতিসমূহ সাধারণভাবে আলোচনা করব।

বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বাকর সিদ্দীক (রা)-এর পরামর্শ গ্রহণ করে মুক্তিপণ দিয়ে বন্দীদের মুক্তি দেন। মক্কা বিজয়ের সময়ে পুনরায় বন্দীমুক্তির ঘটনা ঘটে। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, اذهبوا فانتم الطلقاء 'চলে যাও তোমরা আজ মুক্ত।' শুধু এ দু'টি ঘটনাই নয়, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামামার নেতা ছুমামাহ ইব্নুল আছালকেও মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দেন।

---

[২৬] সূরাহ্ আদ্-দাহর: ৮।

কোনো প্রকার পণ ব্যতীত, মুক্তিপণ (সম্পদ বা ইমাম আশ্-শাফি‘ঈ এর মতে অন্য বন্দী) দ্বারা অথবা অনুগ্রহ করে বন্দী মুক্তির বিষয়টি ও এতদসংক্রান্ত নীতিমালার ক্ষেত্রে মৌলিক বিধান নিম্নোক্ত আয়াতে বিধৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾

‘অতএব তোমরা যখন (যুদ্ধের ময়দানে) কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত কর। পরিশেষে তোমরা যখন তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করবে তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেধে নাও। তারপর হয় অনুগ্রহ না হয় মুক্তিপণ আদায় কর, যতক্ষণ না যুদ্ধ তার বোঝা রেখে দেয়।’[২৭]

কোন নির্দিষ্ট অবস্থায় যখন মুসলিমদের শত্রুরা মুসলিম বন্দীদেরকে দাসবৃত্তিতে বাধ্য করবে এবং বাজারে বিক্রয় করবে, এরূপ অবস্থায় মুসলিমরাও তাদের শত্রুদের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করবে। তাদের বন্দীদেরকেও দাসবৃত্তিতে বাধ্য করবে। যাতে মুসলিম বন্দীদের উপর শত্রুদের জুলুমের মাত্রা কম হয়। এ বিধানটি নিম্নোক্ত আয়াতের আলোকে প্রণীত হয়েছে,

﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾

‘সুতরাং যে তোমাদের উপর আক্রমণ করেছে, তোমরা তার উপর আক্রমণ কর, যেরূপ সে তোমাদের উপর আক্রমণ করেছে।’[২৮]

মুসলিমদের পক্ষ থেকে শত্রুদের সাথে সমআচরণ নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে বেষ্টিত থাকবে। শত্রুপক্ষ মুসলিম বন্দীদের হত্যা করলেও তাদের কোনো বন্দীকে হত্যা করা বৈধ হবে না। যেমনটি রিচার্ড শারদিল (লায়ন হার্ট) মুসলিম বন্দীদের হত্যা করলেও সালাহ্ উদ্দীন আয়্যুবী ক্রুসেডার বন্দীদের বিষয়ে যে ভূমিকা নিয়েছিলেন আমরা তা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি তাদের কোনো বন্দিকে হত্যা করেননি।

---

২৭ সূরাহ্ মুহাম্মাদ: ৪।

২৮ সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯৪।

## উপসংহার

আরবীয় ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যোদ্ধাও সশস্ত্র সংঘর্ষে আক্রান্তদের অধিকার সম্পর্কিত শর'ঈ বিধানের এ হলো যথাসাধ্য উপস্থাপন। ফিক্হ গ্রন্থাবীলতে *সিয়ার* ও *মাগাযী* অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে ফকীহগণ মৌলিক বিধানের উপর ভিত্তি করে অনেক শাখা-মাস'আলা উদ্ভাবন করেছেন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁরা কিছু মৌলিক বিধানও উদ্ভাবন করেছেন। ফলে তাঁদের এ উদ্ভাবনই আধুনিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইনকে পরিপূর্ণতা দান করেছে। বর্তমানে সশস্ত্র সংঘর্ষে আক্রান্তদের রক্ষার জন্য আধুনিক আইনের আরো ব্যাপকতা প্রয়োজন। ইসলাম অনেক পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিজ্ঞান সম্মত ধারণা প্রদান করেছে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, যদিও যুদ্ধ প্রয়োজনেই সংঘটিত হওয়া উচিৎ, কিন্তু এর অস্তিত্ব বড় প্রাচীন। যেমনটি ইব্ন খালদূন বলেছেন, 'যুদ্ধ আল্লাহর মানব সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই বিদ্যমান।' এক্ষেত্রে বিবেকের দাবি, যে-কোন বিধানকে সম্মান করার জন্য সে বিধান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আধুনিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিধানসমূহ বিশেষ করে ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশনের চারটি সনদে স্বাক্ষরকারী সকল রাষ্ট্রের উচিৎ সংশ্লিষ্ট সকল আইনের ব্যাপক প্রচার করা। তবে মুসলিম ব্যক্তির জন্য এর প্রচার-প্রসারের কাজ অত্যন্ত সহজ। কেননা সশস্ত্র সংঘর্ষে আক্রান্তদের সম্পর্কিত সর্বজন স্বীকৃত এ বিধান যদিও মানব রচিত, কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রবর্তিত মহান আল্লাহর নির্দেশনাও অনুরূপ। কেননা মুসলিমরা দ্বীন ইসলামের বিধানকে সম্মান করে থাকে। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে দ্বীনী অনুভূতি জাগ্রত করা উচিত। সাম্প্রতিককালে আমরা আরব ও মুসলিমদের মাঝে যে সশস্ত্র সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ করছি এরূপ ধ্বংসজ্ঞ বন্ধ করার জন্য ইসলামী শরী'আত ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের সৎ পূর্বসূরীদের আদর্শের দিকে আমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন করা কর্তব্য।

এমনিভাবে যোদ্ধা ও সশস্ত্র সংঘর্ষে আক্রান্তদের অধিকার সম্পর্কে আরব ও মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গিও সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। আরব ও মুসলিমদের এ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তাদের লেখনী ও চিন্তাধারার ব্যাপক প্রসার ঘটানো উচিৎ। তাদের পক্ষ থেকে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণ কখনো এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবেন না। আমরা সুমহান ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় এমন কিছু শিক্ষণীয় বিষয় পাব, যা আরব ও মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘটিত সংঘর্ষ নিরসনে আক্রমণ ও শক্তি প্রয়োগকে নিষেধ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত

বাণী আরব ও মুসলিমদের অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

'আর যদি মুমিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা কর এবং ন্যায় বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের ভালবাসেন। নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে।'[২৯]

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রতিভাত হয় যে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন কোনো অবস্থায়ই ইসলামের গন্ডির বাইরে বের হতে পারেনি; বরং এর অধিকাংশ বিধি-বিধানের মূল উৎস হলো এ সুমহান দ্বীন ইসলাম। মহান আল্লাহ আমাদেরকে মানবতার, আরব ও মুসলিমদের কল্যাণ করার তাওফীক দিন। নিশ্চয়ই তিনি উত্তম অভিভাবক এবং উত্তম সাড়া প্রদানকারী।

[২৯] সূরাহ আল-হুজুরাত: ০৯।

# ইসলামী শরী'আত ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে যুদ্ধাক্রান্তদের সুরক্ষা*

**কর্নেল আহমাদ 'আলী আল-আনওয়ার****

## ভূমিকা

মানব ইতিহাসের সূচনা থেকে সকল যুগে যুদ্ধ বিগ্রহ মানুষের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিগণিত। যুগ যুগ ধরে চলে আসা এ যুদ্ধ বিগ্রহ প্রতিনিয়তই নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুর ও হিংস্র থেকে হিংস্র হতে চলছে। এর ফলে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছে বিভিন্ন দেশ, অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়েছে বহু সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী। নিশ্চিহ্ন হয়েছে বহু সভ্যতার নিদর্শন ও জাতীয় সম্পদ। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্রের আবিষ্কার এ হিংস্রতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। এ সকল যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্য দিয়ে মানব ইতিহাসে সৃষ্টি হয়েছে বহু ক্ষত ও আঘাতের। গত শতাব্দিতে ঘটে যাওয়া দুই বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ক্ষতির কথা কারো অজানা নয়। এর পূর্বে ও পরে এ জাতীয় বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। পৃথিবীর ৫০০০ বছরের ইতিহাসে ১৪০০০টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং বিগত ৩৪০০ বছরের মধ্যে এ বিশ্ব শান্তিপূর্ণ ২৫০ বছরও দেখেনি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সংঘটিত মহামারীতে ২১০ মিলিয়ন ছাড়াও কেবল যুদ্ধের শিকার হয়েই নিহত হয় ১ কোটি মানুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহতের পরিমাণ ৪ কোটি ছাড়িয়ে যায়।[১] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হতে গত ৪৫ বছরের মাঝে ৬২ টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এর সর্বশেষটি হলো দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধ। সর্বশেষে সংঘটিত যুদ্ধগুলো ক্ষতিগ্রস্ততার মাত্রা, ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতা, বেসামরিক লোকদের ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া, বহু দেশের অর্থনৈতিকভাবে ভেঙ্গে পড়া ও তার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়া ছাড়াও যুদ্ধ এরিয়ার বাইরে অবস্থিত পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের উপরও এর অশুভ প্রভাব পড়ে।

---

* প্রবন্ধটি রেড ক্রস কর্তৃক প্রকাশিত আন্তর্জাতিক জার্নাল, ২৯ তম সংখ্যা (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) ১৯৯৩ খ্রি., থেকে গৃহীত, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা পৃ. ১২-২৮।

** কর্নেল আহমাদ 'আলী আল-আনওয়ার মিসরের সামরিক কেন্দ্রের প্রধান। তিনি আইন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। সানরিমুতে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ২৯তম প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি জেনেভায় আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের শিক্ষকদের মধ্যে সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি মিসরে বিভিন্ন সামরিক ক্যাডেট প্রতিষ্ঠানগুলোতে যুদ্ধ আইন বিষয়ে পাঠদানের জন্য নিয়োজিত রয়েছেন। এছাড়া মিসরের সেনাবাহিনীর বাৎসরিক প্রশিক্ষণ ও সশস্ত্র মহড়ার ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১ এ পরিসংখ্যান জেনেভায় অবস্থিত ''*হেনরি ডুন্যান্ট ইনষ্টিটিউট*''-এর তথ্য) থেকে নেয়া।

এ সব কারণেই একান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে যুদ্ধের প্রতি আশ্রয় নেয়ার ব্যাপারে ক্ষমতা সীমিত করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এব্যাপারে স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চুক্তি ও সনদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, *নেশনস্ লীগসনদ, ব্রায়ান কিলোগ* চুক্তি ও *জাতিসংঘ সনদ* ইত্যাদি। সর্বশেষটি তার সদস্য দেশগুলোর অস্ত্র ও শক্তির ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। চাই তা রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিংবা শান্তি ও নিরাপত্তা পরিবেষ্টিত যে কোনো অঞ্চলের বিরুদ্ধে হোক। এতদসত্ত্বেও যুদ্ধ একটি বাস্তব সত্য, যা সংঘটিত হওয়া সময়ের অনিবার্য দাবি। এটি মানব সমাজের ঘৃণা ও অনিচ্ছার পাত্র হলেও বিভিন্ন সময়ের চাহিদা পূরণে এর বিকল্প নেই। ফলে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এমন কতিপয় নিয়মনীতি প্রণয়নের যা অবাধে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া এবং সশস্ত্র সংঘর্ষে অস্ত্রের ব্যবহার সীমিত করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করবে। যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যুদ্ধের ক্ষতি ও লোকসানের পরিমাণ কমিয়ে আনা এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে মারণাস্ত্রের ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।

১৮৫৯ সালে হেনরি ডুনান্ট তার স্মৃতিগ্রন্থ *‘সালফোনিয়ার যুদ্ধের ইতিবৃত্ত’* প্রকাশের মাধ্যমে *‘আন্তর্জাতিক মানবিক আইন’* বাক্যটির ব্যবহার শুরু হয়। তিনি এ গ্রন্থে ইতালির *লোমবারডি* শহরে *সালফোনিয়া* যুদ্ধের কারণে বেসামরিক লোকদের যে ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল তার সচিত্র বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘সামান্য চিকিৎসা ও সেবার অভাবে বহু প্রাণ ঝরে পড়ে, সামান্য মনোযোগ ও কিছু পদক্ষেপের ফলে বহু প্রাণ রক্ষা সম্ভব হতো। এ ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠা করা হয় ইন্টারন্যাশনাল এক কমিটির যার মাধ্যমে যুদ্ধাহতদের সেবা ও চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হবে এবং এ ব্যাপারে ১৮৬৪ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়, রণাঙ্গনে আহত সেনাদের সুচিকিৎসা দেয়া এবং সেবার মাধ্যমে তাদের জীবন রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করা। এরপর এ কাজে এগিয়ে আসে *সেন্ট পিটার্সবার্গ চুক্তি* (১৮৬৮), *হেগ কনভেনশন* (১৮৯৯ ও ১৯০৭), *জেনেভা চুক্তি* (১৯২৯) এবং সর্বশেষ ১৯৪৯ সালে সম্পাদিত প্রসিদ্ধ ৪টি *জেনেভা চুক্তি* ও ১৯৭৭ সালে যুক্ত হওয়া *দু’টি প্রটোকল* বা সংযুক্তিপত্র।

এ সকল সনদ ও চুক্তিপত্রের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে মানুষের ঐ সকল গুরুত্বপূর্ণ অধিকার, যা অনাকাঙ্খিত বিভিন্ন যুদ্ধ ও বিগ্রহে ব্যাহত হচ্ছে। এ সনদের মূল উদ্দেশ্য হলো, যুদ্ধের ক্ষতি থেকে সাধারণ ও বেসামরিক লোকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তাদের জান ও মালের রক্ষার দায়িত্ব পালন করা। এ কারণে তারা যুদ্ধের নির্ধারিত পদ্ধতির বাইরে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করছে এবং এমন সব

অস্ত্রের ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, যা যুদ্ধের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেমনিভাবে এ চুক্তিসমূহ চুক্তিবদ্ধ দেশসমূহের উপর এ মর্মে আদেশ জারি করেছে, যাতে তারা তাদের সেনাসদস্যদের এ বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দিতে পারে এবং রণাঙ্গনে এর যথাযথ বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত করতে পারে।

আমরা এ বিষয়টিকে বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্তভাবে উপসংহারসহ ছয়টি অংশে ভাগ করব:

১. যুদ্ধের নিয়মনীতি ও 'আন্তর্জাতিক মানবিক আইন'-এর প্রচার ও প্রসার করা।

২. ইসলামী শরী'আহ্ ও জেনেভা চুক্তির আলোকে যুদ্ধে আক্রান্ত লোকদের ব্যাপারে অবস্থান স্পষ্ট করা।

৩. ইসলামে যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে আচরণ ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার বিষয়ক আলোচনা।

৪. নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য বিশেষ নিয়মনীতি।

৫. যুদ্ধে আহত ও নিহতদের অবস্থা।

৬. উপসংহার।

## প্রথম অংশ

### ১. যুদ্ধের নিয়মনীতি ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইন-এর প্রচার ও প্রসারের আবশ্যকতা

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ আন্তর্জাতিক এ ধারাকে তাদের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং তা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের রূপরেখা নির্ধারণ করেছে। পাশাপাশি এর প্রচার ও প্রসারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। মিসরের সংবিধানে বলা হয়েছে, '*গণপ্রজাতন্ত্রী মিসরের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক এ চুক্তি ও সনদকে সর্বান্তকরণে মেনে নেয়া হয়েছে এবং সরকারী গেজেটের মাধ্যমে এর প্রচার-প্রসারের বিষয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে*। মিসর এটিকে তাদের রাষ্ট্রীয় বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতঃ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে এটির সুষ্ঠু প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য। মিসর ১৯৪৯ সালে জেনেভায় স্বাক্ষরিত সনদ চতুষ্টয়ের সঙ্গেও একাত্মতা ঘোষণা করেছে। ফলে এটি অভ্যন্তরীণ আইনের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

স্বাক্ষরিত সে সনদে সাধারণ জনগণ এবং বিশেষতঃ সশস্ত্র যুদ্ধের যোদ্ধাদের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধি-বিধান এবং নীতিমালার প্রচার বিষয়ক কতিপয় ধারা বিবৃত হয়েছে। তন্মধ্যে ১ম চুক্তির ৪৭ নং, ২য় চুক্তির ৪৮ নং, ৩য় চুক্তির ১২৭ নং, ৪র্থ চুক্তির ১৪৪ নং, ১ম সংযুক্তির ৮৩ ও ৮৭ নং এবং ২য় সংযুক্তির ১৯ নং ধারা সবিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য।

জাতিসংঘও তাদের প্রকাশিত ১৯৭৩ এর ৩১০২ নং, ১৯৭৫ এর ৩৫০০ নং, ১৯৭৬ এর ৭৭ নং, ১৯৭৭ এর ৯৭ নং ধারায় প্রতিটি রাষ্ট্রে অস্ত্রের ব্যবহার বিধিসম্মত করা এবং এগুলোর বাস্তব প্রয়োগের বিষয়ে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানোর কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়াও রেড ক্রস আয়োজিত বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (যাতে মিসরের অংশগ্রহণ ছিল সর্বদা সক্রিয়) অনুমোদিত বিভিন্ন ধারা ও যুদ্ধসম্পর্কিত নিয়মনীতি ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের প্রসার একটি অতি জরুরী বিষয় বলে মিসর আখ্যা দিয়েছে, যার কোনো বিকল্প নেই। এ সকল নিয়মনীতির প্রসারে মিসরের এগিয়ে আসা কেবল এ জন্য নয় যে, মিসর তার অনুমোদন দিয়েছে; বরং মিসরতো ঐ সকল রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত যারা ঐ সকল বিধি-বিধান প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে যা আজ বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর সভ্যতার নিদর্শন ও প্রমাণ হিসেবে কাজ করছে। এর সাথে সম্পর্কিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, যা জেনেভা চুক্তির ২য় সংযুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো প্রতিটি সদস্য দেশগুলোর কর্তব্য হলো তারা তাদের সেনা সদস্যদের জন্য স্তরভেদে কতিপয় উপদেষ্টা নিয়োগ দেবে, যাদের দায়িত্ব হবে, যোদ্ধাদের প্রতিটি মূহূর্তে যুদ্ধের সঠিক নিয়মনীতি ও মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত অগ্র-পশ্চাতে বিভিন্ন অবস্থার সঠিক সমাধান তুলে ধরা।

যুদ্ধের এ সকল নিয়ম-নীতির প্রশিক্ষণ প্রদান ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যদেরকে এর অনুশীলন করার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, যোদ্ধাদেরকে আপন অধিকারের বিষয়ে সচেতন করে গড়ে তোলা, যা আন্তর্জাতিক মানবিক আইন তাদের জন্য নিশ্চিত করেছে। বিশেষতঃ যখন তারা আহত, অসুস্থ হয় কিংবা বন্দি হয়ে আসে অথবা কোনো কারণে যুদ্ধবৃত্ত থেকে ছিটকে পড়ে। উপরন্তু এ আইনকে গভীরভাবে জানার ফলে এর সঠিক বাস্তবায়ন তাদের জন্য অধিকমাত্রায় সহজ হয়ে যাবে। অজানা অবস্থায় তাদেরকে এর বাস্তবায়নের উপর চাপ প্রয়োগের সুযোগ থাকবে না। এ সকল নিয়ম-কানূন সম্পর্কে কমবেশি জ্ঞানলাভ সকল শ্রেণির যোদ্ধা সশস্ত্র সংঘর্ষে তার অবস্থান ও কর্তব্য বুঝার ক্ষেত্রে সহযোগী ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি যে কোনো কাজের নিয়ম-নীতি ও প্রয়োগপদ্ধতি জানা উক্ত কাজের উপর তাকে দায়িত্বশীল বানিয়ে দেয়।

অনুরূপভাবে সৈন্যদলকে যুদ্ধের কলাকৌশল ও তার বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেয়ার ফলে তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বহু গুণে বেড়ে যায়। এছাড়া এটি রণাঙ্গনে যুদ্ধ চলাকালীন পরিস্থিতি বুঝা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে তারাও পরবর্তীদের এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে উৎসাহ প্রদান করবে।

মিসর সর্বদা তার সেনা সদস্যদেরকে দেশের প্রতি মমত্ববোধ ও অঙ্গীকার পূরণের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। মিসরের সশস্ত্র বাহিনী রাষ্ট্রের অন্যান্য বাহিনীর থেকে অধিক পরিপক্ক ও দক্ষ। একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত মিসরীয় সেনা সদস্যদেরকে সর্বদা কোন পরামর্শক পরামর্শ দিয়ে আসছে। তাদের সশস্ত্র বাহিনী যুদ্ধের নিয়মনীতি ও কলাকৌশল ভালোভাবে রপ্ত করে উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ করতঃ তা বাস্তব প্রয়োগে অগ্রগামী হয়। বিধায় তাদের ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ অন্যান্য প্রশিক্ষণ থেকে কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা যায়। মিসরীয় সশস্ত্র বাহিনী মানব কল্যাণে প্রণীত আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও যুদ্ধের আইন-এর প্রচার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এটি একদিকে যেমন জেনেভা আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে অন্যদিকে ইসলামী শরী'আহ্‌কে নিজের বিশ্বাস ও কর্মের সাথে মিলিয়ে আমলে আনে।

ইসলামী শরী'আত চৌদ্দশ বছর পূর্বেই মানব কল্যাণে যে নীতি ও আদর্শের কথা বলেছে, তা আজও মানব সভ্যতাকে বিকশিত করে, সম্মান বৃদ্ধি, তার কষ্টকে লাঘব করে, এছাড়া অধিকৃত সম্পদের ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্য যে সকল আইন-কানূন প্রণীত হয়েছে, তা অনেক উচ্চাসনে অবস্থান করছে।

## দ্বিতীয় অংশ

### ২. ইসলামী শরী'আত ও জেনেভা কনভেনশনের আলোকে যুদ্ধ কবলিতদের অবস্থা

প্রতিটি রাষ্ট্র তার যোদ্ধাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান বলে মনে করে। কেননা তারাই তো তাদের দেশ রক্ষা করে, দেশের জনগণের হয়ে যুদ্ধ করে এবং সাংবিধানিক বৈধতাকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। জীবন বাজি রেখে তারা সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে সংগ্রাম করে থাকে। তাদের কেউ যদি আঘাত প্রাপ্ত হয় কিংবা নিহত হয় অথবা বন্দি হয় অথবা কোনো কারণে যুদ্ধবৃত্তের বাইরে চলে যায়, তাহলে তার সাথে অনুরূপ আচরণ করা উচিৎ যা তার সম্মানকে রক্ষা করে এবং তার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখে। নিঃসন্দেহে সে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে কোনো অপরাধ করেনি; বরং সকলের পক্ষ থেকে পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছে মাত্র।

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন যুদ্ধে আক্রান্তদের অধিকার আদায় এবং জীবনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে। এ আইন প্রতিটি রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য ও যোদ্ধাদের উপর আবশ্যক করে দেয় যে, তারা যেন অন্য পক্ষের যুদ্ধে আক্রান্তদের সাথে সদাচরণ করে। যতটুকু সম্ভব ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনে ও কষ্টের পরিমাণ হ্রাস করার চেষ্টা করে। এ আইন অনুসারে নিম্নোক্ত শ্রেণির লোকেরা যুদ্ধ থেকে নিষ্কৃতি ও সম্পূর্ণ নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার রাখে। যথা: রণাঙ্গনে আহত ও অসুস্থ ব্যক্তি, সমুদ্রে নিমজ্জিত ব্যক্তি এবং বন্দি, যুদ্ধ সংঘটিত এলাকা এবং অধিকৃত এলাকাসমূহে অবস্থানরত বেসামরিক লোক।

এখানে আমরা জেনেভা চুক্তি ও ইসলামী শরী'আতে বর্ণিত বন্দি শ্রেণির সাথে সম্পর্কিত সুরক্ষামূলক বিশেষ বিধানগুলো আলোচনা করব এবং এর মাঝে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করব। কেননা নিয়মতান্ত্রিকভাবে যাদের নিরাপত্তা সবচেয়ে বেশি তারা হলো বন্দি সম্প্রদায়। অথচ না জানার কারণে তাদের অধিকার সব চাইতে বেশি খর্ব হয় এবং তারা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এ শ্রেণির জন্য আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও ইসলামী শরী'আত অনেক ধারা প্রতিষ্ঠা করেছে। কারণ, এরাই নিজের জীবনকে ভুলে গিয়ে দেশ ও তার মাটির জন্য প্রাণপণে লড়াই করেছে। এরপর অন্যান্য শ্রেণির অধিকার নিয়েও আলোচনা করব।

### ৩. জেনেভা চুক্তির আলোকে যুদ্ধবন্দি

নিম্নোক্ত শ্রেণির মধ্য হতে যে কোনো এক শ্রেণির সাথে সম্পর্ক রাখলেই তাদেরকে বন্দি বলে ধরে নেয়া হবে, যখন তারা শত্রুর হাতে ধরা পড়বে:

ক. সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যে কোনো দল এবং ঐ স্বেচ্চাসেবক ইউনিট যারা সশস্ত্র দলের সঙ্গে যুদ্ধের মাঠে এসেছে।

খ. ঐ সকল লোক যারা সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িত হয়নি কিন্তু মূল দলের সঙ্গে রণাঙ্গনে এসে সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালন করছে এবং যুদ্ধের বাইরে অন্যান্য দায়িত্ব পালনে অবদান রেখেছে, এরাও যদি সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রদত্ত আইডি কার্ড বহন করে, তাহলে এদেরকেও যুদ্ধবন্দির অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

গ. অনাধিকৃত এলাকায় বসবাসকারী লোকজনও যদি স্বেচ্ছায় আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে এবং এ ক্ষেত্রে যুদ্ধের সাধারণ নিয়মনীতি অনুসরণ করে, তবে তাদেরকেও যুদ্ধবন্দির অন্তর্ভুক্ত ধরে নেয়া হবে।

ঘ. ঐ সকল স্বেচ্ছাসেবক যোদ্ধা যারা একক বা দলীয় প্রচেষ্টায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিম্নোক্ত শর্ত মেনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং রণাঙ্গনের ভেতর অথবা বাইরে কাজ করে তবে তাদেরকেও যুদ্ধবন্দির অন্তর্ভুক্ত ধরে নেয়া হবে। এক. তারা কোনো নেতার দায়িত্বে বা নেতৃত্বে আসবে। দুই. নির্ধারিত আলামত বা চিহ্ন ব্যবহার করা, যার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এরা যোদ্ধা। তিন. সরাসরি অস্ত্র বহন করা। চার. যুদ্ধনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

ঙ. যোদ্ধাদের বহনকারী পানির জাহাজ কিংবা বিমানের চালক, কলা-কৌশলী কিংবা যুদ্ধরত দু'টি পক্ষের যে কেউ।

চ. সশস্ত্র বাহিনীর ঐ সকল সদস্য যারা প্রতিপক্ষের অনুমতি ছাড়াই যুদ্ধে অবতরণ করে।

## ৪. ইসলামী শরী'আতে যুদ্ধবন্দি

ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে যারা সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেবে কিংবা মূল দলকে সহযোগিতা করবে তারা যখন মুসলিমদের হাতে জীবিত ধরা পড়বে তখন তাদেরকে বন্দি বলে আখ্যায়িত করা হবে। বন্দি করা ইসলামে বৈধ। এ ব্যাপারে আল-কুরআনের নির্দেশনা হলো, ﴿وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ﴾ "আর তোমরা তাদেকে ধরো ও বন্দি করে রাখো।"[২] আরো বলা হয়েছে, ﴿فَشُدُّوا الْوَثَاقَ﴾ "তোমরা তাদের বন্ধন মজবুত করো।"[৩] এটিও বন্দি করার দিকেই ইঙ্গিত বহন করে।

## ৫. যাদেরকে বন্দি হিসেবে গণনা করা যাবে না

ক. গোয়েন্দা (সশস্ত্র বাহিনীর ঐ সকল সদস্যদেরকে গোয়েন্দা মনে করা যাবে না, যারা শত্রুর এলাকাতে ঢুকে তাদের বাহিনীর সুবিধার জন্য কোনো তথ্য সংগ্রহ করে এবং সে যথারীতি সামরিক পোষাক পরিধান করে থাকে।)

খ. ভাড়াটে যোদ্ধা।

গ. যারা বিদ্রোহ করে প্রতিপক্ষের সাথে হাত মেলায়।

---

[২] সূরাহ্ আত্-তাওবা: ৫।

[৩] সূরাহ্ আত্-তাওবা: ৪।

## ৬. ধর্মীয় পন্ডিত ও চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত লোকদের জন্য বিশেষ আইনী ব্যবস্থা

ধর্মীয় পন্ডিতগণ এবং ধর্মীয় সংস্থাসমূহের সদস্য অনুরূপভাবে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত বিভিন্ন ইউনিটের সদস্যদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তামূলক আইনী ব্যবস্থা নেয়া হবে। এটি যোদ্ধাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির সাথে সংশ্লিষ্ট। তাদের জন্য এমন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যাতে তারা নির্ভয়ে ও আশঙ্কা মুক্ত হয়ে নিজেদেরকে দায়িত্ব পালনে জীবন উৎসর্গ করে দিতে পারে। সুতরাং তাদেরকে বন্দি করা এবং তাদের দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করা বৈধ নয়। তবে তারা যদি কেবল তাদের যোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দিতে চায় এবং তাদের বন্দিদের খেদমত করতে চায়, তাহলে তাদেরকে যে-কোন বাধা দেয়া বৈধ। অনুরূপভাবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার পক্ষ থেকে নিয়োজিত চিকিৎসা ইউনিটকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দিতে হবে এবং তাদেরকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানানো যাবে না। এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক আইন অধিকৃত রাষ্ট্রকে নির্দেশ দিয়েছে যে তারা যেন মানবতার দিকে লক্ষ্য করে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত লোকদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে যাতে এ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ নির্বিঘ্নে সকলের কাছে সেবা পৌঁছে দিতে পারে। চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত লোকদের উচিৎ তারা যেন আহত ও অসুস্থ সবাইকে সমান চোখে দেখে। কারো প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ না করে।

## ৭. জেনেভা আইনে উল্লিখিত যুদ্ধবন্দিদের জন্য সাধারণ সুরক্ষা

১৯৪৯ সালের ৩য় জেনেভা চুক্তিতে যুদ্ধবন্দিদের জন্য কতিপয় অধিকার বিধি-বদ্ধ করা হয়েছে। নিম্নে সেগুলোর মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অধিকার তুলে ধরা হলোঃ

ক. বন্দিদেরকে বন্দিকারীর অধীন নয়; বরং রাষ্ট্রের অধীন মনে করতে হবে এবং বন্দিদের সাথে কীরূপ আচরণ করা হলো সে বিষয়ে রাষ্ট্র জিজ্ঞাসিত হবে।

খ. বন্দির ক্ষেত্রে সর্বদা মানবিক দিকটি প্রাধান্য দেয়া। তার উপর কোন অভিজ্ঞতা প্রয়োগ কিংবা এমন কোনো আচরণ করা বৈধ নয়, যার দ্বারা তার অঙ্গহানী কিংবা বড় ধরনের ক্ষতির আশংকা থাকে। ১৯৪৯ সালের তৃতীয় জেনেভা চুক্তির আলোকে বন্দি অবস্থায় বন্দির কোনো শারীরিক ক্ষতি হতে পারে এমন আচরণ কিংবা তার মৃত্যুর সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে এমন আচরণ সম্পূর্ণ পরিহার করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

গ. বন্দির ব্যক্তি মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। রূঢ়তা, অপদস্ততা, তুচ্ছ করা কিংবা লাঞ্ছনার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকানো, সর্বাবস্থায় এগুলো তার মানবিক অধিকারের বাইরে বলে ধরে নেয়া হবে।

ঘ. নারী বন্দিদেরকে ভিন্ন স্থানে রাখা এবং তাদের উপযোগী আবাসন ও আহার্যের ব্যবস্থা করা।

ঙ. বন্দিদের জন্য সম্পূর্ণ বেসামরিক জীবন যাপনে ব্যবস্থা করতে হবে। যেমনটি আমরা তাদের নিকট বন্দি হলে প্রত্যাশা করতাম।

চ. শ্রেণি, জাতীয়তা, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং রাজনৈতিক মতবাদে ভিন্নতার কারণে সুযোগ সুবিধা কমানো বাড়ানো না করা।

ছ. নিয়মিত মেডিকেল চেকআপ এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্য ঠিক রাখার লক্ষ্যে আরামদায়ক ব্যবস্থা করা। তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে প্রেরিত চিঠিপত্র তার নিকট পৌঁছানো এবং সে পাঠাতে চাইলে তা পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

## তৃতীয় অংশ

### ৮. ইসলামে যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে আচরণ

ইসলাম বন্দিদের সাথে দয়া ও নম্র আচরণ এবং তাদের দেখভাল ও খোঁজ খবর নেয়ার আহ্বান জানায়। ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদর যুদ্ধের বন্দিদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্য ছিলো, 'তোমরা বন্দিদের সাথে উত্তম আচরণ করো এবং তাদের কল্যাণের প্রতি খেয়াল রেখো।' এর আলোকে ফিক্বিদগণ বলেছেন, 'বন্দিদেরকে কোনো প্রকার কষ্ট দেয়া জায়েয নয়।' বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ কুরায়যার বন্দিদের ব্যাপারে বলেছিলেন, যখন তারা প্রচন্ড তাপের মধ্যে পড়েছিলো, 'তোমরা তাদের উপর দিবসের উত্তপ্ততা ও অস্ত্রের উত্তপ্ততা একত্রিত করো না। তোমরা তাদেরকে ছায়ায় নিয়ে যাও এবং ঠান্ডা হওয়ার সুযোগ দাও।'

### ৯. জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী বন্দিদের থেকে যে সকল তথ্য চাওয়ার অনুমতি আছে

জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী বন্দিদের উপর রিমান্ডের নামে শারীরিক কিংবা মানসিক চাপ প্রয়োগ করে কোনো কিছু জানতে চাওয়া যাবে না। তবে তাদের নিকট হতে

তার নাম, পদ, জন্ম তারিখ, গ্রুপের নাম ও নম্বর ইত্যাদি বিষয় জানতে চাওয়ার অধিকার রয়েছে। এ কারণে প্রতিটি যোদ্ধার উচিৎ তার পরিচয় সম্বলিত আইডি কার্ড বহন করা।

## ১০. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের দৃষ্টিতেও বন্দির নাম ও পরিচয় জানতে কোনো বাধা নেই। তবে তাদের সৈন্যদলের ব্যাপারে কোনো তথ্য জানার জন্য জবরদস্তি করা যাবে না। কেননা এমন মুহুর্তেও সে নিজের দেশের প্রতি অনেক বেশি অনুরাগ দেখাতে পারে এবং স্বদেশের কল্যাণে কোনো তথ্য কাউকে দিতে চাইবে না; বরং সে নিজের দেশকে অন্য দেশের উপর প্রাধান্য দেবে এবং তাদের গোপন তথ্য কাউকে সরবরাহ করাকে দেশ ও তার মাটির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করবে। যেমনিভাবে কোনো মুসলিম বন্দির জন্য মুসলিমদের কোনো গোপন অবস্থার কথা কারো কাছে প্রকাশ করা বৈধ নয়, যদিও এ জন্য তাকে পীড়াপীড়ি করা হয় এবং তাকে কষ্ট দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম আওযা'ঈ ও সুফইয়ান ছাওরী (রহ.) বলেন, 'কোন বন্দিদের জন্য তাদের গোপন তথ্য কারো নিকট প্রকাশের অনুমতি নেই, যদিও তারা মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। অনুরূপভাবে কোনো অমুসলিমকেও তার রাষ্ট্র তাদের গোপন তথ্য অন্য কাউকে দেয়ার অনুমতি দেয় না, যার দ্বারা বহিরাগত কেউ উপকার গ্রহণ করবে। ইসলামী শরী'আতে দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে বন্দিদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে তাদেরকে এ জাতীয় বিষয়ে বাধ্য করা অবৈধ বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

ইমাম মালিক (রহ.) -কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, 'শত্রু পক্ষের কোনো গোপন তথ্য গ্রহণের জন্য কী বন্দির প্রতি কোনো প্রকার চাপ প্রয়োগ করার অবকাশ আছে? তিনি বলেন, আমি এমনটি শুনিনি।' ইমাম আওযা'ঈ ও সুফইয়ান ছাওরী (রহ.) বলেন, 'কোন বন্দির জন্য তাদের গোপন তথ্য কারো নিকট প্রকাশের অনুমতি নেই, যদিও তারা মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। এখানে গোপন তথ্য বলতে ঐ সকল গোপন বিষয় উদ্দেশ্য, যা প্রকাশ করলে বন্দির রাষ্ট্রের অথবা তাদের সামরিক শক্তির কোনো ক্ষতি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে।

## ১১. বন্দিক্যাম্প ও আবাসন

বন্দিদেরকে নির্ধারিত ক্যাম্পে পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত কোনো নিরাপদ জায়গায় রাখতে হবে। ৩য় জেনেভা চুক্তিতে বন্দিক্যাম্পের বিষয়ে কয়েকটি শর্ত উল্লেখ

করা হয়েছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, স্বাস্থ্য উপযোগী স্থান হওয়া, জীবন যাপনে মৌলিক চাহিদা পূরণের সকল সু-ব্যবস্থা থাকা, আগুণ ও বিপজ্জনক যে কোনো পরিবেশ থেকে দূরে অবস্থান করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে ক্যাম্প নিরাপদ দূরে স্থাপন করা এবং এর জন্য বিশেষ গোপন সংকেত PG অথবা PW ব্যবহার করা।

## ১২. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা '*বন্ধন মজবুত*' করা বলে (شد الوثاق) বন্দিদেরকে পলায়নের সুযোগ না দেয়া বুঝিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আবাসন ব্যবস্থা সীমিত হওয়ায় বন্দিদেরকে ভিন্ন পরিবেশে রাখার বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়নি। সে যুগে বন্দিদেরকে মসজিদের পাশে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সাময়িকভাবে রাখা হতো। এটিই বর্তমানে আধুনিক বন্দিক্যাম্পের রূপ পরিগ্রহ করেছে। আবার কখনো কখনো মুসলিমদের মাঝে বন্দিদেরকে ভাগ করে দেয়া হতো এবং প্রত্যেকের উপর তাকে দেখা শুনার যাবতীয় দায়িত্বভার অর্পণ করা হতো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এ পদ্ধতিটি অধিক প্রচলিত ছিল। সাথে সাথে মুসলিমদেরকে তাদের নিকট অর্পিত বন্দির ব্যাপারে সর্বোচ্চ যত্ন নেয়ার নির্দেশ দেয়া হতো।

## ১৩. বন্দিদের খাবার, তাদের পোষাক ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা

জেনেভা চুক্তির দাবি হলো, রাষ্ট্র বন্দিদের জন্য বিভিন্ন রকমের পর্যাপ্ত খাবারের ব্যবস্থা করবে। যাতে বন্দিদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে না পড়ে, ওযন কমে না যায় এবং খাদ্যের কারণে কোনো প্রকার শারীরিক ক্ষতির সৃষ্টি না হয়। তাদের জন্য আবহাওয়া অনুযায়ী পর্যাপ্ত পোষাক এবং পানি সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। তাদের ধুমপানের ব্যবস্থা রাখতে হবে। খাবার উপযোগী জায়গা নির্ধারণ করতে হবে। খাদ্য দ্বারা দলবদ্ধভাবে তাদেরকে বাধ্য করে শিষ্টাচারমূলক কোনো শাস্তি দেয়া যাবে না।

এ বিষয়ে ইসলামী শরী'আত নির্দেশিত নীতিমালা এ নীতিমালা থেকে ভিন্ন নয়। কেননা ইসলাম হলো রহমত ও অনুকম্পার ধর্ম। আল-কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে আমরা বন্দিদেরকে খাবার খাওয়ানোর আলোচনা খুঁজে পাই।

আল্লাহ তা'আলা ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী মু'মিনদের গুণাবলী উল্লেখ করে বলেন,

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾

'আর তারা আল্লাহর ভালবাসায় অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দিদেরকে আহার্য দান করে। (তারা বলে) কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।'[৪]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবীদেরকে বদর যুদ্ধের বন্দিদের ব্যাপারে বিশেষ নসীহত করেছিলেন। ফলে তারা বন্দিদেরকে উত্তম খাবার দিয়ে নিজেরা সাধারণ খাবার গ্রহণ করতো। ছুমামা ইব্ন আছাল (রা)-এর ঘটনা এর স্পষ্ট সাক্ষী হয়ে আছে, তিনি যখন মুসলিমদের হাতে বন্দি হয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আসেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে বলেন, তোমরা এর সাথে উত্তম আচরণ করো এবং তোমাদের নিকট যে খাবার আছে তা তার নিকট উপস্থিত করো।' ফলে তারা প্রতি সকাল ও সন্ধায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থাকা একটি হৃষ্টপুষ্ট উটের দুধ তার নিকট পাঠিয়ে দিতেন।

পোষাক পরিচ্ছেদের বিষয়েও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুরূপ নির্দেশ রয়েছে, যা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বদর যুদ্ধের বন্দিদের ব্যাপারে বলেছিলেন। জাবির (রা) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন যখন বন্দিদের উপস্থিত করা হলো, সঙ্গে ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা আব্বাস (রা)। তার শরীরে কোনো কাপড় ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য একটি কাপড় তালাশ করলেন, কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জামা ব্যতীত কারো জামা তার শরীরে লাগছিল না, বিধায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জামাটি 'আব্বাসকে (রা) পরিয়ে দেন। কারণ তারা দু'জনেই কিছুটা বেশী লম্বা ও দীর্ঘ কায়াবিশিষ্ট ছিলেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) বলেন, 'বন্দির ব্যাপারে মুক্তিপণ গ্রহণ অথবা অনুগ্রহ করে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তার সঙ্গে

[৪] সূরাহ্ আদ্-দাহ্র: ৮-৯।

উত্তম আচরণ ও আহার্যের ব্যবস্থা করা আমাদের দায়িত্ব।' কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾

"অতঃপর হয়তো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করো, না হয় তাদের থেকে মুক্তিপণ নাও।"[৫]

## ১৪. বন্দিদের কাজে লাগানো

যুদ্ধের সময় দীর্ঘ হওয়ার ফলে বন্দিদের কারা জীবনের সময়ও বাড়তে থাকে। যেমনটি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ ও ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময়ে হয়েছিলো। কোনো কোনো বন্দি যুদ্ধের সূচনার দিকে বন্দি হয় আর অস্ত্র বিরতি পর্যন্ত বন্দি হয়েই থাকে। এ কারণে জেনেভা চুক্তি কিছু শর্ত সাপেক্ষে বন্দিদেরকে কোনো কাজে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে। তাতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে বন্দিদের শরীর ও মন উভয়ই স্বাভাবিক থাকবে। পাশাপাশি বন্দি জীবনের ক্লান্তির মাত্রাও কিছুটা লাঘব হবে। নিম্নে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী তাদেরকে কোনো কাজে লাগানো যেতে পারে।

### ক. অফিসার বা কর্মকর্তা শ্রেণি

স্বেচ্ছায় কাজ করতে আগ্রহী হলে তাদের পছন্দ অনুযায়ী তাদের দ্বারা কিছু কাজ করানো যেতে পারে, অন্যথায় নয়।

### খ. সৈনিক ও সাধারণ কর্মচারি

এ শ্রেণির বয়স, লিঙ্গ ও শারীরিক ক্ষমতার বিবেচনায় উপর্যুক্ত কিছু কাজ এ শ্রেণি থেকে নেয়া যেতে পারে। তবে তাদের স্বাস্থ্যহানী ঘটতে পারে কিংবা তাদের মর্যাদা ও সম্মান পরিপন্থী অথবা জীবনের ঝুকি বয়ে আনবে এমন কোনো কঠিন কাজ কোনো অবস্থাতেই তাদের দ্বারা করানো যাবে না। জেনেভা চুক্তির আলোকে বন্দিরা তাদের এ কাজের উপর নির্ধারিত পারিশ্রমিক পাবে।

## ১৫. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামী শরী'আতে বন্দিদের থেকে কোনো কাজ না করে নেয়ার বিষয়ে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না। এ সকল বিষয়ে মূলনীতি হলো, বৈধ বা স্বীকৃতি

---

[৫] সূরাহ্ মুহাম্মাদ: ৪।

তখনই দেয়া হবে যখন সে বিষয়ে হারাম হওয়ার উপর কোনো প্রমাণ পাওয়া না যাবে। এ ক্ষেত্রেও যেহেতু বন্দিদেরকে কোনো পারিশ্রমিক দেয়ার শর্তে কাজে লাগানোর বিষয়টি নিষিদ্ধ হওয়ার মত কিছু পাওয়া যায়নি। বিধায় আমরা এটিকেও বৈধ বলেই ধরে নেব। তবে ইসলামী শরী'আত মতে তাদের সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপিয়ে দেয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم فإن كلفتموهم فاعينوهم

'আর তোমরা তাদের উপর এমন কাজ চাপিয়ে দিও না যা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য হবে। আর যদি দিতেই হয়, তবে তোমরা তাদেরকে সাহায্য করো।' নিঃসন্দেহে এটি একটি উচু মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি,যার মাধ্যমে বন্দির মানবতা ও সম্মানবোধের প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সামর্থ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেয়া না হয়। আর যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বন্দিদের দ্বারা কোনো কঠিন কাজ করে নিতে হলে সেক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতা করা অত্যাবশ্যক।

## ১৬. বন্দিদেরকে অপরাধের দণ্ডে দণ্ডিত করা

বন্দিরা যে রাষ্ট্রের নিকট বন্দি থাকে সে রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর সকল নিয়ম ও নীতিমালা তাদেরকেও অনুসরণ করতে হবে। কখনো কখনো বন্দিরা ভুলবশত: কিংবা ইচ্ছা করেই কোনো নিয়ম বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়লে, অথবা কোনো অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত হলে, তখন উক্ত রাষ্ট্রের জন্য তাকে বিচারের অধীনে আনার অবকাশ থাকবে। এ অপরাধে জড়িয়ে পড়া দু'ভাবে হতে পারে:

### ক. শৃঙ্খলা লঙ্ঘনজনিত অপরাধ

সশস্ত্র বাহিনী প্রণীত নিয়মাবলীর ব্যতিক্রম এবং সাধারণ কোনো নিয়মের বিপরীত কোনো কাজ করাকে এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন, চিল্লাচিল্লি করা, ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া, কোনো পদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে বেয়াদবীমূলক আচরণ করা, পলায়নের চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়া কিংবা কাউকে পলায়নে সহযোগিতা করা ইত্যাদি।

এ জাতীয় অপরাধের কারণে তাকে জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী নিম্নোক্ত যে কোনো দন্ডেদন্ডিত করা হবে, তা হচ্ছে:

১. সর্বোচ্চ ৩০ দিনের কাজের বিনিময়ে প্রাপ্ত পারিশ্রমিকের ৫০% কর্তন করা হবে।

২. অন্যান্য বন্দিদের তুলনায় তার প্রাপ্ত সুবিধা কমিয়ে দেয়া হবে।

৩. সর্বোচ্চ দু'সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতিদিন দু'ঘন্টা করে কঠোর পরিশ্রমে লাগিয়ে দেয়া। (এটি কেবল ২য় শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য।)

৪. নজরবন্দি করে রাখা।

৫. তবে সর্বাবস্থায় একটি শাস্তির মেয়াদ ৩০ দিনের অধিক হতে পারবে না।

**খ. অপরাধমূলক কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়া**

এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সকল অপরাধ যা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিয়ম পরিপন্থী হয় এবং যাকে বড় অপরাধ হিসেবে আখ্যা দেয়া যায়। যেমন কাউকে মারপিট করা অথবা আঘাত করা কিংবা চুরি করা ইত্যাদি। এমন কর্মকাণ্ডে জড়িত বন্দিকে বিচারের সম্মুখীন করা হবে এবং সামরিক আদালতে তার মামলার মীমাংসা হবে। অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল প্রকার সুযোগ দিতে হবে। তার ব্যাপারে অনুরূপ সিদ্ধান্ত ও ফায়সালা হবে যা উক্ত দেশের সশস্ত্র বাহিনীর কোনো সদস্যের ব্যাপারে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। পাশাপাশি আদালতের এ বিষয়টির প্রতিও দৃষ্টি দেয়া উচিৎ যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি এ দেশের নাগরিক নয়। এ দেশের কোনো নিয়ম কানূন মেনে চলা তার কর্তব্য ও দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। সে কেবল বিশেষ পরিস্থিতির শিকার বলে বিচারের অধীনে এসেছে তাই সঙ্গতঃ কারণেই তার ক্ষেত্রে শাস্তি বাস্তবায়নে দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা নম্র করা প্রয়োজন।

ইসলামী শরী'আতে বন্দিকে তার কৃত অপরাধের দায়ে নির্ধারিত দ দ তি করা একটি স্বীকৃত বিষয়। কারণ বন্দি হওয়ার পর থেকে সে এ দেশের নিয়মের অধীনে চলে এসেছে। সুতরাং সাধারণ কল্যাণের দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ তাকে শাস্তি দেয়া ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। উপরন্তু হকদারের নিকট তার অধিকার ফিরিয়ে দেয়া বন্দির শাস্তি প্রাপ্তির চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

**১৭. বন্দিত্ব থেকে বন্দি পলায়ন**

কখনো কখনো বন্দি তার বন্দিদশা থেকে কোনো সৎ উদ্দেশ্যে পলায়নের চেষ্টা করে, যে উদ্দেশ্য তাকে দেশরক্ষার জন্য দ্বিতীয়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং বন্দিশালা থেকে নিষ্কৃতি দেবে। বন্দি ও নিজ দেশের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য

করলে এটি একটি বৈধ কাজ বলে মনে হয়; অন্যদিকে বন্দিকারী দেশের দিকে তাকালে এটি তাদের প্রতি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ বলে প্রতীয়মান হয় এবং সে দেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি সুস্পষ্ট বিদ্রোহ বলে অনুমেয় হয়।

জেনেভা চুক্তিতে বন্দি কর্তৃক পলায়নের এ ব্যর্থ চেষ্টাকে সাধারণ অপরাধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং বন্দির পলায়নের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করে তাকে বিচারের আওতায় না এনে শিষ্টাচারমূলক হালকা ধরনের কিছু শাস্তি দেয়া যেতে পারে, যার বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তাকে পলায়ন থেকে বিরত রাখার জন্য কোনো শক্তিশালী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন নেই। প্রথমত: তাকে ডেকে সতর্ক করে দেয়া হবে। পুনরায় পলায়নের চেষ্টা করলে তার দিকে ফাকা ফায়ারের মাধ্যমে তার মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করা হবে এবং সর্বশেষ তাকেসহ গুলি চালানো হবে, তবে শরীরের এমন অংশে নয় যার দ্বারা তার জীবন হুমকির মুখে পড়বে; বরং ভীতি সৃষ্টির লক্ষ্যে এরূপ করা হবে যাতে সে পলায়নের প্রতি দুঃসাহস আর দেখাতে না পারে। আর যদি পলায়নে সক্ষম হয় এবং পরবর্তীতে আবারো বন্দি হয় তখন তাকে ও তাকে পলায়নে সহযোগিতা প্রদানকারীদের পূর্বের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না এবং তাদেরকে শাস্তির সম্মুখীনও করা যাবে না।

ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে পলায়নের বিষয়টি আরো ব্যাপক। 'আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মুসলিম বন্দিদের জন্য শত্রুপক্ষের কারাগার থেকে যে কোনো উপায় অবলম্বন করে পলায়ন করার সুযোগ আছে।

## ১৮. বন্দিদেরকে ছাড়িয়ে নেয়া

১৯৪৯ সালের জেনেভায় স্বাক্ষরিত চুক্তিতে এ সিদ্ধান্ত স্থির হয়েছে যে, যুদ্ধ চলাকালীন বন্দিদেরকে ছাড়িয়ে নেয়া বৈধ। আর যুদ্ধের কার্যক্রম থেমে যাওয়ার পর প্রতিটি দেশ চাইলে তাদের বন্দিদের ছাড়িয়ে নিতে পারে এবং এর জন্য যুদ্ধ পরিস্থিতি শান্ত হওয়া কিংবা সন্ধি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। এর জন্য সাধারণতঃ প্রয়োজন হয় উভয় পক্ষের মধ্যস্থতাকারী নিরপেক্ষ কিছু লোকের, যারা আলোচনার মাধ্যমে বন্দিদেরকে ছাড়ানো এবং তাদের দেশে তাদেরকে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবে। এ জাতীয় মধ্যস্থতার জন্য কোনো নিরপেক্ষ রাষ্ট্র কিংবা আন্তর্জাতিক কোনো প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। যেমন, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, রেড ক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটি, জাতীয় রেড ক্রস ইত্যাদি।

বন্দিদেরকে ছাড়িয়ে নেয়ার সময় তাদের নিকট থেকে গৃহীত জিনিসপত্র কিংবা নগদ অর্থ ফেরত দিতে হবে। বন্দিকালীন কৃত অপরাধের কারণে কিংবা স্বাস্থ্যজনিত কোনো সমস্যার কারণে যদি কোনো বন্দির স্বদেশে ফেরা বিলম্বিত হয় সেক্ষেত্রে বন্দিকারী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো উক্ত বন্দিদের দেশকে তাদের নামের তালিকা প্রদান করা।

ইসলামে বন্দিদের ছাড়িয়ে নয়ার দু'টি পথ রয়েছে। হয়তো কোন প্রকার বিনিময় আদান প্রদান ছাড়াই অনুগ্রহের মাধ্যমে, কিংবা তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের মুক্তি দেয়া। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾

"অতঃপর হয়তো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করো, না হয় তাদের থেকে মুক্তিপণ নাও।"[৬]

অনুগ্রহ প্রদর্শন বলতে ইসলামী শরী'আত বিশেষজ্ঞদের ভাষায় 'বন্দির পথ খুলে দেয়া এবং তার থেকে কোনো প্রকার বিনিময় গ্রহণ করা ছাড়াই তাকে দেশে ফেরার সুযোগ করে দেয়া।' এটি মূলতঃ মুসলিমদের গণস্বার্থের সঙ্গে জড়িত যার দায়িত্ব পালন করেন রাষ্ট্র প্রধান। অধিকাংশ ফকীহ আল-কুরআনের উল্লিখিত আয়াতের আলোকে এটিকে বৈধ বলে মনে করেন। ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, 'এর উপরে 'আমল করে আসছেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিকাংশ সাহাবী। তাঁরা বলেন, রাষ্ট্র প্রধানের জন্য কোনো কোনো বন্দিকে কোনো প্রকার বিনিময় গ্রহণ ছাড়াই তাকে মুক্ত করে দেয়া এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেয়ার অবকাশ আছে।'

আলোচ্য আয়াতে মুক্তিপণ গ্রহণের পূর্বেই মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও মুক্তিপণের উপর মানুষের সম্মানের দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর মক্কার মুশরিকদেরকে কোনো প্রকার বিনিময় গ্রহণ ছাড়াই মুক্ত ও স্বাধীন ঘোষণা করেছিলেন। তারা জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি এখন আমাদের সাথে কীরূপ আচরণ করবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছিলেন, إذهبوا فأنتم الطلقاء 'তোমরা চলে যাও। তোমরা স্বাধীন ও মুক্ত।' এটি ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শত্রুদের প্রতি ঔদার্য বা উদারতা প্রদর্শনের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

---

[৬] সূরাহ্ মুহাম্মাদ: ৪।

মুক্তিপণ বলতে বন্দিকে মুক্ত করার বিপরীতে কোনো বিনিময় বা অর্থ গ্রহণ করা বুঝায়। এটি কখনো বন্দির বিনিময়ে বন্দি, আবার কখনো মালের বিনিময়ে হয়ে থাকে, যাতে যোদ্ধারা এর দ্বারা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে। এটিও প্রমাণিত যে, কখনো কখনো ইসলামী রাষ্ট্রের কল্যাণার্থে বন্দিদের মাধ্যমে মুসলিমদের সন্তানদের পড়া-লেখা শিক্ষা দানকে মুক্তিপণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বশেষ কথা এটিই যে, বন্দিদেরকে মুক্ত করা এবং তাদেরকে স্বদেশে ফেরৎ পাঠানো কখনো কখনো বিনিময় ছাড়াও হতে পারে। এটি ইসলাম ধর্মের উদারতা ও ঔদার্যের উপর প্রমাণ বহন করে। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্দিদের প্রতি দয়া প্রদর্শন, তাদের সঙ্গে নম্র আচরণ করা, তাদের অসুস্থদের চিকিৎসা প্রদান এবং আহতদের সেবা দানের নির্দেশ দিয়েছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সালাহ্ উদ্দীন আয়্যুবী (রহ.) যখন খ্রিস্টান বাহিনী প্রধান আহত রিচার্ডের অসুস্থ হওয়া এবং এর মাধ্যমে তার যুদ্ধবৃত্ত ছিটকে পড়ার সংবাদ পেলেন তখন তিনি তাকে দেখতে গেলেন এবং নিজে তার চিকিৎসার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। আধুনিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইন হুবহু এটিই কামনা করে।

ইসলাম যেভাবে নিজেদের বন্দিদের ব্যাপারে যত্ন নেয়ার নির্দেশ দিয়েছে তেমনিভাবে মুসলিম ছাড়াও যিম্মীদের ব্যাপারে একই নির্দেশ প্রদান করেছে। কারণ ইসলামী রাষ্ট্র মানেই মুসলিম ও আহলে কিতাব (যিম্মী)-এর সমন্বিত বসবাস। সুতরাং যখনই তাদের কেউ মুসলিমদের সঙ্গে বন্দি হবে তখন তাদের সাথেও মুসলিম বন্দির অনুরূপ আচরণ করা হবে। আবূ মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فكوا العاني وأطعموا الجائع وعودوا المريض

'তোমরা বন্দিদের মুক্ত করো, অভাবীদের আহার্য প্রদান করো এবং অসুস্থদের সেবা প্রদান করো।'[৭] হিজরী ৭ম শতাব্দীর শেষে ও ৮ম শতাব্দীর শুরুর দিকে তাতারীরা দামেস্কে আক্রমণ করে এবং সিরিয়ার কিছু যিম্মীসহ (ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান) অনেক মুসলিমকে বন্দি করে। ইমাম ইব্ন তাইমিয়া (রহ.) কতিপয় 'আলিমকে নিয়ে তাদেরকে মুক্ত করার জন্য তাতারীদের প্রধান সেনাপতি কাজানের দরবারে আসেন। কাজান কেবল মুসলিম বন্দিদের মুক্তির ব্যাপারে ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু ইব্ন তাইমিয়া (রহ.) কাজানের এ সন্তুষ্টিতে সম্মত হননি। তিনি এ বিষয়ে মুসলিমদের ন্যায় অন্যান্যদের মুক্ত করার ব্যাপারে কাজানকে জানান যে, ইসলামের বিধান মতে আমাদের ও তাদের অধিকার

৭ *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাবঃ ফিকাকুল আসীর, হাদীস নংঃ ২৮৮১।

সমান। অবশেষে সকল বন্দি তথা মুসলিম ও যিম্মীদেরকে ছেড়ে দিতে কাজান বাধ্য হন।

## চতুর্থ অংশ

### ১৯. রণাঙ্গনে নারী, বৃদ্ধ ও শিশুদের বিশেষ মর্যাদা

জেনেভা চুক্তিতে একথা অপরিহার্য হিসেবে বিধৃত হয়েছে যে, রণাঙ্গনে নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ মর্যাদা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। সশস্ত্র যুদ্ধের প্রতিটি সদস্যের দায়িত্ব হলো নারী ও শিশুদের প্রতি যুদ্ধকার্যক্রমকে প্রসারিত না করা; বরং তাদেরকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করা। এর পূর্বে প্রতিটি দলের জন্য অপরিহার্য নিয়ম হলো তারা ১৫ বছরের কম বয়সী কাউকে দলভুক্ত করবে না এবং পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সরাসরি তাদের যুদ্ধের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ দেবে না। তেমনিভাবে মহিলাদেরকে তার ভাবগাম্ভীর্য ও লজ্জা পরিপন্থী কোনো কাজে বাধ্য না করা। একান্ত প্রয়োজনে কোনো সশস্ত্র বাহিনী যদি নারীকে সঙ্গে নিতে চায়, তবে তাদের জন্য ভিন্ন ক্যাম্প স্থাপন করা এবং সকল প্রকার প্রয়োজন পূরণের উত্তম ব্যবস্থা করে দেয়া। এ সনদ গর্ভবর্তী নারীদের থেকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি রহিত করে দিয়েছে।

### ২০. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

কখনো কখনো দেখা যায় মুসলিম মুজাহিদদের মাধ্যমে নারী ও শিশু বন্দি হয়ে এসেছে তখন তাদের হত্যা করা বা কোনো প্রকার কষ্ট দেয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এরূপ কার্য থেকে বারণ করেছেন। তিনি তাঁর প্রেরিত সৈন্যবাহিনীর প্রধানদের লক্ষ্য করে বলতেন,

انطلقوا بإسم الله وبالله وعلى بركة الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا إمرأة ولا تغلوا ولا تخونوا

'তোমরা আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর বরকতের উপর ভরসা করে চলতে শুরু করো, আর কোনো বৃদ্ধ, শিশু, নারীকে হত্যা করতে উদ্যত হয়ো না। কখনো গনীমতের মাল আত্মসাৎ করবে না এবং বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।'[৮]

[৮] বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদীস নং-১৬৬৯৮.

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খলীফা আবূ বাকর (রা) তার প্রেরিত বাহিনীর প্রধান ইয়াযিদ ইবনে আবী সুফিয়ানকে (রা) উদ্দেশ্য করে বলছিলেন,

إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم فى الصوامع فدعهم وما زعموا وإنى موصيك بعشر ولا تقتلن إمرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما.

'নিশ্চয় তুমি সেখানে এমন এক সম্প্রদায় পাবে যারা তাদের বিশ্বাস ও ধারণা মতে নিজেদেরকে তাদের ইবাদাতগৃহে আটকে রেখেছে। তুমি তাদেরকে ছেড়ে দেবে। আর আমি তোমাকে ১০ টি বিষয়ে বিশেষ উপদেশ দিচ্ছি, তুমি কোনো নারী, শিশু এবং অতিশয় বৃদ্ধকে হত্যা করবে না..... ।'[৯]

ইসলাম সর্বদা তার অনুসারীদের সতর্ক করে আসছে, যাতে তাদের যুদ্ধ কেবল ধ্বংসযজ্ঞ চালানো কিংবা অন্তর্ঘাত যুদ্ধ না হয়। আমরা দেখতে পাই যে, ইসলাম বেসামরিক নারী, শিশু, বৃদ্ধ, বার্ধক্যে অক্ষম বৃদ্ধকে হত্যা করা বৈধ মনে করে না। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমরা যা পাই তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হাদীস হলো,

لا تقتلوا الذرية فى الحرب فقيل له أليسوا أولاد المشركين فقال أوليس خياركم أولاد المشركين

'তোমরা যুদ্ধে শিশুদেরকে হত্যা করো না। জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কী মুশরিকদের সন্তান নয়? তিনি বললেন, তোমাদের উত্তম লোকেরা কী মুশরিকদের সন্তান নয়?' এ হাদীসে স্পষ্টভাবে শিশু হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। পাশাপাশি এ দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ সকল শিশুদের মধ্য হতে কেউ এমন হতে পারে যে, সে মানব কল্যাণে বহুমুখী ভূমিকা রাখবে।

## পঞ্চম অংশ

### ২১. যুদ্ধে আহত ও নিহতদের ব্যাপারে করণীয়

রণাঙ্গনে যারা আহত বা অসুস্থ হবে তাদেরকে সর্বাবস্থায় দেখাশুনা করা। আধুনিক চুক্তি ও সনদগুলো সশস্ত্র যুদ্ধের প্রতিটি বাহিনীর উপর আবশ্যক করে দিয়েছে, তারা এরূপ অসুস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে মানবতা সুলভ আচরণ করবে এবং ধর্ম, রাজনৈতিক মতবাদ, জাতীয়তা, বর্ণ ইত্যাদির দিকে দৃষ্টিপাত না করে; বরং তার মানবসত্তার দিকে লক্ষ্য করে সকলের প্রতি সমদৃষ্টি প্রদান করবে। তেমনিভাবে তাদের জীবনের প্রতি সহিংসতা ঠেলে দেয়া অথবা তাদের প্রতি কঠোর আচরণ করা, বিশেষতঃ তাদের জীবনকে ঝুকির দিকে নিয়ে যাওয়া

[৯] *তারীখু মাদীনাতি দিমাশক আল-কাবীর*, পূর্বোক্ত, হাদীস নং-৯২১.

কিংবা তাদের অতিমাত্রায় কষ্ট ও দূর্ভোগে ফেলাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি চিকিৎসাবিহীন তাদেরকে ছেড়ে দেয়া কিংবা আহতদের আক্রমণ করাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে এসব চুক্তি ও সনদে এ বিষয়ও নিশ্চিত করা হয়েছে যে, যুদ্ধে উভয়পক্ষ যত দ্রুত সম্ভব আহত, অসুস্থ এবং নিহত ব্যক্তিদের ব্যাপারে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতঃ তা প্রতিপক্ষ শিবিরে প্রেরণ করবে যাতে তারা অতিদ্রুত আহতদের সুচিকিৎসা প্রদান এবং নিহতদের উপযুক্ত দাফন কাফন রূহের সৎকার করতে পারে। মেডিকেল টিমের দায়িত্ব হলো তারা যতদ্রুত সম্ভব আহতদের সুচিকিৎসার মাধ্যমে তাদের জীবন রক্ষায় এগিয়ে আসবে। উভয় পক্ষ চেষ্টা করবে যাতে তাদের নিহতদের লাশগুলো দ্রুত সংগ্রহ করতে পারে এবং তাতে কোনো রকমের পচন না ধরে এবং তাদের সাথে কোনো প্রকার অমানবিক আচরণ না করা হয়।

জেনেভা চুক্তি আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে চিকিৎসা সেবার কাজে নিয়োজিত বিমান, জাহাজ এবং ভ্রাম্যমাণ মেডিকেল টিমের অতিরিক্ত হেফাজতের কথা বলেছে এবং এদের উপর সকল প্রকার আক্রমণকে নিষিদ্ধ করেছে। কারণ, এতে যুদ্ধাহত লোকদের নিকট দ্রুত চিকিৎসা সেবা পৌঁছানো ব্যাহত হবে। ফলে একটু আগেও তারা ছিল সুস্থ এবং দেশের জন্য প্রাণপণে লড়ছিল অথচ একটু পরেই চিকিৎসা না পাওয়ার কারণে তাদের জীবনে শঙ্কা তৈরি হয়েছে এবং সেবার অভাবে মৃত্যুর পথযাত্রী হচ্ছে।

## ২২. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

জিহাদ চলাকালীন মুসলিম সেনা সদস্যদের আহত ও অসুস্থদের সুচিকিৎসা প্রদান ছিল মুসলিম নারীদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। উম্মে আতিয়্যাহ আল-আনসারী (নাসীবাহ বিনতে হারিস (রা.) যিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ মহিলা সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন,

غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم فى رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوى الجرحى وأقوم المرضى

'আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ৭টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি তাদের পেছনের তাবুতে থাকতাম, তাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করতাম এবং তাদের আহত ও অসুস্থদের সেবা করতাম।'[১০]

[১০] *সহীহ্ মুসলিম, সুনানু ইব্ন মাজাহ্, মুসনাদু আহমাদ।*

রুবাইয়া বিনতে মু'আব্বিয, যিনি ছিলেন ইসলামের মর্যাদাপূর্ণ মহিলা সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি মু'আবিয়া ইব্‌ন আবী সুফইয়ান (রা)-এর সময় পর্যন্ত জীবন পেয়েছিলেন। তিনি বলেন,

كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخدم القوم ونسقيهم الماء ونرد الجرحى والمرضى إلى المدينة.

'আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যুদ্ধে যেতাম। আমরা কাওমের সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতাম, তাদেরকে পানি পান করাতাম এবং আহত ও অসুস্থদের মদীনায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতাম।'[১১]

## ২৩. ইসলামে শত্রুপক্ষের আহত ও অসুস্থদের সেবা

মুসলিম মুজাহিদগণ প্রতিপক্ষের আহত সৈনিকদের সঙ্গে অনুরূপ আচরণ করতেন যা তাঁরা তাঁদের সাথী-সঙ্গীদের সাথে করতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা মুসলিম-অমুসলিম, ভদ্র-অভদ্র, শত্রু-বন্ধু, ধনী-গরীবের মাঝে কোনো পার্থক্য করতেন না; বরং তাঁরা সমভাবে সকলের আরোগ্য ও সুস্থতা কামনা করতেন। ইসলাম রহমত ও দয়ার ধর্ম। এর বাহক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহ তা'আলা বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾

'আর আমি আপনাকে কেবল বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।'[১২] অনুগ্রহ ও মানবতার দাবি হলো, যুদ্ধ বিগ্রহের ক্ষেত্রেও আহত ও অসুস্থদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা এবং তাদের সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখা। অন্যদিকে ইসলাম বেসামরিক লোকদের হত্যা করাকে সম্পূর্ণ নিষেধ করেছে। আর অসুস্থ ও আহতরা একই পরিস্থিতির শিকার। ফলে তাদেরকে হত্যা করা বা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হারাম বলে বিবেচিত হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো সৈন্যদলকে কোথাও প্রেরণ করতেন তখন দলের আমীর বা প্রধানকে কড়া নির্দেশ দিতেন, যাতে তারা আহত ব্যক্তির উপর আক্রমণ না করে, যুদ্ধ থেকে পলায়নকারীর পিছু ধাওয়া না করে, কোনো বন্দিকে হত্যা না করে, ছাগলের পা কর্তন না করে এবং কোনো বৃক্ষ না কাটে।

---

[১১] *জামি'উস্-সহীহ, মুসনাদু আহমাদ।*

[১২] সূরাহ্ আল-আম্বিয়া: ১০৭।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত ব্যক্তির চেহারা বিকৃতি ও তার অঙ্গহানী করাকে নিষিদ্ধ করেছেন। সুলায়মান ইব্ন আবূ বুরায়দা (রা) তার পিতা বুরায়দা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بإسم الله وفى سبيل الله .. اغزوا ولا تغلو ولا تخونوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাউকে কোনো বাহিনীর প্রধান বানাতেন তখন তাকে আল্লাহকে ভয়ের ব্যাপারে বিশেষ নসীহত করতেন এবং তার সঙ্গে থাকা মুসলিমদের ব্যাপারে খুব সতর্ক করতেন। এরপর বলতেন, 'তোমরা আল্লাহর নামে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে অবতরণ করো। তোমরা লড়াই করো, গনীমতের মালে খেয়ানত করো না, বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং কোনো বালককে হত্যা করো না।'[১৩] ইমাম বায়হাকী (রহ.) সামুরাহ ইবনে যুনদুব থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাদাকাহ্র উপর উদ্বুদ্ধ করতেন এবং কারো অঙ্গহানীকে বারণ করতেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষমা ও ঔদার্যের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেমন, বদর যুদ্ধে মক্কার কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয়ের পর তাদের মৃতদেহগুলোকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাফনের নির্দেশ দেন। এটি ছিল মানুষের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শনের উজ্জ্বলতম উদাহরণ যে, মৃত্যুর পরেও তাদের সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ করা। আর কেবল বদরে-ই নয়; বরং মুসলিমদের প্রতিটি যুদ্ধের ক্ষেত্রেই এ নীতি ও আদর্শ বজায় ছিল। বিধায় কাফিরদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিপরীত আচরণ করা হলেও মুসলিমরা তার উত্তম বদলাই দিয়েছে।

ওহুদ যুদ্ধে আবূ সুফইয়ান (রা)-এর স্ত্রী হিন্দা (রা) মুসলিম মুজাহিদদের মৃতদেহের সঙ্গে যে অমানবিক আচরণ করেছিলেন, ইতিহাসের পাতায় আজও তা হিংস্রতার নগ্ন উদাহরণ হয়েই আছে। তিনি তাঁর কতিপয় সঙ্গিনীদের নিয়ে মুসলিম যোদ্ধাদের দেহের বিকৃতি সাধন, তাদের নাক ও কান কর্তন করে তাঁদের কানে দুল ও মালা পরিয়ে দেন, বিশেষতঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয়তম চাচা হামযার (রা) পেট বিদীর্ণ করে, টেনে তার কলিজা বের করে দাঁত দিয়ে তা চিবানোর মত নৃসংশ আচরণও তিনি করেছিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সকল কিছু মার্জনা করতঃ ধৈর্যধারণ করে তাঁর ইসলাম গ্রহণ করাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

---

[১৩] আল-বায়হাকী, *আল-মু'জামূল কাবীর*, হাদীস নং-১৬৬৯৮.

## উপসংহার

এভাবেই আমরা ইসলামের ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখতে পাই যে, ইসলাম এ ক্ষেত্রে কতটা উদারতা প্রকাশ এবং মানবতার প্রতি কী ধরনের মনোভাব প্রকাশ করেছে। ইসলাম প্রতিপক্ষের যোদ্ধা, তাদের আহত ও অসুস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ খেয়াল রাখার নির্দেশ দিয়েছে। ইসলামে প্রথম যুদ্ধ বদর যুদ্ধের বন্দিদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্য ছিলো, استوصوا بالأسارى خيرا ‘তোমরা বন্দিদের সাথে উত্তম আচরণ করো এবং তাদের কল্যাণের প্রতি খেয়াল রেখো।’ আল্লাহ তা‘আলা ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী মু’মিনদের গুণাবলী আলোচনায় বলেন,

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾

“আর তারা আল্লাহর ভালবাসায় অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দিদেরকে আহার্য দান করে।”[১৪] এ কারণেই মুসলিমরা তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতো এবং আহার্য গ্রহণে নিজেদের উপর তাদেরকে প্রাধান্য দিত। আর আদর্শ ও দৃষ্টান্তপূর্ণ এ সকল মূলনীতির পেছনে মূল চাওয়াই ছিল বন্দি এবং যুদ্ধে হতাহতদেরকে সাধারণ যোদ্ধা থেকে ভিন্ন করে দেখানো এবং তাদের সেবায় সকলকে আত্মনিয়োগ করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা।

আন্তর্জাতিক সকল চুক্তি ও সনদের বহুপূর্বে যোদ্ধাদের ব্যাপারে ইসলামের এ মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম দয়া ও রহমতের ধর্ম। আমরা দেখতে পাই যে, যুদ্ধে আক্রান্তদের সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে ১৯৪৯ সালে স্বাক্ষরিত জেনেভা চুক্তির ধারাগুলো এবং ১৯৭৭ সালে এতে স্বাক্ষরিত দু’টি সংযুক্তিতে উল্লিখিত ধারাগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলাম স্বীকৃত সকল ধারার সঙ্গে স্পষ্টভাবে মিলে যায়।

আমাদের সকল যুদ্ধ এবং লড়াইয়েও এ নীতি চাই শ‘রঈ হোক অথবা আন্তর্জাতিক চুক্তি হোক তার বাস্তবায়ন একান্ত কাম্য। তবে আমাদের বিবেচনায় এটি কেবলই কোনো রাষ্ট্রীয় নিয়মানুসরণ নয়; বরং এটি আমাদের শরী‘আহ্ নির্দেশিত এমন পথ ও পদ্ধতি যার বিপরীতে চলার কোনো অবকাশ নেই।

[১৪] সূরাহ্ আদ্-দাহ্র: ৮।

## তথ্য নির্দেশ


১. ইমাম সারাখসী, *শারহুস্-সিয়ার আল-কাবীর*।

২. মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত্-তাবারী, *কিতাবুল জিহাদ ওয়াল জিজিয়া*।

৩. জেনেভা চুক্তি, ১৯৪৯।

৪. ১৯৭৭ সালে জেনেভা চুক্তির সাথে সংযুক্ত এডিশনাল দু'টি প্রটোকল।

৫. ড. 'আলী সাদিক আবূ হীফ, *আল-কানূন আদ্-দাওলী আল-'আম*, আলেকজান্দ্রিয়া : মানশা'আতুল মা'আরিফ, ১৯৬০ খ্রি.।

৬. ড. ওয়াহাবাহ্ আয্-যুহায়লী, *আসারুল হারব ফিল ফিক্হিল ইসলামী*, পিএইচ. ডি. থিসিস, আইন অনুষদ, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২ খ্রি.।

৭. প্রফেসর মাহমূদ শালতূত, *আল-ইসলাম 'আকীদাহ্ ওয়াশ্-শারী'আহ্*, বৈরূত : দারুশ্-শুরূক।

৮. ড. আল-হুসায়নী মুসীলিহী, *মুযাক্কারাতুন্ ফিল কানূনিদ্-দাওলী আল-'আম ফী যামানিল হারব*, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, উম্মু দারমান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৮ খ্রি.।

# আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে ধর্ম, নৈতিকতা ও সংস্কৃতির প্রভাব*

ড. ইহ্সান হিন্দী**

যুদ্ধ আইন অথবা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সংজ্ঞা এভাবে দেয়া যেতে পারে যে, 'এটি এমন এক আইন ও নীতিমালার সমষ্টি, যা যুদ্ধকালীন সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করে এবং সামরিক শক্তির ব্যবহারে যুদ্ধরত দলগুলোর উপর কিছু শর্তারোপ করার মাধ্যমে এর প্রভাব শুধু যোদ্ধাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করে এবং স্থল, নৌ ও আকাশ পথে সশস্ত্র সংঘর্ষে আক্রান্ত বিশেষ করে নিহত, আহত, রোগাক্রান্ত এবং বন্দিসহ অধিকৃত এলাকায় বসবাসরত সাধারণ বেসামরিক লোকদের অধিকার সংরক্ষণ করে।' এ আইন মূলত: দুটি মৌলিক শাখা থেকে গঠিত।

ক. হেগ (Hague) আইন, যা যুদ্ধরত দলগুলোর কার্যক্রম সুসংহত করার জন্য বিশেষ নীতিমালা প্রবর্তন করে।

খ. জেনেভা চুক্তি আইন, যা যুদ্ধকালীন মানবীয় অধিকারের সুরক্ষা দেয়ার জন্য মৌলিক নীতিমালা ও প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান নির্ধারণ করে।

এখানে একটি প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায়। তাহলো আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের উৎস কী? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রয়োজন, আমাদের প্রথমে-এর রূপগত উৎস এবং শর'ঈ উৎসের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা। বিষয়টি গবেষণার নিরীখে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ বিশেষ করে জেনেভা ও হেগ কনভেনশন যুদ্ধের প্রচলন, আন্তর্জাতিক যুদ্ধসমূহে কমাণ্ডারদের

---

* আন্তর্জাতিক রেড ক্রস জার্নাল, সংখ্যা ৪০, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৪ খ্রি.।

** ড. ইহ্সান হিন্দি ১৯১৩ সালে সিরিয়ার *হামাত* শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইতিহাস ও ফ্রেন্স সাহিত্যে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি সামরিক শক্তি কমিশনে কিছুদিন চাকুরী করেন। চাকুরীর পাশাপাশি সাংবাদিকতা পেশায় যোগ দেন। অতঃপর দামেশ্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্রেন্স ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি আলজেরিয়ায় ওহরান বিশ্ববিদালয়ে আইন ও ইতিহাসের প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন। এরপর তিনি সিরিয়া, মরক্কো ও সংযুক্ত আরব আমিরাত বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক আইনের প্রফেসর হিসেবে দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন তন্মধ্যে উল্লেযোগ্য হলো *আল-ইসলাম ও য়াল কানূন আদ্-দাওলী*, *কাওয়ানীনুল হারব ওয়াস সালাম ফী দাওলাতিল ইসলাম*।

পক্ষ থেকে নিজেদের সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নির্দেশনামা এবং আন্তর্জাতিক ফৌজদারী আদালতসমূহের রায়কে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের রূপগত উৎসের স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। কেননা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের রূপগত আকৃতি এ উৎস থেকেই গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এ আইনের শর‘ঈ উৎস অথবা বিষয়গত উৎস থেকে মানবিক আইনের উপাত্ত সংগৃহীত হয়ে থাকে। মোটকথা সভ্যতা, সংস্কৃতি, দ্বীন, ধর্ম ও নৈতিকতা এ আইনের প্রতিপাদ্য উপাত্ত হিসেবে বিশেষভাবে স্বীকৃত। এ উপাত্তগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

## ১. আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের উপর সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব

‘আরবী অভিধান গ্রন্থসমূহে ছাকাফা (সংস্কৃতি) শব্দের কয়েকটি অর্থ রয়েছে। সেগুলোর মধ্য থেকে আমরা নিম্নোক্ত সংজ্ঞাটি নির্বাচন করেছি। সংস্কৃতি *(সাকাফাত) হলো এমন এক অর্জিত বিদ্যা ও জ্ঞানের নাম যার মাধ্যমে মানুষের সমালোচনার ইন্দ্রিয় যোগ্যতা এবং শক্তিমত্তা অর্জিত হয়।*[১] মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করে সভ্যতা-সংস্কৃতি সে সব বিদ্যার-ই অন্তর্গত। সুতরাং সংস্কৃতি অর্জন একক বা ব্যক্তিগত কোনো বিষয়কে বুঝায় না। কেননা যখন কেউ তার জন্মের সময় শূন্যের কোটা থেকে তার সংস্কৃতির সূচনা করে তখন থেকে সে প্রত্যেক সমাজে মূল্যবোধ, প্রচলিত প্রথা ও অভ্যাসের আদলে নির্দিষ্ট মানের সংস্কৃতির স্তুপাকার দেখতে পায়। এ ধরনের সংস্কৃতিকে *‘আছ্-ছাকাফাহ্ আল-‘আকলিয়া আল-ইজতিমায়িয়্যাহ্’* বলা হয়, যা প্রত্যেক মানুষ শিশুকাল থেকে বিভিন্ন কার্যকালে পরিবার, স্কুল ও মহল্লা থেকে অর্জন করে। এরপর সে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান যেমন, ক্লাব, অফিস-আদালত থেকে সংস্কৃতি শিক্ষা করে এবং এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। এসবসহ অন্যান্য উপকরণ যেমন ভ্রমণ, পড়াশুনা, অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্যদের সাথে মেলামেশা ইত্যাদির সংমিশ্রণে সত্তাগতভাবে একটি সভ্যতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর কারণে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনও ব্যক্তি ও সামাজিক সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

**ক.** ব্যক্তি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনা সৈনিকরা নিরক্ষর সৈনিকদের চেয়ে শত্রুপক্ষের সৈনিক ও বেসামরিক নাগরিকদের সাথে উত্তম মানবিক আচরণ করে থাকে। এটি যেমন একটি দিক। অপর একটি দিক হলো সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান সৈনিকরা অতিসহজে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মৌলিক নীতিমালাগুলো

[১] *Dictionnare “le Robert”* 1, p.436.

অন্যান্যদের অপেক্ষা বেশি অনুধাবন করে থাকে। রেডক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটি গুরুত্বের সাথে জেনেভা কনভেনশনের একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছে সেটি হলো, কীভাবে মানবিক আইনকে সাধারণ সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করা যায়। এ মর্মে এ সংগঠনটি আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিষয়কে বিশ্ববিদ্যালয়, সাধারণ ও ক্যাডেট স্কুল ও কলেজগুলোর সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এজন্য চারটি জেনেভা চুক্তির পর এতদসংক্রান্ত চারটি ধারা সংযুক্ত করা হয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে এ কমিটি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় গবেষণামূলক পত্রিকা বের করে থাকে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো জনসাধারণের মাঝে যতদূর সম্ভব যুদ্ধপূর্ব অথবা যুদ্ধ চলাকালীন আন্তর্জাতিক মানবিক আইন মান্য করার প্রবণতা ও সচেতনতা সৃষ্টি করা, বিশেষ করে ঐ সমস্ত লোকদের মাঝে সচেতনতাবোধ সৃষ্টি করা, যারা জোর জবরদস্তি করে শত্রুপক্ষের লোকদেরকে হেনস্থা করে এবং তাদের সাথে মানবতা বিরোধী আচরণ করে থাকে। পাঠকের সমীপে আমাদের এ নিবন্ধ আন্তর্জাতিক মানবিক আইন সম্পর্কিত সংস্কৃতির প্রচারণার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

**খ.** সামাজিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, অনেক সমাজ বা গোষ্ঠী অপরাপর জাতি অপেক্ষা যুদ্ধ বিমুখ। আবার কিছু কিছু জাতি গোষ্ঠী যুদ্ধবাজ। এ ধরনের চেতনা বোধ জাতির সামাজিক জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। এখানে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা বাঞ্চনীয়। সেটি হলো খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক সমাজ বারূদ আবিস্কার করে। কিন্তু তারা শুধু তীর নিক্ষেপণ এবং আতশবাজী খেলায় এ বারূদের ব্যবহার সীমিত রাখে। তারা কখনো এ বারূদকে আগ্নেয়াস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেনি। কারণ, কনফুসিয়াস ধর্মের নীতিমালা দ্বারা প্রভাবিত চৈনিক সংস্কৃতি মানুষের প্রাণনাশক যে-কোন উপকরণকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে। ইউরোপে আমদানী হওয়ার পূর্বপর্যন্ত বারূদের ব্যবহার এরূপ সীমিত গণ্ডির মধ্যে পরিবেষ্টিত থাকে। অতঃপর, পরিব্রাজক মার্কো পুলোর মাধ্যমে ইউরোপে বারূদের অনুপ্রবেশ ঘটলে খ্রিস্টীয় চৌদ্দ শতাব্দীতে তারা বন্দুক ও অস্ত্রে বারূদের ব্যবহার শুরু করে।

ইসলামী সভ্যতাও সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায় যে, ইসলামী সংস্কৃতি এক উন্নত সংস্কৃতি যা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে মানবিক আইনের গোড়াপত্তন করে। যে আইনে মানব মর্যাদা, বিশ্বাস ঘাতকতা নিষিদ্ধকরণ, প্রতিশ্রুতি পূর্ণকরণ এবং বন্দিদের সাথে ভদ্র আচরণ করার বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি মানবিক আইনের মূল উৎস পৌঁছানোর উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং '*মিন যাকিরা আত্-*

*তারীখ আল-'আরাবী আল-ইসলামী'* শিরোনামে একটি অনন্য গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এ গ্রন্থে শান্তি ও যুদ্ধক্ষেত্রে মানবিক মর্যাদার শীর বুলন্দ করার ব্যাপারে 'আরবী প্রবচন ও প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের নীতিমালার সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনাসহ বিধৃত হয়েছে। এরূপভাবে ১৯৯৪ সালে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত ক্যালেন্ডারে ১২টি ছন্দবদ্য আরবী প্রবচন লেখা হয়েছে যা আন্তর্জাতিক আইনের উল্লেখযোগ্য কিছু দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। আর এ প্রবচনগুলো খুব সুন্দর 'আরবী ক্যালিওগ্রাফির মাধ্যমে লিখিত হয়েছে। এ ক্যালেন্ডারে বিধৃত ক্রমধারা অনুযায়ী দশটি প্রবচন নিম্নে উপস্থাপিত হলো,

১. যে তোমার কাছে সাহায্য চায় তুমি তাকে সাহায্য কর।[২]

২. বিশ্বাস ঘাতকতার কোনো ওজর নেই।[৩]

৩. তারা তো নিজেরাই বন্দি, তাদের কাছে কোনো বন্দি আসলে তারা তাকে মুক্ত করতে পারবে না।[৪]

৪. শক্তিবানদের পক্ষ থেকে সন্ধি প্রভাবময়ী।[৫]

৫. শত্রু নিকটবর্তী হলে তাকে নিরাপত্তা দেয়া প্রয়োজন।

৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নকারীকে হত্যা করবে না, পর্দানশীনকে পর্দাহীন করবে না, আহতদের উপর আক্রমণ করবে না, মহিলাদেরকে কষ্ট দিয়ে হয়রানী করবে না।[৬]

৭. সম্মানিত ব্যক্তি বন্দীদের সাথে সম্মান সূচক ব্যবহার করে।[৭]

৮. শত্রুর সাথে এমন আচরণ কর যেমনটি কর তোমার বন্ধুর সাথে।[৮]

৯. আমি তোমাদের জান-মাল উপাসনালয় গীর্জা এবং তোমাদের শহরের ফটকসহ সবকিছুর নিরাপত্তা প্রদান করছি।

আমরা এ ক্যালেন্ডারে উল্লিখিত 'আরবী প্রবাদ-প্রবচনের সাথে আরো কিছু বাণী সংযুক্ত করতে পারি। যেমন, মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান (রা)-এর বক্তব্য, "বিশ্বাসঘাতকতার পরিবর্তে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করাই শ্রেয়।" ইমাম ফখরুদ্দীনের

---

[২] মুহিউদ্দীন ইব্‌নুল 'আরাবী।

[৩] আবূ হায়্যান আত্-তাওফীকী।

[৪] আবূল 'আলা আল-মাররী।

[৫] আশ্-শায়খ শিবরাবী।

[৬] ওলী উদ্দীন ইয়াকিন।

[৭] আবূল 'আলা আল-মাররী।

[৮] ড. আলী ইব্‌ন রিদওয়ান।

বক্তব্য, এ জগতে মানুষের জীবনই সবচেয়ে সম্মানজনক। অনুরূপভাবে মানুষের দেহ অন্যান্য সকল অবয়ব থেকে শ্রেষ্ঠ।' বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নেই, আবূ বাক্‌র (রা.) সেনাপ্রধান ওসামা ইবন যায়দ (রা) ও তাঁর সেনা বাহিনীকে সম্মোধন করে সুদৃঢ় শব্দাবলী দিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনামা ও বক্তব্য দিয়েছিলেন তা যুগ চক্রবালে ইতিহাস কী ভুলে যেতে পারে? যা আজও আধুনিক বিশ্বে মানবিক আইনের মূলনীতি হিসেবে *মাইল ফলক* হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তার বক্তৃতায় বলেছিলেন,

أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فأحفظوها عنى لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا إمرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا الا لمأكل وسوف تمرون بأقوام فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان من الطعام فإذا أكلتم منها فاذكروا إسم الله عليه.

'হে লোকেরা! তোমরা দাঁড়াও! তোমরা থামো! আমি তোমাদেরকে দশটি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করছি, তোমরা তা সংরক্ষণ করো। তোমরা খিয়ানত করবে না। গনীমতের সম্পদ চুরি করবে না, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, লাশ বিকৃতি করবে না, ছোট শিশু, বৃদ্ধ-বণিতাকে হত্যা করবে না, খেজুর বৃক্ষ কর্তন করবে না, জ্বালাও পোড়াও করবে না, কোনো ফলদার বৃক্ষ কাটবে না, গরু, বকরি, উট জবাই করবে না। তবে গোস্ত খাওয়ার প্রয়োজন হলে সীমিত আকারে দু'একটি জবাই করতে পারবে, আর যখন তোমরা এমন শ্রেণির লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, যারা উপাসনায় রত, তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেবে, আর যদি তোমরা এমন কোনো সম্প্রদায়কে অতিক্রম কর, যাদের কাছে রয়েছে রকমারি খাবার, তাহলে তোমরা এ খাবারগুলো থেকে কিছু খেতে পারবে, খাবার সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করবে।'[৯]

এখানে একটি প্রশ্নের উদ্রেক হয়, যদি আবূ বাকরের (রা) আত্মা মানবিক সংস্কৃতির দ্বারা সুসমামন্ডিত না হত তাহলে কী তিনি মানবতার মর্যাদা রক্ষায় সেনা বাহিনীকে এ ধরনের উজ্জ্বল নির্দেশনামা দিতে সক্ষম হতেন? আর যদি তাঁর সেনাপতি ও সেনাবাহিনী পূর্ব থেকে মানবতার এ মহান আদর্শে উজ্জীবিত না হতেন তাহলে কী তারা হঠাৎ করে খলীফার এ নির্দেশনামা গ্রহণ করতে সক্ষম হতেন?[১০]

---

৯ *তারীখু মাদীনাতি দিমাশক আল-কাবীর*, পূর্বোক্ত।

১০ ড. 'আমের আয-যামালী, *মাদখাল ইলা আল-কানূন আদ্-দাওলী আল-ইনসানী*, মানশুরাত আল-মাহ্‌হাদ আল-'আরাবী লি হুকুকিল ইনসান, ১৯৯৩ খ্রি., পৃ. ১০।

## ২. আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে নৈতিকতার প্রভাব

আখলাক বা নৈতিকতা বলতে বুঝায় মানুষের পারস্পরিক আচরণবিধিকে। আর এ নৈতিকতা শুধু মানুষের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। এটি মানুষকে তার অন্তস্থ ষড়-রিপুর প্রভাব থেকে সৎ আদর্শ ও নির্মল পরিচ্ছন্ন জীবনের দিকে ধাবিত করে, যা চতুষ্পদ জন্তুর বিপরীত। এরা তাদের মধ্যে প্রথিত রিপুর উম্মাদনায় পরিচালিত। নৈতিকতা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে অনেক বিধানের মূলভিত্তির অন্তর্ভুক্ত। এজন্য অনেক মানবিক বিষয়ও নৈতিকতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন সীমা লংঙ্ঘন না করা, যে নিরাপত্তা চায়, তাকে নিরাপত্তা দেয়া, প্রতিশ্রুতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, লোপাট-লুণ্ঠন না করা, ছিনতাই না করা ইত্যাদি।

প্রাচীনকালে প্রাচ্য জীবন ব্যবস্থা যেমন *সুমেরীয় ওরনামূ আইন, ব্যাবিলীয়, হাম্মুরাবী আইন, ভারতীয় ও চৈনিক প্রাচীন* আইনসমূহ নিয়ে গবেষণা করলে প্রতীয়মান হয় যে, উল্লিখিত আইনসমূহ সে যুগে সমাজে প্রচলিত রীতি অভ্যাসের সমাহার ছাড়া আর কিছুই নয়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রায় ১০০০ খ্রিস্টপূর্বে ভারতীয় সমাজে *মানু আইন* প্রচলিত ছিল। সেখানে যোদ্ধাদের, ব্যাপারে কিছু আইন বিধিবদ্ধ ছিল। সে আইন অনুযায়ী কোনো যোদ্ধা-ই আত্মসমর্পণকারী শত্রুকে হত্যা করতে পারবে না। এছাড়া বন্দিদেরকে এবং ঘুমন্ত শত্রুকে হত্যা করতে পারবে না। এমনকি অযোদ্ধা, বেসামরিক লোক এবং সন্দেহভাজন শত্রুকেও হত্যা করতে পারবে না।[১১]

উল্লিখিত আইনগুলোর বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করলে এক উন্নত চরিত্রের অনুভূতি প্রতিভাত হয়, যা বিশ্বাসঘাতকতাকে নিষিদ্ধ করে এবং যোদ্ধা ও অ-যোদ্ধাদের মধ্যে পৃথকীকরণ আবশ্যিক করে। আর এটিই হলো বর্তমানে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মূলভিত্তি। আরবীয় ও ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমরা দেখতে পাই যে, স্বয়ং খলীফা সেনাপতি ও 'আরবীয় মুসলিমরা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রশংসিত উজ্জ্বল চারিত্রিক আদর্শের অনুসারী ছিল। আর এ উজ্জ্বল আদর্শ বা নীতি উচ্চ মর্যাদা, ন্যায়বাদিতা ও প্রতিশ্রুতি পূরণ এ তিনটি বিষয় পবিত্র ত্রিত্বের আকার ধারণ করে, যার মাধ্যমে শান্তি ও যুদ্ধকালীন মুসলিমরা পারস্পরিক এবং অন্য সম্প্রদায়ের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখত। এর বহিঃপ্রকাশ হলো, মুসলিমরা যখন একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করত বা মিলিত হতো তখন তারা শান্তিসূচক বাণী ব্যবহার করত। যেমন তারা বলত, *আস্-সালামু 'আলায়কুম*। অপর দিকে অন্যান্য সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী মুসলিমদের কাছে ব্যবসা, ভ্রমণ বা সফরের উদ্দেশ্যে

[১১] *Revue internationale de la Croix-Rouge*, No. 403, Juillet 1952, p. 560.

আগমন করলে তখন মুসলিমরা তাদেরকে পূর্ণ নিরাপত্তা দিত। আমরা যদি একথা বলি তা কোনো সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় উম্মাদনা বলে গণ্য হবে না যে, আরবীয় মুসলিমরা-ই এমন এক জাতি, যারা সর্বপ্রথম অন্য সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর সাথে সাধারণ অবস্থা অথবা যুদ্ধকালীন অবস্থায় চারিত্রিক ভিত্তিমূলকে আবশ্যকীয় আইনী ভিত্তিরূপে উন্নত করেন। তাদের এ চারিত্রিক ভিত্তিমূল আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করতে থাকে। যুগ-পরিক্রমায় এটি মুসলিমদেরকে শত্রু বা প্রতিপক্ষের সাথে সদাচরণের প্রতি নির্দেশনা দেয়।

পরবর্তীকালে বিশেষ করে রোম, ইউরোপ, স্পেন বিজয় এবং ক্রুসেড যুদ্ধগুলোতে চারিত্রিক আদর্শনির্ভর মুসলিমদের এ সুসংহত আচরণবিধির বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপীয় অনেক লেখক, চিন্তাবিদ ও আইনজ্ঞ মুসলিমদের এ উন্নত চারিত্রিক আদর্শের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। যেমন বারুন ডি টাউব (De taube) ১৯২৬ সালে হেগে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ক এক একাডেমিক সেমিনারে বক্তৃতায় বলেন, ‘ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গড়ে উঠা সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নয়নে ইসলামের প্রভাব ও গুরুত্ব আমি নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, ইসলামী বিশ্ব ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে সুসংহত এক যুদ্ধ আইন ও সিদ্ধপ্রথা প্রথিতকরণে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এতে কোনো সংন্দেহের অবকাশ নেই। ক্রুসেড যুদ্ধ যাদেরকে শত্রু বা প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করেছিল এবং যাদের বিরুদ্ধে এ ধর্মীয় যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল তাদের কাছ থেকেই এ ইউরোপীয় জনগোষ্ঠী যুদ্ধ ঘোষণার নিয়ম-কানূন, যোদ্ধা-অযোদ্ধাদের মধ্যে পৃথকীকরণ নীতি, যুদ্ধ-বন্দি, আহত ও অসুস্থ যোদ্ধা বা সেনাদের সাথে আচরণ, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন এবং শত্রুবহিনীর ক্ষতি সাধনের কিছু মাধ্যম বা উপকরণ নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে মানবিক নীতির শিক্ষা গ্রহণ করেছিল।’[১২] এর আরেকটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়, ক্রুসেড যুদ্ধে বন্দিদের সাথে সালাহ উদ্দীন আল-আয়্যুবীর আচরণ থেকে। প্রখ্যাত সীরাহ্কার ইব্ন শাদ্দাদ সালাহ্ উদ্দীন আল-আয়্যূবীর জীবনীতে লিখেছেন যে, তিনি (সালাহ্ উদ্দীন) যুদ্ধবন্দিদের সাথে উত্তম আচরণ করতেন। তিনি তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় বন্দিদেরকে অতিরিক্ত সুবিধা দিতেন, যুদ্ধ শেষে লোকেরা যখন লাশগুলোকে একত্রিত করত আমি (লেখক) সেসময় উপস্থিত ছিলাম। আমি দেখেছি তখন সালাহ্ উদ্দীন আয়্যুবী উক্ত লাশগুলোর মধ্যে অগ্রগামী বা নেতৃস্থানীয়দেরকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতেন। তিনি বিশেষভাবে অগ্রগামী সেনাদেরকে ফ্রান্সীয় পোষাক দিতেন। আর অবশিষ্ট সেনাদেরকে গরম পোষাক দিতেন। কেননা সে সময় শীত ছিল তীব্র। আর যখন শর্ত সাপেক্ষে শত্রু পক্ষের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে যুদ্ধ বা অবরোধের পরিসমাপ্তি

[১২] ড. এ্যাডমুন, La Theoric du Droit international musulman “Revue Egyptienne du Droit international”.

ঘটত তখন তিনি শর্তগুলোকে দ্রুত বাস্তবায়িত করতেন। আর এ শর্ত বাস্তবায়নের ফলে অনেক সময় আত্মসমর্পণকারী সেনাদের অতিরিক্ত সুবিধা অর্জিত হত। যখন কোনো বন্দি মুক্তিপণ দিত তখন তিনি তাকে নিরাপত্তার সাথে তার বাসস্থানে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করতেন।

আল্লাহ্‌র সাহায্যে বিজয় ও সফলতা অর্জিত হলে সুলতান সালাহ উদ্দীন আয়্যুবী একবার তাবুর স্তূপে বসে পড়লেন তখনো তাবু টাঙ্গানো হয়নি। এ সময় সৈন্যরা তার সামনে যুদ্ধ বন্দীদেরকে নিয়ে আসছিল। এরপর তাবু টাঙ্গানো হলো, তিনি খুশি ও আনন্দচিত্তে মহান আল্লাহ্‌র শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন। অতঃপর তিনি রাজা জাফারী ও তদ্বীয় ভাই এবং শাহ্‌জাদা আরনাতকে উপস্থিত হওয়ার জন্য তলব করলেন। তারা আগমন করলে সালাহ উদ্দীন আয়্যুবী নিজে বাদশা জাফরীকে ঠান্ডা শরবত পান করালেন এ সময় তিনি তৃষ্ণায় কাতর ছিলেন। আরবদের উত্তম অভ্যাস ও তাদের ভদ্রচিত ব্যবহার ছিল, যখন কোনো বন্দি বন্দিকারীর কোনো কিছু খাবে তখন সে নিরাপদ হয়ে যাবে। সুলতান সালাহ উদ্দীনও এ অনুপম চরিত্র এবং আদর্শের অনুসারী ছিলেন।[১৩] এর চেয়ে অনুপম আদর্শ পরিদৃষ্ট হয় না। বন্দিদের সাথে এরচেয়ে উত্তম আচরণের কোনো কী দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে? যে স্বয়ং সুলতান বন্দিদেরকে নিজ হাতে ঠান্ডা পানি পান করিয়ে তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন। ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে আমরা দেখতে পাই যে, মধ্যযুগে সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও শক্তি গোটা ইউরোপকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছিল এবং কিছু নীতিমালার প্রবর্তন করেছিল। যেমন নারীদের সংরক্ষণ, অসহায়দের সাহায্য, ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়া ব্যক্তির উপর আক্রমণ নিষেধ এবং এমন শত্রুর উপর আক্রমণ করা নিষেধ, যার হাতে তরবারী ভেঙ্গে গিয়েছে। আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞগণ এর মধ্য থেকে কিছু আইনকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মৌলিক বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা এবং ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স বিপ্লবে সফলতার অন্যতম কারণ ছিল, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে নৈতিক বুনিয়াদ উন্নয়নে বড় ধরনের প্রভাব। ফ্রান্সীয় জনৈক নেতা যে বুনিয়াদি নৈতিকতার মাধ্যমে তার সেনাবাহিনী সফলতা অর্জন করেছিল, তার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন যে, এমন কোনো নেতা অথবা  সৈনিক আছে কী যিনি বিজয় অর্জনের পর তার প্রতিপক্ষ যোদ্ধাকে সম্মান করতে চাবে? আমি নিজ সৈন্যকে প্রতিপক্ষ আহত সৈনিকের সেবা এবং তার সাথে নম্র আচরণ করতে দেখেছি। আমি এতে সন্তুষ্ট হয়ে বলছি যে, আমি এ ধরনের উন্নত সৈনিকের নেতৃত্ব দেই। ফ্রান্সীয় এ

[১৩] ইবনুশ্‌-শাদ্দাদ, *আন্‌-নাওয়াদির আস-সুলতানিয়্যাহ্‌ ওয়াল মাহাসিন আল-ইউসুফিয়্যাহ্‌*, মিন যাকিরাতুত্‌-তা'রীফ আল-'আরাবী আল-ইসলামী, আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত, কায়রো।

নেতা আরো বলেন, সেটারবার্গে অবস্থানরত সেনাবাহিনী বন্দিদের সাথে ভ্রাতৃত্ব স্বরূপ আচরণ করেছে। তারা এ সব বন্দির মাঝে রুটি, প্রয়োজনীয় আহারের গোস্ত ও জাতীয় দৈনিক খবরের বিতরণ করেছে। এ সমস্ত বন্দি সেনা বাহিনীদের কাছ থেকে কাগজ ও কালি নিয়ে জার্মানিতে লিখেছেন যে, মনে হয় যেন এখানে *রায়ন* নদীর কোনো অস্তিত্ব নেই।[১৪]

অপরদিকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে নৈতিকতার বুনিয়াদ গঠনে যে দার্শনিক চিন্তাধারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, সে চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন রুশো এবং মশিকু ফ্রান্সে, এমেরিক ফাটিল সুইজারল্যান্ডে ও বেনিয়ামিন ফ্রাঙ্কলিন আমেরিকায়। তাদের এ দর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রফেসর লীবার ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে গৃহযুদ্ধের সময় আমিরিকান সেনাবাহিনীর জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেন। পরবর্তীকালে এটি আন্তর্জাতিক আইনের ভাষ্যে প্রবেশ করে এবং স্থল যুদ্ধ আইন ও এর আনুসংগিক নীতি হিসেবে প্রকাশ পায়। এটি ১৮৯৯ সালে হেগের দ্বিতীয় চুক্তি এবং ১৯০৭ সালের চতুর্থ চুক্তির সাথে সংযোজিত হয়। হেগের চুক্তিগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ চুক্তির ভূমিকায় স্থলযুদ্ধের নীতি বর্ণনা প্রসঙ্গে নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে সন্নিবদ্ধ করা হয়েছে। এটি মারটিন-এর শর্ত হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাঁর এ গবেষণা ছিল হেগ চুক্তির নৈতিক ভিত্তি সম্পর্কিত। এর সাথে জেনেভা কনভেনশনের নৈতিক ভিত্তির সম্পর্ক রয়েছে। যা হোক এর জন্য কোনো প্রামাণিকতার প্রয়োজন নেই। কেননা এ আইন মানবিকতার মূলভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর মানবিকতার মৌলিক বুনিয়াদ আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধের নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত।[১৫] আর রেড ক্রস আইনের পূর্ণরূপ মানবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এক বিস্তৃত ব্যাখ্যা। সুতরাং এটি নৈতিক নীতিমালার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক আইন। এ আইন এজন্য বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে যে, এর মাধ্যমে আমরা এমন সব সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়ে থাকি, প্রচলিত আইনে যার কোনো সুস্পষ্ট বিবরণ আজও বিধৃত হয়নি।[১৬]

---

[১৪] বাস্সাম আসালী, আল-হারব ওয়াল হাদারাত, মাজাল্লাতু ফিক্র আল-আসকারী আস্-সুরিয়্যাহ্, জুলাই সংখ্যা ১৯৭৭ খ্রি.। জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড হয়ে এ রায়ন নদী উত্তর সাগরে পতিত হয়েছে। রায়ন নদীর অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও মনে হয় যেন এ দেশগুলো সব একই। এদের মধ্যে কোন বিভক্তি নেই। উপরিউক্ত উক্তি দ্বারা এটিই বুঝানো হয়েছে।

[১৫] Miguel A. Marine, “The Evolution and present Status of the Laws of War”, RCADI, 1957, No. 2, p. 639.

[১৬] জন বকতিয়াহ্, আল-কানূনুদ্-দাওলী আল-ইনসানী ওয়া হিমায়াতু দাহায়াল হারব, হিনরি ডুনান সংস্থা, জেনেভা, ১৯৮৬ খ্রি.।

## ২. আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে ধর্মের প্রভাব

দ্বীনের সাধারণ সংজ্ঞা এভাবে দেয়া যেতে পারে যে, 'আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের আধ্যাত্মিক বন্ধন, যা নির্দিষ্ট বিশ্বাস ও প্রতিকীর সমাহার-এর নামই হলো দ্বীন বা ধর্ম। ইসলাম ধর্ম প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা ভিন্নতর। এ ধর্মে শুধু সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের বন্ধনকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি; বরং এতদসংগে নিজের সাথে নিজের সম্পর্ক এবং মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক এমনকি প্রাণী জগত তথা ধরণীকুলের সাথে মানুষের সম্পর্ক নিরূপণ করা হয়েছে।

আজকে আধুনিক বিশ্বে যে সমস্ত ধর্ম প্রচলিত রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কতক আসমানী ধর্ম যেমন ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও ইসলাম। আবার কিছু ধর্ম সংস্কারবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। যেমন ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, কনফুসিয়াস এবং সেন্টু ধর্ম। এসব ধর্ম কম-বেশি আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের উৎস। কেননা এসব ধর্মের সরাসরি ভাষ্য অথবা নৈতিক উদাহরণ দ্বারা এ আইন উপকৃত হয়। যেমন ইসলাম ধর্মে আল-কুরআনের কতিপয় আয়াতে রয়েছে[১৭]

﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾

"ভাল কাজের বদলা ভাল কাজ দ্বারা হয়ে থাকে" আর নৈতিকতার উদাহরণ হলো যেমন উপাসনালয়ে আশ্রিত বক্তিদের উপর আক্রমণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা।[১৮]

এ পর্যায়ে আমরা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মূলনীতির স্বীকৃতির ব্যাপারে রোমান, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের ভূমিকা আলোচনা করব:

**ক.** রোমান ধর্মে এমন কিছু যুদ্ধনীতি ছিল, যা মান্যকরা কমাণ্ডার ও সেনাসদস্যের জন্য অপরিহার্য ছিল। বিশেষ করে ঘোষণা ব্যতীত কেউ কারোর উপর আক্রমণ করতে পারবে না। এ যুদ্ধনীতির উৎকর্ষ সাধনে যাজক Fetiali-এর মত আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি। তাঁর মতে ঘোষণা ছাড়া কেউ কারো উপর আক্রমণ চালাতে পারবে না। এটি আধুনিক আইনে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে আবশ্যিকভাবে আল্টিমেটাম দেয়ার প্রাথমিক ধারণা।

**খ.** খ্রিস্টান ধর্মে আমরা দেখতে পাই যে, সর্বপ্রথম ন্যায় সংগত যুদ্ধ ও ন্যায় বহির্ভূত যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন আগসতিনুস নামক জনৈক তিউনিসীয় পাদ্রী। তিনি'*ফি মাদ্বীনাতিল্লা*' শিরোনামে স্বীয় গ্রন্থে লিখেছেন,

---

[১৭] সূরাহ্ আর-রহমান: ৬০।

[১৮] ড. হামেদ সুলতান, *আল-কানূনুদ্-দাওলী আল-'আম ফী ওয়াক্তিস্-সিলম*, কায়রো, ১৯৬২ খ্রি., পৃ. ৩৪-৩৫।

যুদ্ধ সংক্রান্ত আইন শুধু জনগণের উপরেই প্রবর্তিত হবে না; বরং রাষ্ট্রের উপর এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রবর্তিত হবে। এভাবে তিনি চুক্তি ও যুদ্ধের নীতিমালার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দাবি জানান। আগসতাইনের কয়েক শতাব্দি পরে সেন্ট থমাস ইকুইনাস প্রাকৃতিক আইন এবং মানবিক আইনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করে ঘোষণা দেন যে, এ দু'টি আইন-ই খোদায়ী আইনের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তিনি পাদ্রী আগসতাইনস-এর *ন্যায় সঙ্গত* এবং *ন্যায় বহির্ভূত যুদ্ধনীতির* উৎকর্ষ সাধন করেন।[১৯]

যুদ্ধ আচরণবিধির এ হলো এক দিক। অপর দিকে ইউরোপে আন্তর্জাতিক প্রচলিত আইন নিয়ে যারা প্রথম সারির গবেষক ছিলেন তারা প্রত্যেকেই ছিলেন খ্রিস্টান পাদ্রী, যেমন, ডি. ভিটোরিয়া এবং সাওয়ারিজ প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, ইউরোপে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে বেসামরিক লোকদেরকে রক্ষাকরণ সম্পর্কে কথা বলেছেন তিনি ছিলেন একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। তার নাম হলো কারডিলাল বিলারম্যান (১৫৪২-১৬২১) ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দে ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশিত তার এক গ্রন্থে *ফীল মাবাদীত তাবি'ঈয়্যোহ্ লিদ্-দীনেল মাসীহী* শিরোনামে লিখেছেন যে, যুদ্ধে অংশগ্রহণে সক্ষম নয় এমন শ্রেণির লোক যেমন, অপারগ, মহিলা, বৃদ্ধ, দুর্বল ও অন্যান্যদেরকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা যাবে না। কেননা মানবিক অনুভূতিই এ শ্রেণির লোকদেরকে হত্যা না করার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান জানায়। এছাড়া ধর্মীয় ব্যক্তি বর্গ, ব্যবসায়ী, কৃষক তথা যারা জমিতে চাষ করে তাদেরকে বন্দি করা বৈধ নয়। সকল জাতি একথার উপর একমত।

যখন আমরা আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশাসনিক আইনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তখন আমরা দেখতে পাই যে, মধ্য যুগের শেষ দিকে খ্রিস্টান ধর্ম এমন দু'টি সংগঠন দ্বারা গোটা ইউরোপকে ঐশ্বর্য মণ্ডিত করেছিল, যুদ্ধের সীমারেখা সংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রে এ দু'টি সংগঠনের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। এ দু'টি সংগঠনের নাম হলো যথাক্রমে *সিলমুর রব* ও *হুদনাতুর রব*।

## ১. সিলমুর রব বা খোদায়ী শান্তি

সিলমুর রব তথা (খোদার শান্তি) যাকে ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দে ল্যাটরান কাউন্সিলে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এ বৈঠকে কিছু ব্যক্তিবর্গ যেমন পাদ্রী, আবাল, বৃদ্ধ-বণিতা

---

[১৯] ড. 'আমের আয্-যামালী, *মাদখাল ইলা আল-কানূন আদ্-দাওলী আল-ইনসানী*, মানশুরাত আল-মাহ্হাদিল 'আরাবী লি হুকুকিল ইনসান, ১৯৮৯ ও ১৯৯৪ খ্রি., পৃ. ৯।

এবং কিছু স্থান যেমন উপাসনালয়, শিক্ষালয় ও গীর্জা এবং এমন কিছু জিনিস যেমন, চাষাবাদের জন্তু, সরঞ্জামাদী ও কৃষিজপণ্য বা উৎপাদিত ফসলসমূহকে যুদ্ধের আক্রমণ ও ভয়াবহতা থেকে রক্ষাকরণের নির্দেশ দেয়া হয়।

## ২. হুদনাতুর রব বা খোদায়ী সন্ধি

১০৯৬ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত কিলিরমুন বৈঠকে *হুদনাতুর রবকে* (খোদায়ী সন্ধি) স্বীকৃতি দেয়া হয়। এ বৈঠকে প্রত্যেক সপ্তাহে শুক্রবারের সন্ধ্যা ও রবিবারের সকাল, যীশুর জন্ম উপলক্ষে রোযার সময়, '*ঈদুল ফাসহ্*-এর পূর্বে রোযার সময়ে যে কোনো ধরনের যুদ্ধ ও হানাহানি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। এটি মূলতঃ ইসলামের হারাম মাসসমূহে যুদ্ধ না করার বিধানের অনুরূপ।

## ৩. ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইন

ইসলাম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা ভিন্নতর। কেননা ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মত নিছক একটি ধর্ম নয়; বরং এটি হলো একটি দ্বীন ও শরী'আত। এ শরী'আত পূর্ণরূপে মানুষের জাগতিক জীবনের সকল কর্মকাণ্ড তথা যুদ্ধ ও শান্তি এবং চুক্তির সময় অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথে আচরণ পদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ কথা মনে রাখা দরকার যে ইসলামী শরী'আহ্ আইনের উৎস তিনটি যথা, *আল-কুরআন*, *আস্-সুন্নাহ্* ও *আল-ইজতিহাদ*। এ তিনটি উৎস ইসলামে যুদ্ধনীতিরও উৎস। কালক্রমে এ যুদ্ধনীতির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। ফলে আজকের বিশ্বে একে *আন্তর্জাতিক মানবিক আইন* নাম দেয়া যেতে পারে। আল-কুরআন যুদ্ধ ও শান্তি চুক্তির সময় অন্যান্য জাতি বা জনগোষ্ঠীর সাথে মেলামেশার জন্য অনেক আচরণবিধি ও মূলনীতি প্রবর্তন করেছে, যা সংবিধানের সমপর্যায়ে পড়ে। আর আল-কুরআনে যা কিছু উল্লিখিত হয়েছে হাদীস সেগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। ফলে হাদীস আইনী মূলনীতির পর্যায়ভুক্ত। এরপরে আসে *ফিক্হী ইজতিহাদ*। এতে খুলাফায়ে রাশেদীনের হিদায়াত এবং নির্দেশনামা অন্তর্ভুক্ত, যা এ যুদ্ধ আইনকে সুশৃংখল ও সুসংহত করেছে। একে '*আরবীয় মুসলিমদের যুদ্ধনীতি*' নামও দেয়া যেতে পারে।

আমরা ইসলামে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনকে চারভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন,

১. যে সব অবস্থায় ইসলাম যুদ্ধের অনুমতি দেয়।

২. ইসলামে যুদ্ধ ঘোষণার পদ্ধতি।

৩. ইসলামে বন্দিদের সাথে আচরণ করার পদ্ধতি ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টনের হুকুম।

৪. যুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদদের আচরণ।

এ সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে উপর্যুক্ত চার প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা আমাদের জন্য কঠিন। তাই উপর্যুক্ত চার নম্বর বিষয়ের উপর আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। আর তা হবে খুবই সংক্ষিপ্ত। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য *আল-ইসলাম ওয়াল কানূনুদ্-দাওলী*[২০] ও *আহ্কামুল হারব ওয়াস-সালাম ফী দাওলাতিল* ইসলাম নামক দু'টি গ্রন্থ অধ্যয়ন করা যেতে পারে।[২১]

## যুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদদের আচরণ

যুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদরা প্রতিপক্ষ জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে সমস্ত নীতিমালা বা আইনকানূন অনুসরণ করে থাকে তা শুধু নৈতিক আদর্শ বা স্বীয় কমা ার অথবা রাষ্ট্রীয় নির্দেশনাবলীর কারণে নয়; বরং তাদের এ অনুসৃত নীতি আল-কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে নিসৃত আবশ্যকীয় শর'ঈ নির্দেশনা। যুদ্ধকালীন এ নিয়ম বা নীতি বর্জন করলে কমাণ্ডারের পক্ষ থেকে যেমন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে, তেমনি আল-কুরআন ও সুন্নাহ্য় বর্ণিত এ অকাট্য নির্দেশনামা অমান্য করার কারণে আখিরাতেও তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

যুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদদের আচরণকে সুসংহতকারী কতিপয় শর'ঈ নীতি যা নিম্নরূপ:

## কেবল প্রতিপক্ষ পুরুষ ও যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধকে সীমিত রাখা

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন যায়দ ইব্ন হারিসাকে কমান্ডার করে মুতার যুদ্ধে পাঠিয়ে দিলেন তখন তিনি তাঁকে এই নির্দেশ দেন "তোমরা কখনো শিশু, মহিলা, বয়স্ক এবং আশ্রম বা উপাসনালয়ে আশ্রিত লোকদেরকে হত্যা করবে না।"[২২] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে আহত সেনাদেরকে কাজে ব্যবহার করতে নিষেধ করে বলেন, "আহত সৈনিক দ্বারা যুদ্ধ করাবে না। কেননা তার কিছু অংশ তার কাছে নেই।" অর্থাৎ সে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রমজীবী ও শিশুদেরকে কষ্ট দিতে

[২০] মানশুরাতি দারুত্-তাল্লাশ।

[২১] মানশুরাতি দারুন-নুমায়শ, দামিশক, ১৯৯৩ খ্রি.।

[২২] ড. 'আমের আয্-যামালী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০।

নিষেধ করে বলেন, ولا تقتلوا ذرية ولاعسيفا "তোমরা শিশু ও মেহনতী লোকদেরকে হত্যা করবে না।" এখানে ذرية দ্বারা অপ্রাপ্ত বয়স্কদের এবং عسيف দ্বারা মজদুর ও যারা মাঠে কৃষিকাজ করে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর মেয়েদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা কখনো মেয়েদের সম্মুখীন হবে না। তবে মহিলারা যদি অস্ত্র হাতে তুলে নেয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবে। অন্যথায় নয়।" রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রণাঙ্গনে একজন মুশরিক মহিলার লাশ দেখতে পেয়ে ভর্ৎসনা করে বললেন, "কে এ মহিলাকে হত্যা করেছে? আর কে তাকে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছে? এতো আর যুদ্ধ করেনি।"

## মানবিক স্পিরিট নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া

শর'ঈ কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করা বৈধ নয়। এটি আল-কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

'আর বৈধ কারণ ব্যতীত তোমরা সেই প্রাণকে হত্যা কর না, আল্লাহ যা হারাম করেছেন। এগুলো আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।'[২৩]

সুতরাং হত্যা যদি করতেই হয় তা হবে বিচারের মাধ্যমে শরী'আত সম্মত পন্থায় উত্তম পদ্ধতিতে যা মানবতার কাছাকাছি। এমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে[২৪]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

انا نبى الملحمة وانا نبى المرحمة

"আমি সংগ্রামের নবী, আমি রহমতেরও নবী।"[২৫]

এভাবে মৃত মানুষের সম্মান এবং মানবতার মর্যাদাদানের জন্য লাশ বিকৃতি করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, اياكم والمثلة ولو بالعقور "তোমরা লাশ বিকৃত থেকে দূরে থাক, আর তা যদি দংশনকারী পাগল কুকুরেরও হয়।"

[২৩] সূরাহ্ আল-আন'আম: ১৫১।

[২৪] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৩৬১৫; *সুনানু আবী দাউদ*, হাদীস নং ২৪৩২; *জামি'উত্-তিরমিযী*, হাদীস নং ১৩২৯; *সুনানুন্-নাসা'ঈ*, হাদীস নং ৪৩২৯; ৪৩৩৫-৪৩৩৮; *সুনানু ইব্ন মাজাহ্*, হাদীস নং ৩১৬১; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ১৬৪৯০; *সুনানুন্-দরিমী*, হাদীস নং ২০২২।

[২৫] ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং-৩৯৫।

অধিকাংশ ফকীহ্গণের মতে আগুনে লাশ পোড়ানো ইসলাম পরিপন্থী জঘন্যতম কাজ। কেননা এটি পৌত্তলিকদের প্রথা। তবে বিশেষ কারণে জনঃস্বার্থে লাশ পোড়ানো যেতে পারে। যেমন লাশ না পোড়ালে কলেরা মহামারী বিস্তার লাভ করবে তাতে জনগণের প্রাণনাশের আশংকা রয়েছে এমতাবস্থায় লাশ পোড়ানো যেতে পারে। সাধারণ অবস্থায় কোনো মৃতদেহ পোড়ানো যাবে না। কেননা লাশ পোড়ানো মানবতার অসম্মানের শামিল। মানুষের মনুষত্ব ও মানবতাকে সম্মান করা এবং মর্যাদা দেয়া ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

'আমি তো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে, তাদেরকে চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম রিয্ক দান করেছি, আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।'[২৬]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী (রহ.) বলেন, এ পৃথিবীতে মানুষের নাফ্স হলো, সকল নাফসের মধ্যে উত্তম, আর তাদের দেহ হলো অন্যান্য সৃষ্টির সকল দেহ থেকে উত্তম।'[২৭]

## ৩. লুটতরাজ নিষিদ্ধ যা জাহিলীযুগে প্রচলিত ছিল

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লুণ্ঠন করতে নিষেধ করেছেন। আনসারী এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কোনো এক সফরে বের হলাম। সফরকালে লোকেরা খুবই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল। তারা সামনে বকরীর পাল থেকে একটি বকরী ছিনিয়ে নিয়ে এসে জবাই করল এবং তা আগুনে পাকানো শুরু করল। এমনি সময়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেঁটে হেঁটে চলে আসলেন এবং এ অবস্থা দেখে বিস্মিত হলেন। তিনি গোশতের হাঁড়ি উল্টে দিলেন এবং গোশ্তগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করতে লাগলেন এবং বললেন,

ان النهبة ليست بأحل من الميتة

"লুটের মাল মৃত অপেক্ষা হালাল নয়।"[২৮] সুতরাং এখানে গনীমত ও লুণ্ঠনকে

---

[২৬] সূরাহ্ বানী ইসরাঈল: ৭০।

[২৭] ফখরুদ্দীন আর-রাযী, *মাফাতীহুল গায়ব*।

[২৮] *আল-ইসলাম ওয়াল-কানূনুদ্-দাওলী*, পৃ. ১৩৮-১৩৯।

পৃথক পৃথক বস্তু হিসেবে দেখানো হয়েছে। লুণ্ঠন হারাম আর গনীমতকে আল-কুরআন দ্বারা হালাল সাব্যস্ত করা হয়েছে।

## ৪. খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা নিষিদ্ধ

এমনকি শত্রুপক্ষের অনিষ্টতার আশঙ্কা থাকলেও খিয়ানত করা যাবে না। নিম্নোক্ত আয়াতে এসেছে:

﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾

'যদি তুমি কোনো সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভঙ্গের আশংকা কর তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথ বাতিল করবে; আল্লাহ্ বিশ্বাস-ভংগকারীদেরকে পছন্দ করেন না।'[২৯]

আর হাদীসেও খিয়ানত এবং বিশ্বাসঘতকতাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

سِيرُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا

'তোমরা আল্লাহ্র নামে আল্লাহ্র পথে চল। তোমরা যুদ্ধ কর ঐ ব্যক্তির সাথে যে আল্লাহকে অস্বীকার করেছে (যদি সে আক্রমণ করে)। তোমরা লাশ বিকৃতি করবে না, বিশ্বাসঘতকতা করবে না, গনীমতের মাল চুরি করবে না এবং কোনো শিশুকে হত্যা করবে না'[৩০]

## ৫. ধ্বংসযজ্ঞ ও সম্পদ নষ্ট করা নিষিদ্ধ

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন যুদ্ধে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো এবং মানব সম্পদ ধ্বংস করার স্বীকৃতি দেয় না, তেমনি ইসলামী শরী'আহ্ আইনও ধ্বংসযজ্ঞ চালানোকে হারাম বা নিষিদ্ধ করেছে। ইসলাম যুদ্ধে ফলজবৃক্ষ কাটা, খেজুর বৃক্ষ পোড়ানো, শত্রুর গরু-ছাগল, উট জবাই করতে নিষেধ করেছে। তবে বিশেষ অবস্থায় শত্রুদের শক্তিকে দুর্বল করে দেয়া অথবা বিজয় ছিনিয়ে নেয়ার জন্য উল্লিখিত বিষয় শিথিলযোগ্য।[৩১] এটি ইমাম আওযাঈর অভিমত।

[২৯] সূরাহ্ আল-আনফাল: ৫৮।

[৩০] *সুনানু ইব্ন মাজাহ্*, হাদীস ন ং২৮৪৮; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ১৭৪০০।

[৩১] মুহাম্মাদ ফারায, আস-সালাম *ওয়াল হারব ফিল ইসলাম*, কায়রো, ১৯৯০ খ্রি.।

## ৬. যে নিরাপত্তা চায় তাকে নিরাপত্তা দেয়া

বিংশ শতাব্দীর পূর্বপর্যন্ত ইউরোপীয় যুদ্ধগুলোতে শত্রু বাহিনীর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা চাওয়ার বিষয়কে আবশ্যিকভাবে দেখা হতো না। অবশেষে **১৮৯৯** খ্রিস্টাব্দে হেগে স্থল-যুদ্ধনীতি প্রণয়নকারীগণ যুদ্ধনীতিতে একথা অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়েছেন যে, যুদ্ধে কোনো দলকেই 'নিরাপত্তা দেয়া হবে না' এ মর্মে কোনো ঘোষণা দিতে পারবে না। এর বিপরীত ইসলাম বহু পূর্বে এ সত্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সূচনা থেকে এ নীতি বাস্তবায়িত করেছে। যেমন আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾

'মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহ্‌র বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দেবে, কারণ তারা অজ্ঞ লোক।'[৩২]

## ৭. শত্রুপক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করলে যুদ্ধ বন্ধ করা

ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং মিথ্যাকে অপসারিত করা। এজন্য শত্রুপক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করলে সাথে সাথে যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়া। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

'তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়বে ও আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করবে; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'[৩৩]

তবে ইসলামের ফকীহগণ বিশেষ পরিস্থিতিতে মুসলিম সেনাপতিদেরকে যুদ্ধচলাকলীন প্রতিপক্ষ শত্রুদেরকে হত্যা করার অনুমতি দিয়েছেন। চাই উক্ত শত্রুবাহিনী যুদ্ধের সম্মুখীন হোক অথবা পশ্চাতগামী হোক। এমনিভাবে যুদ্ধ থেকে পলায়ন অবস্থায় ও তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ এই ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে যে, তাদের এই পলায়ন সন্ধির ইচ্ছা ব্যতিরেকে একটি যুদ্ধ কৌশল হতে

---

[৩২] সূরাহ্ আত্-তাওবা: ৬।

[৩৩] সূরাহ্ আল-আনফাল: ৬১; এ বিষয়ে ড. মুস্তফা কামিল শুহাতাহ্ লিখিত গবেষণা নিবন্ধ দেখা যেতে পারে, পৃ. ১৮ ও তৎপরবর্তী।।

পারে। এমনিভাবে শত্রুবাহিনীর পক্ষ থেকে পেশকৃত সন্ধি প্রস্তাব গ্রহণ এমন শর্তযুক্ত হবে না যে, এর দ্বারা যুদ্ধের দিকে আহবান করার জন্য শত্রুবাহিনীকে নিষ্কৃতি দেয়া। ইসলামিক মানবিক আইন যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুসলিম মুজাহিদের আচরণ সুদৃঢ় করার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। এটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক আইনের উৎকর্ষ সাধনে ও অন্যান্য সমসাময়িক লেখক, চিন্তাবিদ ও ইউরোপীয় আইনবিদগণ ইসলামের এ অবদান অকপটে স্বীকার করেছেন।

# ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের দৃষ্টিতে যুদ্ধ বিষয়ক কার্যক্রমের প্রক্রিয়াগত কতিপয় মূলনীতি*

ড. 'আমের আয-যামালী**

## ভূমিকা

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বর্তমান কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালার উপর যা পরবর্তীকালে তার চলার পথে বিস্তৃত শাখা-প্রশাখার দিকে মোড় নিয়েছে। এগুলোর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে, সশস্ত্র লড়াই। বিশেষ করে যুদ্ধ বিষয়ক কার্যক্রম দ্বারা সৃষ্ট ঐ সব ব্যক্তিদের ক্ষয় ক্ষতি সীমিত করা যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি অথবা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে অক্ষম। এ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি আরো সম্প্রসারিত হয়ে ঐসব সম্পদকেও শামিল করে যা সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়নি। আন্তর্জাতিক মানবিক আইন এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত দায়-দায়িত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকে যুদ্ধরত উভয় পক্ষের উপর বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে এবং যুদ্ধে নির্দিষ্ট উপকরণ ও পদ্ধতির ব্যবহারকে শর্তযুক্ত অথবা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবিক আইন যুদ্ধকে নিষেধ করে না, তবে আইনটি তার প্রভাবকে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টায় তৎপর। এ আইন মানবতার এমন প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছে, যা যুদ্ধের আবশ্যকতাকে উপেক্ষা করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে চারটি মূলনীতি গুরুত্বসহকারে অনুসৃত হয়ে থাকে; যথা:-

১. মানবতার সংরক্ষণ

২. সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করার মূলনীতি

৩. সামরিক লক্ষ্যবস্তু এবং বেসামরিক লোকজন ও সম্পদরাজির মধ্যে সাম্যের মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করা

৪. যুদ্ধ বিষয়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখা।

---

* প্রবন্ধটি ২০০২ সালে এপ্রিল মাসে তিউনিসিয়ায় আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে পঠিত হয়। এ সেমিনারে আরব বিশ্বের অনেক সেনা অফিসার ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

** বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টা।

* প্রবন্ধটি অনুবাদ করেন ড. আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া যা আইসিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত *ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইন* গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। পৃ. ৭৪-৮৫- প্রকাশক।

উপরিউক্ত এ চারটি মূলনীতি উপস্থাপন করার মাধ্যমে এগুলোর সারকথা ও নির্দেশনার সাথে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও ইসলামের বিধি-বিধানের পারস্পরিক সম্পর্ক কী তা স্পষ্ট করে দেখাতে সক্ষম হব। তবে এ সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক পর্যালোচনার বিষয়টি নিছক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা নির্ভর করে বেশ কিছু প্রায়োগিক উপাদানের উপর। কারণ শুধু বিধি-বিধানের কোনো মূল্য নেই যতক্ষণ পর্যন্ত এর বাস্তবায়ন এবং এর যথার্থতা প্রমাণে সঠিক দায়িত্ব পালন করা না হবে।'

## ১. মানবতা সংরক্ষণ

মানবিক আইন নিয়ে কথা বলতে হলে শব্দটির আসল তথা '*মানবতা*' সংক্রান্ত আলোচনা অপরিহার্য। বস্তুত: যুদ্ধ মানব সৃষ্ট একটি বাস্তব অবস্থা, কিন্তু তা মানবতার দাবিকে অস্বীকার করতে পারে না। আর আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান, প্রথাগত বিধান (ঈঁংঃড়সধৎু খধি), অথবা লিখিত বিধান একে সুস্পষ্টভাবে সুদৃঢ় করে। এ আইনের নির্দেশনা হচ্ছে, যুদ্ধে আক্রান্তদের সাথে মানবিক আচরণ করা আবশ্যক। অর্থাৎ মানুষের মান-সম্মান, জীবন ও সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। ইসলামের মৌলিক নীতি হচ্ছে, মানুষকে সম্মান করা। যেমন আল-কুরআনে ঘোষিত হয়েছে:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾

'আর আমি আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; আর স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের জন্য বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর এদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।'[১]

এখানে (كرم) ফে'ল বা ক্রিয়াটি (الكرامة) তথা সম্মান শব্দের সাথে আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেয়। এ বাণীই মানবসত্তাকে সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রণীত মৌলিক নীতিমালার মূলবস্তু। এমনকি যুদ্ধের মতো কঠিন সময়েরও মূলনীতি। মানবতাকে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার জন্য আবশ্যক হলো, যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি তাদেরকে যুদ্ধবিষয়ক কর্মকাণ্ডের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্ধারণ না করা। এছাড়া যারা যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে অবস্থান করে তাদেরকেও টার্গেট না

---

[১] সূরাহ্ আল-ইসরা: ৭০।

করা। এ মূলনীতিকে সমর্থন করে আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।'[২]

এ আয়াতের অর্থ হলো, যুদ্ধ শুধু সীমাবদ্ধ থাকবে যুদ্ধরত দলের মধ্যে। আর সীমালঙ্ঘন করা থেকে নিষেধ করার দাবি হচ্ছে নির্ধারিত সীমানায় অবস্থান করা। আমরা জানি, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সনদ নিরাপত্তা নীতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর প্রতিরক্ষার জন্য নির্ধারিত আইন প্রণয়ন করেছে। এ জাতীয় প্রত্যেকটি চুক্তির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের গন্তব্যস্থল একই, যা মানবিক আচরণ বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা ইসলামের ইতিহাসের সকল যুগে দেখতে পাই যে, মুসলিম সৈন্যবাহিনী তাদের সারিতে উদ্ধারকর্মী, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও বিচারকগণকে অন্তর্ভুক্ত করে নিত এবং তাদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সহযোগিতা করতে যত্নবান থাকত। ইসলামের প্রথম যুদ্ধ থেকেই নারীরা অসুস্থ ও আহতদেরকে সেবা করার দায়িত্ব পালন করত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতদেহের অঙ্গ-বিকৃতি, আহতদেরকে হত্যা এবং যুদ্ধবন্দি ও নিরাপত্তা-প্রার্থীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের নীতি নিষিদ্ধ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যুদ্ধবন্দিকে খাবার দান করার বিষয়টি উল্লেখ করতে পারি, যা সুস্পষ্টভাবে আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾

"আর তারা আল্লাহর ভালবাসায় অভাবগ্রস্থ, ইয়াতীম ও বন্দিকে খাবার দান করে।"[৩] হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুলাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

استوصوا بالأسارى خيرا

"তোমরা যুদ্ধবন্দিদের প্রতি ভাল আচরণ কর।"[৪] এ বক্তব্যটি সংক্ষিপ্ত হলেও অনেক বেশি তৎপর্যপূর্ণ। কারণ ভালো আচরণ করার বিষয়টি বন্দি জীবনের বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত সকল দিককেই অন্তর্ভুক্ত করে।

---

২ সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯০।

৩ সূরাহ্ আদ্-দাহ্র: ৮।

৪ সূরাহ্ আল-ইনসান: ৮।

## ২. সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করার মূলনীতি

মানবিক আইনের সর্বাধুনিক চুক্তি হিসেবে আমরা ১৯৪৯ সালের জেনেভা চুক্তির সাথে সংযুক্ত ১নং প্রটোকলের সিদ্ধান্তসমূহের কথা উল্লেখ করব, যা ১৯৭৭ সালে প্রণীত হয়। এর ৪৭ নং ধারার বক্তব্য হলো, '*বিরোধপূর্ণ পক্ষসমূহ বেসামরিক ও সামরিক নাগরিকদের মধ্যে এবং বেসামরিক লক্ষ্যবস্তু ও সামরিক লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে পার্থক্য করার ব্যাপারে কাজ করবে;* তাদের *কর্মতৎপরতা পরিচালিত হবে সামরিক লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে, অন্যকিছুর বিরুদ্ধে নয়।*' প্রথাগত এ আইনটিই হলো মূলতঃ যুদ্ধের রীতি নীতি ও তার ঐতিহ্যগত নীতির মূলভিত্তি। সুস্পষ্টভাবে তা রচনা করা এবং তাকে আন্তর্জাতিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সশস্ত্র যুদ্ধে সর্বাবস্থায় এর প্রতি গুরুত্ব প্রদানের তাগিদ রয়েছে। আমরা লক্ষ্য করব যে, '*অযোদ্ধা*' গোষ্ঠী '*বেসামরিক*' গোষ্ঠীর চেয়েও ব্যাপক। কারণ সশস্ত্র বাহিনীতে যোদ্ধা ছাড়াও চিকিৎসা সেবাদানকারী ও ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের মত অযোদ্ধারাও সংশ্লিষ্ট থাকে।

একদিকে যোদ্ধা ও অযোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্যকরণের এ নীতি, অপরদিকে সামরিক লক্ষ্যবস্তু ও বেসামরিক অধিবাসীগণের মধ্যে পার্থক্য করার নীতির উদ্দেশ্য হলো, বেসামরিক ব্যক্তিদেরকে যুদ্ধবিষয়ক তৎপরতার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত না করা এবং যারা যুদ্ধ করতে অক্ষম তাদেরকেও লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত না করা। যেমন আহত, অসুস্থ, ডুবন্ত, যুদ্ধবন্দি এবং বিমান বিধ্বস্ত হবার পর প্যারাসুট নিয়ে নামা কোনো ব্যক্তি। তেমনিভাবে যুদ্ধবিষয়ক তৎপরতার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা যাবে না চিকিৎসা সেবা ও ধর্মীয় বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে। তারা বেসামরিক বা সামরিক বাহিনীর সদস্য যে-ই হোক না কেন। আরো লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা যাবে না দমকল বাহিনীর ব্যক্তিবর্গ এবং আন্তর্জাতিক ও স্থানীয়ভাবে অনুমোদিত সাহায্য সংস্থাগুলোর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে। আর সুনির্দিষ্টভাবে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন যুদ্ধরত পক্ষগুলোকে এমন সকল ব্যক্তি বা বস্তুকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে স্থির করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক করে দিয়েছে, যার কোনো সামরিক লক্ষ্য নেই। এখানে বিশেষভাবে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শারীরিক প্রতিবন্ধী, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের জন্য নির্মিত পারমাণবিক কেন্দ্রসমূহ, নাগরিকদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পদসমূহ, নিরাপদ অঞ্চলসমূহ, নিরস্ত্র এলাকা, সামরিকভাবে সংরক্ষিত নয় এমন স্থানসমূহ এবং সাংস্কৃতিক সম্পদসমূহকে সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মানবিক আইন ব্যক্তি ও সম্পদ রক্ষার নির্দেশ দেয়। এ নির্দেশ ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, যতক্ষণ না নিরাপত্তা প্রাপ্ত ব্যক্তি যুদ্ধসংক্রান্ত কর্মতৎপরতায়

অংশগ্রহণ করবে, আর যতক্ষণ না সে নিরাপদ ঘোষিত সম্পদ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে।

মানবিক আইন নিরাপত্তা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। অনুরূপভাবে কোনো কোনো সম্পদ অথবা সংস্থার বিরুদ্ধে এবং সুনির্দিষ্ট কিছু স্থানে অনুরূপ প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা নিষেধ করে থাকে। কোনো ব্যক্তি বা সম্পদ বেসামরিক কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ হলে মানবিক আইন সেখানে তাকে বেসামরিক হওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়। আর মানবিক আইন এলোপাতাড়ি আক্রমণ করতে নিষেধ করে এবং যুদ্ধরত পক্ষসমূহকে আক্রমণের কাঙ্খিত লক্ষ্য নির্ধারণে আবশ্যকীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে বাধ্য করে।

বস্তুতঃ এ গুরুত্বপূর্ণ পৃথকীকরণে যে দিকে আমরা ইতোপূর্বে ইঙ্গিত করেছি তা ইসলামী শরী'আতের মজবুত নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী শরী'আত সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধকে স্বীকৃতি দেয় না, যুদ্ধকে সীমাবদ্ধ রাখে সময়, স্থান ও লক্ষ্যমাত্রার নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে। সাধারণ বিধান সম্বলিত আল-কুরআনের আয়াত, নির্দিষ্ট অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ, রাসূলের হাদীস এবং খলীফাগণ ও সেনাপতিদের উপদেশসমূহের উপর নির্ভর করে ফকীহ্গণ এমন কিছু নিয়মনীতি ও আইন প্রণয়ন করেছেন, যার মাধ্যমে তারা যোদ্ধা ও অযোদ্ধাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। আমরা হাদীসের মাধ্যমে জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী, শিশু, শ্রমিক, অতিশয় বৃদ্ধ ও গীর্জার পাদ্রীদের মত নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। হিজরী দশম সনে (৬৩৫খ্রি.) সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদত্ত ভাষণ থেকে প্রথম খলীফা আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) যুদ্ধের মূলনীতি উদ্ভাবন করেছেন এভাবে,

أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فأحفظوها عني لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا إمرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا الا لمأكل وسوف تمرون بأقوام فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان من الطعام فإذا أكلتم منها فاذكروا إسم الله عليه

'হে মানবমণ্ডলি তোমরা থামো! আমি তোমাদেরকে দশটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি তোমরা তা আমার থেকে সংরক্ষণ কর। তোমরা খিয়ানত করবে না, আত্মসাৎ করবেনা, প্রতারণা ও অঙ্গবিকৃতি করবে না, তোমরা শিশু, অতিশয় বৃদ্ধ মানুষ

ও নারীকে হত্যা করবে না, খেজুর গাছ কাটবে না এবং তা আগুনে পোড়াবে না; আর ফলদার বৃক্ষ কাটবে না। খাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত ছাগল, গরু ও উট জবাই করবে না। আর অচিরেই তোমরা এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করবে, যারা নিজেদেরকে গীর্জায় নিয়োজিত রেখেছে, তাদেরকে তোমরা তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেবে। তোমরা অচিরেই এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করবে যারা তোমাদের নিকট এমন কতগুলো পাত্র নিয়ে আসবে যাতে রং বে-রংয়ের খাবার রয়েছে, তোমরা সেসব পাত্র থেকে খেতে চাইলে মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে খাবে।'[৫]

অযোদ্ধাদের রক্ষা করার শর্তসমূহ এবং তাদের গণ্ডির সীমানাকে প্রশস্ত অথবা সংকীর্ণ করার বিষয়ে ফকীহগণের মতবিরোধ সত্বেও ব্যক্তি ও সম্পদ রক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালায় তারা সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অথবা অপরাপর রাষ্ট্রসমূহের মাঝে সংঘটিত যুদ্ধের কিছু ঘটনা থেকে জানা যায় যে, তাতে যোদ্ধা ও অযোদ্ধাদের মাঝে পার্থক্য করার বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয়নি। ফলে সেখানে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল ছিনতাই, লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ। যদিও এটি ইসলামী সেনাবাহিনীর কোনো স্বীকৃত চারিত্রিক নিয়মনীতি নয়। ইসলামী শরী'আতের মূল উৎস আল-কুরআন ও সুন্নাহ শুধু সম্পদ ধ্বংস, ভাংচুর ও নির্মূলকরণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত যুদ্ধসমূহকে কোনোভাবেই সমর্থন করে না। অনুরূপভাবে যমীনে বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ সৃষ্টি সাধারণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং যখন সামরিক উদ্দেশ্য সাধিত হবে এবং প্রতিপক্ষের উপর বিজয় অর্জিত হবে, তখন অর্থহীন কোনো আক্রমণের প্রয়োজন নেই।

## ৩. ভারসাম্যতার মূলনীতি

যুদ্ধে নিষিদ্ধ বস্তুর ব্যবহার সম্পর্কে '*সেন্টপিটার্সবার্গ ঘোষণা*' (১৮৬৮) একটি মূলনীতি স্থির করেছে যার সারকথা হলো, '*যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রসমূহের একমাত্র বৈধ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যে, শত্রুর সামরিক শক্তি দুর্বল করা।' সুতরাং কোনো বাহিনীর একটি বৃহৎ সংখ্যক সৈন্যকে বিপর্যস্ত করাই এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।' আর তা পুরোপুরি লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে তখনই, যখন এতে এমন 'অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হবে, যা অন্যায়ভাবে মানুষের দুঃখ-কষ্ট বৃদ্ধি করবে এবং আহত ও অক্ষম ব্যক্তিদের মৃত্যুকে অনিবার্য করে তুলবে।'* এ ধরনের অস্ত্রের ব্যবহার মানবিক আইনের লঙ্ঘন হিসেবে ধর্তব্য হবে, যেমনটি

---

[৫] *তারীখু মাদীনাতি দিমাশক আল-কাবীর*, পূর্বোক্ত।

উল্লিখিত ঘোষণায় বিবৃত হয়েছে। এ জন্যই *'হেগ' চার্টার* (স্থল যুদ্ধের নিয়মকানূন ও রীতিনীতির সাথে সম্পর্কিত ১৯০৭ সনের চতুর্থ হেগ চুক্তির সাথে সংযুক্ত) যেসব অস্ত্রশস্ত্র, বোমা, ক্ষেপনাস্ত্র এবং এমন পদার্থ যা মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় সেগুলোর ব্যবহার নিষিদ্ধ বলে গণ্য করেছে। ১৯৭৭ সালের প্রথম *এডিশনাল জেনেভা প্রটোকল* (এপি-১) এর চেয়ে আরো বেশি অগ্রসর হয়ে শুধু যুদ্ধরত পক্ষ নয়; বরং চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সকল পক্ষকে এ নীতির অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ চার্টারে বিষয়টি সম্পর্কে আরো গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে, যদি নতুন অস্ত্র-যার গবেষণা কিংবা উন্নয়ন, অথবা সংগ্রহ করা হচ্ছে তা (জেনেভা চুক্তির) গৃহীত সিদ্ধান্তের দাবি অনুযায়ী অথবা আন্তর্জাতিক অন্য কোনো আইনের চাহিদা অনুযায়ী চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সকল পক্ষের কাছে সর্বাবস্থায় বা কোনো বিশেষ অবস্থায় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ বলে স্বীকৃত হবে। এতে নতুন যে কোনো যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধের যাবতীয় নতুন পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হবে।

যে সব হামলা দ্বারা বেসামরিক লোকদের জীবন নাশ হবে অথবা তাদের ক্ষতি সাধিত হবে অথবা সাধারণ জনগণের ক্ষতিসাধন হবে কিংবা ধ্বংসযজ্ঞ, অনিষ্টতা এবং অনুভবযোগ্য ও সরকারি প্রত্যাশিত সামরিক ফায়দা লাভের তুলনায় বেশি বাড়াবাড়ি হবে এসবগুলোকে এ প্রটোকোল এলোপাতাড়ী হামলা বা আক্রমণের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করেছে। আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, যুদ্ধে বিপজ্জনক ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো স্থাপনাকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানানো যাবে না, যতক্ষণ না সেগুলোকে সরাসরি নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ও গুরুত্বসহকারে যুদ্ধবিষয়ক কর্মতৎপরতার পৃষ্ঠপোষকতার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে। আর যখন এ পৃষ্ঠপোষকতাকে নির্মূল করার জন্য আক্রমণ ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকবে না। সাধারণ ও বেসামরিক নাগরিকদেরকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যুদ্ধরত ব্যক্তিবর্গের উপর যেসব সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক, তন্মধ্যে অন্যতম হলো, এমন হামলা পরিচালনা করা থেকে বিরত থাকা, যা বেসামরিক লোকদের মানবিক বিপর্যয় তথা ব্যাপক প্রাণসংহার ঘটাবে অথবা তাদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করবে কিংবা ধ্বংসযজ্ঞ ও অনিষ্টতা উভয়টিই হতে পারে, এবং তাতে ক্ষতির পরিমাণ হবে আশংকাজনক, যা সরাসরি প্রত্যাশিত সামরিক উপকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অনুরূপভাবে যে হামলার সুস্পষ্ট লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ অথবা নিরাপত্তার আওতাভুক্ত বিশেষ ব্যক্তিবর্গ অথবা যেসব হামলা দ্বারা বেসামরিক লোকদের মারাত্মক মানবিক বিপর্যয় তথা প্রাণ-সংহার ও সাধারণ লোকদের সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হবে এবং এতে সামরিক উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, এ ধরনের হামলা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এডিশনাল প্রটোকল-১-এর

মর্মানুযায়ী সীমালঙ্ঘন করে এলোপাতাড়ি আক্রমণ, যার বর্ণনা উপরে দেয়া হয়েছে, তা যুদ্ধাপরাধ বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে বিপজ্জনক ক্ষমতাসম্পন্ন স্থাপনার উপর আক্রমণও যুদ্ধাপরাধ বলে গণ্য হবে।

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন যুদ্ধের উপকরণসমূহের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছে। এডিশনাল প্রথম প্রটোকলে গৃহীত সিদ্ধান্তের একটি ধারার ভিত্তিতে এমন অস্ত্রশস্ত্র, বোমা বা ক্ষেপণাস্ত্র, পদার্থ ও যুদ্ধের পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যার প্রভাব থেকে সীমাহীন দুর্ভোগের উদ্ভব হয় (ধারা-৩৫, অনুচ্ছেদ-২)। বস্তুত: এ সব উপকরণের সামরিক প্রয়োজন বলতে যোদ্ধারা যা ব্যবহার করে থাকে তা তার নির্দিষ্ট সীমাকে অতিক্রম করে। আমরা যখন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার বিষয়ক নীতির দিকে দৃষ্টি দেব, তখন আমরা অবশ্যই লক্ষ্য করব যে, আন্তর্জাতিক আইন *'সেন্টপিটার্সবার্গ ঘোষণা'*-এর সময় থেকে আজকের দিন পর্যন্ত বিশেষ কতগুলো অস্ত্রকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং অন্যান্য অস্ত্রসমূহ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে শর্তারোপ করেছে। কিন্তু *'সেন্টপিটার্সবার্গ ঘোষণা'* পারমাণবিক অস্ত্রের মতো কিছু অস্ত্রের ব্যবহার সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়নে সক্ষম হয়নি। *'নিষিদ্ধ'* অথবা *'শর্তযুক্ত* বা *সীমিতকরণ'* এ উভয়টির উদ্দেশ্য হলো, যুদ্ধের উপকরণসমূহের ধবংসাত্মক প্রভাবকে সীমাবদ্ধ করা এবং সামরিক প্রয়োজনীয়তার সীমানাকে অতিক্রম করতে বাধা প্রদান করা।

ইসলাম যেমনিভাবে তার শত্রুদের মোকাবিলার জন্য সামরিক শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের আবশ্যকতার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে, তেমনি কঠোরভাবে অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন করাকে নিষিদ্ধ করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾

"তোমরা তাদের মুকাবিলায় সাধ্যমত শক্তি প্রস্তুত রাখ।"[৬] আয়াতটির অর্থ ব্যাপক। এর দ্বারা জনবল, অস্ত্রশস্ত্র ও অভ্যন্তরীণ শক্তি অর্জনকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং শত্রুকে প্রতিহত করার যাবতীয় উপাদানসহ পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চয় করার অর্থ এ নয় যে, বেআইনী ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে তা ব্যবহার করা যাবে।

যুদ্ধে রাসূলুলাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশিদীনের আচার-আচরণের ভিত্তিতে ইসলামী ফিক্হ শাস্ত্র যুদ্ধে সংঘটিত পারিপার্শ্বিক এমন

[৬] *সূরাহ্ আল-আনফাল: ৬০।*

ক্ষতিসমূহের কথা অস্বীকার করেনি, যা বেসামরিক লোকজন ও তাদের সম্পদকে আক্রান্ত করে। ফকীহ্‌গণ অস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় ও অস্ত্রের ব্যবহার নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন কিন্তু তাঁরা যুদ্ধের আড়ালে যমীনের বুকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার বৈধতা দেননি। উদাহরণস্বরূপ কেউ আবূ বাকর সিদ্দীক (রা)-এর অসীয়ত (উপদেশ) নিয়ে চিন্তভাবনা করলে দেখবেন যে, তাঁর উপদেশের সূচনা হয়েছে প্রতারণা, খিয়ানত ও গনীমতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়াকে নিষেধ করার মাধ্যমে। সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সম্মান দানের পাশাপাশি মুসলিমদের প্রথম খলীফা গাছ-গাছালি ও পশু-পাখির প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এতে যুদ্ধের মধ্যেও পরিবেশ রক্ষার মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। বিষয়টি মানবিক আইন ১৯৭৭ সালে এডিশনাল প্রটোকল ১-এ সংকলিত হয়েছে। মুসলিমদের সর্বোচ্চ স্বার্থকে সঠিকভাবে আঁকড়ে ধরা সত্ত্বেও ফকীহগণ ইসলামী সৈন্য বাহিনীর উপর কোনো প্রকার শর্ত ছাড়া অথবা যুদ্ধ পরিস্থিতিতে যা করা আবশ্যক হয় তার সীমা অতিক্রম করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার বৈধতা দেননি। যে সব অস্ত্র প্রবীণ ফকীহগণের যুগে প্রসিদ্ধ ছিল, সেসব অস্ত্র ও আধুনিক অস্ত্রের মধ্যে তুলনা করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা জানি যে, যুদ্ধের উপায়-উপকরণ ও কলা-কৌশলসমূহের ব্যবহার কতিপয় শর্তের অধীন ছিল এবং বিভিন্ন ইসলামী ফিক্‌হশাস্ত্রবিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তা এখনও আলোচনা-সমালোচনার বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

### ৪. যুদ্ধের আবশ্যকতা

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের ধারাসমূহের মধ্যে যুদ্ধের আবশ্যকতার বিষয়টি একটি বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। উল্লিখিত *সেন্টপিটার্সবার্গ ঘোষণা*-এর ভূমিকায় যা আছে তা আমাদের ইঙ্গিত করে জানাচ্ছে যে *‘যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা মানবতার দাবির সামনে বন্ধ করে দেয়া আবশ্যক’।* এছাড়া ১৯০৭ সালের চতুর্থ হেগ চুক্তির ভূমিকার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ (স্থল যুদ্ধের নিয়মকানূন ও রীতিনীতি) *মানবিক স্বার্থসমূহের* ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেছে। আর একই চুক্তির ভূমিকায় পঞ্চম অনুচ্ছেদ *‘সামরিক প্রয়োজনসমূহ যা অনুমোদন করে সে অনুযায়ী যুদ্ধের দুঃখ-কষ্টের সীমা নির্ধারণ করা’* শীর্ষক বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছে। আর এ চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা কতিপয় নিষিদ্ধ বিষয়ের বক্তব্য প্রদান করে। তন্মধ্যে একটি নিষিদ্ধ বিষয় হলো, ‘শত্রুর সম্পদসমূহ ধ্বংস করা অথবা তার উপর আধিপত্য কায়েম করা, তবে যখন যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা ধ্বংসকে অপরিহার্যভাবে দাবি করবে (তখন তা নিষিদ্ধ নয়)।’ জেনেভা চুক্তিসমূহের মধ্যে, বিশেষ করে প্রথম এডিশনাল প্রটোকলের মধ্যে বেশ কিছু

সুনির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ রয়েছে, যাতে '*যুদ্ধের আবশ্যকতা*' অথবা তার সমার্থবোধক '*আবশ্যকীয়ভাবে সামরিক চাহিদা*' কিংবা '*আবশ্যকীয়ভাবে সামরিক প্রয়োজন*' এর উল্লেখ রয়েছে। আর দ্বিতীয় এডিশনাল প্রটোকল (নন-ইন্টারন্যশনাল সশস্ত্র যুদ্ধের শিকার লোকজনকে রক্ষা করা)-এর ১৭ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে '*শক্তিশালী সামরিক কারণসমূহ*'-ই কেবল অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র যুদ্ধের সময়ে বেসামরিক নাগরিকদেরকে স্থানান্তর করার বিশেষ অনুমতি প্রদান করে। বস্তুতঃ আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যাপকভাবে অন্যায় পদ্ধতিতে বা অকারণে সম্পদরাজি ধ্বংস করা অথবা তার উপর আধিপত্য কায়েম করা অন্যতম যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য; যতক্ষণ না সেটা সামরিক আবশ্যকতা হিসেবে প্রমাণ না করা যাবে।

ইসলামী আইন শাস্ত্রের একটি মূলনীতি হলো "الضرورات تبيح المحظورات" [অত্যাবশ্যকতা নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে অনুমোদনযোগ্য করে দেয়]। এটি সাধারণ মূলনীতিসমূহের মধ্যে একটি, যা শান্তি ও সংঘাত সর্বাবস্থায় অনুসরণীয়। যেসব উদাহরণ নিয়ে ফকীহগণের আলোচনা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে একটি হলো, শত্রু কর্তৃক নারী ও শিশুদের মত অযোদ্ধাদের মধ্য থেকে কিছু লোকজনকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে আত্মরক্ষা করা অথবা কিছু সংখ্যক মুসলিমকে মানব ঢাল হিসেবে গ্রহণ করে তার মাধ্যমে নিজেকে রক্ষা করা। আর 'আবশ্যকতা'র এ মূলনীতিকে কাজে লাগিয়ে ফকীহ্গণ আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ঢাল গ্রহণকারী শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার বৈধতা দিয়েছেন। যদিও মানব ঢালগুলো যুদ্ধের তৎপরতা বা অপারেশনের মূল উদ্দেশ্য নয়। ফিক্হ শাস্ত্রের মূলনীতিসমূহের মধ্যে জরুরি অবস্থান নিয়ে কথা বলার সময় যে মূলনীতিটির দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়, সে মূলনীতিটি হলো, "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" [কল্যাণ আমদানি করার উপর গোলযোগ দূর করার বিষয়টি অগ্রগণ্য]। সুতরাং যখন তাৎক্ষণিক সামরিক স্বার্থের ক্ষতির পরিমাণ তার উপকারের চেয়ে বেশি হবে, তখন তার জাতীয় সামরিক স্বার্থ অর্জনের চেষ্টা করা অবৈধ বলে গণ্য হবে। এছাড়া জরুরি বিষয়টি তার মাত্রা দ্বারা নির্ধারিত হবে। সুতরাং যখন এমন কোনো জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হবে, যা শত্রুকে আক্রমণ করতে আহ্বান করে, তখন মুসলিম সৈন্যরা আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঢাল গ্রহণ করার অবস্থায় যখন যোদ্ধাদের উপর নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়িত হবে তখন যারা ঐসব লোকদেরকে মানব ঢাল হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের উপর আক্রমণ করার প্রয়োজন নেই।

ফকীহগণ যুদ্ধবিষয়ক প্রয়োজনীয়তার সাথে সংশ্লিষ্ট মাস'আলাসমূহ আলোচনা করার সময় শুধু '*ব্যক্তিবর্গ*'-এর উপর গুরুত্ব প্রদানকে সীমাবদ্ধ করেননি; বরং নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের উপকরণ ও পদ্ধতিসমূহকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে। সামরিক

স্বার্থের প্রতি সর্বোচ্চ মনযোগ দেয়া সত্ত্বেও ফকীহগণ শত্রুর বিরুদ্ধে আগুন ও পানি ব্যবহার করা অথবা উদাহরণস্বরূপ রাতের আঁধারে আক্রমণ করাকে কেন্দ্র করে অনেক বেশি মতবিরোধ করেছেন। তবে এ ব্যাপারে শত্রুর ব্যবহারের অনুরূপ আচরণের বিষয়টি আমাদের স্মরণ থেকে হারিয়ে গেলে চলবে না। আল-কুরআনের আয়াত ও সুস্পষ্ট হাদীসসমূহের উপর ভিত্তি করে ফকীহগণ যুদ্ধ চলাকালীন শত্রুদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে এ মূলনীতি অনুসরণ করার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কিন্তু শত্রুর ব্যবহারের অনুরূপ আচরণের বিষয়টি নির্ধারিত এক সীমায় এসে থেমে যাবে, যা (কখনো) লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়, বিশেষ করে ইসলামে যা নি:শর্তভাবে হারাম। এমনকি বিষয়টি যদি ঐসব অবস্থার মধ্যেও হয়, যা দাবি করে শত্রুকে এমন শাস্তি দেয়া যেরূপ শাস্তি মুসলিমদের তাদের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে; তাহলে আমরা এখনো দেখতে পাই, আল-কুরআন ঐসব (অবস্থায়) মুসলিমদেরকে আহ্বান করেছে হিকমত, (প্রজ্ঞা) ধীর ও স্থিরতা অবলম্বনের দিকে (নিষিদ্ধ আচরণের দিকে নয়)। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের বাণী হলো:

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ﴾

'আর যদি তোমরা শাস্তি প্রদান কর, তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে, যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, তাহলে ধৈর্যশীলদের জন্য সেটিই উত্তম।'[৭]

---

৭ সূরাহ্ আন-নাহল: ১২৬।

# ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনঃ সভ্যতার সংঘাত থেকে সংলাপ

জেম্‌স কোকেন*

সারাবিশ্ব বিশেষ করে পাশ্চাত্য ও মুসলিম বিশ্ব সভ্যতার দ্বন্দ্ব সংঘাতে পরিবেষ্টিত।[১] আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিশ্বজনীনতা আজ প্রচণ্ড হুমকির সম্মুখীন। সভ্যতাগুলোর মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনে ইউরোপীয় সভ্যতার ফসল এ আন্তর্জাতিক মানবিক আইন কী ভূমিকা রাখতে পারছে? তা আজ বিচার্যের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একদল গবেষক এ ইস্যুটি নিয়ে এ কথা বলে সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন যে, মানবিক আইনের মূল ধারণা শুধু ইউরোপীয় সভ্যতা থেকে উৎসারিত নয়; বরং অন্যান্য সভ্যতারও এখানে অংশীদারিত্ব রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ-আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিধি-বিধানের সাথে ইসলামের যুদ্ধ নীতি ও প্রচলিত রীতি তুলনা করা যায়।[২]

---

* জেমস্ কোকেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন ব্যারিস্টার ও লেখক। তিনি কলোম্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন। এছাড়া তিনি আমেরিকা, সুইডেন ও আফ্রিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে পাঠদান করেন। মি. কোকেন তার প্রাথমিক কর্মজীবনে অস্ট্রেলিয়ায় এটর্নি জেনারেল বিভাগে প্রিন্সিপ্যাল অফিসার হিসেবে কাজ করেন। এরপর তিনি উক্ত বিভাগ থেকে প্রকাশিত *Journal of Internationl Criminal Justice*-এর সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া তিনি দীর্ঘ সময় *Humanitarian Dialogue* ও *Intirnational Alert, The Norweginan Peacebuilling froum, The Conflict Prenvention and Peace forum* ও *Global ledership forum*-এর কনসালটেন্ট এবং উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সংখ্যা অনেক। আন্তর্জাতিক মানবিক আইন সম্পর্কে তার প্রকাশিত নিবন্ধের সংখ্যা বিশোর্ধ। Cf. unu. edu/about/unu-system/centre.

1 See, for example, Samuel P. Huntington, "*The clash of civilizations*?", Foreign Affairs, Vol. 72, No. 3, Summer 1993, p.22. Compare Leon T. Hadar, "*What green peril*?", Foreign Affairs, Vol. 72, No. 2, Spring 1993, p.27; contrast Judith Miller, *The challenge of radical Islam*", Foreign Affairs, Vol, 72, No. 2, Spring 1993, p. 43.

2 See, for example, M.K. Ereksoussi, "*Le Coran et les Conventions humanitaires*" Revue internationale de la Croix-Rouge, No. 503, November 1960, pp. 641-650; Sobhi Mahmassani, '*The principles of international law in light of Islamic doctrine*", Recueil des cours, 1966-1, p. 201; R.C. Algase, 'Protection of *civilian lives in warfare: A comparison between Islamic Law and modem international law concerning the conduct of hostilities*", Military Law and Law of War Review, 1977, p. 246; Yadh ben Achour, "*Islam et droit international humanitaire", Review international de la Croix-Rouge, No. 722, March-April*

কিছু ক্ষেত্রে সামান্য ব্যতিক্রমও রয়েছে।[৩] এ ধরনের তুলনামূলক পর্যালোচনায় দু'ধরনের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। যথা :

**প্রথমতঃ** এ ধরনের তুলনামূলক পর্যালোচনা উপরিউক্ত (ইসলামী ও পাশ্চাত্য) অনুসরণীয় আইনকে অপরবির্তনীয়, একরোখা ও অনমনীয় করে তুলতে পারে। যদিও বাস্তবে এতদোভয় আইনে কিছু বিধান অপরিবর্তনশীল, কিছু বিধান ডাইনামিক (কালের প্রবাহে পরিবর্তনশীল) এবং কিছু বিধান বহুমাত্রিক (বিভিন্ন অনুসৃত নীতির সংমিশ্রণে প্রণীত)।[৪]

**দ্বিতীয়তঃ** এ তুলনামূলক পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রাচ্যবিদদের একটি সুক্ষ্মদর্শী শ্রেণির আত্মপ্রকাশ ঘটে;[৫] যারা পাশ্চাত্য নীতিকে পরিমাপক ধরে অন্যান্য

---

*1980, p.59; Hamid Sultan, "La conception islamique" in Les dimensions internationales du droit humanitaire*. Pedone, UNESCO, Paris, and Institut Henry Dunant, Geneva, 1986, pp. 47-60; Said El-Daickak, "*Le droit international humanitaire entre la conception islamique et le droit international positif*", Revue internationale de Ia Croix-Rouge, No. 782, March-April 1990, p. 111; 3. Busuttil,"SIay them wherever you find them': Humanitarian law in Islam", Revue de droit militaire et de droit de la guerre, Vol. 30, 1991, pp. 111-145; Mohammad Bedjaoui, "*The Gulf War of 1980-1988 and the Islamic conception of international law"* in Ige F. Dekker and Harry H.G. Post (eds), The Gulf War of 1980-1988, T.M.C. Asser Institute, The Hague, 1992, p. 282; Farhad Malekian, *The Concept of Islamic International Criminal: A Comparative Stud*y, Kluwer Academic, Norwell, MA, 1994; K. Bennoune, "AsSalamu 'Alaykum? *Humanitarian Law in Islamic Jurisprudence*", Massachusetts Journal of IL, 1994, pp. 605-643; Ameur Zemmali, *Combattants et prisonniers de guerre en droit islamique et en droit international humanitaire*, Editions A. Pedone, Paris, 1997. *Other useful expositions of classical Islamic warfare doctrine can be found in Majid Khadduri*, The Islamic Law of Nations, Shaybani's Siyar, *The John Hopkins Press, Baltimore*, 1966; Majid Khadduri, War and Peace in the Law of Islam, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1984; James Turner Johnson and John Kelsay (eds), Cross, Crescent, and Sword: The Just(fication and Limitation of War in Western and Islamic Tradition, Greenwood Press, Westport, CT, 1990; Edward J. Jurji, "*The Islamic theory of war", Moslem World*, Vol. 30, 1940, pp. 332-342; R. Peters (trans and annot.), Jihad in Mediaeval and Modern Islam: The chapter on Jihad from Averroes' Legal Handbook 'Bidayat al Mudjtahid' and The Treatise '*Koran and Fighting*' by the late Shaykh AlAzhar, Mahmud Shaltut, E.J. Brill, Leiden, 1977; and G. Conrad, "*Combat and prisoners of war in classical Islamic law*: concepts formulated by Hanafi jurists of the 12th century", *Revue de droitpénal militaire etdroitde Ia guerre*, 1981, pp. 269-307.

3 Notably Bedjaoui, op. cit. (note 2)

4 On the notion of legal traditions see particularly H. Patrick Glenn, Legal Traditions of the World, Oxford University Press, Oxford, 2000.

5 On the concept of orientalism see Edward Said, Orientalism, Penguin Books. Harmondsworth, 1978.

মতবাদ বিশেষ করে প্রাচ্যের ইসলামকে পরিমাপ করে থাকে। অর্থাৎ ইসলামের বিধানের কতখানি ঐ নীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত বা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা পরিমাপ করে।[৬]

এ গবেষণা ও পর্যালোচনায় একটি ঐতিহাসিক উপাদান অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস পাওয়া যায়। এ গবেষণা মতে আজ আমাদের দেখা আন্তর্জাতিক মানবিক আইন প্রণয়নে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার নব সম্পর্কের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ ঐতিহাসিক সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের পাশাপাশি এ গবেষণা আন্তর্জাতিক আইনের পরিচিতি তা এমন ভাষায় প্রকাশ করতে প্রয়াসী যা অন্যান্য সভ্যতার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ঐতিহাসিক পদ্ধতি তুলনামূলক পর্যালোচনার সমস্ত দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত থাকার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তাই এ পদ্ধতি বিধি-বিধানের গৌণ (মৌলিক নয়) পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে কোনো মতামতকে উদারভাবে গ্রহণ করে এবং কখনো মনে করে না যে, এতদোভয় মতবাদ স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে অনমনীয় থাকবে।

ইউরোপীয় যুদ্ধ রীতি ও প্রচলিত ইসলামের সংস্কারের প্রভাব ক্রুসেড থেকে শুরু হয়েছে।[৭] ১৯২৬ সালে *হেগ একাডেমীতে* এল ব্যারোন ডি বি যে গবেষণা পত্র উপস্থাপন করেন, তাতে তিনি এ মত উল্লেখ করেন যে, যুদ্ধ ঘোষণার পদ্ধতি আধুনিক আন্তর্জাতিক সাধারণ আইন ইসলামী বিধান থেকে গ্রহণ করা হয়েছে[৮] এবং তা ক্রুসেডের বীরত্ব প্রদর্শনের নীতিমালায় প্রভাব বিস্তার করে। খ্রিস্টান গীর্জার আধুনিক কৃষ্টকার প্রমাণ উপস্থাপন করেন যে, যুদ্ধ আইন সংক্রান্ত *হুগো গ্রোটিউজ*-এর রচনাবলীতে ইসলামী বিধানের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে।[৯]

---

6 See benAchour, op. cit. (note 2), p. 59.

7 See for example Marcel Boisard, "On the probable influence of Islam on western public and international law", International Journal of Middle East Studies, Vol. 11, 1980, pp. 429-50.

8 Baron Michel de Taube, *Etudes sur le development historique du droit international dans l'Europe orientate*" in Recueil des Cours, 1926-I, p. 341, pp. 393-394. See also 1907 *Hague Convention Relative to the Opening of Hostilities*, Oct. 18, 1907, 36 Stat. 2259, 2271 (pt. 2) TS No. 538, 1 Bevans 619. Said E1-Dakkak, in contrast, states that "Ia conception islamique ne pose pas comme condition l'existance d'une guerre au sens traditionnel du terme, c'est-c-dire, selon une conception qui implique, outre lexistence de faits d'armes, l'exigence de Ia declaration de guerre entre deux ou plusieurs Parties." See El-Dakkak, op. cit. (note 2), p. 112.

9 Christopher G. Weeramantry, *Islamic Jurisprudence: An International Perspective, Macmillan*, Houndmills, 1988, pp. 149-158.

আধুনিক ইউরোপীয় যুদ্ধ আইনও এর ফসল। আন্তর্জাতিক মানবিক আইন প্রণয়নে ইসলামের প্রভাবের উপর গবেষণা খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। এ নিবন্ধে উক্ত জটিলতা নিরসনের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংবিধানের আওতায় উসমানিয়া সাম্রাজ্যকে একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার পর থেকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে ইসলামের প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে। আর উসমানিয়া সাম্রাজ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তির সময় সাধারণতঃ ১৮৫৬ সালের প্যারিস চুক্তিকে মনে করা হয়।[১০]

অনিবার্যভাবেই এ গবেষণা দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এক. কোনরূপ বিস্তারিত বিবরণ ছাড়াই আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও ইসলামের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্কের সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা। দুই. মৌলিকভাবে এতে আক্রমণকালীন রীতি-নীতি ও আইনকানূন নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে, যুদ্ধের কারণ নিয়ে নয়। অর্থাৎ যুদ্ধ শুরু করার বিধান বা অধিকার নয়, শুধু যুদ্ধ চলকালীন প্রযোজ্য আইন।

## ১৮৫৬ থেকে ১৮৯৯ পর্যন্ত অন্যান্যদের (মুসলিমদের) সাথে আচরণ এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সূচনা:

অনেকে মনে করেন যদিও তা সঠিক নয় যে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বিকাশের প্রাথমিক স্তরে ইসলাম ও মুসলিম নেতৃবৃন্দের উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা ছিল না। ১৮৫৬ সালে উসমানিয়া সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহে অন্তর্ভুক্তি ও ১৮৯৯ সালে প্রথম হেগ শান্তি সম্মেলনের পরে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইন প্রণয়নে মুসলিম নেতৃবৃন্দের সহায়ক ভূমিকা ছিল মাত্র। অথচ সুক্ষ্ম গবেষণার মাধ্যমে আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয় যে, ইউরোপীয় যুদ্ধ আইনের শিরোনামে '*আন্তর্জাতিক*' ও '*মানবিক*' শব্দ দু'টি সংযোজনে এ স্তরের মুসলিমদের (ইসলামের) অনেক বড় ভূমিকা ছিল। গবেষণার এ পর্যায়ে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, প্রথমদিকে *ইসলামকে* 'প্রাচ্যের অন্য একটি শক্তি' হিসেবে চিত্রিত করা হত এবং তার প্রতিপক্ষ হিসেবে আধুনিক আইনের প্রণয়ন সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও মানবিক সংঘাতের কারণে এ আইন বিভিন্ন সভ্যতার রীতি-নীতি ও অন্যান্য আইন হিসেবে মেনে নিতে এবং খ্রিস্টান গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। এ কারণেই ইসলাম আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে কিছু বিশ্বজনীন ধর্মনিরপেক্ষ বাক্য সংযোজনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

---

10 *Declaration Respecting Maritime Law, Paris*, 16 April 1856.

আজ আমরা যে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন দেখতে পাই তা ১৮৫৬ সালের ইউরোপীয় যুদ্ধ আইন হতে অনেকটা ভিন্নতর, তা ছিল সমগ্র ইউরোপীয় খ্রিস্টান সংস্কৃতির আলোকে প্রণীত চিন্তাধারা দিয়ে গঠিত খ্রিস্টান প্রজাতন্ত্রের (Republica Christiana) জনগণের আইনের ফসল।[১১] ইউরোপীয় রাষ্ট্রসংঘের বাইরের জনগণ বিশেষ করে আমেরিকান রেড ইণ্ডিয়ান ও মুসলিমদের ক্ষেত্রে ১৮৫৬ সালের পূর্বে ইউরোপ প্রভাবিত আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইনের প্রয়োগ ছিল খুবই হতাশাব্যঞ্জক। কারণ, এ আইনের ধারণা অনুযায়ী ঐ সকল জনগণ এ আইনের একান্ত অনুগত থাকবে, তারা কোনো প্রকার নীতি নির্ধারক হবে না। যুদ্ধ শুরুর অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে ক্রুসেডে মুসলিমদেরকে খুব কম সুরক্ষাই প্রদান করা হয়েছিল। ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধকে '*ন্যায় যুদ্ধ*' হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। আর এর দ্বারা মহান আল্লাহ্‌র বিধান প্রত্যাখ্যাত, তা সুস্পষ্ট হবে বলে মনে করা হত।[১২] কিন্তু ইউরোপে রেনেসাঁ যুগের সূচনা লগ্নেই এ অসামাঞ্জস্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যদিও পিটোরিয়া, খ্রিস্টান ও মুসলিমদেরকে সমান মনে করার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করতেন না। কারণ, তার মতে মুসলিমরা বিশ্বাসী নয়, তথাপি তিনি বলেছেন, 'মুসলিম শিশুকে হত্যা করা বৈধ নয় (কারণ সে নির্দোষ)। অনুরূপ নারীদের হত্যা করা অবৈধ (কারণ, তারাও নির্দোষ হিসেবে স্বীকৃত)।[১৩] ১৮৫৯ সালে সলফেরিনোতে হেনরী ডুনান্ট বারবার একথা বলেছেন যে, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য তিনি বা অন্য কেউ যে মানবিক সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন তা সকল পক্ষের কাছে সমানভাবে পৌঁছানো একান্ত প্রয়োজন। চাই সে পক্ষ ফ্রেঞ্চ, 'আরব, জার্মান বা স্লাভ হোক।[১৪] হেনরী ডুনান্টের এ মানবিক সাড়া দেয়ার পেছনে কী কারণ ছিল? কোনো সন্দেহ নেই যে, হেনরী ডুনান্টের মন-মনন এক আন্তর্জাতিকতার মৌলিক অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। আমাদের কোনভাবেই ভুলে গেলে চলবে না যে, তাঁর আন্তর্জাতিকতার এ

11 See for example Ahmad Rachid, "*L'Islam et le droit des gens*", Recueil des Cours, 1937-Il, p. 371, pp. 378-380.

12 See Johnson and Kelsay, cit. (note 2); see also de Taube, op. cit. (note 8), pp. 387-390.

13 F. Vittoria, "*The second relection on the Indians, or on the law of war made by the Spaniards on the barbarians*" *in A. Carnegie* (ed.), De Indis et de iure belli relectiones (trans. J.P. Bate), New York, 1917, p. 179 (36).

14 H. Dunant, *A Memory of Solferin ICRC*, 1986 (first published in French in 1982), excerpted in Pierre Boissier, Histoire du Comitd International de Ia Croix-Rouge: De Solferino Tsushima, Henry Dunant Institute, Geneva, 1978, p. 35. See also ibid., 213, on the differing approaches to the European and Ottoman powers in the provision of medical assistance during the Crimean War.

অনুভূতি খ্রিস্ট্রীয় আদর্শ হতে উৎসারিত ছিল।[১৫] যুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা সীমিতকরণের জন্য আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের প্রাথমিক পদক্ষেপগুলো সুস্পষ্টভাবে ছিল 'খ্রিস্ট্রীয় জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের আলোকে প্রণীত'।[১৬] 'রেড ক্রস আন্দোলন প্রতিষ্ঠার পূর্বে হেনরী ডুনান্ট আন্তর্জাতিক মানের আরো একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার নাম ছিল [التحالف الدولى لاتحادات الشبيبة المسيحية] খ্রিস্টান যুব সংঘের আন্তর্জাতিক ফেডারেশন [Internatonal Alliance of Young Mens Christian Associations.] এ সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্রিস্টীয় জনকল্যাণমূলক কাজ পরিচালনার জন্য খ্রিস্টান যুবসমাজকে সংগঠিত করা। অনুরূপভাবে যদিও সলফেরিনো সফরে ডুনান্টের মূল উদ্দেশ্য ছিল তৃতীয় নেপোলিয়নের সাথে সাক্ষাৎ করে আলজেরিয়ায় তাঁর বাণিজ্য প্রকল্পের অনুমতি লাভ। পাশাপাশি তাঁর আরেকটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, সম্রাটের কাছে তার একটি লিখিত স্মারকলিপি প্রদান, যার শিরোনাম ছিল[১৭] '*শার্লিমানের সাম্রাজ্য বা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা*'। মহান সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের মাধ্যমে সলফেরিনো গঠিত মানবিক আন্দোলন এবং তারই নেতৃত্বে ইউরোপীয় খ্রিস্টান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ডুনান্টের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যোগসূত্র হচ্ছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খ্রিস্টীয় চেতনা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সম্পর্কে ডুনান্টের দৃঢ় বিশ্বাস।[১৮] ডুনান্টের ধারণা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কোনো খাঁটি ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠন নয়; বরং তা দুর্বল, অসুস্থ ও আহতদের জন্য খ্রিস্টীয় জনকল্যাণমূলক রীতির আলোকে সোমেরিয়ান-এর এক আন্তর্জাতিক রূপ।[১৯] তাই কখনো কখনো মনে হয় যে, এরূপ মৌলিক খ্রিস্টীয় কোনো প্রকল্প সহজে মুসলিম ও ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

কিন্তু যখন আমরা গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তখন আমরা দেখতে পাই যে, প্রথম থেকেই ইসলামের মৌলিক বিধান খ্রিস্টীয় মৌলিক বিধানের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। সলফেরিনো-এর যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করে বোসিয়ার তাঁর '*রেড ক্রস আন্তর্জাতিক সংস্থার ইতিহাস*' শীর্ষক গ্রন্থে খ্রিস্টীয় মানবিক আন্দোলন ও অন্যান্যের (ইসলামের) মধ্যে যে ক্ষীণ পার্থক্য রয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। এ প্রবন্ধে তিনি সলফেরিনো যুদ্ধের ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির

---

15 Ibid.

16 *Ibid*., pp. 11-12.. See also ICRC, *La guerre et Ia charité*, ICRC, Geneva, 1866.

17 See Richard Deming, Heroes of the International Red Cross, ICRC, New York, 1969, pp. 5, 8-10, 14.

18 Dunant writing in Notice sur la,Régence de Tunis (1858), quoted in Boissier, op. cit. (note 14), p. 17.

19 Dunant writing in La guerre et la charité, op. cit. (note 16).

বর্ণনাও দিয়েছেন। ডুনান্টের মতে এসব ক্ষয়ক্ষতি মানবিক কার্যক্রম প্রত্যাহারের কারণ ছিল। আর তা ছিল নেপোলিয়নের পক্ষে যুদ্ধরত মুসলিম বাহিনীর নিমসাই (অস্ট্রিয়ান) শত্রুদের উপর দয়া প্রদর্শন প্রত্যাখ্যানের ফল। যদিও অষ্ট্রিয় সেনাপ্রধান বারবার আন্তর্জাতিক আইন "*droit des gens*" -এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আহ্বান জানান।[২০] পাশপাশি আরো অনেক সূত্র থেকে জানা যায় যে, তৎকালীন ফরাসী যুদ্ধ ক্রুটিপূর্ণ কলা-কৌশলের ফলে এ ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি সংঘটিত হয়েছিল। এটি ছিল অষ্ট্রিয় রিজার্ভ বাহিনীর উপর হঠাৎ প্রচন্ড গোলা বর্ষণের কৌশল।[২১] বাস্তবতা যাই হোক, বোসিয়ার এ দৃষ্টান্ত ইসলামের 'বর্বরতা'[২২] ও খ্রিস্ট ধর্মের 'উদারতা'-এর মধ্যে এক প্রাচীন ও মৌলিক পার্থক্য নির্দেশ করে।

কখনো কখনো মুসলিমদেরকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন অভিধায়ে ভূষিত করা হয়েছে। তাই আন্তর্জাতিক মানবিক আইন আন্দোলনে তাদেরকে পৃথক ও ভিন্নতর হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছিল। রেড ক্রস সোসাইটি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮৬৩ সালের জেনেভা সম্মেলনে কোনো ইসলামী রাষ্ট্র উপস্থিত ছিল না। তবে ১৮৬৪ সালে প্রণীত জেনেভা চুক্তির ধারাগুলোকে ১৮৬৫ সালে তুরস্ক স্বীকৃতি প্রদান করে।[২৩] পরবর্তীতে ১৮৭৪ সালে ইরানও এর সাথে ঐকমত্য পোষণ করে।[২৪] ঐ বছরেই যুদ্ধের আইন-কানূন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী ব্রাসেলস সম্মেলনে তুরস্ক অংশগ্রহণ করে। জেনেভা সম্মেলনে গৃহীত ধারাসমূহ পূনর্বিবেচনার জন্য[২৫] অনুষ্ঠিত ১৮৬৮ সালের সম্মেলনেও তুরস্ক অংশ নেয়। মানবিক যুদ্ধ আইনের ধারা-উপধারা প্রণয়নের জন্য অনুষ্ঠিত *সেন্ট পিটার্সবার্গ* সম্মেলনেও[২৬] তুরস্ক উপস্থিত ছিল। এ সম্মেলনেরই ঘোষণা ছিল - 'যুদ্ধ চলাকালীন সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলোকে শত্রুর সামরিক শক্তিকে দুর্বল করা একমাত্র বৈধ উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা উচিৎ'।[২৭]

---

20 Boissier, op. cit. (note 14), p. 24-25.

21 See, for example, Deming, op. cit. (note 17), p. 7.

২২ ইসলাম সম্পর্কে বোসিয়ারের এরূপ ধারণা সঠিক নয়। কারণ ইসলামে কোন বর্বরতা নেই। ইসলাম একটি সুমহান জীবন ব্যবস্থা।- অনুবাদক।|

23 BConvention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field, Geneva, 22 August 1864. Turkey ratified in the Convention on 5 July 1865.

24 On 5 December 1874.

25 Turkey was one of the original signatories to the Additional Articles relating to the Condition of the Wounded in War, Geneva, 20 October 1868.

26 Turkey also signed and ratified the Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles Under 400 Grammes Weight, St. Petersburg, 29 November/11 December 1868

27 Ibid.

কিন্তু এ সকল সম্মেলনে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সহায়ক ভূমিকা ছাড়া কোনো মৌলিক অবদান ছিল না। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, এ স্তরগুলোতে মুসলিমরা যে যৎসামান্য অবদান রেখেছে তাও ইসলামী বক্তব্যের আলোকে নয়; বরং তা ছিল ইউরোপীয় রাষ্ট্র সংঘের বক্তব্যের আলোকে। রাষ্ট্র সংঘের মধ্যে মুসলিম ও ইসলামী আদর্শের প্রভাব খুবই নগণ্য ছিল। তাই আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিকাশেও তাদের অবদান ছিল একেবারেই কম।

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের আধুনিকায়নে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ভূমিকা নিয়ে অনেক ইউরোপীয় রাষ্ট্রের প্রবল সন্দেহ রয়েছে। ফরাসী বংশোদ্ভুত কনস্টান্টিনোপলের চিত্রকর জিগার স্মিথ ১৫ মার্চ ১৮৬৮ সালের আন্তর্জাতিক রেড ক্রস সোসাইটিকে লিখেছিলেন যে, তিনি তুরস্কে রেড ক্রস সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে খুব কমই আশাবাদী। তিনি লিখেন, 'প্রতি মুহূর্তে আমরা কনস্টান্টিনোপলে এক অবর্ণনীয় মূর্খতার সম্মুখীন হচ্ছি। কোনো কাজ নেই এমন সংস্থার কাগজে অনুমতি নিতেও এখানে প্রচুর কষ্ট করতে হচ্ছে। তুর্কীরা সাধারণভাবে কোনো সংস্থার উপকারিতা বুঝে না। তারা সবকিছুকে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেয়। তারা তাদের আইনের খেলাপ কোনো কিছু সহ্য করে না। উদ্ভুত এ সমস্যা দু'টোর জন্য আমরা প্রথমেই ১৮৬৪ সালের জেনেভা কনভেনশনে তাদের সম্পৃক্ততার কথা বলে তাদেরকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছি। যদিও তারা এ বিষয়ে কিছুই বুঝে না। তবে শেষ পর্যন্ত যখন আমরা তাদেরকে আশ্বস্ত করলাম যে, অন্যান্যদের মত আমরা স্বাক্ষরিত চুক্তির সীমা অতিক্রম করব না, তখন বিষয়টির সমাধান হলো।'[২৮]

জিগার স্মিথের এ মন্তব্য দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন প্রণয়নে কোনো প্রকার কার্যকর ভূমিকা রাখতে ইউরোপীয় দুর্বলতম দেশ তুরস্ক শুধু অক্ষমই নয়; বরং তারা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের এ আধুনিকতা বুঝতেও অক্ষম। বাস্তবে এরকম একটি বিশ্বাসও রয়েছে যে, মুসলিমগণ ছাড়া খ্রিস্টীয় জনকল্যাণমূলক কাজ বাস্তবায়ন অসম্ভব। সুতরাং আন্তর্জাতিক মানবিক আইন নিছক একটি খ্রিস্টীয় আইন। জিগার স্মিথ ও তার মত আরো অনেকেরই এরূপ মত পোষণ অব্যাহত রাখে।

গুস্তাভ মইনিয়ারের নেতৃত্বে খ্রিস্টান ও অন্যান্যদের (মুসলিমদের) এ বিশাল ব্যবধানের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি হয়। ডুনান্টকে দেউলিয়া ঘোষণার পর যিনি মইনিয়ার রেড ক্রস আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি স্বীকার

---

[28] Quoted in Boissier, op. cit. (note 14), p. 288,

করেছেন যে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন খ্রিস্টীয় আদর্শে তৈরি।[২৯] কিন্তু সাথে সাথে তিনি এটিও বারবার বলেছেন যে, এটি তখনই আন্তর্জাতিকতা লাভ করেছে যখন তা ধর্মের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্বজনীনতা ইতিবাচক বিজ্ঞান[৩০] ও প্রকৃতিগত দর্শন[৩১] দ্বারা পুষ্ট হয়েছে। ১৮৮৮ সালে লিখিত মইনিয়ারের তত্ত্ব আরো বিতর্কের অবতারণা করে সুস্পষ্ট করেছে যে, আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইনের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি জনসাধারণের হৃদয়,[৩২] উন্নত চিন্তাধারা,[৩৩] আন্তর্জাতিক ঐক্য[৩৪] ও সংহতির বহিঃপ্রকাশ। তিনি বলেন,[৩৫]

"রেড ক্রসের প্রতিষ্ঠাতা এতে নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের মোহর এঁটে দেননি। ১৮৬৩ সালের রেড ক্রসের পতাকা-যদিও তাতে লাল ক্রস চিহ্ন অংকিত আছে- তথাপি এটির ততখানি ধর্ম নিরপেক্ষ হওয়া প্রয়োজন, যতখানি তা রাজনীতি নিরপেক্ষ।"

রেড ক্রসের সংজ্ঞা প্রদানে মইনিয়ার যে অবদান রেখেছেন তার গুরুত্ব দু'ভাবে অনুধাবন করা যায়:

**এক.** রেড ক্রসের নেতৃবৃন্দ এ আন্দোলনের আইনের মূল ভিত্তিকে খ্রিস্টান দর্শন থেকে সরিয়ে স্বভাবগত আইন ও আন্তর্জাতিক ইতিবাচকতার আলোকে তৈরি আন্তর্জাতিক ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের দিকে নিয়ে গেছেন।

**দুই.** এ আইনকে সকল ধর্মের অনুসারীদের মাধ্যমে ও তাদের মধ্যে প্রয়োগের কার্যকর ভূমিকা রেখেছেন মইনিয়ার। যার মধ্যে ইসলাম ধর্মও রয়েছে। অনুরূপভাবে ১৮৬৮ সালে '*উসমানীয় রেড ক্রিসেন্ট* সোসাইটি প্রতিষ্ঠায়ও মইনিয়ারের মূল ভূমিকা ছিল।[৩৬]

---

29 In 1888 Moynier wrote that in the Red Cross "ii est impossible de ne pas voir un produit de la civilisation chrë'tienne": G. Moynier, Les causes du succ de Ia Croix- Rouge, monograph, Geneva, 1888, republished as "Introduction" in Le Memorial des ving-cinq premii-es anné'es de la Croix-Rouge, ICRC monograph, Geneva, 1888, excerpted in Boissier, op. cit. (note 14), p. 455.

30 ICRC, La neutralite'des militaires blessds, pamphlet presented at the Paris Exhibition, excerpted in Boissier, op. cit. (note 14), p. 268.

31 *Ibid*.

32 *Ibid*., p. 267.

33 *Ibid*.

34 *Ibid*.

35 ICRC, La guerre et la charite, experted in Boissier, op.cit. (note 14), p. 262.

36 *Ibid*., pp. 287-289.

রেড ক্রসে মইনিয়ারের নেতৃত্বকালীন ১৮৭৫ সালে উসমানিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বলকান অঞ্চলে খ্রিস্টান বিদ্রোহী ও মুসলিম প্রশাসনের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এ যুদ্ধ রেড ক্রস আন্দোলনকে দু'টি প্রাসঙ্গিক সমস্যার মধ্যে ফেলে দেয়। তা হলো, এ আন্দোলনের মানবিক মৌলিক বিধানের সাথে একদিকে প্রশাসনের (উসমানিয়া সাম্রাজ্যের) সম্পর্ক অন্যদিকে খ্রিস্টানদের সাথে সম্পর্ক কীভাবে রক্ষা করা যায়! যেহেতু রেড ক্রস এ সমস্যার দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য হয়েছে, সেহেতু বলকান সমস্যা রেড ক্রস সোসাইটিকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের প্রকৃত পরিচয় দানের একটি সুযোগ করে দেয়।

বলকান সমস্যা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মূলনীতি ও প্রশাসনের (উসমানিয়া প্রশাসন) মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে তিনটি স্তরে সম্পর্ক স্থাপন করে। যথা :

**এক.** এ সমস্যার মাধ্যমে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, রেড ক্রসের কার্যক্রম কী দু' রাষ্ট্রের পারস্পরিক সংঘাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, না কী তা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে? 'উসমানীয় প্রশাসন যেমনটি বুঝেছিল যদি তেমনটি রেড ক্রসের কার্যক্রম শুধু রাষ্ট্রের পারস্পরিক সংঘাতের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকত, তবে উসমানিয়া সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে যে সভ্যতার সংঘাত হয়েছিল তাতে রেড ক্রিসেন্ট কোনো ভূমিকা রাখতে পারত না। জাতীয় রেড ক্রস সোসাইটিসমূহের কাছে প্রেরিতব্য মাসিক বুলেটিনে মইনিয়ার রেড ক্রস সোসাইটির কার্যাধিকারের পক্ষে জোর ওকালতি করেন,[৩৭] যা এই সংঘাতে রেড ক্রসের মর্যাদাপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সহায়ক হয়। মইনিয়ারের রেড ক্রসের ভূমিকা নিয়ে এ ব্যাখ্যা আন্তর্জাতিক মানবিকতার প্রতি ইঙ্গিত করে, যার স্থান রাষ্ট্রের ধারণার চেয়ে অনেক উপরে। তাঁর মতে ১৮৬৪ সালের জেনেভা কনভেনশনের ধারাসমূহ শুধু রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র সংঘাত অর্থাৎ সরকার রয়েছে এমন রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সংঘর্ষের সময় প্রযোজ্য হবে, এমনটি নয়; বরং তা ধর্মীয় বিশ্বাস ও আদর্শিক সকল ক্ষেত্রে সকল অর্থে প্রযোজ্য হবে। এমনকি তা যদি সরকার পরিচালিত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও হয়।[৩৮] সুতরাং মানবিক আইনের মৌলিক আইনসমূহ কমপক্ষে তাত্ত্বিকভাবে রাষ্ট্র প্রশাসনের উপর অগ্রাধিকার লাভ করেছে। তবে অবশ্যই এ আইন ততক্ষণ পর্যন্ত প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্র নিজেই তা মেনে না নেয়।

---

[37] *Ibid.*, pp. 393-394.

[38] *Ibid.*, pp. 394.

**দুই.** উক্ত সংকট ঐ সকল রাষ্ট্রীয় রেড ক্রস সোসাইটির ভূমিকাও সুস্পষ্ট করেছে, যে রাষ্ট্র ঐ সংঘাতে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আক্রান্ত অঞ্চলের পরবর্তী দেশ যথা সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো আশ্রয় গ্রহণকারীদের মাধ্যমে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হলো যে, স্বীয় রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণকারী পলায়নপর জনগণের প্রতি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় রেড ক্রস সোসাইটিসমূহের সাহায্য করা প্রয়োজন আছে কী না? তাৎক্ষণিকভাবে রেড ক্রস এ প্রশ্নের সমাধানে মন্টিনিগ্রোতে একটি রাষ্ট্রীয় রেড ক্রস প্রতিষ্ঠা করে এ কথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল যে, এ অবস্থায় রেড ক্রস সোসাইটির সাহায্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়া একান্ত কর্তব্য।[৩৯] কেননা এ সংস্থা তার আন্দোলন কর্মসূচী ও মানবিকতার মূলনীতির কাছে দায়বদ্ধ। কিন্তু যে রাষ্ট্রে অবস্থিত তার কাছে দায়বদ্ধ নয়।

**তিন.** এ সংকট আরো একটি বিষয় নিশ্চিত করেছে যে, রেড ক্রস আন্দোলন তার কার্যক্রম পরিচালনা এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের প্রশাসনের উপর কতখানি নির্ভর করবে, যা তুরস্কের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট হয়েছে। জিগার স্মিথ উল্লেখ করেছেন যে, সেখানে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা-ই মূল সমস্যা ছিল বিষয়টি সঠিক নয়; বরং মূল স্বীকৃতি অনুযায়ী যেমনটি উসমানিয়া রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিষ্ঠতা নিজেরই মূল সমস্যা ছিল। 'উসমানিয়া সাম্রাজ্যের জনগণ ও উসমানিয়া সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিল ঐক্যের অভাব।[৪০] আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বাস্তবায়নের জন্য যে পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল তার শিকড় আধুনিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র যন্ত্রের মধ্যে বিস্তৃত ছিল। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের এ সকল সোসাইটি চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে কেন্দ্রীয় আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের সান্নিধ্য অর্জনের জন্য কাজ করছিল। সুতরাং এর জন্য জাতীয়তাবাদী সংহতি থাকা প্রয়োজন, যার উৎস হচ্ছে পাশ্চাতের মধ্য ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ। উসমানীয় সাম্রাজ্য আধুনিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র ছিল না; বরং এ সাম্রাজ্য ছিল বিভিন্ন জাতীয়তার একটি ইউনিয়ন। ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা তাদের মধ্যে ঐক্যের সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। তৎকালীন মুসলিমদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন প্রয়োগের সম্ভাব্যতার উপর এ বহুমাত্রিক মূলধারা প্রভাব বিস্তার করেছিল। এভাবেই উসমানিয়া প্রশাসনের মাধ্যমে মানবিকতার মূলনীতিগুলোর প্রয়োগ

---

39 *Ibid*., pp. 391-398.

40 *Ibid*. p. 288.

> সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল, যে প্রশাসনের মধ্যে ইতোপূর্বে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বীজ বপিত হয়েছিল। বলকান সংকট আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মূলনীতি ও খ্রিস্টীয় মূলনীতির মধ্যে সম্পর্কের ইস্যুটিও উত্থাপন করেছিল।

ডুনান্টের খ্রিস্টীয় আন্তর্জাতিকতার চেয়ে অভ্যন্তরীণ সংঘাতে রেড ক্রস সোসাইটির কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে মইনিয়ারের কার্যপদ্ধতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মইনিয়ার আন্তর্জাতিক মানবিক আইনকে এমন আন্তর্জাতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যা ছিল সকল ধর্মীয় অনৈক্য ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। ১৮৬৪ সালের জেনেভা কনভেনশনে উসমানিয়া সাম্রাজ্যের সম্পৃক্ততা শুধু এটিই প্রমাণ করেনি যে, এ সংস্থার সম্পর্ক শুধু খ্রিস্টান রাষ্ট্রের সাথে নয়; বরং আরো প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সংস্থার কার্যক্রম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও প্রযোজ্য হবে। মইনিয়ারের এ কর্মকৌশল রেড ক্রস সোসাইটিকে শুধু একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার রূপ দেয়নি; বরং একে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংস্থায়ও পরিণত করেছে।[৪১]

রেড ক্রস সোসাইটির প্রতীক একটি বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এ বিতর্ক অদ্যাবধি অব্যাহত আছে। এ গবেষণায় সে বিতর্কের কারণেই একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, তা হলো খ্রিস্টান সভ্যতার অবদান এ আন্তর্জাতিক মানবিক আইন কী অন্য সভ্যতার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে?

এ প্রতীক আরো বিতর্ক সৃষ্টি করে যখন রেড ক্রস সোসাইটি ১৮৬৪ সালের জেনেভা কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোর গৃহযুদ্ধে সংখ্যালঘু খ্রিস্টানদের পক্ষে কাজ করে। জেনেভা কনভেনশনে স্বাক্ষর করা সত্ত্বেও তুর্কি শক্তি তার অঙ্গীকার ভঙ্গ পূর্বক রেডক্রসের প্রতীক প্রদত্ত সুরক্ষার স্বীকৃতি প্রদান করে নি। তখনও এ চুক্তির অবমাননার কাজ অব্যাহত ছিল। যদিও আন্তর্জাতিক রেড ক্রস সোসাইটির চাপে চুক্তি অবমাননার শাস্তি নির্ধারণ এবং এ সংস্থা প্রদত্ত তুরস্কের নতুন আইন প্রণীত হয়েছিল। শক্তি প্রয়োগনীতির অজ্ঞতার কারণে এটি কোন অবমাননা ছিল না; বরং তা ছিল রেড ক্রস সংস্থার প্রতীক ক্রস এর জন্য। কারণ এ প্রতীক মুসলিম সেনাদের মনে এক বিরূপ

[41] In 1882, in La Croix-Rouge, son passe, son avenir, Moynier repeated this statement, characterizing the Convention as “une declaration commeune reconnaissance de certaines lois d’ordre superieur, auxquelles telle ou telle nation s’honore de se soumettre spontanément, et dont le caract.re impératf ess absolu.” *Ibid*.

অনুভূতি জাগ্রত করেছিল।[৪২] সাধারণতঃ এ অনুভূতিগুলো ক্রুসেড যুদ্ধে পরিলক্ষিত হয়েছিল। যদিও সকল পক্ষ এ ব্যাপারে একমত ছিল যে, ১৮৬৩ সাল থেকেই রেড ক্রস ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ধর্মীয় প্রতীক ধারণ করছে না। তদুপরি এ ঐকমত্যের দৃষ্টিভঙ্গি যুদ্ধের মাঠে রক্তপাত কিংবা ক্রস চিহ্ন দেখে তুর্কি সেনাদের মনে নেতিবাচক অনুভূতি সৃষ্টির উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। অবস্থা এতটাই করুণ হয়েছিল যে, রোমান রেড ক্রস সোসাইটি যখন উসমানীয় সোসাইটিকে জরুরী চিকিৎসা সাহায্য প্রদানের প্রস্তাব দেয়, তখন তুর্কি সোসাইটি তা এই বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, তাদের পক্ষে রোমান সাহায্যে কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা বিধান সম্ভব নয়।[৪৩] এ সমস্যার তড়িৎ সমাধানের জন্য তাৎক্ষনিকভাবে ইসলামী ঐতিহ্য সম্বলিত রেডক্রিসেন্ট প্রতীক গ্রহণ করা হয়। যাতে কমপক্ষে তুর্কি সোসাইটি কাজ করার সুযোগ পায়।

মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন পূর্বক চূড়ান্ত কর্মনীতি পরিচালনার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস সোসাইটি এ প্রস্তাব গ্রহণ করে ভারমুক্ত হয়। আজ পর্যন্ত এ সংস্থা উপরিউক্ত কর্মনীতি অব্যাহত রেখেছে। জানুয়ারি ১৮৭৭ সংখ্যার বুলেটিন-এ আন্তর্জাতিক রেড ক্রস সোসাইটি বিভিন্ন জাতীয় রেড ক্রস সোসাইটিগুলোকে এ মর্মে লিখে পাঠায় যে,

'মানবিকতার এমন মূলনীতি বাস্তবায়ন করতে এ সোসাইটি চায় সকল জাতির হৃদয় আকর্ষণ করতে, সে যে ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন। এমন কোনো সমস্যা সৃষ্টি করা সমীচিন হবে না, যা বাহ্যিকভাবে অ-খ্রিস্টান জাতির সামনে পরিচালনা করতে তাদের আপত্তি থাকবে; বরং যদি রেড ক্রস-এর প্রতীক পরিবর্তন করে এবং অ-খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোর কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা যায় তবে তাই করা শ্রেয়।'[৪৪]

বেশ কিছু চিঠিপত্র আদান-প্রদানের[৪৫] পর সংঘর্ষ চলাকালীন রেড ক্রসের পরিবর্তে রেড ক্রিসেন্ট প্রতীক ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়। সংখ্যালঘু

---

[42] Message from the Sublime Porte to the Federal Council, 16 November 1876, *quoted in the Bulletin international des societies de Secours aux Militaires blesses*, No. 29, January 1877, pp.35-Y1, p.36.

[43] Boissier, op. cit. (note 14), p.401.

[44] *Bulletin international des Sociétés de Secours aux Militaires blesses*, No. 29, January 1877; see also Boissier, op. cit. (note 14), P. 402.

[45] See communications reproduced in the *Bulletin international des Societies de Secours aux Militaires blesses*, No. 20, January 1877, pp. 35-37; No. 30, April 1877, pp. 39-47; No. 31, July 1877, pp. 83-91; No. 32, October 1877, pp. 147-154.

খ্রিস্টান যখন স্লাভদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে তখন তারা তুর্কিদের সাথে রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট উভয় প্রতীককে স্বীকৃতি দিয়েই তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে।[৪৬] যদিও এতে খুব কম উপকার হয়েছে। কারণ রেড ক্রস প্রতীকধারীদের বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ তখনও অব্যাহত ছিল। কিন্তু তখন যে রেডক্রিসেন্ট প্রতীকের যাত্রা শুরু হয় তা আজও রেড ক্রসের পশাপাশি মানবতার রক্ষায় একটি স্বতন্ত্র প্রতীক হিসেবে স্বীকৃত আছে।

কিন্তু একটি প্রতীক কেন এত বড় বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো সংক্ষিপ্তাকারে এর সুস্পষ্ট উত্তর হলো, এ প্রতীকটি ঐতিহাসিকভাবে খ্রিস্টানদের *ধর্মীয় প্রতীক ক্রস*–এর সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং তা নিরপেক্ষ সাহায্যের প্রতীক হওয়ার জন্য যথার্থ নয়। সর্বোপরি মূল সংস্থার প্রতীক হিসেবে *রেড ক্রসকে* গ্রহণ করার দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, এ সংস্থার আন্তর্জাতিকতা সার্বিকভাবে ছিল ইউরোপীয় চিন্তাধারার ফল। এতে মুসলিমদের কথা হিসেবে ধরা হয়নি। উপরোক্ত এ প্রতীক ও তৎসংক্রান্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের পরিচিতির ক্ষেত্রেও এক বিরাট বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। একদিকে ইউরোপীয় ও মুসলিমদের অনেকেই মনে করেন যে, *ক্রস* একটি ধর্মীয় প্রতীক এবং তারা প্রস্তাব করেন যে, এ প্রতীকের স্বীকৃতির জন্য আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সকল ধর্ম ও সভ্যতার সমান মর্যাদা থাকা উচিৎ। অপরদিকে আরেকদল অতি আধুনিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষ পন্থা অবলম্বন করে বলেন, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের ক্ষেত্রে কোনো ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার সঙ্গত নয়। বিশেষত: ধর্মীয় গণ্ডির ঊর্ধ্বে উঠে একটি স্বভাবগত মানবিক আইন বাস্তবায়নই তার কাজ। অবশ্যই তা এমন একটি প্রতীকে হওয়া উচিত যা মানবতাকে ঐক্যবদ্ধ করে। এক্ষেত্রে এ প্রতীক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা তা এ সমস্যার সৃষ্টি করেছে যে, ধর্মনিরপেক্ষ ও আন্তর্জাতিক একটি বিধান কীভাবে ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে? এ দু'টি বিধানের কীভাবে সহাবস্থান সম্ভব? আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অভ্যন্তরে ইসলাম ও ইউরোপীয় বিধানের মিলনস্থলে এ প্রশ্নটি সততই লুকায়িত আছে।

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের প্রাথমিক বছরগুলোর এ চিত্র অর্থাৎ মুসলিম হিসেবে মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সুস্পষ্ট বিবরণ দেয় এবং এ সময় মুসলিমদের বিপরীতে এ আইন স্বীয় পরিচিতি তুলে ধরে। প্রথমদিকে এটি প্রাচ্যবাদিতার চিরাচরিত কৌশল গ্রহণ করে এর মাধ্যমে ইউরোপীয় খ্রিস্টান শাসন ব্যবস্থা '*খ্রিস্ট্রীয় জনকল্যাণ*'-এর আলোকে পরিচিত হতে চেষ্টা করে,

[46] See Boissier, op. cit. (note 14), p. 405.

অন্যদিকে প্রাচ্যের মুসলিমদের অন্যান্য উপাধি দিয়ে দুর্ণাম বশতঃ বার্বার ও তুর্কী নামে অভিহিত করে। যদিও উসমানিয়া সাম্রাজ্য ও ইরান আইনগতভাবে অন্যান্য রাষ্ট্রের মত সমান মর্যাদা নিয়ে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সনদে স্বাক্ষর করেছে; তথাপি এ আন্তর্জাতিক মানবিক আইন মূলতঃ ইসলামী আইন ও বিধি-ব্যবস্থার কাছে ভিন্নতরই রয়ে গেছে।

যা হোক, ইসলামের সাথে এ মুখোমুখি অবস্থান এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারীগণের বিশেষকরে গুস্তাভ মইনিয়ারের জোর প্রচেষ্টা সে প্রাথমিক প্রাচ্যবাদিতার ঊর্ধ্বে উঠে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে এ আইনকে বাধ্য করেছে। মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক মানবিক আইন নিজেকে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার প্রচেষ্টারত-এ পরিচয় প্রদান শুরু করেছে। এ মতানৈক্য প্রতীক (মনোগ্রাম) সংক্রান্ত বা পদ্ধতি সংক্রান্ত (যেমন উসমানিয়া প্রশাসনের অভ্যন্তরে কাজ করা কঠিন ছিল) হতে পারে। এ আত্মপরিচয় পরবর্তীতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। যেমন এ আইন রেড ক্রস আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে বাধ্য করে এবং তা তাহলো আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত উপনীত হওয়া নিশ্চিত করেছে। তবে যে অভিযোগটি বাস্তবিকভাবে রয়ে গেছে যে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের যে কার্যপরিধি রয়েছে তা জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা ইউরোপের খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য থেকে উৎসারিত। ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

## ১৮৯৯-১৯৪৫: আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে ইসলামের অবস্থান কী জাতি (উম্মাহ) হিসেবে, জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র হিসেবে, না কী একটি সভ্যতা হিসেবে?

১৮৭৭ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিকাশ ও পরবর্তীতে এর উন্নতি অগ্রগতিতে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের সমান ভূমিকা ছিল। এমন অবস্থায় প্রাথমিকভাবে এ ভূমিকা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। এ দু'অবস্থায়ই ইসলামী অংশিদারিত্ব ছিল আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের গঠন ও প্রকৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট। ১৮৭৭ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত মৌলিক ইস্যুটি মানবিকতা ও রাষ্ট্রপ্রশাসনের উপর নির্ভরশীল হওয়ার পরও তা মহান আল্লাহ্‌র বিধান ও ধর্মীয় আন্তর্জাতিক সমাজ ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। ১৮৭৭ ও ১৯০৭ সালে হেগ শান্তি সম্মেলনে ইরান ও

উসমানিয়া সাম্রাজ্যের দু'টি প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিলেন।[৪৭] তারা যেহেতু তৎকালীন বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন,[৪৮] সেহেতু মনে করা হয় যে, তাঁরা ইসলামেরই প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, যদিও এ প্রতিনিধি দল দু'টির সদস্যবৃন্দ ছিলেন পাশ্চাত্য আদর্শের প্রতি অনুগত।[৪৯] এ উভয় প্রতিনিধিদল যদিও সম্মেলনের সকল ক্ষেত্রে কর্মতৎপর ছিলেন কিন্তু তাঁরা ক্ষুদ্রশক্তি হওয়ার কারণে কম গুরুত্ব পেয়েছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক মানবিক আইনকে সক্ষম করার ক্ষেত্রে তাঁদের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

মুসলিম প্রতিনিধিদলসমূহের অংশগ্রহণের ফলেই হেগ শান্তি সম্মেলন দু'টিতে ধর্মনিরপেক্ষ নীতিকে আইনগতভাবে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মূলনীতি হিসেবে নিশ্চিত করা হয়। ১৮৯৯ সালের সম্মেলনে ইরানের প্রতিনিধি দলের প্রচেষ্টায় এ নীতিও প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্থাপনাসমূহ ধ্বংসের নিষিদ্ধের যে বিধান রয়েছে তাতে মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যেন কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করা না হয়।[৫০] উসমানিয়া ও ইরানী প্রতিনিধিদলের পাশাপাশি অন্য কিছু প্রতিনিধিদলের জন্য রেড ক্রসের স্থলে লাল রঙ-এর *নতুন চাঁদ* (রেড ক্রিসেন্ট) এবং *লাল সিংহ ও সূর্য প্রতীকের* স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।[৫১] এতে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় যে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন যে কোনো ধর্মীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে সক্ষম। কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেতে সক্ষম এমন একটি প্রতীক গ্রহণ না করে একাধিক নিরপেক্ষ প্রতীক গ্রহণের কারণে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের কার্যক্ষমতা হুমকির মুখে পড়েছে। ফলে একটি বিতর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, রেড ক্রস প্রতীকের ধর্মীয় ব্যাখ্যা কী যথার্থ, না কী নিছক ধারণা প্রসূত? ইতোমধ্যে

47 See Arthur Eyffinger, The 1899 Hague Peace Conference: The Parliament of Man, the Federation of the World, Kiuwer Law International, The Hague 1999; William I. Hull, The Two Hague Conferences and their Contributions to International Law, Ginn & Company, Boston, 1908; reprinted Kraus Reprint Co., New York, 1970.

48 Compare Eyffinger, op. cit. (note 46), p. 97.

49 Ibid.,pp. 170-171, 193-194.

50 See Hull, op. cit. (note 46), pp. 253-4. Ironically, throughout the 1899 Conference, the Turkish delegation was dogged by allegations of religious discrimination within the Ottoman Empire of the Armenian Christian minority: see Eyffmger, op. cit. (note 46), pp. 349-351.

51 Byffinger, op. cit. (note 46), pp. 268, 277-278, 279.

অ-ইউরোপীয় দেশ যথা-জাপান ও চীন জানিয়ে দিয়েছে যে, তাদের কাছে '*রেড ক্রস*' প্রতীকের কোনো ধর্মীয় গুরুত্ব নেই।[৫২] আবার মুসলিম রাষ্ট্রগুলো শুধু *ক্রসকে* প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়।[৫৩] এ কঠিন বিরোধের প্রতি দৃষ্টিদান পূর্বক অনেক কষ্টে হলেও একটি মাঝামাঝি সমাধানে পৌঁছা সম্ভব হয়। ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত রেড ক্রসের একক অফিসিয়াল প্রতীক ছিল। যদিও কোনো কোন প্রতিনিধিদল কম বেশি *রেড ক্রিসেন্ট* এবং *লাল সিংহ ও সূর্য*-এর স্বীকৃতি প্রদান করেছিল। ১৯০৬ সালের জেনেভা সম্মেলনে বিষয়টি পূনর্বিবেচনা করে একটি প্রতীক নির্ধারণের সাধারণ নীতি গ্রহণ করা হয়। সাথে সাথে উসমানীয়া সাম্রাজ্য ও ইরানকে তাদের নিজস্ব অধিকার সুরক্ষার সুযোগও প্রদান করা হয়।[৫৪]

ধর্মনিরপেক্ষ প্রতীক হিসেবে অফিসিয়াল স্বীকৃতি প্রদানের পর *ক্রস প্রতীকের প্রভাব* ও মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পায়। এটি সুইজারল্যান্ডের পতাকার অনুরূপ, যা দীর্ঘকাল যাবৎ নিরপেক্ষতার প্রতীকও ছিল।[৫৫] কিন্তু বাস্তবে এটি সুস্পষ্ট নয় যে, আসলেই কী এ বিশ্বাসে ১৯০৬ সালে *রেড ক্রসকে* প্রতীক হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, এটি সুইস পতাকার রূপান্তর, না কী অন্য কিছু? কেননা ১৮৬৩ সালের যে সম্মেলনে এ প্রতীক নির্ধারণ করা হয়েছিল তার কার্যবিবরণী সঠিকভাবে রেকর্ডভুক্ত করা হয়নি। তবে সার্বিক পর্যালোচনায় আমরা প্রায় নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি যে, এ প্রতীক নির্ধারণের আলোচনা ধারার সাথে *সুইস পতাকার* কোনো সম্পর্ক নেই।[৫৬] এ প্রতীকটি মূলতঃ খ্রিস্ট্রীয় প্রতীক কী না তার চেয়েও আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অনেক কষ্ট ও চেষ্টায় অবশেষে ১৯০৬

---

52 Boissier, op. cit. (note 14), p.499.

53 See Hull, op. cit. (note 46), pp. 114-115, 118.

54 See Framiois Bugnion, "The red cross and red crescent emblems", *Internationa*l *Review of the Red Cross*, No. 272, October 1989, p. 408; Hull, op. cit. (note 46), p.118; see also Actes de Ia Conference de Revision reunie Genve du 11 Juin au juillet 1906, Imprimerie Henry Jarrys, Geneva, 1906, pp. 17, 63, 160-164, 175, 199, 214, 260 and 286.

55 See Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies in the Field, Geneva, 6 July 1906, Art. 18: "As a compliment to Switzerland, the heraldic emblem of the red cross on a white ground, formed by revising the Federal colours, shall be retained as the emblem and distinctive sign of the Army Medical Services."

56 See Boissier, op. cit. (note 14), pp. 105-107, 499.

সালের সম্মেলনে এ প্রতীকের ধর্মনিরপেক্ষ ব্যাখ্যা প্রদান করে তাকে দাপ্তরিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়।[৫৭]

প্রতীক নিয়ে এ পর্যালোচনায় আরো একটি বিষয় স্পষ্ট হলো যে, মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ বিভাজন নিছক ধর্মীয় বিভাজন নয়; বরং সভ্যতার বিভাজন বটে। যেমন উভয় সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী মুসলিম রাষ্ট্র তুরস্ক ও ইরানের জন্য একটি নয় পৃথক দু'টি প্রতীকের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছিল। তাদের প্রতীক দু'টি যথাক্রমে *রেড ক্রিসেন্ট* এবং *লাল সিংহ ও সূর্য* ইসলামের অভ্যন্তরের পার্থক্যগুলোর ক্ষেত্রে ঐক্যসাধনের নির্দেশক নয়; বরং তা ইসলামপূর্ব আরবের সভ্যতার ঐহিত্যের প্রতিফলন মাত্র। এ দাবি আরো শক্তিশালী হয়, যখন আমরা দেখি বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষ শাসন সংস্কার হলেও তারা রেড *ক্রিসেন্ট প্রতীককে* আঁকড়ে ধরে থাকে।

মুসলিম উম্মাহর অভ্যন্তরীণ অনৈক্যের সাথে সাথে এ প্রতীক নিয়ে মতানৈক্য একটি তত্ত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরে যতই আধুনিকতা ও জাতীয়তাবাদের বীজ যত শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করতে লাগল ততই এ মতানৈক্য বৃদ্ধি পেতে লাগল। সুতরাং ১৮৯৯ সালে বুলগেরিয়া একটি শাখা প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। যদিও তখন বুলগেরিয়া উসমানিয়া তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীনে একটি প্রদেশ ছিল। ফলে তাদের প্রতিনিধি দলও উক্ত সাম্রাজ্যের অনুগামী একটি শাখা প্রতিনিধি দল ছিল। ১৯০৭ সালে তাদের আসন ও প্রতিনিধিদলের স্বাক্ষরকে মূল রাষ্ট্র থেকে পৃথক হিসেবে গণ্য করা হয়।[৫৮] খিলাফত শাসন ব্যবস্থার পতন ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অভ্যন্তরীণ শক্তি হিসেবে মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্য অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে।[৫৯] যদিও এ সময় মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আন্তর্জাতিক সম্মেলনসমূহে মুসলিম প্রতিনিধি দলের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

57 Boissier suggests that the delegates at the 1899 Conference believed the version of events they enshrined, despite its inaccuracy. He notes that it was a version of events which "Moynier lui-mme a frs curieusement accrdditëe dans plusieurs de ses dcrits." Given Moynier's other efforts to promote the secularist moment in the Red Cross movement, it is perhaps not so curious that he should have accredited such a secularist version of events: ibid., p. 499.

58 See Hull, op. cit. (note 46), pp. 11, 13; Eyffinger, op. cit. (note 46), pp. 96-99.

59 See D. Lloyd George, The Truth About the Peace Treaties, Victor Gollancz, London, 1938, especially at Chapters XXII-XXVI.

এ বিষয়টির ফলাফল খুব দ্রুত পরিদৃষ্ট হয় এভাবে যে, ১৯২৯ সালের ২৭ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত জেনেভা চুক্তির ১৮ নং ধারার মাধ্যমে রেড ক্রিসেন্ট এবং লাল সূর্য ও সিংহ প্রতীককে দাপ্তরিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।[৬০] ইরান, মিসর ও তুরস্ক আগে থেকেই এ প্রতীক ব্যবহার করত বলে এটি কোনো আনুসঙ্গিক সিদ্ধান্ত ছিল না। তাই মুসলিম রাষ্ট্র বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে মুসলিম শক্তির যে প্রবৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল তা আন্তর্জাতিক মানবিক আইন প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে। অনুরূপভাবে তারা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অভ্যন্তর থেকেই এতে ইসলামী আদর্শ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্নতর। কারণ এ আইন গ্রহণের চরম মূল্য হিসেবে উসমানিয়া সাম্রাজ্যের যখন পতন হয়েছিল, সে সময় ব্যতীত ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ কখনো অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকৃতি দেয়নি যে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন প্রণয়নে দাপ্তরিকভাবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সমান অংশিদারিত্ব ছিল।[৬১] আধুনিক আন্তর্জাতিক সমাজের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে 'শক্তিশালী' করা মূলতঃ একটি অনুগত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার নামান্তর। আরেকদল ইউরোপীয় রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র থেকে বিশেষ এক অবয়বে ইসলামী উম্মাহ্ পুনর্গঠন করার কাজে সচেষ্ট ছিল।[৬২] উপরিউক্ত পর্যালোচনা দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিকাশের জন্য অনুষ্ঠিত সম্মেলনসমূহে মুসলিমদের কখনোই সমান ভূমিকা ছিল না।

---

60 Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies in the Field, Geneva, 27 July 1929, Art. 19:

"As a compliment to Switzerland, the heraldic emblem of the red cross on a white ground, formed by reversing the Federal colours, is retained as the emblem and distinctive sign of the medical service of armed forces. Nevertheless, in the case of countries which already use, in place of the Red Cross, the Red Crescent or the Red Lion and Sun on a white ground as a distinctive sign, these emblems are also recognized by the terms of the present Convention."

See Actes de Ia Confe'rence diplom.atique convoquée par le Conseilfede'ral suisse pour Ia Revision de la Convention du 6juillet 1906 pour i'Amdlioration du Sort des Blesses et Malades dons les Armées en Campagne, etpour lElaboration dune Convention relative au Traitement des Prisonniers de Guerre, réunie Gen,.'e du ler au 27juillet 1929, *Imprimerie du Journal de Gene, Geneva*, 1930, pp. 19, 247-254, 570, 615 and 666.

61 John Strawson, "Encountering Islamic law", available at http://www.iiu.edu.my/deed/lawbase/jsrps.html

62 Majid Khadduri, "*Islam and the modern law of nations*", American Journal of international Law, Vol. 50, 1956, pp. 353-372, p. 358; Strawson, op. cit. (note 60), notes that Persia adopted a constitution based on the Belgian model in 1906, and was followed by Egypt in 1923.

মুহাম্মাদ বাজাবী বলেন, জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলোর প্রশাসন সাধারণ আইনের ক্ষেত্র থেকে ইসলামী আইনকে পৃথক পূর্বক একে একটি সাংবিধানিক, প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দান করেছে।[৬৩] ফলে তা একটি বিশেষ ও স্বতন্ত্র আইন হিসেবে ইসলামী শিরোনাম অর্জন করেছে। উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা কয়েকটি উপায়ে মানবিক আইনের সাথে ইসলামী আইনের নূন্যতম সম্পর্ক পরিস্ফুটিত হয়। কারণ, ইসলাম বা সাধারণ আইনের আলোকে দু'টি মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সম্মেলনসমূহে মুসলিম প্রতিনিধি দলগুলোর তেমন কোনো অবদান ছিল না। ঐ সময়ে খুব কম মুসলিম গবেষকই আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও ইসলামী ঐহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। জন ফিলসাই জোর দিয়ে বলেছেন যে, এ সময় পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের উৎকর্ষ সাধনে মুসলিম পণ্ডিতবর্গের অংশিদারিত্ব ছিল এ আইনের অভ্যন্তরে থেকেই। দীর্ঘকালেও তাঁরা সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনার সীমা নির্ধারণী কোনো স্বতন্ত্র ইসলামী নীতি প্রচলনের প্রচেষ্টা চালাননি।[৬৪]

তবে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক সাধারণ আইনের অভ্যন্তরে বিশিষ্ট মুসলিম ব্যক্তিত্বদের অব্যাহত অবদান রাখার পথ তৈরি সংক্রান্ত একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু জাতিগত বিভক্তির পরেও মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের পক্ষে সামষ্টিক আদর্শ আঁকড়ে থাকা কি করে সম্ভব? যে সামষ্টিক আদর্শ আন্তর্জাতিক সাধারণ আইনের মধ্যে প্রতিফলিত হবে। আন্তর্জাতিক স্থায়ী আদালতের মৌলিক গঠনতন্ত্রের ৩৮ ও ৯ ধারার আলোকে অনেক মুসলিম গবেষক উত্তর দিয়ে থাকেন। এর ৯ নং ধারায় রয়েছে:[৬৫]

'প্রতিটি নির্বাচনের সময় নির্বাচকমণ্ডলীর উচিৎ এ দিকে দৃষ্টি দেয়া যে, এ আদালতের সদস্য হওয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থির যোগ্যতা অর্জনই প্রত্যেকটি মানুষের জন্য যথেষ্ট নয়; বরং কোনো সংস্থা বা সংঘ তৈরির সময় দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক যে, তা যেন বড় বড় সভ্যতা ও বিশ্বের প্রধান প্রধান আইন ও বিধানের প্রতিফলনের দায়িত্ব গ্রহণ করে'।

আন্তর্জাতিক আদালতের ৩৮ ধারায় রয়েছে, 'এটি নিশ্চিত করা হবে যে, এ আদালত যে আইন প্রয়োগ করবে তা অবশ্যই সভ্য জাতিসমূহ স্বীকৃত সাধারণ

63 Bedjaoui, op. cit. (note 2), pp. 295-296.

64 See John Kelsay, *"Islam and the distinction between combatants and noncombatants"*, in Johnson and Kelsay, op. cit. (note 2), P.197, PP. 207-8

65 Statute of the Permanent Court of International Justice, adopted pursuant to Article 14 of the League of Nations.

মৌলিক আইন হতে হবে।' মুসলিম পণ্ডিতগণ জোর দিয়ে বলেছেন যে, ইসলাম অবশ্যই আন্তর্জাতিক আদালতের মূলনীতিতে উল্লিখিত বড় সভ্যতাসমূহের একটি। আর ইসলামী আইন অবশ্যই বিশ্বের মৌলিক আইন ব্যবস্থার একটি। সুতরাং আন্তর্জাতিক আদালতে ইসলামী আইনকে আন্তর্জাতিক আইনের উৎস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান একান্ত কর্তব্য।[৬৬] এ চিন্তাধারা গবেষকদের পর্যালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং এ বিষয়টি প্রথমতঃ দাপ্তরিকভাবে জাতিপুঞ্জ, অতঃপর জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সম্মেলনে উত্থাপিত হয়েছে।[৬৭] এ পদ্ধতিতেই বহুসভ্যতা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক আইন একটি বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এভাবেই গঠনগত দিক থেকে ইসলামের বৈশিষ্ট্যাবলীর স্থান ইউরোপীয় সভ্যতার সাম্যনীতির উর্ধ্বে। এ পদ্ধতিতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। যথাঃ

**এক.** ধর্ম, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে বিশেষ ভিত্তি থাকার পরেও মুসলিম রাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক আইনের বিধান প্রয়োগের যথার্থতা কোনো প্রকার আপত্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা।

**দুই.** আইন কর্তৃপক্ষের এই স্বীকৃতি দেয়া যে, এ বিধান শুধু ইসলামী আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; বরং তা ধর্মনিরপেক্ষ আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। কমপক্ষে আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের ক্ষেত্রে বিষয়টি অরো সংকীর্ণ অর্থে প্রযোজ্য। বহু সভ্যতার আলোকে প্রতিষ্ঠিত এ নীতি দু'টি বিষয় আমাদের সামনে তুলে ধরে। যথা-

**এক.** বিশ্বজনীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিধি-প্রণয়নের ক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের কার্যকরী অংশগ্রহণ। আন্তর্জাতিক সমাজ অঙ্গনে ভূমিকা পালনকারী অমুসলিমদের গঠনমূলক অংশ গ্রহণের মতই মুসলিম ভূমিকা পালনকারীদেরও নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

---

[66] See *"Proceedings of international conferences on comparative law of* 1932,1937, in Bulletin trimestriel de Ia Sociëtd de legislation comparée, 1937, pp. 346-7.

[67] See Memoranda presented in September 1939 to the League of Nations and on 17 April 1945 to the United Nations Conference in San Francisco; see also Mahmassani, op. cit. (note 2), p. 222. Articles 9 and 38(1) (C) of the Statute of the International Court of Justice, appended to the United Nations Charter, reproduce Articles 9 and 38C3) of the PCIJ Statute almost verbatim.

**দুই.** *রেড ক্রিসেন্ট এবং লাল সূর্য ও সিংহ*-এর দাপ্তরিক স্বীকৃতি প্রদান এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিশাল দৃষ্টান্তের মাঝে সভ্যতার প্রতীক রক্ষা করা। যদিও ১৮৯৯ ও ১৯৪৫ সালের মধ্যে ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের পরস্পর মুখোমুখি হওয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল। মুসলিম কর্মকর্তাগণ যে নীতি অবলম্বন করেছেন, তাতে জাতীয়তাবাদের গুরুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে।[৬৮]

## ১৯৪৫-১৯৭৭: ইসলাম, জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইন

উপনিবেশ পরবর্তী বিভিন্ন সংঘাতের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন পুনর্গঠনে ১৯৪৫ সাল ও ১৯৭৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁদের এ অংশগ্রহণ জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে উঠে ইসলামী বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ছিল না; বরং তা নিছক জাতীয়তাবাদের প্রতিধ্বনি ছিল।[৬৯] এ সংঘাত ও মতানৈক্যের ফলে ১৯৪৯ সালের জেনেভা চুক্তি পরিবর্তনের জন্য ১৯৭৩ সালের একটি কুটনৈতিক সম্মেলন আহ্বান জরুরী হয়ে পড়ে। এ বিশাল মতপার্থক্যে বিভিন্ন মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অংশগ্রহণ ছিল। যথা- ১৯৪৮ সালে সূচিত আরব-ইসরাঈল সংঘর্ষে।[৭০] এ প্রশ্ন

---

68 See Elihu Lauterpacht, "*The legal irrelevance of the 'state of war*", ASIL Proceedings 1968, pp. 58-68; Julius Stone, Of Law and Nations, 1974, p. 427 ff. Particularly important in this debate was the contribution by the Egyptian legal expert Georges Abi-Saab, both in his writings (see particularly G. Abi-Saab, "*Wars of national liberation and the laws of war*", Annales d'Etudes Internationales, Vol. 3, 1972, p. 93) and as an Egyptian delegate at the 1974-1977 Conference which led to adoption of the two Additional Protocols: see Jean J.A. Salmon, "*Les guerres de liberation nationale" in Antonio Cassese (ed.), The New Humanitarian Law of Armed Conflict, Editoriale Scientifica*, Naples, 1979, p. 55. See also the Reports by the Secretary-General entitled Respect for Human Rights in Armed Conflict, e.g. UN A/7720, 20 November 1969.

69 See Res. XXIII of 12 May 1968, Final Act of the international Conference on Human Rights, Tehran, 22 April- 13 May 1968 (AJConf. 32/41); U NGA Res. 2444 (XXIII), 13 January 1969.

70 Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, Geneva, 12 August 1949; Convention (U) for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, Geneva, 12 August 1949; Convention (Ill) relative to the Treatment of Prisoners of War, Geneva, 12 August 1949; Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Geneva, 12 August 1949; Official Commentary to the 1949 Geneva Conventions, Jean Pictet (ed.), ICRC, Geneva, 1965.

উত্থাপিত হয় যে, এ সংঘাতে মানবিক আইন কতখানি প্রযোজ্য হবে এবং এ আইনে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অবস্থান কী হবে?[৭১] অনুরূপভাবে ১৯৫৬ সালের সুয়েস সংকট ও ১৯৬৫ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বরে সংঘটিত ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ।[৭২] বিশেষভাবে পঞ্চাশ দশকের শেষ ও ষাট দশকের শুরুতে আলজেরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা যায়। এ যুদ্ধকে ফ্রান্স স্বীকৃতি না দেয়ার কারণে যুদ্ধকালীন মুসলিম বিদ্রোহীরা বিভিন্নভাবে সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। আর আন্তর্জাতিক মানবিক আইন তাদের সুরক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছিল। উপরিউক্ত প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে জেনেভা চুক্তির[৭৩] সংযোজনী প্রথম প্রটোকলের প্রথম ধারা প্রণয়নে মুসলিম অংশগ্রহণকারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। চাই তা রাষ্ট্র হোক বা পি.এল. ও-এর মত কোনো সংস্থা হোক।[৭৪] এতে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে পরিধি বৃদ্ধি পেয়ে যারা উপনিবেশিক আগ্রাসন, বিজাতীয় দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে এবং জাতিগত শাসনের জন্য যুদ্ধ করে তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এ প্রটোকলের প্রথম ধারার ফলে (অ-রাষ্ট্র সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণের কারণে) আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের দীর্ঘদিনের রাষ্ট্র-চিন্তার মূলনীতিতে একটি মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ মৌলিক পরিবর্তন ছিল মুসলিম নেতৃবৃন্দের অবদানের সরাসরি ফল। আরো

---

71 Dietrich Schindler, "State of war, belligerency, armed conflict" in Antonio Cassese (ed.), The New Humanitarian Law of Armed Conflict, Editoriale Scientifica, Naples, 1979, pp. 3 and 8.

72 Ibid., pp. 9-10.

73 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), Geneva, 8 June 1977. See also Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), Geneva, 8 June 1977.

74 See Protocol I, op. cit. (note 72), Art 1(4). This text was adopted in draft in 1974 by a vote of 70 in favour (22 of which were States with an Islamic majority), 21 against (0 Islamic States) and 13 abstentions (1 Islamic State). At the final vote in 1977, the same text was passed by 87 for (24), 1 against (Israel)4 and 11 abstentions (0): see Salmon, op. cit. (note 67), pp. 65-66. The PLO was permitted to send a delegation to the conference (as were other recognized national liberation movements) and was seen by many of the Western States as the intended beneficiary of this expansion of international humanitarian law: see George H. Aldrich, "Prospects for United States ratification of Additional Protocol I to the 1949 Geneva Conventions", American journal of international Law, Vol. 85, No. 1, 1991, p. 6. On the contribution by Georges Abi-Saab, Egyptian delegate, see op. cit. (note 67).

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, উক্ত নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য মৌলিকভাবে ইসলামের আদর্শ উদ্ভাসিত ছিল না; বরং তা ছিল জাতীয়তাবাদের আলোকে পরিচালিত।[৭৫]

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সর্বশেষ পরিবর্তনে অ-রাষ্ট্র সংস্থাগুলোর ভূমিকার প্রতিফলন ঘটেছে। এতে এমন কিছু যুদ্ধকৌশলকে বৈধতা দেয়া হয়েছে, যেগুলো অ-রাষ্ট্র সংস্থাসমূহ করতে বাধ্য হয়। আধুনিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র তাদের স্থায়ী সৈন্যবাহিনী দ্বারা চিরাচরিত নিয়মে যুদ্ধ করতে সক্ষম, কিন্তু অ-রাষ্ট্র সংস্থাগুলোর পক্ষে কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী গঠন করা সম্ভব নয়। ফলে তারা এমন গেরিলা যুদ্ধের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়, যা ১৯৪৯ সালের জেনেভা চুক্তিতে বৈধ কার্যক্রমের আওতায় পড়ে না। এজন্য তাদের আক্রমণাত্মক কার্যাবলী আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সীমা থেকে ছিল বহুদূরে । অংশগ্রহণকারী ইসলামী পক্ষগুলো উপরিউক্ত কার্যাবলীকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের গন্ডির ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে 'যোদ্ধা'-এর ধারণা পুন:নির্ধারণের ক্ষেত্রে।[৭৬] অনুরূপ মুখোশ ব্যবহারের বৈধতা ও প্রকাশ্যে অস্ত্রবহনের শর্তারোপের ক্ষেত্রে মুসলিম প্রতিনিধিদলগুলোর জোরালো ভূমিকা ছিল। আর মুসলিম স্বাধীনতাকামী সংগঠনগুলো (যথা- পি. এল. ও এবং আলজেরিয়ার সংগঠনসমূহ) তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে এ সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হচ্ছিল।[৭৭]

১৯৭৪-১৯৭৭ সালের সম্মেলনগুলো মূলতঃ আরব-ইসরাঈল সংঘাত প্রসঙ্গে মুসলিম অংশগ্রহণকারী পক্ষগুলোর অভিযোগ এবং অন্যদের পক্ষ থেকে তা খণ্ডনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তদন্ত কমিশন গঠন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সম্মেলনের শেষভাগে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো যেসব অধিকৃত অঞ্চলে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের লঙ্ঘন হচ্ছে কমপক্ষে সেখানে প্রথম প্রটোকলের ৯০ ধারা অনুযায়ী গঠিত তদন্ত কমিশন কার্যকর করার প্রস্তাব উত্থাপন করে। কিন্তু যে বিষয়টিকে নিরপেক্ষ হিসেবে গণ্য করা যেত, তা গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতির

75 See, for example, Article 22 of the Palestine National Covenant, 1968, in Yehuda Lukacs (ed.), Documents on the Israeli-Palestinian Conflict, 1967-83, Cambridge University Press, Cambridge, 1984, p. 142.

76 Protocol I, op. cit. (note 72), Arts 42-45.

77 See Salmon, op. cit. (note 67), pp. 103- 104, 108-109. At one point the Arab countries presented a proposal for the absolute prohibition of attacks on objects designed for civilian use, such as houses, dwellings and means of transport, irrespective of whether they were used for military purposes: see Charles Lysaght, "The attitude of western countries" in Antonio Cassese (ed.), The New Humanitarian Law of Armed Conflict, Editoriale Scientifica, Naples, 1979, p. 349, p. 364.

বেড়াজালে বন্দী হয়ে পড়ে। কারণ, এ তদন্ত কমিশন দ্রুত আরব-ইসরাঈল সমস্যায় মাথা ঘামানো শুরু করে দেয়। ফলে সোভিয়েত ব্লক (যারা এ আন্তর্জাতিক সালিশিকে সন্দেহের চোখে দেখছিল) এবং পাশ্চাত্যের (যারা এর মধ্যে ইসরাঈলের বিরুদ্ধে একটি কৌশল দেখছিল) জোর প্রচেষ্টায় তৃতীয় বিশ্বের এ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়।[৭৮] মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর উপরে বর্ণিত জোরালো অবদান থাকলেও কখনো কখনো আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের উন্নয়নে তাদের প্রচেষ্টা বাধা গ্রস্থ হয়।

১৯৭৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানগণ সুস্পষ্টভাবে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের আওতায় কাজ করার সম্মতি প্রদান করে। ব্যক্তিস্বার্থে তারা কখনো এ আইন বিকাশের জন্য এর উন্নয়নকে তাদের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেননি; বরং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাদের কার্যক্রমের গ্রহণযোগ্যতা প্রাপ্তির জন্য নিজেদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে প্রচারের প্রয়াস পেয়েছেন। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বক্তব্যে ইয়াসির আরাফাত এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে চেয়েছেন। এতে তিনি ফিলিস্তিনী মুক্তি সংস্থাকে মানবিক নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি জাতীয়তবাদী আন্দোলন হিসেবে চিত্রিত করেছেন, যেখানে ধর্মীয় অনুভূতির কোনো স্থান নেই। তিনি বলেন, 'প্রথম থেকেই আমাদের এ আন্দোলন কোনো বংশীয় বা ধর্মীয় চেতনায় পরিচালিত নয়। আর আমাদের টার্গেট কোনো ব্যক্তি ইয়াহুদী নয়; বরং আমাদের টার্গেট ইয়াহুদীবাদী আন্দোলন ও তাদের শত্রুতা। তাই আমাদের এ আন্দোলন মানুষ হিসেবে ইয়াহুদীদের জন্যও। আমরা সংগ্রাম করছি, যেন ধর্মীয় ও বংশীয় সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও মুসলিম সকলেই সমঅধিকার ও সমমর্যাদার ভিত্তিতে সাম্যের সাথে বসবাস করতে পারে।'[৭৯]

দীর্ঘ ৭৫ বছর ধরে চলে আসা দৃষ্টিভঙ্গিই আরাফাতের বক্তব্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। আর তা হলো, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও আন্তর্জাতিক সাধারণ আইন থেকে ইসলামী আদর্শকে দূরে রাখা। সুতরাং কখনো কখনো মুসলিম নেতৃবৃন্দ এ আইনের ধারাগুলোকে তাদের স্বার্থ হাসিলের কাজে ব্যবহার করেছেন। আবার কখনো কম প্রভাবশালী কোনো সভ্যতার অনুসরণ করতে গিয়ে এগুলো চর্চা করেছেন। ১৯৭৪-১৯৭৭ সালের সম্মেলনে 'রণকৌশল', বিষয়ক আলোচনায় সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক সাধারণ আইন ও বিশেষভাবে

---

78 See Luigi Condorelli, "Les pays afro-asiatiques" in Antonio Cassese (ed.), The New Humanitarian Law of Armed Conflict, Editoriale Scientifica, Naples, 1979, p. 386, pp. 394-5.

79 Lukacs, op. cit. (note 74), p. 174.

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের ধারা প্রণয়নের ক্ষেত্রে মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। তাঁদের কেউ কেউ আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে কোনো অবদান না রেখে একে ইসলামী আইন ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হিসেবে চিত্রিত করে থাকেন। এ সম্পর্কে অভ্যন্তরীণ সংঘাতের বিধি সম্বলিত দ্বিতীয়[৮০] অতিরিক্ত প্রটোকলে কিছু দিক নির্দেশনা রয়েছে। তবে তা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হলেও আন্তর্জাতিক মানবিক আইন[৮১] বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সকল দিক নির্দেশনা মুসলিম নেতৃবৃন্দের আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মৌলিক মানবিক বিধান ত্যাগপূর্বক ইসলামের পুরোহিততন্ত্রের আলোকে আন্দোলনের আদি নিদর্শন। পরবর্তী বছরগুলোতে এ পরিবর্তন আরো শক্তিশালী হয়। এমনকি তা এখন মানবিক আইনের ধর্মনিরপেক্ষ আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে এক মৌলিক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে। এ বিষয়টি আমরাও প্রত্যক্ষ করছি।

## ১৯৭৭-১৯৯৮: মানবিক বিশ্বজনীনতা ও ধর্মীয় বিশ্বজনীনতা পরস্পর বিপরীত না কী সামসঞ্জস্যপূর্ণ?

ইরানের ইসলামী বিপ-বকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী রাজনীতির ধারণার পুনর্জাগরণের ইঙ্গিত হিসেবে গণ্য করা হয় যা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের ভিত্তি আন্তর্জাতিক সাধারণ আইনের সাথে মুসিলম নেতৃবৃন্দের সম্পর্কের গুণগত পরিবর্তন সাধন করেছে এবং ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনকে পরস্পর বিরোধী দু'টি স্বতন্ত্র বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করেছে। অত্র গবেষণার এ অংশে আমি এ বৈপরিত্য সুস্পষ্ট করার জন্য দু'টি ঘটনা উল্লেখ করব। প্রথমত: ১৯৮০-১৯৮৮ সালে সংঘটিত ইরান-ইরাক যুদ্ধ। দ্বিতীয়ত: আন্তর্জাতিক ফৌজদারী আদালতের রোম ঘোষণায় জাতিগত সমস্যা নিয়ে বিতর্ক।

ইসলামী বিপ-বোত্তর ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান মৌলবাদী ও বিশ্বজনীন ইসলামের স্বার্থে জাতীয়তাবাদ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। জাতীয়তাবাদী

80 op. cit. (note 72).

81 See Howard S.Levie (ed.), The Law of Non-international Armed Conflict: Protocol II to the 1949 Geneva Conventions, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1987, p. 5 (Egypt on compatibility of draft Protocol II with Islam), p. 65 (Saudi Arabia on compatibility of Article 1 with Islamic law doctrine of full respect and protection for all human beings regardless of colour or race) and p. 301 (Saudi Arabia on penal provisions).

বৈশিষ্ট্য থেকে ইসলামী ঐক্যের দিকে ইরানের এ পরিবর্তন ১৯৮০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর-এ আন্তর্জাতিক মানবিক আইন কর্তৃপক্ষকে লেখা এক পত্রে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। এতে ইরান সশস্ত্র শক্তিগুলোর চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য প্রতীক হিসেবে *লাল সিংহ ও সূর্যের* পরিবর্তে রেড ক্রিসেন্টকে গ্রহণের ঘোষণা প্রদান করে।[৮২]

১৯৮০ সালের ইরান-ইরাক যুদ্ধে উভয়পক্ষের আক্রমণ পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের আচরণ ইসলামী ঐক্যকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে। অসংখ্য প্রমাণ থেকে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের আওতায় উভয়পক্ষের কাজ করার প্রচন্ড আগ্রহ রয়েছে।[৮৩] কিন্তু বাস্তবতা ছিল একেবারে আলাদা।[৮৪] আরো পরিতাপের বিষয় হলো, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের ক্ষেত্রে এরূপ কথা ও কাজের গরমিল নতুন কিছু নয়। আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মানদণ্ড গুলো দূরের কথা ইসলামিক মানদণ্ডও মান্য করার কোনো দৃষ্টান্ত এ উভয়পক্ষের কার্যক্রমে একেবারেই পাওয়া যায় না।

এ বিষয়টি উভয়পক্ষের দেশের সাধারণ জনগণকে দেয়া বক্তব্যে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, বহির্বিশ্বে আন্তর্জাতিক মহলকে প্রদত্ত বক্তব্যে নয়। ইরান অভ্যন্তরীণ সভা-সমাবেশে এ যুদ্ধকে এভাবে বিশেষায়িত করেছিল যে, এটি কাফির, অমুসলিম ইরাকী বাথ পার্টির নেতা সাদ্দাম হোসাইনের[৮৫] কবল থেকে ইসলামকে রক্ষার সংগ্রাম। অপরদিকে ইরাকী শাসকবর্গ এ যুদ্ধকে এভাবে

82 ‘Adoption of the red crescent by the Islamic Republic of Iran”, International Review of the Red Cross, No. 219, November-December 1980, pp. 316-317.

83 See for example Letter dated 28 June 1984from the Deputy Permanent Representative of Iraq to the United Nations addressed to the Secretary-General, UN Doc. S/i 6649, 28 June 1984; Statement dated 17 July 1989 by the Foreign Ministry of the Islamic Republic of Iran, UN Doc. S/20470, 19 July 1989, Annex.

84 See for example ICRC, Memorandum from the International Committee of the Red Cross to the States Parties to the Geneva Conventions of 12 August 1949 concerning the conflict between the Islamic Republic of Iran and Republic of Iraq, Geneva, 7 May 1983, reprinted in Marco Sassoli and Antoine A. Bouvier, How Does Law Protect in War?, TCRC, Geneva 1999, p. 978; and ICRC, Second Memorandum from the International Committee of the Red Cross to the States Parties to the Geneva Conventions of 12 August 1949 concerning the conflict between the Islamic Republic of Iran and Republic of Iraq, Geneva, 10 February 1984, reprinted in ibid., p. 982; see also UN Doc. S/RES/S40 (31 October 1983).

85 See Shahram Chubin and Charles Tripp, *Iran and Iraq at War*, LB. Tauris and Company Ltd., London, 1988, P.38.

চিত্রিত করেছিল যে, এটি ইরানের সীমানা বিহীন বিপ্লব-এর কবল থেকে ইরাকী নেতৃত্বকে রক্ষা করার যুদ্ধ।[৮৬] পরবর্তীতে এ যুদ্ধকে ইরানী আগ্রাসন থেকে ইরাকের ভূমি রক্ষার যুদ্ধ হিসেবে প্রচার করা হয়। সুতরাং ইরানের বিবেচনায় ছিল ইসলামী মানদ । অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সাধারণ আইনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। এ ইরাকের পদ্ধতিগত পার্থক্য শুধু বক্তব্যের পার্থক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং উভয়ের আক্রমণকালীন কার্যক্রমেও তা প্রভাব বিস্তার করে। ইরাকী সর্বোচ্চ নেতৃত্ব যুদ্ধকালীন সময়ে ইরানী বেসামরিক জনগণকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করাকে নিজেদের জনসাধারণের কাছে এ বলে বৈধ হিসেবে প্রচার করে যে, এ 'অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধে' মানবিক সীমাবদ্ধতা প্রযোজ্য হবে না। ইরানী বেসামরিক জনগণকে এ জন্যও লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা বৈধ যে, তারা তাদের যুদ্ধোন্মাদ নেতৃত্বকে সহযোগিতা করছে।[৮৭] কিন্তু তাদের এ বক্তব্য আন্তর্জাতিক মহলের কোনো সহানুভূতি অর্জনে সক্ষম হয়নি।[৮৮]

অন্যদিকে, ইরানী শাসকবর্গ এ যুদ্ধকে '*জনগণের যুদ্ধ*' হিসেবে প্রচার করে সত্তর দশকের সফল ও অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী পি.এল.ও এবং অন্যান্য মুসলিম স্বাধীনতাকামী সংস্থাসমূহের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস চালান এবং এতে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সংযোজন করেন।[৮৯] ইরানী সামরিক পরিকল্পনাকারীগণ তাদের ঘোষণা অনুযায়ী ইসলামী যুদ্ধের কারণে প্রচলিত যুদ্ধোপকরণ পরিহারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[৯০] এ লক্ষ্যে ইরানী পরিকল্পনার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। যথা,

**এক.** ফলাফলের মাধ্যমে (অর্থাৎ শত্রুর সামরিক শক্তি ধ্বংসের মাধ্যমে) বিজয় অর্জিত হয় না; বরং নিছক কাজের মাধ্যমেই (অর্থাৎ জীবনোৎসর্গের মাধ্যমে ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে) বিজয় অর্জিত হয়।

**দুই.** মুসলিম (ইরানী) জনগণ শুধু ধর্মদ্রোহী ইরাকী শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বৈধ মনে করে, ইরাকের মুমিন জনসাধারণের বিরুদ্ধে নয়। যাতে স্বীয় শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাদের করার সম্ভাবনা থাকে।[৯১]

86 Kelsay, op. cit. (note 63), p. 213.

87 Ibid., p. 215; Chubin and Tripp, op. cit. (note 84), p. 60.

88 See for example UN Security Council Resolution 543, UN Doc. S/RES/543, 31 October 1983, para. 2.

89 Kelsay, op. cit. (note 63), pp. 215-216

90 *Ibid*. See also Chubin and Tripp, op. cit. (note 84), p. 43.

91 *Ibid*., pp. 213-214; Chubin and Tripp, op. cit. (note 84), pp. 40-46.

এ পদ্ধতিটি আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। কারণ এ নীতি ইরাকের বেসামরিক জনগণ ও ইরানী সামরিক অবকাঠামোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু সময় প্রবাহের সাথে সাথে সুস্পষ্ট হলো যে, এ দু'নীতির মধ্যে বিরাট ফারাক রয়েছে। তা হলো ইরানী সামরিক কার্যক্রমের লক্ষ্য (সান বুট্রোসবার্গের ঘোষণার) '*শত্রুর অগ্রশক্তিকে দুর্বল করা*' এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; বরং তা রক্তপাতের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ছিল। সে রক্তপাত ব্যক্তির নিজের হতে পারে কিংবা কোনো কাফিরেরও হতে পারে[৯২] এবং এতে মানব জীবনকে কোনভাবেই মূল্যায়ন করা হয়নি; বরং একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র (মনোনীত ইসলামের) প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়েছে। এ নীতি শাহাদাত (আত্মোৎসর্গ)-এর প্রতি উৎসাহিত করেছে; যে সকল ব্যক্তিবর্গ ইসলামী চেতনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে না তাদেরকে হত্যা করা বৈধ মনে করেছে এবং এর ফলে আশ্রিত যুদ্ধবন্দীর চেয়ে ঈমানদার যুদ্ধবন্দীদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।[৯৩] ১৯৮৪ সালে বিষয়টি সুস্পষ্ট হলো যে, ইরাকের শী'আ জনগণ ইরাকের বাথ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে না, তখন ইরানী পরিকল্পনাকারীগণ বেসামরিক জনগণকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্ধারণ করে। ইরাকের বসরায় বোমাবর্ষণের মাধ্যমে এর সূত্রপাত হয়।[৯৪]

যুদ্ধের মানদণ্ড সংক্রান্ত বিধানে ঠাণ্ডা মাথায় ইরানের ইসলামী বিপ্লবসহ কিছু বিষয় অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। বাস্তবিক পক্ষেই ইরান মুসলিম নেতৃবৃন্দের চিন্তার জগতে একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। তা হলো আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বা ইসলামী মানদণ্ড কোনটি যুদ্ধকালীন তাদের প্রভাবিত কর্মনীতি হবে? মুসলিম নেতৃবৃন্দ আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতার ছায়াতলে ভূমিকা পালনকারী একটি সভ্যতা হিসেবে ইসলামের অবদানকে কখনোই স্বীকার করেনি; বরং আজ এতদোভয় বিধানকে সরাসরি সাংঘর্ষিক বলে অনুভূত হচ্ছে।

পরবর্তী দশকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের উৎকর্ষতা এবং সশস্ত্র সংঘাতকালীন আচার-আচরণের সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ-এর সাথে সাথে ইসলামের সাথে ভিন্নতা পোষণ পূর্বক আরো একটি সমস্যা তৈরি হয়েছে। তা হচ্ছে, লিঙ্গ সম্পর্ক

92 See Chubin and Tripp, op. cit. (note 84), p.40.

93 See Prisoners of War in iran and iraq: The Report of a Mission Dispatched by the Secretary-General, UN Doc. S/16962, January 1985.

94 See Kelsay, op. cit. (note 63), pp. 214-215; Chubin and Tripp, op. cit. (note 84), p.51.

(অর্থাৎ নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত সমস্যা)। ১৯৯৮ সালে রোম কুটনৈতিক সম্মেলনে আন্তর্জাতিক ফৌজদারী আদালতের খসড়া মূল বিধান প্রণয়নের মাধ্যমে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট করা হয়েছে।[৯৫] এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো,

**প্রথমত:** স্বয়ং আদালতের কার্যক্রমে এর কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাঝে লিঙ্গের সমতা বিধান নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।[৯৬] কারণ, আরব রাষ্ট্রগুলো এ ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের কোটা পদ্ধতি চালুর প্রয়াসের বিরোধিতা করে। অবশেষে তারা একটি সমঝোতায় এভাবে উপনীত হলো যে, আদালতের বিচারক ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি তারা বিবেচনায় রাখবেন।[৯৭]

**দ্বিতীয়ত:** মুসলিম রাষ্ট্রগুলো 'লিঙ্গ' পরিভাষাটির সংজ্ঞায়ন ও ফৌজদারী কার্যক্রমের মৌলিক মানদণ্ডে এর প্রয়োগের বিরোধিতা করে।[৯৮] তন্মধ্যে অনেক রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আদালতের এ মৌলিক সিদ্ধান্তকে আন্তর্জাতিক সাধারণ আইনে লিঙ্গ প্রসঙ্গটি অন্তর্ভুক্ত করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মনে করে। আন্তর্জাতিক ফৌজদারী আদালতের আইনের এ ব্যাখ্যা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারের সাথে এ আইনের সমন্বয়ের আবশ্যিকতা যদিও এ সকল রাষ্ট্র মেনে নেয়। কিন্তু '*লিঙ্গ*' বিষয়ে কোনরূপ প্রভেদ ছাড়া সমানভাবে এ আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের বিষয়টি তারা মেনে নিতে পারেনি (যেমনটি কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত হয়েছে)।[৯৯] এতে ইসলামী

95 Rome Statute of the International Criminal Court; 17 July 1998, UN Doc. AICONF.183/9*, reprinted in 37 ILM 999 (1998). See generally Roy S. Lee (ed), The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute: Issues, Negotiations, Results, Kluwer Law International, The Hague, 1999.

96 See Cate Steams, "Gender issues" in Lee (ed), op. cit. (note 94), p. 372.

97 Rome Statute, op. cit. (note 94), Arts 36(8)(iii) and 44(2). See also the comments by Algeria, Egypt, Jordan, Kuwait, Libyan Arab Jamahiriya and Qatar in the 1996 Report by the Preparatory Committee on the Establishment of an international Criminal Court, Vol. 11 (Compilation of Proposals), U NGA Official Records, Fifty-first Session, Supplement no. 22A, A151/22 (1996) at 12.

98 See Otto Triffterer (ed.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers' Notes, Nomos, Baden-Baden, 1999, pp. 164-165.

99 Steams, op. cit. (note 95), p. 372.

রাষ্ট্রগুলোর আশংকা হলো, তাদের এই ভূমিকার কারণে কমপক্ষে এ ক্ষতি হবে যে, আন্তর্জাতিক ফৌজদারী আদালত শরী'আতের আলোকে আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাখ্যা প্রদান থেকে বিরত থাকবে। আরো ক্ষতির বিষয় যে, এ আদালত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারের বিষয়টির মত অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ শুরু করে এবং এতে চরম লিঙ্গ বৈষম্য অন্তর্ভুক্ত হয়। বিষয়টি যে শুধু ইসলামী অধিকার ও কর্তব্য এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব, তা নয়; বরং আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে ইসলামের মতানৈক্য পোষণ করার সুযোগের সাথে সম্পর্কিত। ফলে একটি মারাত্মক প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অভ্যন্তরে ইসলামী সভ্যতার কী কোনো স্থান রয়েছে?

'*ক্ষতিকর বৈষম্য*' শীর্ষক অনুচ্ছেদের বিরোধিতার ক্ষেত্রে আরব রাষ্ট্রগুলোর সাথে রক্ষণশীল খ্রিস্টান রাষ্ট্রসমূহ ঐকমত্য পোষণ করে। বিশেষ করে যে সকল রাষ্ট্র আশংকা করেছে যে, লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রমকে এ অনুচ্ছেদটি অপরাধপ্রবণ করে তুলবে।[১০০] কোন কোন রাষ্ট্র '*ক্ষতিকর বৈষম্য*' অনুচ্ছেদটি বজায় রাখতে আগ্রহ প্রকাশ করে এই শর্তে যে, সেখান থেকে '*লিঙ্গ প্রকরণ*' শব্দটি একেবারেই মুছে দেয়া হবে, তবে শুধু 'লিঙ্গ' শব্দটি থাকতে পারে। এতে লিঙ্গ বৈষম্য সমস্যা থেকে অনেকটা মুক্ত থাকা যাবে। কিন্তু স্বাধীন চিন্তাধারার পাশ্চাত্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিস্টান রাষ্ট্রসমূহের সম্মিলিত আতাঁতের ফলে এ প্রস্তাব সফল হতে পারেনি।[১০১]

অতঃপর যখন মৌলিক বিধানে '*লিঙ্গ প্রকরণ*' পরিভাষাটি বজায় রাখার সিদ্ধান্ত হলো, তখন এর সংজ্ঞা নির্ধারণে আবার বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। অংশগ্রহণকারী সকলেই বুঝতে পারলেন যে, মূল সমস্যাটি এ ধারণার সামাজিক প্রয়োগের মধ্যে লুকায়িত রয়েছে। এ জন্য আলোচনা শেষে '*লিঙ্গ প্রকরণ*' সংক্রান্ত স্তর বিন্যাসে সামাজিক মতানৈক্য দূরীকরনার্থে একটি ভাষা নির্ধারণ করা হয়। 'সমাজ পরিমণ্ডলে নারী ও পুরুষ এবং পরিবারের প্রচলিত ইউনিট (একক)' অনুরূপ 'তাদের সমাজ প্রবাহে নারী ও পুরুষ' ইত্যাদি ভাষা সংবলিত প্রস্তাবকে তখন প্রত্যাখ্যান করা হয়।[১০২] সর্বশেষে এ সংজ্ঞা নির্ধারণে উপরের শেষোক্ত বাক্য

100 Ibid.

101 Ibid.

102 Ibid., p. 374.

থেকে 'তাদের' শব্দটিও বাদ দেয়া হয়।[১০৩] রোমের মৌলিক বিধান আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অভ্যন্তরে 'লিঙ্গ প্রকরণ'-এর এমন একটি সংজ্ঞা প্রদান করেছে, যা সমাজের গন্ডি থেকে মুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক ধারণা বহন করছে। আর তা কোনো সভ্যতা বা নির্দিষ্ট সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত নয়। সুতরাং আন্তর্জাতিক ফৌজদারী আদালতের বিচারকগণ ও বাদীগণ কীভাবে এ বিমুক্ত ধারণা অনুধাবন করবে, তা কীভাবে তাদের দেখা সমস্যাবলীতে প্রয়োগ করবে? বিভিন্ন সভ্যতার সাথে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার মাধ্যমে তাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এ ধারণা কোনো ভূমিকা রাখবে কী না? রাখলে তা কীভাবে?

যখন আমরা রোমের মূলনীতির লিঙ্গপ্রকরণ সংক্রান্ত তৃতীয় দিক অর্থাৎ জোর পূর্বক গর্ভ ধারণ[১০৪] করানো-এর প্রতি দৃষ্টি দেই, তখন নিশ্চিতভাবে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, কীভাবে এ সামঞ্জস্য বিধানের কার্যক্রম চলতে পারে? প্রথম দিকে আরব মুসলিম রাষ্ট্রগুলো, পরবর্তীতে তাদের সাথে যুক্ত হওয়া '*পবিত্র আসন*' সংবলিত ক্যাথলিক খ্রিস্টান কিছু রাষ্ট্র '*জোরপূর্বক গর্ভধারণ*' কে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ, তারা আশংকা করছিল যে, এতে জোরপূর্বক গর্ভধারীণী নারীকে তার গর্ভপাত করার অধিকার প্রদানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাধ্য হবে।[১০৫] তারা বলে যে, এ অপরাধের জন্য জোরপূর্বক ধর্ষণ ও অবৈধ গর্ভধারণের ধারাগুলো প্রযোজ্য হতে পারে যা কার্যতঃ পূর্ব থেকেই মূল বিধানের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ রাষ্ট্রগুলো তুরস্কের সমন্বয়ে বৃহৎ জোট গঠন করে এর তীব্র বিরোধিতা করে।[১০৬] বারবার অধিবেশন শেষে সর্বসম্মতভাবে সকলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, এ অপরাধগুলো সীমিত ব্যাখ্যাসহ অন্তর্ভুক্ত করে এর সাথে এ কথাটি জুড়ে দিতে হবে-এ অপরাধের এমন কোনো ব্যাখ্যা করা যাবে না যা গর্ভধারণ ও গর্ভপাত সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হয়।[১০৭]

---

103 Rome Statute, op. cit. (note 94), Art. 78): 'For the purpose of this Statute, it is understood that the term 'gender' refers to the two sexes, male and female, within the context of society. The term 'gender does not indicate any meaning different from the above."

104 See Triffterer, op. cit. (note 97), pp. 164-165.

105 See Steaines, op. cit. (note 95) pp. 366-367.

106 Ibid.

107 Ibid., p. 367. Art. 7(2)(f) now provides: "'Forced pregnancy' means the unlawful confinement of a woman forcibly made pregnant, with the intent of affecting the ethnic composition of any population or carrying out other grave violations of international law. This definition shall not in any way be interpreted as affecting national laws relating to pregnancy."

'জোরপূর্বক গর্ভধারণ সংক্রান্ত বিতর্কের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার আরেকটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। তা হলো, সাংঘর্ষিক দর্শন ও বিভিন্ন সভ্যতার সমন্বয়ে গঠিত একটি সমাজে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সমন্বয় কি সম্ভব? এ প্রশ্নের কার্যকরী ও সুস্পষ্ট উত্তর হলো, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন সভ্যতাসমূহের মধ্যে সংলাপের মাধ্যমে কাজ করে। সুতরাং যদিও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মানবতাবাদী চিন্তাধারা ইউরোপ কিংবা খ্রিস্টানদের চিন্তার ফসল, কিন্তু এখন সকল সভ্যতা ও সংস্কৃতি একে স্বাগত জানাচ্ছে।[১০৮] আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের উৎকর্ষ সাধন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে সংলাপের মাধ্যমে এমন কিছু পন্থা তৈরি করা, যাতে সাধারণ মানবিকতার প্রতি গুরুত্ব প্রদান এবং তার বহিঃপ্রকাশ করা সম্ভব হয়। একই সাথে বিভিন্ন সভ্যতার চালিকা শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত মানদ এবং বিধানাবলীও বাস্তবায়নের সুযোগ থাকে।

## সংঘাত ও সংলাপ

এ গবেষণায় উপস্থাপিত হয়েছে যে, ১৮৫৬ সালে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও ইসলামী 'আকীদা প্রথম যখন যৌথভাবে কাজ শুরু করে তখন এতদোভয়ের মধ্যে বিরাট মতপার্থক্য ছিল। কিন্তু আজ এ বিশাল মতদ্বৈধতা কমে এসেছে। এটি ইসলামী ও ইউরোপীয় সভ্যতার যৌথ কার্যক্রমের ফলে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে সামঞ্জস্যতার কারণে সম্ভব হয়েছে। অন্যান্য লেখকগণও সশস্ত্র সংঘর্ষের সময় আচার-আচরণ সংক্রান্ত বিরাট সামঞ্জস্যতা তাদের লেখায় সুস্পষ্ট করেছেন।[১০৯] বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে এ সামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়। যথা এ মানদ সমূহের অনুসরণ,[১১০] ফৌজদারী

108 Notable in this respect is the ratification by Saudi Arabia on 28 November 2001 of the Second Additional Protocol. This is, perhaps, an important sign that at least one Islamic actor believes that international humanitarian law and Islamic law can sit comfortably together, even in situations of non-international armed conflict. It may be an important indicator of the willingness of Islamic actors to engage in that conversation of civilizations which, as I describe below, I believe lies at the heart of the future and process of IHL.

109 See generally Ereksoussi, op. cit. (note 2); Busuttil, op. cit. (note 2); Algase, op. cit. (note 2).

110 Malekian, op. cit. (note 2), pp. 36-38.

অপরাধ,[১১১] যুদ্ধরত পক্ষগুলোর কার্যপরিধি নির্ধারণ,[১১২] বেসামরিক জনগণের সুরক্ষা[১১৩] (নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করাকে সীমিত করণ),[১১৪] যুদ্ধবন্দী,[১১৫] অধিকৃত অঞ্চল ও বস্তুর প্রতি করণীয়,[১১৬] গুপ্তচরবৃত্তি,[১১৭] প্রতারণা,[১১৮] রণকৌশল নির্ধারণ,[১১৯] যুদ্ধে বে-আইনী উপকরণের প্রয়োগ[১২০] ও অপরাধের দায়-দায়িত্ব[১২১] প্রভৃতি। কিন্তু প্রতীক নির্ধারণ নিয়ে বিতর্ক একটি মৌলিক মতপার্থক্যের বহিঃপ্রকাশ। সেখানে এ বাহ্যিক মিল প্রশ্নবিদ্ধ। এখানে একটি প্রশ্নের অবতারণা হয়। তা হলো মহান আল্লাহ্[১২২] উৎস দ্বারা প্রভাবিত ইসলামী মানদণ্ড এবং মানুষের অন্তর্নিহিত ধারণা প্রভাবিত মানবিকতার মানদণ্ডের মধ্যে কীভাবে সমন্বয় সাধন সম্ভব? মুসলিম সেনাবাহিনী ও কুটনীতিবিদগণ কী আল্লাহ্র প্রতি কর্তব্যকে গ্রহণ করবে, না কী মানবিকতার প্রতি কর্তব্যকে? ইসলামী বিধান ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিধান যখন দ্বন্দ্বপূর্ণ হচ্ছে, তখন মানদণ্ড হিসেবে কোন বিধান প্রাধান্য পাবে?

---

111 Ibid., pp. 38-41 (on criminality), 45-63 (aggression), 63-73 (war crimes), 74-75 (restricted weapons), 76-78 (crimes against humanity), 79-89 (slavery), 90-93 (genocide), 94-97 (apartheid), 98-106 (torture), 107-112 (internationally protected persons), 113- 115 (hostages), 116-120 (drug offences), and 132-134 (piracy).

112 Taube, op. cit..-tnote 8), pp. 390-394; Rechid, op. cit. (note 11), pp. 385-386; El-Dakkak, op. cit. (note 2), pp. 115-124; Malekian, op. cit. (note 2), pp. 135-147.

113 Melakian, op. cit. (note 2), pp. 154-159; see also Ameur Zemmali, Combattants et prisonniers de guerre en droit islamique et en droit international humanitaire, Editions A. Pedone, Paris, 1997; Taube, op. cit. (note 8), p. 391, citing Abu Bakr (634 CE), p. 392 citing Marghinani; ben Achour, op. cit. (note 2), pp. 6 1-63; EI-Dakkak, op. cit. (note 2), p. 119; Zemmali, op. cit. (note 2) p. 132 ; Bedjaoui, op. cit. (note 2), p. 292.

114 See generally benAchour, op. cit. (note 2), p. 65; EI-Dakkak, op. cit. (note 2), pp. 121-124; Zemmali, op. cit. (note 2), pp. 131-132; Bedjaoui, op. cit. (note 2), p. 290; Malekian, op. cit. (note 2), pp. 149-153.

115 Taube, op. cit. (note 8), p. 391, citing Abu Bakr (680 CE).

116 Taube, op. cit. (note 8), p. 391, citing Abu Bakr; p. 392, citing Marghinanis Hidayah (1196 CE); Zemmali, op. cit. (note 2), p. 133.

117 Zemmali, op. cit. (note 2), p. 131.

118 Taube, op. cit. (note 8), p. 392, citing Marghinani; EI-Dakkak, op. cit. (note 2) pp. 116-118.

119 EI-Dakkak, op. cit. (note 2), pp. 118-119.

120 Taube, op. cit. (note 8), pp. 392-3, citing Mahmoud ci Mahboud's Vikayah (1280 CE); Bedjaoui, op. cit. (note 2), p. 291.

121 *Malekiari*, op. cit. (note 2), pp. 172-178.

122 Cf. Rechid, op. cit. (note 11), p. 392.

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে বৃহত্তর বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত মেনে নিয়েই আমরা কখনো কখনো উপরিউক্ত সমস্যা হতে এ বলে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করি যে, 'ইসলামী আইন' আন্তর্জাতিক সাধারণ আইনের আওতায় একটি 'আঞ্চলিক পরিভাষা'।[১২৩] কিন্তু সমস্যা সমাধানের এ পদ্ধতি কখনো কখনো ভয়াবহ সমস্যার জন্ম দেয়। বিশেষ করে সংঘর্ষপূর্ণ অঞ্চলে যদি মুসলিম ও অমুসলিম জনগণের সম্মিলিত বসবাস থাকে। সেখানে মুসলিম সৈন্যরা মুসলিম বেসামরিক জনগণের ক্ষেত্রে কী ইসলামী বিধান অনুসরণ করবে? আর অমুসলিম জনগণের ক্ষেত্রে কী আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিধান অনুসরণ করবে? এ পদ্ধতি মধ্যযুগের '*ন্যায় যুদ্ধ*' সংক্রান্ত খ্রিস্ট মতবাদকে পুনরুজ্জীবিত ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিশ্বজনীনতাকে দুর্বল করে এক বিপদজনক রূপলাভ করবে। এছাড়াও মুসলিম রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের উপর যতটা নির্ভর করে থাকে সে তুলনায় আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মধ্যে মুসলিমদের এ আঞ্চলিক পরিভাষাটির সুস্পষ্ট অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।[১২৪] এভাবে একদিন এ ইসলামী আঞ্চলিক পরিভাষাটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

আমার দৃষ্টিতে এর উত্তম সমাধান হলো, 'সভ্যতাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সংলাপ' হিসেবে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনকে অনুধাবন করা। আর আন্তর্জাতিক বিচার আদালত ও আন্তর্জাতিক স্থায়ী বিচার আদালতে মূলনীতির ৯ নং ধারা অনুযায়ী একটি সভ্যতা হিসেবে ইসলামও এ সংলাপের অংশীদার হবে এবং সভ্য জাতিসমূহ স্বীকৃত সাধারণ আইনের মূলনীতি নির্ধারণের সহায়ক বিধানের অন্যতম উৎসও হবে ইসলাম।[১২৫]

এটি সঠিক নয় যে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বিভিন্ন সভ্যতার আলোকে ও জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে গঠিত একটি কনক্রিট আইন;[১২৬] বরং এটি বোঝা উচিৎ

---

123 See M.H. Mendelson, "The formation of customary international law", Recueil des Cours, Vol. 272, 1998, p. 155, pp. 215-7; G. Cohen-Jonathan, "La coutume locale", Annuairefranéais de droit international, Vol. 7, 1961, p. 119. Local customs can be bilateral (e.g. Right of Passage over Indian Territory (india v. Portugal), (1960) ICJ Reports 6 at 39), regional (as was considered in the Asylum case (Peru v. Colombia), (1950) ICJ Reports 266) or common to a "particular ideological group, or a group which shares the same policies on a specific issue, irrespective of their location": Mendelson, op. cit., p. 216. এটি লেখকের অভিমত। বাস্তবে এরূপ নয়। কেননা ইসলাম হলো একটি বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থা। এর বিধিবদ্ধ আইন কখনো আঞ্চলিক পরিভাষা হিসেবে গণ্য হতে পারে না; বরং এটি একটি বিশ্বজনীন পরিভাষা। অনুবাদক।

124 Compare Bedjaoui, op. cit. (note 2), p. 295.

125 See ICJ Statute, Art 38(l)(C).

126 Compare Bartram S. Brown, "Nationality and internationality in international humanitarian law", Stanford Journal of International Law, Vol. 34, No. 2, 1998, pp. 347-406.

যে, এটি বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে সংলাপের একটি কার্যক্রম এবং প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিপরীত সংঘটনকারী[১২৭] মতবাদের বিপরীতমুখির মধ্যে সংলাপ ও প্রশান্তিকর সাম্য প্রতিষ্ঠার একটি চলমান কার্যক্রম। প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সকল চুক্তি ও নথিপত্র সংলাপকালীন আচরণ বিধি হিসেবে গৃহীত হবে এবং এ সংলাপে সকল পক্ষ ও রাষ্ট্র সমান সুযোগ লাভ করবে। এ বিষয়টি প্রতিটি পক্ষই আবশ্যক হিসেবে মেনে নেবে। তীব্র সংঘাতের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে যথাসম্ভব রাষ্ট্রগুলোকে মুক্ত করে একটি সমন্বয়মূলক কার্যক্রমের নামই আন্তর্জাতিক মানবিক আইন। সশস্ত্র সংঘাতকে সীমাবদ্ধকরণ-ই হচ্ছে এ কার্যক্রমের মানবিকতার অন্তর্নিহিত রূপ। প্রত্যেকটি দেশের এ অধিকার রয়েছে যে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মানদণ্ডের চূড়ান্ত উৎস হিসেবে বিভিন্ন বিষয়কে সে গ্রহণ করতে পারবে। তবে সে বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হতে হবে। সুতরাং এ মানবিক অংশগ্রহণের লক্ষ্যে কোনো রাষ্ট্রের জন্য যে কোনো অস্বাভাবিক বিষয়ই মূল উদ্দীপক হতে পারে, তা অন্য রাষ্ট্রের জন্যও পরোক্ষ উদ্দীপক হতে পারে।[১২৮] তাই এ আইন মেনে নেয়া ও প্রয়োগের কারণ প্রধানতঃ প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। এ অর্থে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বাস্তবায়নের প্রকৃতি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের মূল্যবোধ ও আদর্শেরই প্রতিচ্ছবি। অর্থাৎ এটি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়নযোগ্য।[১২৯]

*প্রাচ্যবাদিতা* ও *মানদণ্ড গত বিবেক* সমস্যা দু'টি এড়িয়ে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে সংলাপ কার্যক্রম হিসেবে আমরা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনকে কতটুকু বুঝতে সক্ষম হয়েছি তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে - রোমের মৌলিকবিধান ও প্রতীক নির্বাচন। কারণ, এ দু'টি বিষয়ই (রোম মৌলিক বিধান ও প্রতীক) সংলাপকালে মতানৈক্যকে সম্মান দেখিয়ে একটি সমঝোতা। উক্ত দু'টি ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের কার্যক্রমে মুসলিম পক্ষগুলোর কোনো ক্ষতি না করে ইসলামী আদর্শ সংরক্ষণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। স্বীকৃত মতানৈক্য বজায় রেখেই সভ্যতাসমূহের মধ্যে সংলাপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি একক সমধানের পথে অগ্রসর হওয়ার ফল-ই হলো উপরিউক্ত দু'টি বিষয়।[১৩০]

127 Compare International Law Association, Report of the Sixty-Fifth Conference (1992), El-Fania, Cairo, 1993, p. 4; see also Strawson, op. cit. (note 60).

128 *Compare Mahmassani*, op. cit. (note 2), p. 233.

129 On multivalence in the reconciliation of legal traditions, see Glenn, op. cit. (note 4), pp. 324-327.

130 Guy de Lacharrire, "*Le point de vue juriste: Ia production et L'application du droit international dans une monde multiculturel*", in R.J. Dupuy (ed.), L'avenir du droit international dans un monde multiculturel, Colloque, La Haye, 17-19 November 1983, Martinus Nijhoff, The Hague, 1984, p. 67.

কখনো কখনো এ পদ্ধতি ইসলামী ‘আকীদার মতানৈক্য সংক্রান্ত বিধান *মতানৈক্য রহমত স্বরূপ*[১৩১] এ বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। তেমিন বক্তব্য রয়েছে যে, ‘ইসলামী শরী‘আত আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে বিশ্বজনীনতা নিশ্চিত করার মৌলিক কারণ হতে পারে, আর তা হওয়াই উচিৎ।’[১৩২]

বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়ের কারণে এ আইন কতটুকু বিশ্বজনীনতা লাভ করলো, তা কী সমান সমান না কী বেশি, তা খুব জরুরী বিষয় নয়; বরং নিশ্চিত হতে হবে যে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বিভিন্ন মতানৈক্যের সাথে নিজেকে খাপ-খাওয়াতে সক্ষম।[১৩৩] একই সময়ে আমাদের পারস্পরিক মানবতাকে রক্ষার সাথে সাথে মতানৈক্যের সংরক্ষণের মাঝেই এ আইনের শক্তি নিহিত।[১৩৪] অর্থাৎ এ আইন-ই সভ্যতাসমূহের পারস্পরিক সংঘাতকে পারস্পরিক সংলাপে রূপান্তরিত করার একটি উপায়।

## সারসংক্ষেপ

বিশ্বের চারিদিকে শুধু সভ্যতাসমূহের মাঝে সংঘাত-সংঘর্ষ পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের পর্যালোচনা থেকে প্রতিভাত হয় যে, এ দু’টি বিধান তীব্র প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বের মাঝে অবস্থান করছে। ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের প্রত্যেকটির বিধানাবলীকে নিজস্ব পরিসরে প্রতিষ্ঠিত ও সুবিন্যস্ত ধরে পরিচালিত সকল তুলনামূলক গবেষণাই প্রাচ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু যদি আমরা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের উৎকর্ষ সাধনে মুসলিম নেতৃবৃন্দের ভূমিকা আলোচনা করি, তাহলে এতদোভয়ের বিধানাবলীর পারস্পরিক আদান-প্রদানের এক ভিন্ন চিত্র আমাদের সামনে ফুটে উঠবে। আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের ধারাসমূহ ‘তার সাথে’-এর বিপরীতে ‘অন্যান্য’ (ইসলামী) শব্দটি প্রয়োগের কারণে প্রথমদিকে সভ্যতার উন্নয়নে ইসলামের ভূমিকা ছিল ক্ষীণ। অতঃপর তা জাতীয়তাবাদী শক্তি, পরিশেষে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সাথে প্রতিযোগী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে ইসলামের ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এটি কার্যতঃ ‘*সভ্যতাসমূহের মধ্যে সংলাপ*’ মাত্র।

---

131 Glenn, op. cit. (note 4), p. 325; see also Bedjaoui, op. cit. (note 2), p. 284.

132 EI-Dakkak, op. cit. (note 2), p. 125.

133 Compare S. Sucharitkul, “*L’Humanitd en tant qu’dlement contribuant au développement progressif du droit international contemporain*”, in Dupuy (ed.), op. cit. (note 17), p. 415; R. J. Dupuy, “Conclusions du colloque”, in Dupuy (ed.), op. cit. (note 128), p. 447, pp. 456-467.

134 See Glenn, op. cit. (note 4) p. 338.

# ইসলামে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন*

ড. জা'ফর 'আব্দুস সালাম**

আমরা নিবন্ধে (ভূমিকায়) নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করব: 'আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের' পারিভাষিক অর্থ ও পরিধি বিশ্লেষণ ইসলামী শরী'আত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিষয়ে আলোচনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা অতীত ও বর্তমানের সাথে সংশ্লিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা প্রসঙ্গ ইসলামী আইনে ব্যক্তির মর্যাদা ও ইসলামীজীবন গঠনে এর ভূমিকা।

আমরা বিষয়গুলো নিম্নোক্ত দু'টি অধ্যায়ে আলোচনা করব:

১. ইসলামে যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২. যুদ্ধের উপকরণ ও কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ।

## প্রথমত: আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের পারিভাষিক অর্থ ও পরিধি বিশ্লেষণ

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন একটি নবোদ্ভূত পরিভাষা। আন্তর্জান্তিক আইন বুঝানোর ক্ষেত্রে পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর বয়স মাত্র কয়েক বছর। ১৯৭১ সালে জেনেভায় বিভিন্ন দেশের সরকারী রাষ্ট্রপ্রধান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এক কনফারেন্সে রেডক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত একটি সনদে সর্বপ্রথম এ পরিভাষার ব্যবহার দেখা যায়।

---

* *আল-কানূনদ্-দাওলী আল-ইনসানী: দলীলুন লিত্-তাতবীক 'আলাস সা'ঈদিল ওতানী*, মানসূরাতুল লাজনাহ্ আদ্-দাওলিয়্যাহ্ লিস্-সালীবিল আহ্মার, দারুল মুস্তাকবিল আল-'আরাবী, কায়রো, ২০০৩ খ্রি., পৃ. ৪৯-৮১।

** ড. জা'ফর 'আব্দুস সালাম মিশরীয় একজন ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ইসলামী আইন বিভাগের একজন খ্যাতনামা প্রফেসর। তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরও ছিলেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে যুক্ত হয়ে ইসলামের আধুনিক বিষয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি *রাবেতা আলাম-আল-ইসলামীর* একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। তিনি অসংখ্য আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান করে সমসাময়িক ইস্যুগুলো সম্পর্কে ইসলামের সুমহান আদর্শ তুলে ধরেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক ইসলামিক মানবিক আইন বিশেষজ্ঞ। এ বিষয়ে তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ ও গবেষণামূলক গ্রন্থ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, *আল-ওয়াজীয ফীল কানূন আদ-দাওলী আল-'আম, কাদিয়াতু ফিলিস্তীন আমামাল কানূন আদ-দাওলী*। Cf. www.noqata.info.

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন এমন কতিপয় নিয়ম কানুনের সমন্বিতরূপ যা প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হলো, বিশ্বের মাঝে চলমান সশস্ত্র সংঘাতে শক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণারোপ। এর কারণ হলো নিম্নরূপ:

১. যুদ্ধের প্রয়োজনের বাইরে যেন বিজিত দল বা দেশ প্রতিপক্ষ বাহিনীর উপর সীমালঙ্ঘন করতে না পারে।

২. যারা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি তাদের জান-মালের নিরাপত্তা দান।

রেড ক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটির পক্ষ থেকে এ নতুন পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়, যাতে এর মাধ্যমে সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য প্রণীত আইন কানুনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের মধ্য হতে নিছক মানবিক মর্যাদার দিকটি অধিক প্রাধান্য পায়। এ আইনের মূল লক্ষ্য হলো মানবসত্তার মান ও তার সম্পদের সংরক্ষণ নিশ্চিত করা। আর এটি কেবল জেনেভা চুক্তির সঙ্গে বিশেষিত নয়; বরং সকল প্রকার যুদ্ধনীতি ও চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট, যা যুদ্ধের অবাধ কার্যক্রম বন্ধ ও অস্ত্রের ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণারোপ করে এবং মানবসত্তার অধিকার নিশ্চিত করে।

ইসলামী ফিক্হে পরিভাষাটির ব্যবহার এভাবে না পাওয়া গেলেও এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়। সুতরাং একথা বলা যায় যে, বর্তমানে পরিভাষাটি সর্বসম্মত একটি পরিভাষা। এতে কোনো মতপার্থক্য নেই।[১] ইসলামী শরী'আতের ফকীহ্গণের পরিভাষাটি যেমন তারা ব্যবহার করেননি

---

[১] পরিভাষাটি ব্যবহার সম্পর্কে দেখুন: সাদিক আবূ হাইফ, *আল-কানূনুদ্-দাওলী আল-'আম*, ১৯৭৫, পৃ. ২৮৪; সালাহ্ 'আমের, *কানূনুত্-তানযীম আদ্-দাওলী*, ১৯৮১ খ্রি., পৃ. ৩৬।

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বিষয়ে মিসর ও রেডক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটির উদ্যোগে কায়রোতে সর্বপ্রথম একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনারে পরিভাষাটির সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়। এখানে আমরা এ পরিভাষাটির পরিচিতির জন্য কয়েকটি গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। যেমন, *মুকাদ্দামাতুন লিত্-তা'রীফ বিল-কানূনুদ্-দাওলী আল-ইসলামী*, পৃ. ১৬; মুহাম্মদ তালা'আত আল-গুনায়মী, *নাযরাতুন্ 'আম্মা আলা-কানূনীদ-দাওলী আল-ইনসানী আল-ইসলামী*, পৃ. ১৭; এ সমস্ত নিবন্ধে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন এবং মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইনের দু'টি পরিভাষার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট করা হয়েছে। প্রথমটি যুদ্ধ এবং সশস্ত্র সংঘর্ষের সময় মানবাধিকারকে সুরক্ষা দেয়। আর দ্বিতীয়টি নিরাপদ সময়ে মানবাধিকারকে সংরক্ষণ করে।

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : সাইয়েদ হাশিম, আল-কানূন আল-ইনসানী ওয়াল কুয়াত আল-মুসাল্লাহা পৃ. ৫৭; ইয়াহ্ইয়া শায়মী, *আস্-সালাহ্ ওয়া আসালীবুল কিতাল ফীল কানূন আদ্-দাওলী*, পৃ. ১০৭; ইংরেজী ভাষায় রচিত, *Mveuthey, Introduction to International Humanitarian law,* p. 12. এ সমস্ত নিবন্ধে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে আমরা এর উপরই নির্ভর করেছি। প্রকৃতপক্ষে, যে সমস্ত বিধি-বিধানের উপর এ নতূন পরিভাষা প্রযুক্ত হয়েছে তা বেশিরভাগই যুদ্ধ সংক্রান্ত আইনে বর্তমান। সুতরাং এ দিক থেকে এ পরিভাষাটি ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো, মানবিক মূলনীতির উপর জোর দেয়া। অপর দিকে যুদ্ধকালীন অথবা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সময় শুধু মানবিক আচরণ সীমিতকরণ নয়; বরং সকল ধরনের সংঘাত ও সংঘর্ষে চাই তা রাষ্ট্রীয় হোক বা না হোক এ মানবিক মূলনীতির অনুসরণ অনস্বীকার্য। যুদ্ধ আইন ও এর মূলনীতির বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে দেখুন: *আল-'আলাকাতুদ্-দাওলিয়্যাহ্ ফীল কানূনিদ্-দাওলী ওয়া ফীশ্-শারী'আহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ্*, মাকতাবাতুস্-সালাম আল-'আলামিয়্যাহ্, ১৯৮১ খ্রি., পৃ. ৭২০ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

তেমনি তারা 'আন্তর্জাতিক সাধারণ আইন' পরিভাষাটিও ব্যবহার করেননি। তবে এতদ্‌সম্পর্কিত বড় বড় সমস্যা ও সমাধান মৌলিক ফিক্‌হ গ্রন্থে ও ইসলামী জ্ঞান ভান্ডারে '*জিহাদ*'[২] অথবা '*সিয়ার*'[৩] শিরোনামের অধীনে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি পরিভাষাটি ব্যবহারে পুরাতন ফিক্‌হী আইনের সাথে এর কোনো অমিলও পাওয়া যায় না। কারণ ফিক্‌হের গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান '*সিয়ার*' ও '*জিহাদ*' সম্পর্কিত অধ্যায়গুলো মুসলিম ও অন্যদের মাঝে সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও তার কর্মপদ্ধতি নিয়েই আলোচনা করে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকে কখনোই বৈধতা প্রদান করে না। এর অর্থ এ নয় যে, ইসলামী জিহাদের তাৎপর্য ও আধুনিক যুদ্ধনীতির ধারণা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অভিন্ন তবে উপকরণ ও পদ্ধতির বিষয়ে কথা বলতে গেলে এ নতুন পরিভাষা ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই।

## দ্বিতীয়ত: ইসলামী শরী'আতের আলোকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার গুরুত্ব

আমরা কী এ অংশে পূর্ব যুগে মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও তাতে ব্যবহৃত উপায়-উপকরণ এবং কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব, না কী বিভিন্ন রাষ্ট্র বা দলের মধ্যে যুদ্ধ চলাকালে পারস্পরিক সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখার জন্য মানব রচিত নিয়ম কানূন নিয়ে আলোচনা করব? নিঃসন্দেহে উভয় প্রশ্নের উত্তরই হবে নেতিবাচক। আমরা কেবল ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করব না। কারণ, এ জাতীয় আলোচনার মাধ্যমে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য সাধন সম্ভব হয় না। ইসলামী শরী'আতের বিধি-বিধান ও মূলনীতি কেবলই গত হয়ে যাওয়া এমন বিষয় নয় যার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে, কার্যকারিতা শেষ হয়ে গেছে; বরং এটি এমন শরী'আত ও বিশ্বাস যা বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মাঝে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখে। এছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক সুসংহত করার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অদ্যাবধি বহাল রয়েছে।

---

২ জিহাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো শ্রম ও শক্তি ব্যয় করা। আর পরিভাষায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় জানমাল ও বক্তব্যদানের মাধ্যমে সশস্ত্র সংগ্রামে প্রাণান্তকর শক্তি প্রয়োগ করাকে জিহাদ বলে। দ্রষ্টব্য: *আল-বাদা'ঈ ওয়াস সানা'ঈ*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯৮।

৩ সিয়ার শব্দটি سيرة শব্দের বহুবচন। এর অর্থ পথ বা রাস্তা। আর এদ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন-চরিত থেকে সংগৃহীত জিহাদের পদ্ধতি বুঝানো উদ্দেশ্য। দ্রষ্টব্য: শামসুদ্দীন আর-রামলী, *নিহায়াতুল মুহ্‌তাজ ইলা শারহিল মিনহাজ*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪১; এখানে একটি মাস'আলার উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইসলামী শরী'আত মুরতাদ এবং ইমাম বা রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য থেকে বর্হিগমনকারী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মলূনীতি প্রণয়ন করেছে যা আন্তর্জাতিক যুদ্ধে যোদ্ধাদেরকেও সুরক্ষাদানে বেশ সহায়ক।

অন্যদিকে এ কথাও বলা যাবে না যে, ইসলামী শরী'আত এমন মানব রচিত একটি রাষ্ট্রীয় সংবিধান যা কেবল দেশের মাঝে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার কাজ করে; বরং এটি এমন একটি সমাজ ব্যবস্থার নাম যা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ইসলাম, খ্রিস্টীয়, ইয়াহুদী, বৌদ্ধ ও অন্যান্য সব ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সবাইকে এক পতাকা তলে আশ্রয়-ছায়া দেয়ার জন্য কাজ করে। সম্ভবত: এটি অতিরঞ্জন হবে যদি বলি, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইসলামের ভূমিকা বিশেষতঃ শেষ আশ্রয় হিসেবে উসমানী খিলাফতের (যে সময়ে ইসলাম একটি রাষ্ট্রীয় রূপ লাভ করে) পতনের পর এর পরিধি অতীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় রাখার লক্ষ্যে এর সক্রিয়তা কমে গিয়েছিল। আমি যখন থেকেই আন্তর্জাতিক ইসলামী মানবাধিকার আইন নিয়ে লেখালেখি শুরু করি তখন থেকেই একটি প্রশ্ন আমার ভিতরে বারবার উঁকি দিত, তা হলো বর্তমান সময়ে এ জাতীয় আলোচনার গুরুত্ব এবং এর প্রায়োগিক মূল্যায়ন কতটুকু? বিভিন্ন আঙ্গিকে এর গুরুত্ব নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক. পৃথিবীতে বহু রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণের প্রধান উৎস হচ্ছে ইসলামী শরী'আত। এমন রাষ্ট্রের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ। নিকট অতীত পর্যন্ত এ রাষ্ট্রসমূহ ইসলামী শরী'আহ্ প্রণীত নীতিমালার আলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। মূলতঃ এ কারণে বিশ্ব দরবার ইসলামী শরী'আতকে বিশ্বের সকল রাষ্ট্র পরিচালনার চাবিকাঠি হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এর সত্যতা প্রমাণিত হয় এভাবে যে, আন্তর্জাতিক আদালত তার বিচারিক নিয়মনীতি প্রণয়নে ও বিচারে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী শরী'আতের আশ্রয় নিয়েছে। তাদের প্রকাশিত এক পত্রের ২৯ নং ধারায় এ কথার উল্লেখ রয়েছে। সেখানে আরো বলা হয়েছে, *এ আদালত বিশ্বের সকল সভ্যতা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করবে*।

অন্যদিকে এ অর্থেই ইসলামী শরী'আহ বিশ্বের মৌলিক সকল নিয়মনীতির সঙ্গে সম্মিলিতভাবে তৃতীয় উৎস হিসেবে পরিগণিত হবে যা আন্তর্জাতিক আদালতের ৩৮ নং ধারায় স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। ধারায় স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে, আদালতের নিকট উপস্থাপিত বিভিন্ন মামলার ফায়সালা আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি অনুযায়ী করা এ আদালতের দায়িত্ব।

বিভিন্ন সভ্য জাতি কর্তৃক প্রণীত সাধারণ নিয়মনীতি। আর এ কারণে আন্তর্জাতিক এ আদালতে সব সময় ইসলামী শরী'আহ্র পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একজন প্রতিনিধি থাকেন।

খ. নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে, ইসলামী এ সকল মূলনীতি প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইনের মূলনীতি তৈরির পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

আর এ আইন যুগ যুগ ধরে চলে আসা বিভিন্ন বিশ্বাস, দর্শন ও নৈমিত্তিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই উৎসারিত ও সৃষ্ট। ক্ষণে ক্ষণে এটির বাস্তবতা ধরা পড়ে। চিরস্থায়ী আইন কানুনের আদলে আন্তর্জাতিক আইনের এ ধারাসমূহ পারস্পরিক সম্পর্ককে মজবুত করার লক্ষ্যে প্রাকৃতিক নিয়মেই রচিত হয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামী শরী'আত-ই সমুন্নত এবং এটি-এর সাধারণ নীতিমালাসমূহের মূল উৎস। যদিও শরী'আত মহান আল্লাহ প্রদত্ত ওহীকে এ জাতীয় নীতিমালার উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেনি; বরং এর সঠিক বাস্তবায়নের জন্য ওহী প্রেরণ করে মানুষের সুস্থ বিবেক ও মস্তিষ্কের নিকট অর্পণ করেছে ।

এ অর্থে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নে ইসলামী শরী'আতের ভূমিকা অপরিসীম। একটা সময় এমন পার হয়েছে যেখানে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি প্রণয়নে অন্যান্য রাষ্ট্রের সংঙ্গে সহযোগী ভূমিকা পালন করেছে। এর অনেকগুলোই যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত, আবার কতক শান্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বর্তমান সময়ে চালু থাকা অনেক নিয়মনীতিই সে সময়কার যা আজ আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে সুসংহত করছে।

আমরা সুনির্দিষ্টভাবে এ শরী'আতের সাথে সম্পর্কিত এসব নীতিমালা ও মূল উৎসের দিকে দৃষ্টিপাত করব। এগুলো কতিপয় অবস্থার বর্ণনা যা অতীতে সম্বোধিত কিন্তু বর্তমানের সাথে সম্পর্কিত। আমরা অবশ্য ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কিত অবস্থা নিয়ে আলোচনা করব।

'*ফ্রেডরিক ডি মোলিয়ান*' রচিত সশস্ত্র বাহিনী ও যুদ্ধনীতি সম্পর্কিত এক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে[৪], যে সকল লোকেরা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেয় এবং দায়িত্ব পালনের স্বার্থে নিজের জান উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত থাকে তারা এ সকল নীতির ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ রাখে না। তাদের মতে এ সব নিয়মনীতি সুন্দর বটে কিন্তু এগুলো বাস্তবতার সাথে সম্পর্ক রাখেনা এমন শ্রেণির লোকের রচিত কিছু বাক্য মাত্র।

কোন কোন অবস্থায় এ সকল যোদ্ধা ও সৈন্যরা প্রাথমিক কিছু মানবাধিকার নীতির একটি ব্যাপারে আগ্রহী থাকে ও সে অনুযায়ী যুদ্ধকার্য সম্পাদনের ইচ্ছুক হলেও যখন তাদের মধ্যে প্রতিপক্ষের ভয়ংকর আচরণের বিষয়টি সন্দেহের সৃষ্টি করে তখনই তারা তাদের পূর্বজ্ঞাত নিয়মনীতি ভুলতে শুরু করে। সুতরাং সশস্ত্র সংঘর্ষ বিষয়ক নিয়মনীতির ক্ষেত্রে উত্তম শিক্ষার জন্য এমন পরিবেশ ও

---

[৪] ফেডরিক ডি মুলিনান, *কানূনুল হারব ওয়াল কুয়াত আল-মুসাল্লাহা*, হিনরী ডুনান সংস্থা, জেনেভা, ১৯৮৪ খ্রি., পৃ. ৫।

পরিস্থিতির উত্তরণ করা প্রয়োজন যাতে তা প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে অধিক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে এবং বাস্তব প্রয়োগে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ কথা সত্য যে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের প্রয়োগ অন্যান্য আইন প্রয়োগের চেয়ে কঠিন। আর এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের উচ্চারিত নীতি বাক্যের দৌড় কতদূর তা সকলের জানা।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এ সকল নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান যতক্ষণ পর্যন্ত যোদ্ধাদের অন্তরে প্রবেশ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত এর সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। এগুলো যখন তাদের আকীদা ও বিশ্বাসের সঙ্গে মিলে যাবে তখন এর বাস্তব ফল আশা করা যাবে। কারণ, বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষার অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হলো, এটি বিশ্বাসীর অস্তিত্ব ও তার দেহ গঠনের সাথে এমনভাবে যুক্ত হয়ে যায় যে, এটি তার স্বাভাবিক অভ্যাস ও কাজে পরিণত হয়। ইসলামী সেনাবাহিনীর গুণাবলী শুনলে হয়তো আপনি আশ্চর্য হবেন যে, একজন মুসলিম যোদ্ধা অস্ত্র ধারণের পূর্বে তার ঈমান ও বিশ্বাসকে যাচাই করে নেয় এবং হাতে তুলে নেয় আল-কুরআন। ফলে তার ব্যবহৃত অস্ত্রটিও উত্তম আচরণে অভ্যস্ত হয়ে যায়। যখন শত্রুর দিকে ধাবিত হয় তখন সে যুদ্ধ নিয়ম মেনেই ধাবিত হয়। যখন তার তরবারি কোষমুক্ত হয় তাও অপ্রয়োজনে নয়। অনুরূপ একজন মুসলিম নিজেকে ইসলামী শিক্ষায় লালন করায় ইসলাম তাকে বানিয়ে দেয় পরিপূর্ণ মুসলিম, সে মহান প্রভুর ইচ্ছার সামনে নিজেকে সর্বদা মস্তক অবনত, তার আদেশ ও নিষেধ পালনে থাকে সদা সচেষ্ট। আমরা কনফারেন্স ও সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে প্রস্তাব দেব যাতে তাঁরা তাদের মূল শিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষাকেও যুক্ত করেন!

ইসলামে যুদ্ধ-জিহাদ রয়েছে এবং তা মহান আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ম অনুসারেই পরিচালিত হয়। মহান এক লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ইসলামে যুদ্ধ প্রবর্তিত হয়েছে। সে উদ্দেশ্য হলো ন্যায় ও সুমহান। যোদ্ধা বা মুজাহিদগণ এ ইনসাফ ও ভারসাম্যপূর্ণ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই লড়াই করেন। ইসলামে বিজয় মানেই ইসলামের মান অক্ষুণ্ন রাখা ও এর মর্যাদাকে সমুন্নত করা। যার মাধ্যমে মানবতা ও মানব সভ্যতা ফিরে পাবে তার আসল রূপ। সুতরাং মানবিকতার পূর্ণতাই রয়েছে ইসলামী জিহাদের প্রাণ ও চেতনা।

বলা হয়, যুদ্ধের দাবানল যোদ্ধাদেরকে উত্ত্যক্ত করে ও তাদের স্বাভাবিক চিন্তার পথ রুদ্ধ করে দেয়। ল্যাটিন প্রবাদ আছে, (Inter arma silent leges) অর্থাৎ অস্ত্রের মাঝে নীতিমালা চুপসে যায়। কারণ, অস্ত্রের ঝনঝনানি ও কামানের

বিকট আওয়াজ নীতি বাক্য শোনা থেকে শ্রবণ শক্তিকে বিকল করে রাখে; বরং মঙ্গল ও কল্যাণ সাধন সর্বদা নীতিগত আদর্শের উপর প্রাধান্য লাভ করে। আর এ কারণেই ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মের সাথে যোদ্ধাদের সম্পৃক্ততাকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্যতম ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সবশেষে আমি আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি, যারা মনে করে যে, নিম্নোক্ত দু'টি প্রধান সমস্যার সমাধানে ইসলামী শরী'আত অনেক এগিয়ে। মানব রচিত আইন আজ অবধি ইসলামী শরী'আতের ধারে কাছে পৌঁছতে পারে নি।

**প্রথম:** প্রতিটি ব্যক্তিকে আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে একজন আইনসত্তা হিসেবে গণনা করা।

**দ্বিতীয়:** আন্তর্জাতিক আইনের জন্য নৈতিক মূল্যবোধের মূলনীতি তৈরি করা।[৫]

উপরিউক্ত দু'টি বিষয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য আমরা প্রাচীন কিছু বিধি-বিধান দেখতে পাই, আধুনিক নিয়ম-নীতি প্রণয়নে আমরা সে দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব এবং আইনকে অধিক ফলপ্রসু ও কার্যকর করার লক্ষ্যে পূর্বোক্ত নীতিমালাসমূহের সহায়তা গ্রহণ করব।

গ. আমরা মূল আলোচনা শুরুর পূর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যার মাধ্যমে মূলতঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ খণ্ডনের প্রয়াস পাব। আর তা হলো, বর্তমানে যুদ্ধ পদ্ধতির ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে এবং ক্রমবর্ধমান উন্নতির ধারায় আজ এমন সব অস্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে যা পূর্বে কল্পনাও করা ছিল অসম্ভব। তবে পদ্ধতিগত এ পরিবর্তন ও অস্ত্রের আধুনিকতা যুদ্ধের মানবিকতার ব্যাপারে শর'ঈ নিয়ম-নীতির ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলবে না। যারা ইসলামী শরী'আহ্ প্রণীত নিয়ম-নীতির উপর অভিযোগ আরোপ করে তাদের কাছে দাবি হলো তারা যেন ইসলামী শরীআহ্র যুদ্ধের নীতিমালা ও মানবিকতার নীতির উপর ভিত্তি করে গৃহীত পদক্ষেপের উপর গবেষণা চালান। কারণ, সামষ্টিক নীতিমালা এখনো বিদ্যমান এবং যে সকল কারণ সামনে রেখে শর'ঈ বিধি-বধান প্রণয়ন করা হয় তা অপরিবর্তনীয়ই রয়ে গেছে। মুসলিমরা অনেক যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তাদের যুদ্ধের ইতিহাস দীর্ঘ। তারা বহু অস্ত্র ব্যবহার করেছে, বহু কৌশল

[৫] *ফ্রিডম্যান, তাতাউরুল কানূনিদ্-দাওলী*, অনূদিত. দারুল আফাক আল-জাদীদাহ্, বৈরূত, পৃ. ১৯৫। দ্রষ্টব্য: আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ: *আল-ওয়াসীত ফিল-কানূনিদ্-দাওলী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২।

> অবলম্বন করেছে। কিন্তু কুরআন মাজীদ ও হাদীসে উল্লিখিত সামষ্টিক নীতিমালা প্রত্যেকটি যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গবেষকদের দায়িত্ব হলো, নতুন সমস্যার সমাধানে এ সকল নীতিমালা প্রয়োগ করা ও সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা।

আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়কে দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করব। প্রথম ভাগে ইসলামী শরী'আতে যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় ভাগে যুদ্ধসমূহে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও রণ-কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করব।

## তৃতীয়ঃ ইসলামে ব্যক্তির মর্যাদা বা অবস্থান

যখনই আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সঙ্গে ইসলামী শরী'আতের তুলনামূলক অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হবে তখনই অনুসন্ধানকারী হতভম্ভ হয়ে দেখবে যে, বিশেষতঃ এ বিষয়ে ইসলামী শরী'আতে কী ধরনের বিশ্লেষণ রয়েছে। আর এ বিষয়টি কেবল শরী'আতে মূল দু'টি উৎস আল-কুরআন এবং সুন্নাহের সাথে বিশেষিতঃ নয়; বরং মুজতাহিদদের গবেষণালব্ধ ফিক্হী সিদ্ধান্ত ও প্রণীত বিধি-বিধান আমাদেরকে দেয় অতিরিক্ত চিন্তা ভাবনার উপাদান। ফলে এর দ্বারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে মানুষের সম্মান ও মর্যাদা অতি মাত্রায় নিশ্চয়তা পেয়ে থাকে।

বাস্তবে আমরা অতিরঞ্জন করব না যদি বলি, ইসলামী শরী'আতের আলোকে-ই একজন মানুষ সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা পেতে পারে। কেননা মানব সৃষ্টির সূচনা হয় একে কেন্দ্র করে। কুরআনুল কারীম কীভাবে বিষয়টি স্পষ্ট করেছে, আল্লাহ তায়ালা তার অতি নিকটবর্তী ও অনুগত সৃষ্টিকে (ফেরেশতা) চ্যালেঞ্জ করেছেন, মানুষের সৃষ্টি ও ফেরেশতাদের উপরে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝানোর জন্য। সূরাহ্ বাকারার এ অংশে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾

'আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই, তখন ফেরেশতারা বলল, আপনি কি

পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা প্রতিনিয়ত আপনার গুণকীর্তন করছি এবং আপনার পবিত্র সত্ত্বাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি যা জানি, তোমরা তা জান না। আর আল্লাহ তা'আলা শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম। তারপর তিনি সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন এবং বললেন, আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা বলল, আপনি পবিত্র। আমরা কোনো কিছুই জানি না, তবে আপনি যা আমাদেরকে শিখিয়েছেন (সেগুলো ব্যতীত)। নিশ্চয় আপনি প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, প্রজ্ঞাময়। তিনি বললেন, হে আদম! ফেরেশতাদেরকে এ সবের নাম বলে দাও। তারপর যখন সে এসবের নাম বলে দিল, তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত আছি এবং সে সব বিষয়ও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর আর যা তোমরা গোপন কর!'[৬]

উল্লিখিত আয়াতগুলোর প্রসঙ্গ হলো সমস্ত সৃষ্টিজীবের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾

'আর যখন আমি আদম (আ)-কে সাজদাহ্ করার জন্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইবলীস ব্যতীত সবাই সাজদাহ্ করলো।'[৭] এ সাজদাহ্র ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ লিখেন যে, এর দ্বারা তাকে সম্মান করা ও অভিবাদন জানানোই উদ্দেশ্য।

সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত হতেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্মান দান করেছেন 'ইলমের মাধ্যমে। মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ফেরেশতাদের মাধ্যমে মানুষকে মর্যাদা দেয়ায় মানুষের সম্মান সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে। আল-কুরআন আল্লাহ্ কর্তৃক মানুষকে মর্যাদাদান এবং সম্মান প্রদর্শনের বর্ণনা দিয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾

৬ সুরা আল-বাকারাহ্: ৩০-৩৩।

৭ সুরা আল-বাকারাহ্: ৩৪।

'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতর অবয়বে।'[৮] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

'নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।'[৯]

উল্লিখিত আয়াতসহ অপরাপর আয়াতে আল-কুরআন মহান আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে উচ্চাসনে স্থান দিয়েছে। আল-কুরআন মানবিক ও শ্রেষ্ঠত্বকে ধর্ম বা শরী'আতের বিবেচনায় শুধু মু'মিনদের সাথে সংযুক্ত করে নি; বরং তা আদম (আ) ও তার সকল সন্তানের সাথে সম্পৃক্ত করেছে।

নিশ্চয়ই মর্যাদাপূর্ণ এ আয়াতসমূহ এমন একটি সাধারণ সংবিধান বা গঠনতন্ত্রের মর্যাদা রাখে, যেখান থেকে মানুষের পারস্পরিক আচার-আচরণের শুদ্ধতা ও লেনদেনের স্বচ্ছতা বিষয়ক বিস্তারিত বিধি-বিধান গবেষণা করে বের করা সম্ভব।

## চতুর্থ: ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় ব্যক্তির অধিকার ও মর্যাদা

ইসলামী শরী'আতের প্রশংসার অন্যতম একটি দিক হলো, এখানে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় নিয়ম-নীতির মাঝে কোনো পার্থক্য স্বীকৃত নয়। কারণ ইসলামী সমাজে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সদস্যদের জন্য যে অধিকার মেনে নেয়া হয় ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক তৈরিতে সে অধিকারের প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখা হয়। পাশাপাশি ইসলামী শরী'আত শান্তিচুক্তিতে ব্যক্তির যে অধিকার সংরক্ষণ করে যুদ্ধের ময়দানেও তা সমভাবে প্রযোজ্য।[১০]

আমরা সশস্ত্র সংঘর্ষ ও এর সাথে সম্পর্কিত আইন নিয়ে আলোচনা করছি। সুতরাং আমাদের আলোচনার অনিবার্য দাবি হলো, আমরা সাধারণ মানুষের অধিকার বিষয়ক আইন নিয়ে আলোচনার পর ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় অধিকার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

৮ সূরাহ্ আত্-ত্বীন: ৪।

৯ সূরাহ্ আল-ইসরা: ৭০।

১০ H. Sultan. *La Conception Islamique du Droit International Humanitaire*, R. Egyptienne D.1 vol. 34, p. 12.

বলেছেন, 'নিঃসন্দেহে আমি তো আল্লাহ প্রদত্ত রহমত।' স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাও আল-কুরআন মাজীদে এ দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন":

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾

"আর আমি তো আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।"[১১]

যদি আমরা মানুষের জাতীয়তা, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, দেশ, সামাজিকতা ও বাহ্যিক সম্মানের অন্যান্য দিক থেকেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেই তবুও এখান থেকেই মানুষের সত্যিকার সম্মান ও মর্যাদা বুঝে আসে। এ সম্মান প্রাপ্তির পেছনে প্রধান কারণ হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা আদমকে নিজ হাতে সৃষ্টি করে তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন, তার ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁকে সাজদাহ্ করিয়েছেন। তার জন্য আকাশম লী ও যমীনের সকল সৃষ্টিকে তার নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন, পৃথিবী নামক এ গ্রহে তাকেই বানিয়েছেন প্রতিনিধি। আর যাতে এ সম্মান জীবনের বাস্তবতার সাথে মিলে যায় এবং জীবনের গতিপথকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দিয়েছেন কিছু অধিকার ও বাহ্যিক স্বাধীনতা, যা বর্তমান যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রণীত নিয়মনীতি থেকে মোটেও কম গুরুত্বপর্ণ নয়।

বাস্তবতা হলো ইসলাম পূর্ব যুগে মানব সত্তার কোনো অধিকার ছিল না, মূল্যহীন একটি অবজ্ঞার পাত্রের নাম ছিল মানুষ। আরব উপদ্বীপ, রোম, পারস্য এবং বিশ্বের সর্বত্র অবলীলায় মানুষ হত্যার শিকার হতো, কাউকে বা জ্বালিয়ে দেয়া হতো, আবার কখনো কখনো বহু প্রাণীর জীবননাশ হতো। অন্যান্য প্রাণীর যেটুকু ভক্তি করা হতো এর সামান্যও ছিল না মানুষ নামক এ সৃষ্টির জন্য। বিদ্রুপ করে বা কৌতুকাচ্ছলে বহু প্রাণকে সইতে হয়েছে আমৃত্যু কষ্ট। তাদের নিকট কোনো প্রকার দায়িত্ববোধ বা জবাবদিহীর বালাই ছিল না। নির্ভয়ে লোমহর্ষক হত্যাকা  সংঘটিত হতো।

ইসলামের আগমনের ফলে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে মানুষের সম্মানবোধ স্থির হয়। ইসলাম ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত প্রাণ হরণ নিষিদ্ধ করে। স্পষ্ট ভাষায় আল-কুরআন ঘোষণা দেয়:

﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

'এ কারণেই আমি বনী-ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করার কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা

[১১] সূরাহ্ আল-আম্বিয়া: ১০৭।

করে সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল এবং যে কারো জীবন রক্ষা করলো, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করল।'[১২]

এটিই হলো অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সম্মিলিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যার ভিত্তি হলো, ব্যক্তি এবং সমাজ এক ও অভিন্ন। হত্যা একটি জঘন্য পাপ, এর প্রভাব হত্যাকারী, নিহত ব্যক্তি অথবা তাদের পরিবারের নিকট সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং এটিকে গোটা সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সুতরাং এটি ইসলামের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সকল মানুষের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ। যে দিন আদম (আ)-এর পুত্র কাবিল তার ভ্রাতা হাবিলকে হত্যা করেছিল সে দিন থেকেই আল্লাহ তা'আলার এ বিধান ঘোষিত হয়ে আছে। উপরিউক্ত আয়াতগুলো আল-কুরআনে সূরাহ্ আল-মায়িদায় আদম (আ)-এর দু'পুত্রের ঘটনার পরেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষত: এ ব্যাপারে আল-কুরআনের আরো কতিপয় নির্দেশ রয়েছে, যা জীবনের সম্মান এবং এ সম্মানের প্রতি যারা বিতশ্রদ্ধ তাদের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তি ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

'আপনি বলুন, এসো, আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো, স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্রতার কারণে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দেই, নির্লজ্জতার কাছে যেওনা, তা প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য হোক, যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু ন্যায়ভাবে। তিনি তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ।'[১৩] মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴾

'আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে

১২ সূরাহ্ আল-মায়িদা: ৩২।

১৩ সূরাহ্ আল-আন'আম: ১৫১।

না। যারা এ কাজ করে তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে।'* মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾

'আমি এ মহাগ্রন্থে তাদের জন্য লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখমের বিনিময়ে যখম।'[১৪]

এভাবেই ইসলাম মানুষের জান মালের নিশ্চয়তা প্রদান এবং মানবসত্তার সংরক্ষণের মাধ্যমে মানুষের সামনে কল্যাণের পথ খুলে দিয়েছে। কারণ ইসলাম শান্তি চায় এবং এটিকে মানুষের ভাললাগার পাত্র হিসেবে উপস্থানপন করতে চায়। এ কারণে ইসলাম মানবতার সঠিক বিকাশ ও উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবার লক্ষ্যে উত্তম পথের দিশা দিয়েছে। যে ক্ষমা কিংবা অন্য কোনো উপায়ে অপরাধীকে জীবন্ত থাকার সুযোগ দিল নিঃসন্দেহে সে একটি সুন্দর ও উত্তম পথের আবিষ্কার করলো। ফলে, এ পথের অনুসারীদের প্রতিদান সওয়াব হিসেবে একটি অংশ বিচার দিবসের আগ পর্যন্ত সে পেতে থাকবে।

আমরা দেখতে পাই, ইসলাম ন্যায় সঙ্গত কারণ ছাড়া কোনো প্রাণ হরণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছে। অন্যদিকে যুদ্ধ মানেই রক্তের বন্যা বয়ে যাওয়া ও সহস্র প্রাণ ঝরে পড়া। কারণ, এটি তো সম্ভব না যে, মুসলিম কিংবা তাদের প্রতিপক্ষ এমন পোশাক পরিধান করে যুদ্ধে নামবে যাতে কারো কোনো আঘাত, যখম না হয় এবং হত্যার শিকার না হতে হয়। সুতরাং মুসলিমদের জন্য তখনই যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া বৈধ হবে যখন প্রতিপক্ষকে হত্যা করার সঙ্গত কারণ এবং আইনগত বৈধতা পাওয়া যাবে।

যুদ্ধে কাউকে হত্যা করা বৈধ হওয়ার প্রধান কারণ হলো, যুদ্ধ মহান আল্লাহর রাস্তায় এবং মহান আল্লাহর নির্দেশিত পথ অনুযায়ী হওয়া। সুতরাং ইসলামী শরী'আহ নির্দেশিত সীমার বাইরে যাওয়া কিংবা নিষিদ্ধ কোনো উপায় উপকরণ অথবা পদ্ধতি ব্যবহার করে যুদ্ধ করা বৈধ নয়। নিঃসন্দেহে ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করা বৈধ নয়। জিহাদের মাঠে হত্যা বৈধ হওয়ার শর'ঈ কারণ হলো, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, মানব জীবনের যথাযথ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা এবং মানুষের বিশ্বাসের প্রকৃত স্বাধীনতা প্রদান করা। এগুলো ইসলামী যুদ্ধের প্রধানতম লক্ষ্য।

---

[১৪] সূরাহ্ আল-মায়িদা: ৪৫।

* সুরা আলফুরকান ৬৮-৬৯

এ কারণসমূহ সুস্পষ্ট হওয়ার জন্য আমাদেরকে যুদ্ধের অনুমোদিত পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। যাতে আমরা ইসলামে যুদ্ধ বৈধ হওয়ার মৌলিক কারণগুলো সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারি। পাশাপাশি যে সকল পদ্ধতি এ মহান লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তা বিস্তারিতভাবে জানতে পারি।[১৫]

মানুষের প্রাপ্ত অধিকার ও সম্মান তাকে ফিরে দেয়ার জন্যই ইসলামে জিহাদ ও যুদ্ধের অবতারণা হয়েছে। সুতরাং বাহ্যিক ভাবে প্রশ্নবিদ্ধ এ কাজটি শরী'আহ সম্মত পদ্ধতিতেই সম্পাদন করা কর্তব্য।

আল-কুরআন সশস্ত্র যুদ্ধের বিষয়টি মানুষের অপছন্দনীয় বিষয় হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। তারা কামনা করতো তাদের স্বাভাবিক মৃত্যু অবধি যুদ্ধের দাবানল যেন জ্বলে না উঠে। কিন্তু আল-কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী মানুষের জিন্দেগী কোনো মহান লক্ষ্য ছাড়াই শেষ হয়ে যাবে তা সমীচীন নয়। মুসলিমদের কর্তব্য হলো, তাঁরা অন্যদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবে এবং তাদের উপর অর্পিত কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে তারা সচেষ্ট হবে। মানুষের জীবন অতি মূল্যবান হলেও কখনো কখনো অবমূল্যায়নের শিকার হয়, যখন কোনো কারণে সম্মান হারিয়ে ফেলে অথবা সংকীর্ণতার সম্মুখীন হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ মূল্যবান জীবন দিয়েছেন। সুতরাং যখন তিনি চাইবেন আমরা যাতে আমাদের জীবন তার পথে আইনসঙ্গতভাবে নিয়োজিত করি তখন আমাদের কৃপণতা করা উচিৎ নয়। কারণ, যে দায়িত্ব ও অধিকারকে সামনে রেখে নিজের প্রাণ উৎসর্গ বৈধ করা হয়েছে, তা কিন্তু মানুষের অমূল্য এ জীবনের সঠিক সংরক্ষণের জন্যই।

## প্রথম ভাগ: ইসলামে যুদ্ধের লক্ষ্যসমূহ

### ইসলামী শরী'আতে যুদ্ধের সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামী পরিভাষায় বৈধ যুদ্ধকে বলা হয় '*জিহাদ*'। পারিভাষিক অর্থে, নিজের জান, মাল ও ভাষার বা রসনার ব্যবহারে মহান আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং সামর্থ্যের সর্বোচ্চটুকু ব্যয় করার নাম '*জিহাদ*'।

---

১৫ ইসলামী শরী'আতে মানবাধিকার বিষয়ে আমরা অনেক উৎস থেকে সাহায্য নিয়েছি। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, এ শিরোনামে ফাতহী 'উসমানের রচনা, *মুহসিন কানদীলের নাযরিয়াতুল হারব ফীল কুরআন*, রোয আল-ইউসুফ প্রেস, ১৯৮১ খি; মুহাম্মাদ হুসাইন হায়কল, *আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়্যাহ্*, দারুল মা'আরিফ, মুহাম্মাদ সাদিক আফীফী, *আল-মুজতামা' আল-ইসলামী ওয়াল 'আলকাতুদ্-দাওলিয়্যাহ্*, মাকতাবাহ্ আল-খানিজী, ১৯৭৩ খ্রি.।

মহান আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করা, তার দ্বীনকে সুসংহত করা, মুসলিমদেরকে অমুসলিমদের আঘাত থেকে নিরাপদে রাখা, ইসলামের দাওয়াতের পথে বাধা-বিপত্তি দূরে সরানো এবং দাওয়াতের পথকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়িয়ে দেয়াসহ মহান আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে '*জিহাদ*'কে বিধিসম্মত করা হয়েছে।

কতক সাহাবীর বর্ণনামতে ইসলামে জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষকে দুনিয়ার সংকীর্ণতা হতে প্রশস্ততার দিকে এবং মানুষের দাসত্ব হতে মহান আল্লাহর দাসত্বের দিকে নিয়ে আসা। আর, ইসলাম প্রকৃত অর্থে একটি সমুন্নত দা'ওয়াত। এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে কল্যাণের দিকে পথ দেখানো এবং তাদেরকে পথভ্রষ্টতা ও সৃষ্ট সংকীর্ণতা হতে মুক্ত করা যাতে তারা গোটা বিশ্ব সম্পর্কে খবরদারি এবং সৃষ্টিকে অন্তর চক্ষু দিয়ে অবলোকন করতে পারে। ফলে আখিরাতে তাদের জন্য যে পরিণতি অপেক্ষা করছে সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার উদয় হবে।

সুতরাং বলা যায়, ইসলামের মহান লক্ষ্য জড়িত হয়ে আছে মানবতার উন্নতি ও মান-মর্যাদার সমন্বয়ের সঙ্গে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দা'ওয়াত সর্বব্যাপী করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনিভাবে যে কোনো নর-নারী এমন থাকবে না, যার নিকট এ আহ্বান পৌঁছেনি। এটি আসমান থেকে যমীনের দিকে প্রেরিত বাণী। আর আল্লাহ তা'আলা এর জন্য তার মহান রাসূলকে নির্বাচিত করেছেন। সুতরাং উত্তম পদ্ধতিতে দ্বীনের প্রতি আহ্বান এর সফলতার চাবিকাঠি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীকে দীর্ঘ ১৩ বছর উত্তমরূপে দা'ওয়াত দিয়েছেন এবং এ দা'ওয়াত দিতে গিয়ে তিনি ও তাঁর অনুসারীরা যে অবর্ণনীয় অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন ইতিহাসের পাতায় এর দৃষ্টান্ত পাওয়া দুষ্কর। এর ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অনুসারীদেরকে আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) হিজরতের নির্দেশ দেন। সবশেষে কুরাইশরা তার হত্যার ষড়যন্ত ও তার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ব্যাপারে একমত হলে স্বয়ং তিনি মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌঁছে সামাজিকভাবে মযবুত বন্ধনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠা করেন এমন একটি শাসনব্যবস্থা যার মাধ্যমে তিনি মদীনাস্থ সকল গোত্র ও সমাজকে এক সুতায় আবদ্ধ করেন। বিভিন্ন গোত্রের ঐকমত্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় একটি সংবিধানের, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের ব্যাপারে একটি বিশেষ অবস্থান বেছে নেন। কারণ, তিনি কুরাইশদের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য আক্রমণের ব্যাপারে অবগত ছিলেন। একথা জানা দরকার যে, কুরাইশরা কখনোই মেনে নেবে না যে, মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দা'ওয়াত ছড়িয়ে

পড়ুক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার পাশ ঘেষে যাওয়া সিরিয়া অভিমুখী রাস্তার ব্যাপারে খুব সতর্ক ছিলেন, যাতে কুরাইশরা যাত্রা পথে কোনো ধরনের বাধা সৃষ্টি কিংবা গোলযোগ সৃষ্টির সুযোগ না পায়। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত এটিই ছিল যে, দা'ওয়াতের পথকে কন্টক মুক্ত করতে হলে এদের বিরূদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতে হবে যাতে কোনো ধরনের বাধা বিপত্তি ছাড়াই ইসলামের সুমহান দা'ওয়াত মানুষের নিকট পৌছে দেয়া যায়।

হিজরী ১ম বর্ষে রচিত এ সংবিধান মক্কার মুশরিক ও মদীনায় অবস্থানকারী মুশরিকের মাঝে পার্থক্য করেছে। মক্কার মুশরিকরা হচ্ছে সরাসরি মুসলিমদের শত্রু। আর মদীনার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মদীনা সনদের দ্বারা চুক্তিবদ্ধ। যেমনিভাবে মুসলিমদের প্রতি তাদের জন্য কিছু কর্তব্য রয়েছে তেমনিভাবে তাদের জন্যও মুসলিমদের প্রতি কিছু অধিকার রয়েছে। এমনই একটি কর্তব্য হলো যে, 'তারা মক্কার কুরাইশদের কোনো সম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্ব নেবে না এবং মুসলিমদের থেকে তাদের সম্পদ বাচানোরও চেষ্টা করবে না।' বাক্যটি এ দিকে ইঙ্গিত করে যে, মদীনাবাসীদের জন্য শত্রুপক্ষের কোনো ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয়া কিংবা তাদের সম্পত্তির নিরাপত্তা দেয়ার সাংবিধানিক কোন সুযোগ ছিল না। এমন একটি সংবিধান গৃহীত হওয়া ও এর বাস্তবায়ন ছিল সময়ের উপযুক্ত দাবি। মূলতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে একটি রাজনৈতিক সমাজ, প্রকারান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের জন্য এ সনদ প্রদান করেন। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা দাঁড় করানো, যেখানে প্রতিটি সদস্য মদীনার উপর সম্ভাব্য আক্রমণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ডাকে সাড়া দিতে পারে এবং জীবন বাজি রেখে নিজের শহরকে রক্ষা করতে পারে। পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দা'ওয়াত অন্যত্র পৌঁছাতে পারে।

হিজরী দ্বিতীয় বছরে জিহাদ ফরয করা হয়। আল-কুরআনুল কারীম এ ফরয বিধানের সীমারেখা ও কারণসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾

'যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে, যাদের সাথে কাফিররা যুদ্ধ শুরু করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে

অবশ্যই সক্ষম যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এ অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে (খ্রিস্টানদের) নির্জন গির্জা, ইবাদত খানা, (ইয়াহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে মহান আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়।'[১৬]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

'তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোনো একটি বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্য তা অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।'[১৭]

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

'আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। *বস্তুতঃ ফিতনা (বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও সন্ত্রাস) সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে। তাহলে তাদেরকে হত্যা কর। এই হলো কাফিরদের শাস্তি। আর তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।'[১৮*]

---

[১৬] সূরাহ্ আল-হাজ্জ: ৩৯-৪০।

[১৭] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ২১৬।

* এটি তৎকালীন মুশরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কেননা তারা ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। তাদেরকে ইসলাম থেকে ফিরে আসতে বাধ্য করার জন্য নির্যাতন চালিয়ে ছিল। এমনকি তারা মুসলমানদেরকে তাদের জন্মভূমি থেকে বহিস্কার করেছিল। এ সমস্ত কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উপরোক্ত আয়াতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। দ্রষ্টব্য: *ফী যিলালিল কুরআন* (কায়রো: দারুশ শুরুক, ২০০৭ খ্রী: পৃ. ১৮৯।

[১৮] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯১।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾

'সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা, আল্লাহর নিকট বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফিতনা (সন্ত্রাস) সৃষ্টি করা নর-হত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ। বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তারা তোমাদেরকে দ্বীন থেকে সরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়।'[১৯]

আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে আরো বলেন,

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

'আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু দেশ ত্যাগ করেনি তাদের বন্ধুত্বে তোমাদের প্রয়োজন নেই যতক্ষণ না তারা দেশত্যাগ করে। অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় নয়। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সবই দেখেন।'[২০]

অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾

'আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যে পর্যন্ত না ফিতনার (সন্ত্রাস) অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারো প্রতি কোনো জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা জালিম (তাদের ব্যাপার ভিন্ন)।'[২১]

---

[১৯] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ২১৭।

[২০] সূরাহ্ আল-আনফাল: ৭২।

[২১] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯৩।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾

'আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সে দিকেই আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। পক্ষান্তরে তারা যদি তোমাকে প্রতারণা করতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও মু'মিনদের মাধ্যমে।'[২২]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

'আর যুদ্ধ কর আল্লাহর পথে তাদের সাথে, যারা যুদ্ধ করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।'[২৩]

এ সকল আয়াত ও অন্যান্য আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে মুসলিমদেরকে বিশেষ প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণ করা ও যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি শত্রুদের সঙ্গে আচরণ কেমন হওয়া প্রয়োজন সে বিষয়েও দিক নির্দেশনা দেয়। আমরা ইসলামী শরী'আতে যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্যকে তিনটি উদ্দেশ্যে উল্লেখ করতে পারি, তা হলো নিম্নরূপ:

## প্রথম উদ্দেশ্য: ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা

যে বাস্তবতার আলোকে ইসলামী দা'ওয়াতকে অন্যান্য দা'ওয়াত এবং পূর্ব নবীদের দা'ওয়াতী মিশন থেকে ভিন্ন করে দেখানো যায় তা হচ্ছে, এ দা'ওয়াতের অন্যতম একটি গুণ হলো বিশ্বায়ন। এটি প্রতিটি জাতি ও গোত্রকে এর অন্তর্ভুক্ত হতে আহ্বান জানায়। সুস্থ বিবেকের দাবি পূরণে এবং প্রতিটি হৃদয়ে ইসলামের এ আহ্বানের প্রতি সাড়া দেয়া কর্তব্য। আর এ লক্ষ্য পূরণার্থেই জিহাদকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

এর উদ্দেশ্য এ নয় যে, অমুসলিমদের জোরপূর্বক ইসলামে প্রবেশ করানো হবে; বরং তাদের সামনে ইসলামী শরী'আতের বিধানাবলী সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা

---

[২২] সূরাহ্ আল-আনফাল: ৬১-৬২।

[২৩] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯০।

হবে এবং ইসলামের এ আহ্বান গ্রহণ করা না করার ব্যাপারে তাদেরকে পূর্ণ বিশ্বাসগত স্বাধীনতা প্রদান করা হবে। আর এটি তখনই সম্ভব হবে যখন বিজীত এলাকার মাঝে এমন পরিবেশ তৈরি করা হবে সেখানে তারা তাদের পারিবারিক ঐতিহ্যগত প্রাপ্তধর্ম থেকে মুক্ত হয়ে মুক্ত মনে চিন্তা ভাবনা করতে পারবে।

এ জন্য মুসলিম বাহিনী যুদ্ধ বা অন্য কোনো কারণে যেখানেই সফর করতো, তাদের সাথে থাকতো একদল আল-কুরআন বিষয়ের পণ্ডিত ও দাওয়াত দানকারী স্বতন্ত্র বাহিনী। এ কারণেই সকল মুসলিম জিহাদ ফরয হওয়ার উপর একমত হয়েছে। এ ব্যাপারে আল-কুরআনের আয়াত:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

‘তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোনো একটি বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।’[২৪]

সুতরাং ইসলামে জিহাদের মূল উদ্দেশ্য হলো অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসীর প্রতি পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে ইসলামী ‘আকীদা ও বিশ্বাস তাদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে নিজেদের পছন্দসই ‘আকীদা ও বিশ্বাস নিজেরা বেছে নিতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾

‘আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যে পর্যন্ত না ফিতনার (সন্ত্রাস) অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারো প্রতি কোনো জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা জালিম (তাদের ব্যাপার ভিন্ন)।’[২৫]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

[২৪] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ২১৬।

[২৫] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯৩।

‘আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রিস্টানদের) গির্জা, এবাদত খানা, (ইয়াহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, সেগুলোতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, শক্তিধর।’[২৬]

ইসলাম ভাল কাজ করার শক্তি প্রদান করে, যাতে মন্দ কাজকে থামিয়ে রাখা যায়, মানুষের সঠিক বিশ্বাসকে সংরক্ষণ করা যায় এবং যে সকল স্থানে মহান আল্লাহর নামসমূহ স্মরণ করা হয় সেগুলোকে ধ্বংস হওয়া ও অন্যান্য বাধা-বিপত্তি থেকে দূরে রাখতে পারা যায়। আর এ সব কিছুই মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের অন্তর্ভুক্ত এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে ধরে রাখার শামিল।

ইসলামে যুদ্ধ বা *জিহাদ* ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ নয় যতক্ষণ পর্যন্ত এর সাথে ইসলামের ‘আকীদা বিশ্বাসকে রক্ষা কিংবা অন্যসব ধর্মের সংরক্ষণ অথবা বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে উচ্চ মাত্রায় ধরে রাখার মত কোনো কারণ না পাওয়া যায়। উপরন্তু জিহাদ মানেই অস্ত্র ধারণ নয়; বরং আল-কুরআনের ভাষায় উত্তম উপদেশ ও কৌশলে মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান করা ও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾

‘জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে আপন পালনকর্তার পথের প্রতি উত্তমরূপে আহ্বান করুন।’[২৭]

আল্লাহ্ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

‘আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের প্রতি কোমল হয়েছেন, পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগ ও কঠিন হৃদয়ের অধিকারী হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো।’[২৮]

[২৬] সূরাহ্ আল-হাজ্জ: ৪০।

[২৭] সূরাহ্ আন্-নাহল: ১২৫।

[২৮] সূরাহ্ আলে-‘ইমরান: ১৫৯।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾

'অতএব আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে জিহাদের মাধ্যমে কঠোর সংগ্রাম করুন।'[২৯]

জিহাদের নির্দেশনার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো আল-কুরআন এবং এটিই বড় জিহাদ। কোনো লোক সম্পূর্ণ আত্মতুষ্টিতে ইসলাম গ্রহণ করবে যা কুরআনী জ্ঞানের শিক্ষা। এটি অস্ত্রের বলে কিংবা জোর-জবরদস্তি করে কখনোই সম্ভব নয়।

শাফি'ঈ মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফিক্হী গ্রন্থ '*মুগনিল মুহতাজ*' এ এসেছে, '*জিহাদ* আবশ্যক হওয়ার অর্থ হলো একটা বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছা। কারণ জিহাদের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করা এবং সত্যের সাক্ষ্যকে সমুন্নত করা। কাউকে হত্যা করা এর মূল লক্ষ্য নয়। সুতরাং জিহাদ ছাড়াই যদি এর মূল লক্ষ্য সাধিত হয় তবে সেটিই জিহাদ হতে উত্তম বিবেচিত হবে।[৩০]

সুতরাং কাফিরদের হত্যা করা ইসলামের মূল লক্ষ্য হতে পারে না। প্রকৃত অর্থে ইসলাম শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য উপায়ে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব ততক্ষণ সেটিই কার্যকর থাকবে। যুদ্ধ ঘোষণা একেবারে শেষ চিকিৎসা, যার মাধ্যমে জটিল ও কঠিন সমস্যা সমাজ থেকে দূর করা হবে, যা ভিন্ন কোনো উপায়ে সম্ভব নয়।[৩১] এ বাস্তবতাই উচ্চারিত হয়েছে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বক্তব্যে,

لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا،

'তোমরা শত্রুর মোকাবেলা কামনা করো না এবং মহান আল্লাহর নিকট সুস্থতা ও শান্তি কামনা করতে থাকো। আর যখন শত্রুর মুখোমুখি হতে হয়, তখন তোমরা অটল ও অবিচল থেকো।*

আমরা যা উল্লেখ করলাম তা যারা ইসলামের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন, তাদের সকলের মত নয়। কারো কারো বক্তব্য হলো,[৩২] ইসলামে জিহাদকে ফরয করা হয়েছে ইসলামের আহ্বানকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার

---

[২৯] সূরাহ্ আল-ফুরকান: ৫২।

[৩০] *মুগনীল মুহ্তাজ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১০; মুহাম্মাদ সাদিক 'আফীফী, *আল-মুজতামা' আল-ইসলামী ওয়াল 'আলাকাত আদ্-দাওলিয়্যাহ্* (মিসর: মাকতাবা আল-খানিজী, তা. বি.), পৃ. ১৫০।

[৩১] ড. ওয়াবাহ্ আয্-যুহায়লী, আছারুল হারব ফী ফিক্হীল ইসলামী (বৈরূত: দারুল ফিক্র, ১৯৬৫ খ্রি.), পৃ. ৯০।

[৩২] আমরা সুস্পষ্টভাবে এ উদ্দেশ্যে মুসলিম ফকীহ্গণের বক্তব্যে পেয়ে থাকি। উদারহরণ স্বরূপ, কামাল ইবনুল হুমামের বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, "যুদ্ধের উদ্দেশ্য হলো বিশ্বকে বিপর্যয় ও সহিংসতা থেকে মুক্ত করা।" দ্রষ্টব্য: *আশ্-শারহুল রাদাভী*, পৃ. ৩০২।

* *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্ সিয়ার, হাদিস নং ২৮৬১

স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, ধর্মপালনে মুসলিমদের উপর আরোপিত বাধাকে দূরে করা, এবং ধর্ম প্রচারে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান ইত্যাদি কারণে। তাঁরা আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছে:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾

'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের* সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করে এবং জেনে রাখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।'[৩৩] তাঁরা বলেন, ইসলামের দা'ওয়াতকে ছড়িয়ে দেয়া এবং এর পথে সকল বাধা-বিপত্তি দূর করাই জিহাদের মূলকথা নয়; বরং জিহাদের ব্যাপকতা এর চাইতে বেশি। দা'ওয়াতের প্রথম স্তরে মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল আরো ব্যাপক। তারা মনে করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তারা নিকটবর্তী কাফিরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। অতঃপর যেখানেই কাফির পাবে সেখানেই তাদের বিরুদ্ধে লড়বে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে এমন আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে কাফিররা তাদের মাঝে রূঢ়তা ও কঠোরতা দেখতে পায় এবং এ অবস্থায় তাদের মধ্যে ভয়-ভীতির সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾

'তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক। আর তোমরা জেনে রাখো যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।'[৩৪]

অনুরূপ অপর আয়াতে বলা হয়েছে:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾

'হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন** এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। এটি কতই না নিকৃষ্ট স্থান।'[৩৫]

---

[৩৩] সূরাহ্ আত্-তাওবাহ: ১২৩।

[৩৪] সূরাহ্ আত্-তাওবাহ: ১২৩।

[৩৫] সূরাহ্ আত্-তাহরীম: ৯।

* ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে সমস্ত কাফির মুসলিম সমাজে মিশে মুসলিমদের ক্ষতি সাধন ও সন্ত্রাসীকর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। তাদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে উল্লেখিত আয়াতে এ নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে।

** উল্লেখিত আয়াতে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যদি তারা আক্রমণ করে। আর মুনাফিকদের সাথে জিহাদের অর্থ হলো যুক্তি-তর্ক, প্রমান উপস্থাপন এবং তারা যদি অপরাধে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের উপর শরীয়ত সম্মত হদ কায়েম করা ও একটি জিহাদ। দ্রষ্টব্য: *তাফসির আল-মুনীর*, ১৪শ খণ্ড পৃ: ৭০৭

আর কাফিরদের বিরুদ্ধে মু'মিনদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে[৩৬]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾

'তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।'[৩৭]

ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) এ অবস্থানকে স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন, 'ইসলামী দা'ওয়াতকে সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে যুদ্ধ-জিহাদ সর্বদাই চালু থাকবে। যাতে মহান আল্লাহর উচ্চ বাণী সর্বদা সমুন্নত থাকে।' নিঃসন্দেহে প্রত্যেক ব্যক্তি ও জাতির অবস্থান জানা ও তাদের ব্যাখ্যা অনুসারে মুসলিমরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে কিরূপ আচরণ করবে তার পরিধি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। তাদের সঙ্গে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে চুক্তিবদ্ধকরা পাবে ন্যায্য অধিকার। আর যাদের পক্ষ হতে বিশ্বাসঘাতকতার সম্ভাবনা থাকবে তাদের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলতে হবে।[৩৮]

এর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী কতিপয় লোকের বক্তব্য হলো, 'ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক হবে শান্তি-চুক্তি নির্ভর। কারণ ইসলামী দাওয়াতের মূল শিক্ষাই হলো উত্তম বাক্য বিনিময় ও কৌশলে এ দিকে আহ্বান করা যাতে তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়। তারা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করে থাকেন। যেমন মহান আল্লাহর বাণী,

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

'বল, 'তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।' তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে সে শুধু তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তবে তোমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।'[৩৯]

---

৩৬ কামিল সালামাহ্ আদ্-দাকস্, *আল-'আলাকাতুদ্-দাওলিয়্যাহ্ ফিল ইসলাম 'আলা দুইল ইজায আল-বায়ানী ফী সূরাতিত্-তাওবা*, দারুশ্-শুরুক, ১৯৭৫ খ্রি., পৃ. ৬৪০-৬৪১।

৩৭ সূরাহ্ আল-ফাতহ: ২৯।

৩৮ দ্রষ্টব্য: ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ্, *যাদুল মা'আদ*, পৃ. ৮০।

৩৯ সূরাহ্ আন্-নূর: ৫৪।

অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ﴾

'অতএব আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, আপনি তাদের শাসক নন।'[৪০]

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾

'দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হিদায়াত পথভ্রষ্টতা থেকে পৃথক হয়েছে।'[৪১]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾

'আর আপনার প্রভু যদি চাইতেন, তবে পৃথিবীর বুকে যারা রয়েছে, তাদের সবাই ঈমান নিয়ে আসতো সমবেতভাবে। আপনি কি মানুষের উপর জবরদস্তি করবেন ঈমান আনার জন্য?'[৪২]

আমরা মনে করি, অমুসলিমরা যেখানেই থাকুক না কেন ইসলাম তাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানায় না। যেমনিভাবে তা ইসলামের দাওয়াতের প্রচার ও বিশ্বাস সংরক্ষণের প্রয়োজনে অস্ত্র ধরতে বারণ করে না। তথাপীও ইসলাম কাউকে জোরপূর্বক ইসলামে প্রবেশ করানোর অনুমতি দেয় না।

---

৪০ সূরাহ্ আল-গাশিয়াহ: ২১-২২।

৪১ সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ২৫৬।

৪২ সূরাহ্ ইউনুস: ৯৯; এ প্রসঙ্গে সুবহী মাহ্মাসানী বলেন, "কুরআনের এ ভাষ্য থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তিনি জোরজবরদস্তী ব্যতিরেখে মানুষের কাছে সতর্করণ, সুসংবাদ ও উপদেশ দানের মাধ্যমে এ মহাসত্যের পয়গাম পৌঁছে দেবেন। তাঁর এ রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করা অথবা না করার বিষয়টি তিনি মানুষের উপর ছেড়ে দেবেন। সুতরাং কাউকে জোর করে অথবা বাধ্য করে ঈমান গ্রহণ করানো যাবে না। বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহ্র হাতে। তিনি তাদেরকে আখিরাতে একত্রিত করবেন এবং বিচারের মাধ্যমে সকল কৃতকর্মের প্রতিফল দান করবেন।" দ্রষ্টব্য: সুবহী মাহ্মাসানী, *আল-কানূন ওয়াল 'আলাকাত আদ্-দাওলিয়্যাহ্ ফিল ইসলাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭; হামিদ সুলতান, *আহ্কামুল কানূন আদ্-দাওলী ফিশ্-শারী'আহ আল-ইসলামিয়্যাহ্*, কায়রো, ১৯৭৫, পৃ. ৩; মুহাম্মাদ আবূ যাহ্রাহ, *নাযরিয়াতুল হারব ফিল ইসলাম*, আল-মাজাল্লাতুল মিসরিয়্যাহ্ লিল কানূনিদ্-দাওলী, কায়রো: ১৯৬৫ খ্রি., পৃ. ২৩১; মুহাম্মাদ 'আব্দুল্লাহ্ দারায, *আল-কানূনুদ্-দাওলী ওয়াল ইসলাম*, আল-মাজাল্লাতুল মিসরিয়্যাহ্ লিল কানূনিদ্-দাওলী, কায়রো: ১৯৪৯ খ্রি., পৃ. ১৫১।

## দ্বিতীয় উদ্দেশ্য: প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করা ও সন্ত্রাস নির্মূল করা

ইসলাম পূর্ববর্তী সকল আসমানী ধর্মও এ বিষয়ে ইসলামের সঙ্গে একমত যে, যখনই কোনো গোত্র বা সমাজ প্রতিপক্ষের আক্রমণের শিকার হবে তখন তাদের জন্য আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণ করা সম্পূর্ণ বৈধ। ইসলামী শরী'আতে বিষয়টি খুব স্পষ্ট ভাষায় আলোচিত হয়েছে, বিধায় কেউ কেউ বলেই ফেলেছেন যে, এটি ইসলামে জিহাদ বৈধ হওয়ার প্রধান কারণ।

প্রথমে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

'আর লড়াই কর আল্লাহর রাস্তায় তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।'[৪৩]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾

'আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যে পর্যন্ত না ফিতনার (সন্ত্রাস) অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারো প্রতি কোনো জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা জালিম (তাদের ব্যাপার ভিন্ন)। সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। বস্তুতঃ যারা তোমাদের উপর জবরদস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি করেছে তারা তোমাদের উপর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা মুত্তাকী, আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন।'[৪৪]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾

---

৪৩ সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯০।

৪৪ সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯৩-১৯৪।

'যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যাদের সাথে কাফিররা যুদ্ধ শুরু করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ।'[৪৫]

আমরা লক্ষ্য করছি যে, আলোচ্য আয়াতসমূহে আক্রমণকারীদের আক্রমণ প্রতিহত করার প্রধান দু'টি শর্তের উল্লেখ রয়েছে। প্রথম শর্তটি হলো, আবশ্যকীয়তার শর্ত। যার ধারণা হলো, প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করা আবশ্যক। প্রথম আয়াতটি বলছে, 'আর তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না।' অর্থাৎ সীমালঙ্ঘনের পথ অবলম্বন করো না। যেমনটি দ্বিতীয় আয়াত বলছে:

﴿فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾

'অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারো প্রতি কোনো জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা জালিম (তাদের ব্যাপার ভিন্ন)।'[৪৬] এ সকল আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে তারা যদি যুদ্ধ থেকে হাত গুটিয়ে নেয় তাহলে আমাদের জন্য যুদ্ধ শুরু করা কিংবা যুদ্ধ চলমান রাখা বৈধ নয়। এ বিষয়টি হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রের পন্ডিতগণ '*আবশ্যকীয়তার শর্ত*' শিরোনামে আলোচনা করে থাকেন।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে *সামঞ্জস্যতার* শর্ত। যার অর্থ হলো প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করতে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুটই আক্রমণ বৈধ, এর চাইতে বেশি বৈধ নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾

'আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ কষ্ট তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে।'[৪৭]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾

'বস্তুতঃ যারা তোমাদের উপর জবরদস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি করেছে তারা তোমাদের উপর।'[৪৮]

---

৪৫ সূরাহ্ আল-হাজ্জ : ৩৯-৪০।

৪৬ সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯৩।

৪৭ সূরাহ্ আন্-নাহল: ১২৬।

৪৮ সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯৪।

এর উপর ভিত্তি করে ইসলামী ফিক্‌হের সিদ্ধান্ত হলো, গুটি কয়েক লোকের সীমালজ্ঘনের প্রতিশোধ গ্রহণে নিরপরাধ লোকদেরসহ সম্মিলিত আক্রমণ বৈধ নয়। চাই তা সাধারণ যুদ্ধে হোক কিংবা গৃহ যুদ্ধে হোক।

## তৃতীয় উদ্দেশ্য: অত্যাচারের পথ রুদ্ধ করা

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ইসলাম সকল শ্রেণির লোকদের বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। মানুষের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধকে ইসলাম সম্মানের চোখে দেখে এবং মুসলিম ও ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো, তারা একে অপরকে উত্তম ও কল্যাণ কাজে উদ্বুদ্ধ করবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতায় সর্বদা নিয়োজিত থাকবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

‘সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালজ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না।’[৪৯] অন্য এক স্থানে এ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশটি কিছুটা বিস্তারিতভাবে এসেছে এভাবে যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾

*‘আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছ না দুর্বল সেই নারী-পুরুষ ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এ জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা তো অত্যাচারী। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।’[৫০]

এ কারণে কুরাইশদের বিরুদ্ধে বনূ খুযা‘আহ্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সাহায্য চাইলে তিনি তাদের হয়ে লড়াই করেন। তিনি ‘*হিলফুল ফুযুল*’ কে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, ইসলাম এটির সম্মান বাড়িয়ে দেবে। নিপীড়নের শিকার এরূপ দুর্বলদের সাহায্যে এগিয়ে আসা কেবল মুসলিমদের সাথে সীমাবদ্ধ নয়; বরং অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

---

[৪৯] সূরাহ্ আল-মায়িদা: ২।

[৫০] সূরাহ্ আন্-নিসা: ৭৫।

* উল্লেখ্য যে, এই আয়াতে নির্যাতিত নিপীড়িত মানবতাকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষার জন্য কেবল এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তথাপি যদি পূর্ব চুক্তির ভিত্তিতে যদি কোনো রাষ্ট্র মুসলিমদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তাহলে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা কর্তব্য হয়ে পড়ে। আল-কুরআনে ঘোষিত হয়েছেঃ

﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

'অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় নয়। আর তোমরা যা আমল কর আল্লাহ তা দেখেন।'[৫১]

## যে সকল কারণে শরী'আত যুদ্ধ সমর্থন করে না

আমাদের এ আলোচনা থেকে এ কথা সহজেই অনুমেয় হয় যে, ইসলামে যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু হলো মানুষ। শোষিত ও নিপীড়িত মানুষকে শোষণ ও নিপীড়ন থেকে উদ্ধার করে প্রশস্ত দুনিয়ার আলোতে বের করার জন্যই ইসলামে যুদ্ধের বিধান আরোপ করা হয়েছে। এখানে গোটা পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষকে নিয়েই আলোচনা, ব্যক্তি বিশেষ কিংবা ইসলামী দল বিশেষ নয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানবতাকে অনাচার, অকল্যাণ ও রক্তপাত থেকে রক্ষা করা।

সুতরাং বলা যায় যে, যুদ্ধের প্রধান কারণ হলো ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো অঞ্চল শত্রু কবলিত হলে ইসলামী রাষ্ট্র কবলিত মানুষের রক্ষাকল্পে শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে। কেবলই জাগতিক চাওয়া পাওয়ার বা ক্ষমতা লাভের জন্য ইসলামী শরী'আতে যুদ্ধ বৈধ নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর কর, তখন যাচাই করে নিও এবং যে তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বলো না যে, তুমি মুসলিম নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর, বস্তুতঃ আল্লাহর কাছে অনেক

[৫১] সূরাহ্ আল-আনফাল: ৭২।

সম্পদ রয়েছে। তোমরাও তো এমনি ছিলে ইতোপূর্বে; অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব, এখন যাচাই করে নাও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কাজ কর্মের খবর রাখেন।'[৫২]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

'নবীর পক্ষে উচিৎ নয়, বন্দিদেরকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহ চান আখিরাত। আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৫৩]

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾

'অতঃপর যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক থাকে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে সন্ধি করে, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করতে অনুমতি দেননি।'[৫৪]

অনুরূপ প্রতিহিংসামূলক যুদ্ধ পরিচালনা ইসলাম সমর্থন করে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

'এ পরকাল আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও ফাসাদ (সন্ত্রাস) সৃষ্টি করতে চায় না। খোদাভীরুদের জন্যে শুভ পরিণাম।'[৫৫]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

[৫২] সূরাহ্ আন্-নিসা: ৯৪।

[৫৩] সূরাহ্ আল-আনফাল: ৬৭।

[৫৪] সূরাহ্ আন্-নিসা: ৯০।

[৫৫] সূরাহ্ আল-কাসাস: ৮৩।

'যারা পবিত্র মসজিদ থেকে তোমাদেরকে বাধা প্রদান করেছিল, সে সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা'[৫৬]

## দ্বিতীয় ভাগঃ যুদ্ধের উপায়-উপকরণ

### যোদ্ধাদের যুদ্ধ পদ্ধতির ব্যাপারে সাধারণ কিছু নিয়ম-নীতি

যেমনিভাবে ইসলামে যুদ্ধের মৌলিক কারণ মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট তেমনিভাবে যুদ্ধের কর্ম পদ্ধতি ও উপায়-উপকরণ নির্ধারণেও মানুষের অধিকারের দিকটি অধিক লক্ষণীয়। বাস্তবতা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইন যুগ যুগ ধরে চলে আসা একটি আইন যা বিভিন্ন যুদ্ধে ব্যবহৃত উপায় উপকরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে দু'টি বিষয়ের প্রতি জোর দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে। প্রথমটি মানবসত্তার দিকটি নজরে আনা এবং দ্বিতীয়টি প্রয়োজনের প্রতি অধিক দৃষ্টি দেয়া। প্রথম দিকটির প্রতি খেয়াল রেখেই প্রতিটি যোদ্ধাকে কতিপয় বিষয় মাথায় রেখে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। মানুষের সম্মান ও মানুষ হিসেবে তার অধিকার হচ্ছে এর অন্যতম একটি বিষয়। কারণ, একজন যোদ্ধার সাথে তার প্রতিপক্ষ যোদ্ধার মাঝে মূলতঃ কোনো শত্রুতা নেই; বরং একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ায় তার দেশকে শত্রু মুক্ত করতেই তার রণাঙ্গনে গমন। তাহলে এটি রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির নয়। আন্তর্জাতিক আইন যোদ্ধাদেরকে মৌলিকভাবে দু'টি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা আবশ্যক করে।

প্রথমত: যুদ্ধবন্দি, আহত, অসুস্থ এবং যুদ্ধের কারণে যারাই ক্ষতির সম্মুখীন হবে তাদের যত্ন ও সেবা করা। এমনিভাবে সাধারণ লোক, যারা যুদ্ধে অংশ নেয়নি, তাদের সুরক্ষার প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখা।

দ্বিতীয়টির সম্পর্ক যুদ্ধে পদ্ধতি ও ব্যবহৃত উপায় উপকরণের সাথে। এটির সম্পর্ক মৌলিকভাবে মানুষের সম্মানের সাথে। কারণ, একজন মানুষ তার মতই আরেকজনকে হত্যায় উদ্যত হচ্ছে যা তার জন্য হারাম। সুতরাং তার জন্য শোভা পায়না যে, সে অননুমোদিত কোনো পন্থা বা উপায় কাজে লাগাবে অথবা তার চেহারা বিকৃত করবে কিংবা তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতামূলক কোনো আচরণ করবে; বরং প্রয়োজন মিটে যায় এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা যার মাধ্যমে

[৫৬] সূরাহ্ আল-মায়িদাঃ ২।

প্রতিপক্ষের শক্তি ও দাম্ভিকতা চূর্ণ হয়ে যায় এবং আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। শর'ঈ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও এ দিকে সর্বোচ্চ খেয়াল রাখা যাতে যুদ্ধে ব্যবহৃত পদ্ধতি আইন পরিপন্থী না হয়। আইনের মধ্যে থেকেই এমন পন্থা অবলম্বন করা যার দ্বারা প্রতিপক্ষের পরাজয় বরণ নিশ্চিত হবে এবং তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে।[৫৭]

## যুদ্ধে ব্যবহৃত উপায়-উপকরণ

ইসলামী আইন ও সমকালীন বুদ্ধিজীবিরা এ বিষয়ে একমত যে, যুদ্ধ বাহ্যিকভাবে একটি অনুত্তম কাজ। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের মাঝে সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে সম্পর্ক স্থির রাখা সম্ভব ততক্ষণ যুদ্ধের দিকে না যাওয়াই শ্রেয় ও উত্তম। যুদ্ধ একেবারে শেষ ও চূড়ান্ত পর্যায়ের সিদ্ধান্ত।

সঙ্গত কারণেই আন্তর্জাতিক মানবিক আইন যোদ্ধার ইচ্ছানুযায়ী অস্ত্র ব্যবহারের উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এ অস্ত্রের ব্যবহার এমন হওয়া উচিত যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রতিপক্ষ বাহিনীর ক্ষতি করবে না। এটিই মানবতার দাবি। এমনকি প্রতিপক্ষের পরাজয় নিশ্চিত হওয়ার পরও তাদের বিরূদ্ধে আক্রমণ চালানো যাবে না। যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রেও উত্তম পন্থা বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। এর দ্বারা যুদ্ধে ব্যবহৃত অনুমোদিত কৌশল (Ruses licites) ও প্রতারণামূলক অপকৌশলের (Moyens perfides) মাঝে পার্থক্য করা সহজ হবে যে, প্রথমটি বৈধ আর দ্বিতীয়টি অবৈধ।

আমরা বিশ্বাস করি, এ জাতীয় নিয়ম-কানূন তৈরির পেছনে ইসলামী শরী'আতের ভূমিকা অনেক বেশি। স্বয়ং আল-কুরআনের বহু আয়াতে এ বিষয়ের আলোচনা এসেছে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾

'বস্তুতঃ যারা তোমাদের উপর জবরদস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের উপর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ, যারা মুত্তাকী আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন।'[৫৮]

---

[৫৭] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: *কাওয়া'ইদুল 'আলাকাত আদ্-দাওলিয়্যাহ্*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩৩ ও তৎপরবর্তী।

[৫৮] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯৪।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

'আর যুদ্ধ কর আল্লাহর পথে তাদের সাথে, যারা যুদ্ধ করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।'[৫৯]

মুসলিম ফকীহগণ বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, যুদ্ধের ময়দানে হলেও শ্রেষ্ঠত্ব ও উত্তমতার প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখা উচিৎ। উল্লিখিত আয়াতে '*তাক্ওয়া*' শব্দটি দ্বারা এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং আল-কুরআনের দাবি অনুযায়ী প্রতিপক্ষের আক্রমণকে তাদের অনুরূপ পদ্ধতিতে প্রতিহত করলেও মানুষের সম্মানের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। শত্রুরা আমাদের সম্মান নিয়ে খেলায় মত্ত হলেও আমরা তা করতে পারি না। প্রতিপক্ষ যদি মানবীয় ও চারিত্রিক গুণাবলি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে আমাদের ইজ্জত-আব্রুর প্রতি অস্ত্র তাক করে, কিন্তু আমরা তা করব না। তারা যদিও আমাদের বন্দিদের ক্ষুধার্ত রাখতে পারে, আমাদের কর্তব্য হবে বন্দিদের সাথে উত্তম ও সৌজন্যমূলক ব্যবহারের ব্যাপারে অতিমাত্রায় যত্নশীল হওয়া।[৬০]

এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে ইসলামের লিখিত চুক্তিনামা বা সনদগুলো উত্তম দৃষ্টান্ত হতে পারে। এগুলোর সূচনা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন, যখন তিনি কোন দল বা উপদলকে অভিযানে প্রেরণ করতেন তখন তাদেরকে দিক নির্দেশনামূলক বিশেষ উপদেশ দিতেন। এমনিভাবে খুলাফায়ে রাশেদূন পরবর্তীকালে হুবহু এ ধারা চালু রাখেন। ইসলামের ইতিহাসের পাতা উল্টালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খুলাফায়ে রাশেদূনের পক্ষ থেকে রণাঙ্গনে মানুষের অধিকারের বিষয়ে উজ্জ্বল ও অমূল্য বাণীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দলকে যুদ্ধে প্রেরণ করার সময় বলছিলেন,

تألفوا الناس وتأنوا بهم، ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم، فما على الأرض من أهل مدر أووبر إلا أن تأتوني بهم مسلمين أحب إليّ من أن تأتوني بأبنائهم ونسائهم، وتقتلوا رجالهم.[৬১]

---

[৫৯] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯০।

[৬০] দ্রষ্টব্য: *বাহ্সুশ্-শায়খ আবী যাহ্রাহ্*, পৃ. ২৯৯।

[৬১] *তারীখু আদ-দিমাশ্ক আল-কাবীর*, হাদীস নং-৩৫১১৯।

'মানুষের ভালোবাসা অর্জন কর এবং আপন করে নাও। আক্রমণ করার পূর্বে অবশ্যই তাদের নিকট দা'ওয়াত পৌঁছাও। কারণ আমার নিকট সমাজের সাধারণ ও বিশেষ শ্রেণির লোকদের ইসলাম গ্রহণ অতি প্রিয় এর থেকে যে, তোমরা তাদের পুরুষদের হত্যা করবে আর তাদের নারী ও শিশুদেরকে বন্দি করে নিয়ে আসবে।'[৬২] তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেছেন,

انطلقوا باسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله ولاتقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا، ولا امرأة، ولاتغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

'তোমরা আল্লাহর নামে চলতে শুরু কর, সর্বদা আল্লাহর নামে ও আল্লাহর পথে চলতে চেষ্টা করবে। অশীতিপর বৃদ্ধ, ছোট শিশু এবং নারী হত্যা থেকে বিরত থাকবে। গনীমতলব্ধ মাল একত্রিত কর, আত্মসাৎ করো না, আত্মসংশোধনের প্রতি মনযোগী হও এবং অন্যের প্রতি অনুগ্রহশীল হও। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ইহসানকারীদের পছন্দ করেন।'[৬৩] তিনি অন্য বাহিনীকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন,

اخرجوا بإسم الله تقاتلون فى سبيل الله من كفربالله ولا تغدروا ولا تغلوا ولاتمثلوا ولاتقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع.

'তোমরা আল্লাহর নামে বের হও এবং আল্লাহর রাস্তায় কাফিরদের* বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হও। বিশ্বাসঘাতক হয়ো না, গনীমতের মাল আত্মসাৎ করো না, কারো অঙ্গহানী বা চেহারা বিকৃতি করো না, ছোট শিশু কিংবা ধর্মযাজকদের হত্যা করো না।'[৬৪]

যুদ্ধে প্রেরিত বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে আবূ বাকর (রা) প্রদত্ত দশটি বিশেষ উপদেশ এ ব্যাপারে স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন,

إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم فى الصوامع للعبادة، فدعهم وما زعموا وستجد قوما قد فحصوا أوساط رؤوسهم من الشعر وتركوا منها أمثال العصائب، فاضربوا ما فحصوا بالسيف، وإنى موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا، ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا نخلا وتحرقها، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بقرة الا لمأكلة، ولا تجبن، ولا تغلل.

'নিশ্চয় তোমরা এক শ্রেণির লোক পাবে যারা ইবাদতের জন্য নিজেদেরকে মঠ বা আশ্রমে সর্বদা ধরে রাখে, তাদেরকে এবং তাদের কৃত ইবাদতকে ছেড়ে

৬২ *কানযুল উম্মাল*, হাদীস নং-১১২৮৮।

৬৩ *প্রাগুক্ত* , হাদীস নং-১১২৮২।

৬৪ *আল-মুয়াত্তা*, হাদীস নং-৮৫৮; আল-বায়হাকী, *মা'রিফাতুস সুনান*, হাদীস সং-৫৬৪১.

* যে সমস্ত কাফির মুসলমানদের আক্রমণ করে।

দাও। আর তুমি এমন সম্প্রদায়কে দেখতে পাবে যারা মাথার মাঝখান থেকে চুল মুন্ডন করে পার্শ্বচুল দ্বারা ঝুঁটি রেখেছে তাদের ঝুঁটিতে তলোয়ার দ্বারা আঘাত কর। (কেননা এরা ছিল ঐ সম্প্রদায়ের সন্ত্রাসী বাহিনী) আমি তোমাকে দশটি বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছি: কোনো নারী বা বালক কিংবা অশীতিপর বৃদ্ধকে হত্যা করো না, কোনো ফলদার বৃক্ষ কর্তন করো না, খেজুর গাছ জ্বালিয়ে দিওনা, আবাদী ভূমিকে নষ্ট করো না, খাওয়ার প্রয়োজন ব্যতিরেকে ছাগল বা গরু জবাই করো না, কাপুরুষ হয়ো না এবং গনীমতের মাল আত্মসাৎ করো না।'[৬৫]

আমরা এ সকল ওসিয়তনামা থেকে যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষের সাথে একজন মুসলিম যোদ্ধার কী ধরনের আচার-আচরণ কাম্য, তার নিয়ম পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারি। প্রথমত: যারা সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে আর যারা সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে না তাদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করা। এর দ্বারা কার দিকে যুদ্ধের হাত সম্প্রসারিত করা বৈধ হবে আর কার দিকে নয় এ বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হবে। এ নিয়মটি আধুনিক যুগের ক্রমোন্নতি পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। তবে বিষয়টি আরেকটু পরিষ্কার হওয়ার জন্য এ নিয়মটির বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্র ও পরিধি নিয়ে স্ববিস্তার আলোচনা করছি।

## প্রথমত: যারা সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়েছে

আল-কুরআনের কতিপয় আয়াতে এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় যে, কোন্ শ্রেণির লোকদের দিকে যুদ্ধের কার্যক্রমকে প্রসারিত করা বৈধ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ * الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾

'আর যুদ্ধ কর আল্লাহর পথে তাদের সাথে, যারা যুদ্ধ করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে

[৬৫] *কানযুল উম্মাল*, হাদীস নং-১১২৮/২।

পছন্দ করেন না। আর তাদেরকে (মক্কার মুশরিদের) হত্যা কর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে*। বস্তুতঃ ফিতনা বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না মসজিদুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে যুদ্ধ করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। তাহলে তাদেরকে হত্যা কর। এ হলো কাফিরদের শাস্তি। আর তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল, অন্ত্যন্ত দয়ালু। আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যে পর্যন্ত না ফিতনার (সন্ত্রাসের) অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারো প্রতি কোনো জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা জালিম (তাদের ব্যাপার ভিন্ন)। সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। বস্তুতঃ যারা তোমাদের উপর জবরদস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি করেছে তারা তোমাদের উপর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ, যারা মুত্তাকী আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন।'[৬৬]

আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্টতঃ এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধ হবে তাদের সঙ্গে যারা মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে অথবা মুসলিমদেরকে দেশান্তরে বাধ্য করবে কিংবা যুদ্ধনিষিদ্ধ সম্মানিত মাসসমূহকে বৈধ মনে করবে। তখন মুসলিমদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। সকল তাফসীরকার এ বিষয়ে একমত যে, আল-কুরআনের বক্তব্য '*আর তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না*' এর অর্থ হলো তোমরা যুদ্ধের সূচনা করো না।[৬৭]

## দ্বিতীয়তঃ যে সব শ্রেণির বিরুদ্ধে যুদ্ধকার্যক্রম পরিচালনা বৈধ নয়

উপরিউক্ত আলোচনার উপর ভিত্তি করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, যারা যুদ্ধের সূচনা করতে জানেনা কিংবা যুদ্ধের জন্য রণাঙ্গনে অবস্থান নিতে পারে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকার্যক্রম পরিচালনা বৈধ নয়। এটি একটি সাধারণ সূত্র। মুসলিম পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে কিছু বিশেষণের উল্লেখ করেছেন যারা এ বিশেষণের অধিকারী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বৈধ নয়।

---

[৬৬] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯০-১৯৪।

[৬৭] শায়খ আবূ যাহ্রাহ এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, لا يقتل إلا من يكون في الميدان عاملا في القتال بيديه أو برأيه، ومن لا يقاتل لا يقتل. দ্রষ্টব্য: *আল-'আলাকাতুদ দাওলিয়্যাহ্ ফিল ইসলাম* এবং *বুহুসুল মু'তামার আল-আওয়্যাল লি মুজাম্মাল বুহুস আল-ইসলামিয়্যাহ*, ১৯৬৪, পৃ. ২৯৬।

* ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। তাদেরকে ইসলাম থেকে ফিরে আসতে বাধ্য করার জন্য নির্যাতন চালিয়ে ছিল। এমনকি তারা মুসলমানদেরকে তাদের জন্মভূমি থেকে বহিস্কার করেছিল। এ সমস্ত কাফিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উপরোক্ত আয়াতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। দ্রষ্টব্য: *ফী যিলালিল কোরআন* (কায়রো: দারুশ শুরুক, ২০০৭ খ্রী: পৃ. ১৮৯।

## ১. ধর্ম পণ্ডিত বা যাজক

ধর্ম পণ্ডিতগণ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদেরকে যুদ্ধের কার্যক্রম থেকে দূরে রাখবে এবং নিজ ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকার্যক্রম সম্প্রসারিত করা বৈধ নয়। ইয়াযিদ ইব্‌ন মু'আবিয়াকে (রা) সম্বোধন করে আবূ বাকর সিদ্দীক (রা)-এর বিশেষ ওসিয়তনামায় একথার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেন,

ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم فى الصوامع للعبادة، فدعهم ومازعموا.

'নিশ্চয় তোমরা এক শ্রেণির লোককে পাবে যারা উপাসনার জন্য নিজেদেরকে মঠ-আশ্রমে সর্বদা ধরে রাখে, তাদেরকে এবং তাদের কৃত উপাসনাকে ছেড়ে দাও।' আর এভাবেই ইসলাম যুদ্ধে স্বাভাবিক কার্যক্রম থেকে বিভিন্ন ধর্মের লোকদের 'উপাসনালয়কে সম্পূর্ণ দূরে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এটি সর্ব যুগে ও সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য একটি সর্বজনীন মূলনীতি।[৬৮]

এর পাশাপাশি আবূ বাকর সিদ্দীক (রা)-এর বিশেষ ওসিয়তনামায় বাইজেন্টাইন ধর্ম পণ্ডিতদের একটি বিশেষ শ্রেণির উল্লেখ রয়েছে, যারা মাথার মাঝখান থেকে চুল মুণ্ডণ করে পার্শ্বচুল দ্বারা ঝুঁটি রেখেছে এ গোষ্ঠী সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ না হলেও যুদ্ধে তাদের হাত রয়েছে, বিধায় এরাও যুদ্ধ আওতার বাইরে নয়। এ শ্রেণি বিভিন্নভাবে তাদের সৈন্যবাহিনীকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছে এবং উস্কানি দিয়েছে, ফলে এরাও বিধানগতভাবে অন্যান্য যোদ্ধাদের ন্যায়।

নিঃসন্দেহে এ বিধানটির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, এর মাধ্যমে ইসলাম মানুষের সাধারণ বিশ্বাসের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল ও উদার তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যা আল-কুরআনের এ আয়াতে উচ্চারিত হয়েছে,

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾

'দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হিদায়াত পথভ্রষ্টতা থেকে পৃথক হয়ে গেছে।'[৬৯]

---

[৬৮] বিধানটির ব্যাখ্যা এ নীতির আলোকে করা উচিত, যে ব্যক্তি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। আর যদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাহলে তাকে হত্যা করা বৈধ। যদি কোনো ধর্মীয় ব্যক্তি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অথবা উৎসাহ প্রদান করে যেমন, রোমের কতিপয় ধর্মীয় যাজক সিরিয়ায় মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ চলাকালীন লোকদেরকে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহিত করেছিল। এজন্য তাদেরকে যোদ্ধাদের মধ্যে গণ্য করে হত্যা করা হয়। দ্রষ্টব্য: Mohammed Abu Zahra, *concept of war in Islam*, Studies of Islam series. No. 2, 1961, p. 45.

[৬৯] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ২৫৫।

ইসলাম এ শ্রেণির লোকদেরকে (ধর্মপণ্ডিত হওয়ার কারণে) সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধের আওতামুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। যদিও এদের প্রধান কাজই হলো মুসলমানের মঙ্গলের বিরুদ্ধে কাজ করা এবং অন্য ধর্মকে বিজয়ী ধর্ম হিসেবে তুলে ধরা। তথাপিও বিশ্বাসের স্বাধীনতা অর্জন ও 'উপাসনালয়ের সম্মান সমান। ইসলাম এদের প্রতি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সংরক্ষণ করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

'যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এ অপরাধে যে তারা বলেছিল আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রিস্টানদের) গির্জা, এবাদত খানা, (ইয়াহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, সেগুলোতে আল্লাহর নাম অধিকহারে স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, শক্তিধর।'[৭০]

আয়াতটির স্পষ্ট দাবি হলো, সম্মানের দৃষ্টিকোণ থেকে মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়ের কোনো পার্থক্য নেই।[৭১] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্যের মাধ্যমে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যায়, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন 'যারা আশ্রমে বসে ধ্যানে লিপ্ত, তাদেরকে হত্যা থেকে নিবৃত থাকো।'[৭২]

## ২. নারী

যুদ্ধের বিধান কার্যকর না করার দ্বিতীয় শ্রেণি হলো, নারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'আমলী সুন্নাত দ্বারাও এটি প্রমাণিত। কোনো এক যুদ্ধে একজন মহিলার মরদেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চোখে পড়লে তিনি খুব রাগান্বিত হন এবং অগ্রগামী বাহিনী প্রধান খালিদ ইব্ন

[৭০] সূরাহ্ আল-হাজ্জ: ৪০।

[৭১] সুবহী মাহ্মাসানী, *আল-কানূন ওয়াল 'আলাকাহ্ আদ্-দাওলিয়্যাহ্ ফিল ইসলাম* (বৈরূত: দারুল 'ইলম লিল মালাইঈন, ১৯৭২ খ্রি.), পৃ. ২৪০।

[৭২] আস-সুরুখসী, *আল-মাবসূত*, ১০ম খণ্ড (কায়রো: ১৩২৪ খ্রি.), পৃ. ৬৯।

ওয়ালীদকে (রা) ডেকে পাঠান। তিনি কঠোর হুশিয়ারী বাক্য উচ্চারণ করেন এবং বলেন, 'এটি হত্যার উপযুক্ত ছিল না।' তথাপিও কোনো নারী যদি যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয় কিংবা অস্ত্র ধারণ করে, আর তাকে হত্যা করা ছাড়া বিকল্প পথ না থাকে, তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া বৈধ।[৭৩]

এ ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা এটিই যে, নারীর ভিতরে নম্রতার মাত্রা কঠোরতার তুলনায় ছিল অনেক বেশি, পাশাপাশি সে যুগের প্রচলিত যুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ একেবারেই ছিল কম। সঙ্গতকারণেই তাদেরকে যুদ্ধের আওতামুক্ত মনে করা হত। আর যখন কোনো নারী এ নিয়মের বিপরীত প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে যুদ্ধে অংশ নেয় তাহলে সে নিজেই নিজের নিরাপত্তা ভঙ্গ করলো। বর্তমান যুগে এ সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি, কারণ আধুনিক যুদ্ধ পদ্ধতিতে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ অতিমাত্রায় বেশি। সুতরাং সে লড়বে অথচ তাকে হত্যা করা যাবে না, এটি কোনো ইনসাফপূর্ণ বক্তব্য নয়।

## ৩. শিশু ও বয়োবৃদ্ধ

এ দু'শ্রেণী শারিরীক দুর্বলতা ও যুদ্ধে অক্ষমতার কারণে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে না। শিশু দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সকল বালককে বুঝানো হয়েছে যারা শরী'আত অনুযায়ী প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছেনি। পৃথিবীর অধিকাংশ মাযহাব সেটাকে নির্ধারণ করেছেন পনের বছরের পূর্ণতার মাধ্যমে।[৭৪] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্যেও এরূপ নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান। তিনি বলেন,

ما بال أقوام تجاوزهم القتل حتى قتلوا الذرية. ألا لا تقتلوا الذرية كررها ثلاثا.

'কি হলো এ সকল লোকের, যারা হত্যা করতে করতে শিশুদেরকেও হত্যার শিকারে পরিণত করে। সাবধান, তোমরা এরূপ করো না। তিনি এ কথাটি তিন তিন বার উচ্চারণ করেছেন।' শিশুদের এ বিধানের আওতায় অতি বয়োবৃদ্ধ, অসুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী, বিকারগ্রস্থ, অন্ধ, বিকলাঙ্গ, ডান হাত অথবা উল্টাভাবে ডান ও বাম হাত কর্তিত লোকদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৭৫]

---

৭৩ আশ্-শাওকানী, *নায়লুন আওতার শারহু মুনতাকাল আখবার* (মিসর: আল-মাতবা'আতুল 'উসমানিয়্যাহ্, ১২৫৫ হি.), পৃ. ২৮৮।

৭৪ সুবহী মাহ্মাসানী, *আন্-নাযরিয়্যাহ্ আল-'আম্মাহ্ লিল মু'জিবাত ওয়াল 'উকূদ ফিশ্-শার'ঈল ইসলামী*, ২য় খণ্ড (বৈরূত : ১৯৭২ খ্রি.), পৃ. ৮৮; ইব্ন 'উমর (রা) থেকে রিওয়ায়ত করা হয়েছে যে,

أنّه عرض على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم أحد وأنا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزه.

৭৫ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, দ্রষ্টব্য: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ সূরাহ্ আল-ফাত্হ, ১৭।

ফকীহ্গণ যোদ্ধা সৈনিক হওয়ার জন্য শারীরিক সুস্থতা, শক্তিমত্তা ও কোন অঙ্গ ক্ষতযুক্ত না হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। আল-কুরআনের কতিপয় আয়াতও এর প্রতি ইঙ্গিত করে,

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ﴾

'দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের কোনো দোষ নেই (জিহাদে অংশগ্রহণ না করলে)।'[৭৬] আয়াতটির বিপরীত অর্থের মাধ্যমে এ সকল শ্রেণি যুদ্ধের আওতার বাইরে থাকবে বলে প্রমাণিত হয়।

## ৪. ব্যবসায়ী ও কৃষক

ইসলামী ফিক্হের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে, ব্যবসায়ী এবং কৃষকদের হত্যা না করা অপরিহার্য। এর পাশাপাশি কারিগর এবং অন্যান্য পেশার লোকদেরও একই বিধানের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি অবশ্য ইমাম আওযা'ঈ ও আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) -এর মত। তাঁরা বলেন, এরা সাধারণ যোদ্ধা নয়। পক্ষান্তরে অধিকাংশ 'আলিমদের মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদূনের ওসিয়তনামায় এদের উল্লেখ না থাকায় এরা যুদ্ধের আওতামুক্ত থাকবে না।

আমরা মনে করি, এরা যদি নিজ পেশার বাইরে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে পাঁয়তারা করে তাহলে এদের সাথে সাধারণ যোদ্ধার মত আচরণ করা হবে। পক্ষান্তরে তারা যদি নিজ পেশায় ব্যস্ত থাকে এবং যুদ্ধের ব্যাপারে কোনো অবদান না রাখে সেক্ষেত্রে তাদেরকে অযোদ্ধা ধরে নেয়া হবে এবং তাদেরকে হত্যা করা বৈধ হবে না।

এ মতটি আধুনিক যুগের অনেক ফকীহ-এর বক্তব্য দ্বারাও সুসংহত হয়েছে। শায়খ আবূ যাহরাহ (রহ.) বলেন, 'নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুর্বলদের হত্যা থেকে বারণ করেন। এরা ঐ সকল শ্রমিক যারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্যের কাজ করে দেয়, তারা যুদ্ধে অংশ নেয়না এবং নিজের বাহিনীকে শক্তিশালী করার পেছনে কোনরূপ ভূমিকাও রাখে না। সুতরাং তাদেরকে হত্যা করা হারাম।'[৭৭]

---

৭৬ সূরাহ্ আত্-তাওবা: ৯১।

৭৭ *আল-'আলাকাহ্ আদ্-দাওলিয়্যাহ্ ফিল ইসলাম*, পৃ. ২৯৬।

## যে সকল অবস্থায় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করলেও ইসলাম তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে না

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, উপরিউক্ত শ্রেণিদের ব্যাপারে ইসলামী শরী'আতের নীতিগত সিদ্ধান্ত হলো, এরা যুদ্ধে সরাসরি অংশ না নিলে তাদের দিকে যুদ্ধকার্যক্রম প্রসারিত করা বৈধ নয়। অন্য সকল অবস্থায়ও কী তারা এ নিরাপত্তার আওতায় থাকবে? ফকীহ্গণ আলোচনা করেছেন যে, শত্রু পক্ষ রণাঙ্গনে যদি নারী, শিশু অথবা হত্যা নিষিদ্ধ এমন কোনো শ্রেণির লোকদেরকে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে কিংবা কোনো দুর্গে সম্মিলিতভাবে সবাই আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন কী তাদের উপর হামলা করা বা সম্মিলিত আক্রমণ বিধিসম্মত হবে?

আলোচ্য মাস'আলায় 'আলিমদের মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। হানাফী মাযহাবের পণ্ডিতগণ এমতাবস্থায় তাদের উপর আক্রমণ করা বৈধ মনে করেন। কারণ বড় ধরনের ক্ষতিকে প্রতিহত করার জন্য ছোট ক্ষতিকে মেনে নেয়ার দৃষ্টান্ত ইসলামে রয়েছে। এর বিপরীতে অধিকাংশ 'আলিম এটি অবৈধ বলেছেন। তবে পরিস্থিতি গুরুতর যেমন শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া, কিংবা তাদের উপর বিজয় লাভ অথবা মুসলিমদের থেকে তাদের আসন্ন ক্ষতিকে দূর করা হয়, তাহলে তা সাময়িক সময়ের জন্য বৈধ হবে।[৭৮]

১৯৭৭ সালে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সম্মতিতে সম্পাদিত প্রথম জেনেভা চুক্তির সংযুক্তিতে অনুরূপ একটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'সৈন্যদের জন্য আবাদী বা বেসামরিক লোকদের বসবাসের কোনো শহর বা এলাকাকে তাদের আত্মরক্ষার্থে ঢাল হিসেবে ব্যবহার বৈধ নয়। সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িত প্রতিটি পক্ষের নিকট চুক্তির নির্দেশ হচ্ছে, প্রতিপক্ষের প্রতি হামলার ক্ষেত্রে যাতে তাদের কোনো আবাদী ভূমি কিংবা বেসামরিক লোকদের বসবাসের এলাকাতে আক্রমণ করা না হয়। অনুরূপ সাধারণ বসতির আশপশে কোনো ফৌজি চোকি কিংবা ঘাটি স্থাপন করা যাবে না। সর্বোচ্চ চেষ্টা রাখতে হবে যাতে আক্রমণের সামান্য প্রভাবে বেসামরিক লোকদের ক্ষতি না হয়।'[৭৯]

এভাবে ১৯৭৭ সালে লিখিত চুক্তি ইসলামী আইনের কঠোর ধারার সাথে পথ চলতে থাকে, যা দশম শতাব্দীরও পূর্বে ফিক্হ গ্রন্থে বিধিবদ্ধ হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য সব ধর্ম ও মতবাদ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, মানবতার রক্ষার্থে তারা যে সব সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা ইসলামী আইনের তুলনায় খুবই নগণ্য।

---

৭৮ আশ্-শায়বানী, *আস্-সিয়ারুল কাবীর মা শারহিস্-সুরুখসী*, ১ম খন্ড (ভারত, হায়দারাবাদ: ১৩৩৫ হি.), পৃ. ৩৩।

৭৯ *কাওয়া'ইদুল 'আলাকাত আদ্-দাওলিয়্যাহ্ ফিল কানূনিদ্-দাওলী ওয়াশ্-শারী'আহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ্*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩৪।

## যুদ্ধে বেসামরিক এলাকার সুরক্ষা

ইসলাম যুদ্ধের ক্ষতি থেকে কেবল কতিপয় শ্রেণির লোকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেনি; বরং যুদ্ধের এ ক্ষতি বেসামরিক কোনো অঞ্চলকে যেন আক্রান্ত না করে সে বিষয়টিও নিশ্চিত করেছে। বিশেষতঃ এ বিষয়ে ইসলামের কতিপয় মূলনীতি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিষেধাজ্ঞা অনুসারে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণিকে হত্যা বৈধ নয়। তেমনিভাবে ক্রীতদাস ও পরাধীন শ্রেণির লোকদেরকে যুদ্ধের আওতা মুক্ত রাখার ব্যাপারে বলা হয়েছে।

বেসামরিক এলাকাকে যুদ্ধের আওতামুক্ত রাখার একটি উত্তম পদ্ধতি হলো, তাদের নিকট ইসলামের আহ্বান পৌঁছানো। এরপর তারা নিজেরাই তিনটি সুযোগের যে কোনো একটিকে বাছাই করে নিতে পারবে। যদি প্রথম দু'টির কোনো একটিকে গ্রহণ করে তবে তারা নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। প্রথমতঃ ইসলাম গ্রহণ করবে, এর দ্বারা নিজেদের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করবে এবং তাদের উপর আরোপিত হবে ইসলামী বিধি-বিধানের বাস্তবায়ন। দ্বিতীয়তঃ নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদন, এ বিষয়ে এখানে স্ববিস্তার আলোচনা করা সম্ভব নয়, তবে এতটুকু বলা যায় যে, এটি প্রতিপক্ষের পক্ষ থেকে প্রদত্ত করের সাথে সম্পর্কিত। এর মাধ্যমে তাদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ফলে ইসলামী রাষ্ট্র ও তাদের মাঝে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। জিহাদের মৌলিক উদ্দেশ্য এর দ্বারাও উত্তমরূপে সম্পাদিত হয়। কেননা এ চুক্তির কারণে অমুসলিমদের মাঝে দ্বীনী দা'ওয়াত পৌঁছানোর পথে কোনো বাধা থাকে না। তবে এ দা'ওয়াত গ্রহণ না করার ব্যাপারে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।

ইসলামের ইতিহাসে এ পদ্ধতি দু'টির ব্যবহার অনেক বেশি পাওয়া যায় এবং এর মাধ্যমে বহু এলাকা ইসলামী শাসনের অধীনে চলে এসেছে। ফলে তাদের সাথে যুদ্ধের ইতি টানা সম্ভব হয়েছে। ইসলামী যুদ্ধনীতি বাস্তবায়নের ফলে কোথাও কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। যদি কোথাও বিপরীত কিছু হয়ে থাকে তাহলে তা মুসলিম যোদ্ধাদেরকে এতদসম্পর্কে আল-আল-কুরআনে এ ধরনের আচরণ নিষেধ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

'আর তোমাদেরকে যে সালাম দেয় তাকে বলো না যে, তুমি মুসলিম নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর, বস্তুত: আল্লাহর কাছে রয়েছে অনেক সম্পদ। তোমরাও তো ইতোপূর্বে এমনি ছিলে; অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব, এখন অনুসন্ধান করে নিও। আর তোমরা যা করছ আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।'[৮০]

এ কারণেই 'উমর ইব্ন 'আব্দুল 'আযীয (রহ.)-এর খিলাফতকালে মুসলিম সেনাপতি কুতায়বা ইব্ন মুসলিম আল-বাহিলী (রহ.)-এর নেতৃত্বে মুসলিম সেনাবাহিনী ইসলামের আহ্বান পৌঁছানো ব্যতীত যখন পারস্যের '*সাফদ*' নামক এলাকায় অভিযান প্রেরণ করে তখন এলাকাবাসীরা সমরকন্দের উপর 'উমর ইব্ন 'আব্দুল 'আযীয (রহ.) -এর নিযুক্ত শাসক সুলায়মান ইব্ন আবিস সারি (রহ.) -এর নিকট এ মর্মে অভিযোগ উত্থাপন করে যে, 'নিঃসন্দেহে কুতায়বা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আমাদের প্রতি অবিচার করেছে, ইসলাম গ্রহণের শর্তসমূহ উপস্থাপন ব্যতিরেকে আমাদের এলাকা আমাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা করতে চান। আমরা আপনার কাছে খলীফার নিকট এমন একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করার অনুমতি প্রার্থনা করছি, যারা তাঁর নিকট আমাদের প্রতি কৃত অবিচারের বিষয়টি তুলে ধরবেন। যদি আমাদের কোনো প্রাপ্য থাকে তাহলে আমরা তা ফিরে পাব, আমাদের এর প্রয়োজন রয়েছে। তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। সবশুনে 'উমর ইব্ন 'আব্দুল 'আযীয (রহ.) সুলায়মান (রহ.)-এর নিকট পত্র লিখলেন, 'সমরকন্দবাসী আমার নিকট তাদের প্রতি কৃত জুলুম এবং কুতায়বাহ কর্তৃক তাদেরকে দেশান্তরিত করার অভিযোগ করেছে। যখন তোমার নিকট আমার এ পত্র পৌঁছবে, তখন তুমি তাদের জন্য একজন কাযী নির্ধারণ করবে, তিনি এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে ফায়সালা করবে। যদি ফায়সালা তাদের পক্ষে যায় তবে কুতায়বাহ তাদের উপর বিজয় লাভের আগেই আরবদেরকে তাদের সেনা ছাউনি থেকে বের করে দাও এবং তাদের নিকট তাদের এলাকা ফিরিয়ে দাও।'

গভর্নর খলীফার নির্দেশ প্রতিপালন করলেন এবং '*সাফদ*' বাসীর পক্ষে রায় দিলেন। ফলে মুসলিম সেনা সদস্যদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়া হয়। কারণ তারা সেখানে ইসলাম অসমর্থিত পদ্ধতিতে প্রবেশ করেছে। এরপরই কেবল নতুন করে তাদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছানো এবং তাদের গ্রহণ করা বা না করার প্রেক্ষিতে কুতায়বার জন্য চুক্তি করা কিংবা যুদ্ধ অবতীর্ণ হওয়া বৈধ হবে, অন্যথায় নয়।'

---

[৮০] সূরাহ্ আন্-নিসা: ৯৪।

এরপর *সাফদ* অথবা *সিন্দুবাসী* বলতে লাগলো, যা হয়েছে আমরা এতেই সন্তুষ্ট আমরা কোনো যুদ্ধ চাই না। তাদের বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোকেরা বলতে শুরু করলো, আমরা এ জাতির (আরব) সঙ্গে উঠাবসা করেছি, তাদের সঙ্গে অবস্থান করেছি, তারা আমাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছে। এখন যদি আবার আমরা যুদ্ধের দিকে ফিরে যাই, জানিনা জয় কাদের হবে?

এখানে আমরা আরো স্মরণ করতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের সূচনা হিসেবে মক্কাবাসীর উপর অর্থনৈতিক অবরোধ চাপিয়ে দেন। কিন্তু যখন তিনি কতিপয় লোকের আর্তনাদ ও অনেকের এ জাতীয় অভিযোগ শুনতে পেলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে ক্ষুধার্ত রেখেছে এবং মানুষকে হত্যা করেছে, তখনই তিনি অবরোধ তুলে দেন এবং সকল প্রকার খাবার তৎক্ষণাৎ মক্কায় প্রবেশের অনুমতি দেন।

সর্বশেষ বক্তব্য যে, যুদ্ধের ইতিহাসে বেসামরিক লোকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যত নিয়ম কানূন প্রণীত হয়েছে, নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা অতীতের সব ব্যবস্থাকে হার মানাবে। মদীনায় হিজরত করার পূর্বে এবং মক্কায় থাকাকালীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সঙ্গী সাথীরা যে অমানবিক কষ্ট ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলো, কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পুরোনো প্রতিপক্ষের সঙ্গে যে অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, ইতিহাসে এর নজীর পাওয়া যায় না। যখন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হচ্ছিল, তখনই তিনি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, 'আজ আমি তোমাদের ঐ কথায় বলছি, যা নবী ইউসুফ (আ) তাঁর ভাইদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, মহান আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তোমরা চলে যাও, আজ তোমরা মুক্ত।' এ মহান বিজয়ের পেছনে ছিল না কোনো রক্তপাত, না ছিল ধ্বংসযজ্ঞ, কাউকে ক্রীতদাসের শিকারও হতে হয়নি, বন্দিও হতে হয়নি কোনো নারী বা শিশুকে।

বেসামরিক লোকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মধ্যে এটিও একটি যে, যুদ্ধের কোনো কার্যক্রম বেসামরিক শহরের দিকে পরিচালনা করা যাবে না। তবে বিভিন্ন দুর্গ ও কেল্লার দিকে অভিযান পরিচালনা করা যাবে। সকল মাযহাব এর উপর একমত। যদিও শাফি'ঈরা মনে করে, যুদ্ধ যদি দূরবর্তী কোনো এলাকার

সঙ্গে হয় তবে মুসলিম বন্দিদের কেউ যদি তাদের সঙ্গে থাকে তথাপিও তাদের দিকে যুদ্ধের অস্ত্র তাক করা বৈধ।[৮১]

## নিষিদ্ধ অস্ত্রসমূহ

ইসলামী যুগে অধিক ব্যবহৃত অস্ত্রের মধ্যে ছিল, তীর, বর্শা, তরবারী, ঢাল মিনজানিক ইত্যাদি। দীর্ঘ সময়ে সংঘটিত যুদ্ধে কখনো খন্দক (পরিখা) খনন অথবা অবরোধের মত কৌশলেরও প্রচলন ছিল।

এক জায়গা হতে অন্যত্র পরিবহনের ক্ষেত্রে স্থল পথে সাধারণতঃ ঘোড়া এবং অন্যান্য প্রাণীসমূহকে ব্যবহার করা হতো। আর সমুদ্র পথে ছিল জাহাজের ব্যবহার। ভিন্নমুখী এ অবস্থার দিক বিবেচনা করেই যোদ্ধাদেরকেও পদাতিক, ঘোড়সওয়ার ও জাহাজারোহী তিন ভাগে ভাগ করা হতো।

আরবরা তৎকালীন যুগে আক্রমণ ও পলায়ন পদ্ধতিতে যুদ্ধ করতো। যেখানে থাকতো মিশ্রিত কিছু দাগ। একজন যোদ্ধা দাগ পার হয়ে আক্রমণ করে ফিরে আসতো। এটি ছিল অনেকটাই আধুনিক গেরিলা যুদ্ধের মত। এটি আক্রমণে অধিক নিরাপদ ও পরাজয় বরণ থেকে অধিক নিরাপদ মনে করা হতো।

ইসলামের আগমনের পর যুদ্ধ পদ্ধতির পরিবর্তন হয়। যোদ্ধাদেরকে মজবুতভাবে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করানো হয়। অতঃপর সেখান থেকে পালাক্রমে একজন দু'জন এবং সম্মিলিত আক্রমণের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾

'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালবাসেন যারা তাঁর পথে (আইন সিদ্ধভাবে ঘোষিত যুদ্ধে) সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে, যেন তারা সীসা গলানো প্রাচীর।'[৮২] এরপর যুদ্ধাস্ত্রের আধুনিকায়ন হয়। তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র। সে অনুপাতে যোদ্ধাদেরকেও রণাঙ্গনে নতুন পদ্ধতিতে সাজানো হয়।

---

[৮১] আমরা ইতোপূর্বে ফিক্হ শাস্ত্রের যে প্রাচীন গ্রন্থগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করেছি সেসব গ্রন্থে এ নীতির বিস্তারিত বিবরণ বিধৃত হয়েছে। আর এ বিষয়ে যে সমস্ত নতুন গবেষণাধর্মী গ্রন্থ রচিত হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, মাজীদ আল-খাদ্দুরী, *আল-হারব ওয়াস্-সিলম ফী শারী'আতিল ইসলাম* (বৈরূত: আদ্-দারুল মুত্তাহাদাহ্ লিন্-নাশ্র, ১৯৭৩ খ্রি.), পৃ. ১৩০ এবং তৎপরবর্তী; সুবহী মাহ্মাসানী, *আল-কানূন ওয়াল 'আলাকাহ্ আদ্-দাওলিয়্যাহ্ ফিল ইসলাম*, পৃ. ২০৯; মাহ্মূদ শালতূত, *আল-ইসলাম আকীদাহ্ ওয়াশ্-শারী'আহ্*, ৮ম সংস্করণ, পৃ. ৪৫১ এবং তৎপরবর্তী; নাজীব আল-আরমিনাযী, *আশ্-শার'উদ্-দাওলী ফিল ইসলাম* (দামিশক : ১৯৩৮ খ্রি.), পৃ. ৮০ এবং তৎপরবর্তী।

[৮২] সুরা আছ-ছফ্ফ: ৪।

অস্ত্র সম্পর্কিত পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উল্লিখিত অস্ত্রগুলো হলো তাদের প্রাথমিক যুদ্ধাস্ত্র। তাদের নিকট যুদ্ধে এসব অস্ত্রের কোনো বিকল্প ছিল না। একারণেই পরবর্তী ফকীহ্গণ তাদের যুগে আবিষ্কৃত নতুন নতুন যুদ্ধাস্ত্র যুদ্ধে ব্যবহার নিয়ে গবেষণা করেছেন। যেমন: বিষ মাখানো তীর, মিনজানিক,[৮৩] দুর্গ বিধ্বংসী অস্ত্র ও শত্রুদের উপর অগ্নী নিক্ষেপণ অস্ত্র ইত্যাদি।

মালিকী ফকীহ ইমাম খলীল তার প্রসিদ্ধ '*আল-মুখতাছার*' গ্রন্থে জিহাদ নিয়ে স্ববিস্তার আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, যুদ্ধে এমন সকল অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ যা নিজেদের উপকারের তুলনায় প্রতিপক্ষের অধিক ক্ষতি সাধন করতে পারে। তিনি বিশেষিত বিষ মাখানো তীর প্রতিপক্ষের প্রতি নিক্ষেপের বিষয়ে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এটি ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং এটিকে হত্যার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন বলে ধরে নেয়া হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾

'তোমরা কাউকে হত্যা করো না আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তবে ন্যায় সংগতভাবে, কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি, কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে, নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত।'[৮৪]

অনুরূপভাবে ফকীহ্গণ শত্রুপক্ষকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া সম্পর্কিত আলোচনাও করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের বিরুদ্ধে অতি মাত্রায় বিদ্বেষী হওয়া এবং বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার দায়ে কিছু লোককে আগুনের মাধ্যমে শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সৈন্যদের যাত্রা শুরুর পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার তাদেরকে তা থেকে বারণ করেন এবং বলেন, 'আগুনের শাস্তি কেবল রবের জন্যই শোভা পায়।'

*মিনজানিক* নিক্ষেপণের ক্ষতির দিক বিবেচনায় কোনো কোন ফকীহ্ এর ব্যাপারে আপত্তি তুলেছেন। আরা যারা অনুমতি দিয়েছেন, তারাও এর সঙ্গে বেশি মাত্রায় প্রয়োজন হওয়া এবং বিকল্প পদ্ধতি না থাকাসহ আরো কতিপয় শর্ত জুড়ে দিয়েছেন।[৮৫] এর উপর অনুমান করে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে,

---

৮৩ তৎকালীন যুগে ব্যবহৃত বিশেষ এক প্রকার যন্ত্র, যার মাধ্যমে কিছুটা দূরে পাথর নিক্ষেপ করা যেতো।

৮৪ সুরা আল-ইসরা: ৩৩।

৮৫ মুহাম্মাদ আল-আমীর, *আল-ইকলীল ফি মুখতাসারী খালীল* (কায়রো : ১২২৪ হি.), পৃ. ১০৩; আত্-তাবারী, *কিতাবুল জিহাদ*, পৃ. ৩।

ঐ সকল অস্ত্র যার ক্ষতির সীমানা ও পরিধি অনেক বেশি তা যুদ্ধে ব্যবহার করা হারাম। বিশেষত: প্রজ্জলনকারী অস্ত্র যেমন সাধারণ বোমা, পেট্রোল বোমা ইত্যাদি যুদ্ধে ব্যবহার কখনোই অনুমোদিত হতে পারে না। এটি হারাম।

## রণাঙ্গনে শত্রুর সঙ্গে ব্যবহার

যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষের সঙ্গে কী ধরনের ব্যবহার কাম্য? এ বিষয়েও মুসলিম ফকীহগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে তাদের অধিক গৃহীত একটি মূলনীতি হলো *‘সীমালঙ্ঘন না করা’*। ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ নয় এমন যে কোনো আচরণই *সীমালঙ্ঘন* বলে ধরে নেয়া হবে, সেটি যে কোনো অবস্থাতেই হোক না কেন। এটি অপরিবর্তনীয় একটি বিধান যা রহিত হবার নয়।[৮৬]

## আমরা উল্লিখিত এ সূত্রের কিছু প্রায়োগিক দিক উল্লেখ করা সমীচিন মনে করছিঃ

১. সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে ইসলামী আইন অনুসৃত ধারা হচ্ছে, যারাই কেবল শত্রুতার মধ্যে পড়বে অর্থাৎ যুদ্ধের কার্যক্রমের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে যারা অংশ নেবে তাদের দিকে যুদ্ধকার্যক্রম প্রসারিত করা যাবে, অন্য দিকে নয়।

   আল্লাহ তা'আলা বলেন,

   ﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾

   ‘অতঃপর যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক থাকে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে সন্ধি করে, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ খোলা রাখেন নি।’[৮৭]

এর উপর ভিত্তি করে এ ফিক্হী মাস’আলা বের হয়ে আসে যে, প্রতিপক্ষের আত্মসমর্পণ অথবা পরাজয় বরণ মেনে নেয়ার পর যুদ্ধকার্যক্রম চালু রাখা যাবে না। এ আয়াত এবং সীমালঙ্ঘণ হারাম প্রমাণিত করে এমন প্রত্যেকটি আয়াতের

---

[৮৬] সাইয়্যেদ সাবিক, *ফিক্হুস্-সুন্নাহ্*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৪; মুহাম্মাদ ‘আফীফী, *আল-মুজতামা‘উল ইসলামী ওয়াল ‘আলাকাতুদ্-দাওয়িল্যাহ্*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭।

[৮৭] সূরাহ্ আন্-নিসা: ৯০।

দাবি হলো, যুদ্ধে আহত ব্যক্তির উপর পুনরায় অস্ত্র ব্যবহার বৈধ না হওয়া। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ এটিকে বৈধ মনে করেন। তবে এ হুকুম রাষ্ট্রদ্রোহীদের ব্যাপারে নয়। কেননা তারা আহত হওয়ার পরও তাদের উপর সর্বসম্মতিক্রমে অস্ত্রের ব্যবহার বৈধ। আমাদের অতি আগ্রহ থাকার পরও এ দু'প্রকারের মাঝে ফকীহ্দের পার্থক্য করার বিষয়টি স্পষ্ট নয়। ইতিহাস থেকে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং করেছেন কিংবা তার সামনে কোনো আহত ব্যক্তির উপর অস্ত্র চালানো হয়েছে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাইনি। আল-কুরআন অথবা সুন্নাহয় এর বৈধতা দানকারী কোনো উদ্ধৃতিও আমরা পাইনি। সুতরাং সাধারণ মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমরা এর বৈধতার বিপক্ষে অবস্থান স্পষ্ট করছি এবং এটি আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ কর্মসমূহের একটি বলে ধরে নিচ্ছি।

সালাহ্ উদ্দীন আয়্যূবী (রহ.)-এর জীবনী থকে পাওয়া যায় যে, তিনি প্রতিপক্ষের আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত সৈন্যদের নিজে সেবা করতেন। এটি ইসলামের সুমহান শিক্ষার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

২. যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের চেহারা বিকৃতি, অঙ্গহানী করা ইসলামে নিষেধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لا تغلوا ولا تغدرا ولا تمثلوا 'তোমরা গনীমতের মাল আত্মসাৎ করো না, বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং (নিহত ব্যক্তিদের) অঙ্গহানী করো না।' অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীরে দাগ দেয়া এবং লোমহর্ষক বিকৃতি করা থেকেও বারণ করেছেন। তিনি বলেন,

إذا قاتل أحكم فليتجنب الوجه إن الله كتب الإحسان فى كل شيئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة.

'তোমাদের কেউ যখন যুদ্ধে নামবে, সে যেন প্রতিপক্ষের চেহারায় আঘাত না করে।' তিনি আরো বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের উত্তমতা পছন্দ করেন। যুদ্ধের ময়দানে যখন তোমরা বিধি সম্মত ভাবে কাউকে হত্যা করতে চাও তখন সেটি উত্তমরূপে সম্পাদন কর আর যখন কোন প্রাণী যবেহ করার ইচ্ছা করো তখন যবেহের উত্তম পদ্ধতি নির্বাচন করো।'[৮৮]

ইসলাম নিহত ব্যক্তির মাথাকে গভর্নর কিংবা সেনাপ্রধানের নিকট পাঠানোকে হারাম মনে করে। এ কারণে যখন রাজা *বিতরীকের* মাথা আবূ বাকর (রা)-এর নিকট প্রেরণ করা হলে তিনি এতে বিস্মিতও রাগান্বিত হন। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, 'তোমরা জুলুম করেছ।' এরপর তিনি তার গভর্নরদের নিকট এ মর্মে

---

[৮৮] *সহীহুল বুখারী*, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং-২৫৫৯, পৃ.২১৫।

পত্র লিখলেন, 'তোমরা আমার নিকট কারো মাথা প্রেরণ করো না। চিঠি ও খবরই আমার জন্য যথেষ্ট হবে। আর মাথা পৃথক করা বিকৃতির অন্তর্ভুক্ত।'

৩. এ বিষয়ে আরেকটি মূলনীতি হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের পরপরই মরদেহগুলো দাফনের নির্দেশ দিতেন, যাতে এগুলোর সাথে কেউ কোনো ধরনের অসৌজন্যমূলক আচরণ করতে না পারে। তিনি বদর যুদ্ধের শেষে রণাঙ্গনেই দাফনের নির্দেশ দেন, যাতে এটিকে আদর্শ হিসেবে সবাই গ্রহণ করতে পারে।

৪. ক্ষুধা, পিপাসা ইত্যাদির মাধ্যমেও প্রতিপক্ষকে কষ্ট দেয়া এবং হত্যার চেষ্টা বৈধ নয়। *বায়তুল মাকদিস* পুনরুদ্ধারের সময় সালাহ্ উদ্দীন আয়্যূবীর হাতে কিছু বন্দি আসে। যখন তিনি নিশ্চিত হন যে, মুসলিমদের কাছে এদের খাওয়ানোর মত কিছু নেই, তখন তাদের ছেড়ে দেন যাতে ক্ষুধার কষ্টে তাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে না হয়। এতদসত্ত্বেও মুক্ত লোকগুলো যুদ্ধের মাঠে নিহত হন। কিন্তু পিপাসা ও ক্ষুধার্তের কারণে না মরায় সুলতান সালাহ উদ্দীন তাদের মৃত্যুতে কোনো আক্ষেপ করেননি। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্দিদেরকে ক্ষুধা ও পিপাসা দিয়ে কষ্ট দিতে নিষেধ করেন।

সুলতান সালাহ উদ্দীন আয়্যূবীর এ সিদ্ধান্ত ও রিচার্ড লায়ন হার্ট (সিংহ হৃদয়) নামীয় একজন ইউরোপীয় সেনানায়ক, যিনি সুলতানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন, তার এক কাজের মাঝে তুলনা করা হয়েছিলো। বাস্তবে এটি ছিল একজন সভ্য, নিষ্ঠাবান মুসলিমের সঙ্গে একজন বর্বর শাসকের তুলনা। রিচার্ড তিন হাজার মুসলিমকে আত্মসমর্পণের শর্তে হত্যা করবে না বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু আত্মসমর্পণের পরপরই তিনি তাদের সকলকে হত্যা করেন। আর এতেই একজন ধার্মিক, চিন্তাশীল লোকের সঙ্গে জংলীপনা ও বর্বর লোকের তুলনার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।

৫. ইসলাম রণাঙ্গনেও বিশ্বাসঘাতকতাকে নিষিদ্ধ করেছে। এখানে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, যুদ্ধের বৈধ কৌশল ও নিষিদ্ধ বিশ্বাসঘাতকতা এক জিনিস নয়। কৌশল অবলম্বনের বৈধতাও আমরা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার গৃহীত নীতিতেও দেখতে পাই। ইমাম নববী (রহ.) বলেন, 'আলিমগণ একমত যে, পূর্ব থেকেই প্রতিপক্ষের সঙ্গে কোনো শান্তি চুক্তি কিংবা অন্য কোনো চুক্তি না থাকলে তাদের বিরুদ্ধে যে কোনো ধরণের রণ-কৌশল গ্রহণ করা বৈধ অন্যথায় বৈধ নয়।' আল-কুরআন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিয়েছে:

﴿إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

'তবে এ সকল গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়, যাদের সঙ্গে তোমাদের চুক্তি রয়েছে তোমরা যা করছ আল্লাহ্ তা দেখেন।'[৮৯]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾

'তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ কর, যখন তোমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও আর তোমরা পাকাপোক্ত কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহকে যামিনদার বানিয়েছ। নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা কর।'[৯০]

এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নব মুসলিম নু'আয়ম ইব্‌ন মাস'উদকে (রা) প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার জন্য কৌশল অবলম্বনের অনুমতি দেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পরপরই কুরাইশ এবং বনূ কুরাইযা ও অন্যান্য গোত্রের মাঝে সংশয় সৃষ্টির দায়িত্ব পালন করেন। তার উদ্ভাবিত এ কৌশল খন্দক যুদ্ধে মুসলিমদের জয়ের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলো।[৯১]

৬. ইসলাম সম্মিলিত আক্রমণকে নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا﴾ "আর যারা সঞ্চয় করেছে অকল্যাণ তারা অনুরূপ অসৎ কর্মের বিনিময় পাবে।"[৯২]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾

"আর একজন পাপীর পাপের বোঝা অন্য কেউ বহন করবে না।"[৯৩]

৭. যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মুসলিম যোদ্ধাদের জন্য কোনো ধ্বংসযজ্ঞ চালানো, গাছ কেটে ফেলা, প্রাণীকে হত্যা করা কিংবা কোনো উপায়ে যমীনে নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করা বৈধ নয়; বরং হারাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾

---

৮৯ সূরাহ্ আল-আনফাল: ৭২।

৯০ সূরাহ্ আন্-নাহল: ৯১।

৯১ ড. মুহাম্মাদ তালা'আত আল-গুনায়মী, *নাযরাতুন 'আম্মাহ্ ফিল-কানূনিদ্-দাওলী আল-ইসলামী*, পৃ. ৩৭; প্রবন্ধটি এ গ্রন্থের তিন নম্বর প্রবন্ধ।

৯২ সূরাহ্ ইউনুস: ২৭।

৯৩ সূরাহ্ ফাতির: ১৮।

'আর তোমরা পৃথিবীতে সংশোধনের পর বিপর্যয় (সন্ত্রাস) সৃষ্টি করো না।'[৯৪] যদিও ফকীহ্গণ এ মূলনীতি থেকে প্রয়োজনে বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, যেমন কুকুরসহ ক্ষতিকর প্রাণীসমূহকে হত্যা করা, খাওয়ার প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন প্রাণী যবেহ করা ইত্যাদি।

এটি আবূ বাকর (রা) কর্তৃক ইয়াযিদ ইব্‌ন মু'আবিয়াকে (রা) প্রদত্ত ওসিয়তনামায় উল্লেখ রয়েছে। অনুরূপ ইব্‌ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আলী (রা)- এর নিকট তার ভ্রাতুষ্পুত্র কোনো এক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি তাকে বললেন, সম্ভবতঃ তুমি কোনো শস্য ভূমিকে জ্বালিয়ে দিয়েছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। 'আলী (রা) বললেন, হতে পারে তুমি কোনো খেজুর বাগান পুড়িয়ে দিয়েছো? তিনি হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলেন। তিনি আবার বললেন, সম্ভবতঃ তুমি কোনো শিশুকে হত্যাও করেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। 'আলী (রা) বললেন, এখানেই তোমার যুদ্ধের মৃত্যু হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও মৌমাছিকে হত্যা করতে বারণ করেছেন। কেননা এটিও এক ধরনের ফাসাদ। এটি আল-কুরআনের ঐ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত, যেখানে বলা হয়েছে:

﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾

'যখন সে ফিরে যায় তখন সে চেষ্টা করে সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণনাশ করতে। আর আল্লাহ ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না।'[৯৫] অন্যদিকে এটি রুহ বিশিষ্ট প্রাণী। সুতরাং এটিকে হত্যা করাও বৈধ নয়।

[৯৪] সূরাহ্ আল-আ'রাফ: ৫৬।

[৯৫] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ২০৫।

# ইসলামী শরী‘আত ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে যুদ্ধাক্রান্ত জনগণের সুরক্ষা*

প্রফেসর ড. ওয়াহবাহ্ আয-যুহায়লী**

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, আর সালাত ও সালাম আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি। অতঃপর বিংশ শতাব্দীতে আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের উৎপত্তি দেখা দিয়েছে যখন জাতিপুঞ্জের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, আর ইসলামী রাষ্ট্রগুলোকে তার সদস্যপদ লাভ করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল এ যুক্তি প্রদর্শন করে যে, এসব রাষ্ট্রের অধিকাংশই হলো ঔপনিবেশিক শাসন বা ম্যানডেটরি শাসনের অধীন।

অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ (UNO) সার্বভৌমত্ব বিষয়ে সমতার মূলনীতির ভিত্তিতে পৃথিবীতে তার সকল সদস্যকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে গ্রহণ করা অনুমোদন করেছে। যেমনটি বলা হয়েছে এ সংস্থার সনদের দ্বিতীয় দফার প্রথম অনুচ্ছেদে। সনদের প্রথম দফার ৪ নং অনুচ্ছেদকে জাতিসংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ করা আর ঐ মূলনীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপর ভিত্তি করে জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধি করা, যে

---

* প্রবন্ধটি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামাবাদে অক্টোবর-২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।

** প্রফেসর ড. ওয়াহ্‌বাহ্ আয-যুহায়লী বিশ্ববরেণ্য একজন আলিম। তিনি ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার দামিস্কে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সমকালীন যুগের একজন খ্যাতিমান মুফাসসির ও ইসলামী আইনবিদ। তিনি ১৯৭১ সালে *তুলনামূলক ফিক্‌হ* বিষয়ে মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ অনুষদ থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৬৩ সালে দামিস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে আল-ফিক্‌হ বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৭৫ সালে প্রফেসর পদে উন্নীত হন। এরপর তিনি ২০০১ সালে *শরীয়াহ্ অনুষদের* ডীন নির্বাচিত হন। তিনি সিরিয়া ছাড়া মক্কা, মদীনা, রিয়াদ, কাতার, কুয়েত, পাকিস্থানসহ মুসলিম বিশ্বের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে *আল-ফিক্‌হ* এবং *উসূলুল ফিক্‌হ* বিষয়ের অধ্যাপক হিসেবে পাঠ দান করেন। তিনি সিরিয়া, মক্কা, জেদ্দা, ভারত, আমেরিকা এবং সুদানের *ফিক্‌হ* একাডেমির আজীবন সদস্য। ইসলামী আইন বিষয়ে তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো, *আছারুল হারব ফীল ফিক্‌হিল ইসলামী*, *আল-ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, *উসূলুল ফিক্‌হ আল-ইসলামী*। তাফসীর বিষয়ে তাঁর অনবদ্য রচনা হলো, *আত-তাফসীরুল মুনীর ফীল ‘আকীদাহ্ ওয়াশ শরী‘আহ্*। দ্রষ্টব্য: উইকিপিডিয়া *আল-মাওসূয়াহ্ আল-হুররা*, ar.mwikipedia.org, afaqattaiseer.net/vb/ archive.

* প্রবন্ধটি ড. আবূ বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া অনুবাদ করেন যা আইসিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত *ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইন* গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। পৃ. ২৮-৫৯- প্রকাশক।

মূলনীতি জাতিসমূহের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করেছে। তন্মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো, নিজস্ব অবস্থান গ্রহণের অধিকার, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রতকরণ, জাতি, ভাষা কিংবা ধর্মের ভিত্তিতে কোনো ব্যবধান অথবা নারী-পুরুষের মাঝে কোনো প্রকার বৈষম্য সৃষ্টি না করে সকল মানুষের জন্য মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

এ সনদের আলোকে আমরা *'ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন'* বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হব; অর্থাৎ এ আইন-কানূনের মূলনীতিগুলো নিশ্চিত করা এবং মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যকার সম্পর্কের ভিত নির্ধারণ করা সম্ভব। বিষয়টি নিম্নোক্ত দুটি পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে:

**প্রথম পরিচ্ছেদ:** শান্তি ও নিরাপদকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে:

- ইসলামী শাসনব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সংগঠনের মূলনীতি
- অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান
- শান্তি, মানবিক, ভ্রাতৃত্ববোধ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতিকে তুলে ধরা

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:** যুদ্ধ চলাকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। এতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত।

- ইসলামী শরী'আতে যুদ্ধ অনিবার্য অবস্থায় বৈধ
- শরী'আতের দৃষ্টিতে যুদ্ধের শর্তসমূহ
- ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণ
- ফিক্হ অভিজ্ঞান কর্তৃক পৃথিবীকে দুটি বা তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করার উদ্দেশ্য বর্ণনা।

## প্রথম পরিচ্ছেদ: শান্তি ও নিরাপদকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

একথা সর্বজনবিদিত যে, 'আকীদা, শরী'আত, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ব্যাপারে ইসলামের দা'ওয়াত হলো, বিশ্বজনীন দা'ওয়াত। এর উদ্দেশ্য হলো, তার কল্যাণ ও মূলনীতিমালা ব্যাপকভাবে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া এবং তা শুধু

অর্থনৈতিক, বস্তুগত, জাতিগত, ঔপেনিবেশবাদী, জাতীয়তাবাদী স্বার্থের জন্য নয়; বরং সামগ্রিকভাবে দুনিয়া ও আখিরাতে মানবতার মুক্তি, সৌভাগ্য বা সমৃদ্ধি, কল্যাণ, ন্যায়বিচার ও সুখ-শান্তি নিশ্চিত করা। কারণ ইসলামী দা'ওয়াতে 'আকীদা বা বিশ্বাসের রূপ হলো, *রবুবিয়াত* ও *ইবাদতের* ক্ষেত্রে শির্ক অথবা পৌত্তলিকতার কোনো প্রকার মিশ্রণ ছাড়াই আল্লাহ তা'আলার নির্ভেজাল একত্ববাদের ঘোষণা ও স্বীকৃতি প্রদান করা। সুতরাং এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের উপর অবতীর্ণ সকল কিতাবের প্রতি, শেষ দিনের প্রতি এবং তাকদীর তথা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত ফয়সালার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হলো এ দ্বীনের মূলনীতি। দ্বীন ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে যেমন কোনো জোর-জবরদস্তি নেই তেমনি এর প্রচার-প্রসারের ব্যাপারেও কোনো প্রকার জোর-জবরদস্তি নেই; বরং রয়েছে স্বাধীনতা ও মন থেকে মেনে নেয়া। এক্ষেত্রে আলোচনা ও উদারতা হলো আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বানকারীদের কর্ম তৎপরতার মূল ভিত্তি। *তাকওয়া* (আল্লাহ সচেতনতা) অথবা সৎকর্ম ব্যতীত কোনো দল বা মানুষের অন্যের উপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

সকল মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা করার নীতিই হলো প্রত্যাশিত মূলনীতি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ এ এক নারী থেকে, আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তি-ই বেশি মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে বেশি তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।"[১]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾

"দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্ত পথ থেকে।"[২]

---

[১] সূরাহ্ আলা-আল-হুজুরাত: ১৩।

[২] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ২৫৬।

ইসলামী দা'ওয়াত প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে মূলনীতি ও শ্লোগান হচ্ছে, চিন্তা-ভাবনা ও যুক্তিকে কাজে লাগানো এবং সত্যকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। আল্লাহ তা'আলা আল-কুর'আনের বহু আয়াতে এ প্রসঙ্গে ঘোষণা দিয়েছেন, তন্মধ্যে একটি আয়াত হলো,

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

'আপনি বলুন, হে আহলে কিতাব! এসো সে কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই। আর তা হলো, আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো 'ইবাদাত করব না, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করব না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া একে অন্যকে *রব* হিসেবে গ্রহণ করবেনা। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বলো, তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।'[৩]

অন্য আরেকটি আয়াত হলো,

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾

'আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া আহলে কিতাবের সাথে বিতর্ক করবে না, তবে তাদের মধ্য থেকে যারা জুলুম করেছে তাদের সাথে বিতর্ক করতে পার। আর তোমরা বলো, 'আমাদের প্রতি এবং তোমাদের প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহতো একই। আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।'[৪]

শান্তি ও নিরাপত্তার নীতি হলো শক্ত নীতি যা লঙ্ঘন করা কোনো অবস্থাতেই ঠিক নয়। তবে অন্যদের পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ির অবস্থায় এবং শত্রুরা অস্ত্র-সস্ত্রের দ্বারস্থ হলে ভিন্ন কথা।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

---

[৩] সূরাহ্ আলে 'ইমরান: ৬৪।

[৪] সূরাহ্ আল-'আনকাবূত: ৪৬।

'হে মুমিনগণ! তোমরা পূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'[৫]

মুসলিম এবং আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান ও অন্যান্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি নিম্নোক্ত আয়াত দু'টিতে বর্ণিত হয়েছে,

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা দেখাতে ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বের করে দেয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। সুতরাং তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে, তারাই জালিম।'[৬]

মুসলিমরা নবুওয়াতের যুগ থেকে শুরু করে এক সুদীর্ঘ সময়ে একটি নীতি মেনে চলেছে, তা হলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সাহাবী ও অনুসারীগণ কর্তৃক বিশ্বের রাজা-বাদশা, আমীর-ওমারা ও সেনাপতিদের নিকট দাওয়াত প্রেরণ করার ক্ষেত্রে একটি মাত্র উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা। আর তা হলো দ্বীন ইসলাম প্রচার। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম বলেন,

أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإلا فعليك إثم الأريسيين: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ

'ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি পাবেন, আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন; আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তাহলে আপনার উপর সাধারণ জনগণের পাপের বোঝা আপতিত হবে 'আপনি বলুন, হে আহলে কিতাব! তোমরা এসো এমন এক বাক্যের দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান; যেন আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো 'ইবাদাত না করি, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করি এবং আমাদের কেউ যেন আল্লাহ ছাড়া অন্যকে রব হিসেবে গ্রহণ না করে।'[৭]

---

[৫] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ২০৮।

[৬] সূরাহ্ আল-মুমতাহিনা: ৮-৯।

[৭] *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ৭।

বিভিন্ন সময়ে মুসলিমদের সাথে আরব কিংবা অনারবদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর মধ্যে যেগুলোতে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করা হয়েছিল সেগুলোতে মুসলিম কর্তৃক যুদ্ধের আশ্রয় নেয়াটা ছিল অস্তিত্ব রক্ষা ও শত্রুদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য এবং সমতার ভিত্তিতে সকল জনগোষ্ঠী ও জাতির মাঝে স্বাধীনতার পতাকার উড্ডয়নকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য। এখান থেকে এ সত্যটি ঘোষিত হয় যে, মুসলিমরা কোনো অত্যাচারী রাজা, অথবা জালিম শাসক, অথবা কোনো স্বৈরাচারী নেতার আচরণ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে শুধু এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করে।

বস্তুত: *ইসলামী রাষ্ট্র* হলো এমন এক শাসনব্যবস্থা, যার মূল বুনিয়াদ হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজকে কোনো প্রকার পার্থিব ক্ষমতা এবং বশ্যতা সৃষ্টির প্রবণতা থেকে মুক্ত করে স্বাধীন করা, যা তৎকালীন মানব সমাজে ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান ছিল। ইসলাম এ *'ক্ষমতা এবং বশ্যতা'* কে পরিবর্তন করে প্রদান করেছে ন্যায়বিচার, পরামর্শ, সমতা, অনুকম্পা, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের রূপ। এগুলো হলো শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ইসলামী বুনিয়াদী নীতিমালা।[৮] এসব মূলনীতির আলোকে ইসলামের ছায়ায়, এর দিক-নির্দেশনায় ও শরী'আতে এবং তদনুযায়ী মুসলিমদের অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার মধ্যে আমাদের জন্য *'শান্তি ও নিরাপত্তা'* সংক্রান্ত নীতিমালার কেন্দ্রবিন্দুসমূহ নিম্নলিখিত শিরোনামে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে,

## ১. ইসলামের শাসনব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সংস্থার মূলনীতি

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের *মাইলফলক* স্থাপনের জন্য ইসলামী শাসনতন্ত্রে রয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনার অনেক মূলনীতি। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ:[৯]

### এক. মানবিক ভ্রাতৃত্ব সংরক্ষণ

মুসলিমগণ আল-কুরআনে বর্ণিত হিদায়াতকে গ্রহণ করেছে, যা সৃষ্টি ও স্রষ্টার ঐক্য (তথা একসত্তা থেকেই সকল মানবকে সৃষ্টি করার তত্ত্ব) এবং মানুষের সার্বিক মানবিক ভ্রাতৃত্বের বিষয়টি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা হলেন সৃষ্টিকর্তা আর মানুষ হচ্ছে তাঁর সৃষ্টি ও কর্ম। তাঁর সৃষ্টিগত ইচ্ছা

[৮] প্রফেসর ড. হামেদ সুলতান, *আহকামুল কানুন আদ-দাওলী* ফীশ-শরী'আহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ্) পৃ. ১১৫

[৯] শায়খ রশীদ রিদা, *'আল-ওহী আল-মুহাম্মদী'* পৃ. ২২৮; আরো দেখুন: *'তাফসীরুল মানার'* ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৩১৪৪; মুহাম্মদ আবূ যাহরা কর্তৃক লিখিত মুহাম্মদ ইবন হাসান আশ-শায়বানী'র *'আস-সিয়ারুল কাবীর'* নামক গ্রন্থের ভূমিকাংশ, পৃ. ৪১-৫৮; *'আছারুল হারব ফী ফিকহিল ইসলামী'* পৃ. ১৪১-১৪৭।

ও প্রজ্ঞায় তিনি চেয়েছেন যে, মানবকুল তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা, আকীদা-বিশ্বাস ও মতবাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হবে; আর সকল মানুষ হবে স্বাধীন। তারা মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত ওহী এবং প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ পর্যন্ত আগত সকল রাসূল ও নবীগণের রিসালাতের আলোকে পছন্দ করে নেবে এমন পথ ও মত যার মধ্যে তাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর তাদের এ পছন্দকরণ ও স্বাধীনতা অনুশীলনের পর তারা এ পছন্দকরণের বিশুদ্ধতা ও যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। সুতরাং এমন বিষয় পছন্দ করা অপরিহার্য যাতে প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং যার মাধ্যমে মানুষ তাদের নিজেদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি ও সফলতা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

আল্লাহ তা'আলা নবী ও রাসূলগণের রিসালাতের অনুসরণ করার মাধ্যমে মুক্তির পথকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

'সমস্ত মানুষ ছিল একই জাতি। অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে প্রেরণ করেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব নাযিল করেন, যাতে করে তিনি লোকদের মতভেদজনিত বিষয়গুলোকে মীমাংসা করতে পারেন। আর যাদেরকে তা দেয়া হয়েছিল, স্পষ্ট নিদর্শন তাদের কাছে আসার পরেও শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ সে বিষয়ে তারা বিরোধিতা করতো। অতঃপর আল্লাহ তাঁর ইচ্ছাক্রমে সে সত্য বিষয়ে ঈমানদারগণকে হিদায়াত দিয়েছেন, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথের দিকে হিদায়াত প্রদান করেন।'[১০]

এ আয়াতের আলোকে বলা যায় যে, যুদ্ধের ময়দানে যে আক্রমণ করে অথবা যে ব্যক্তি আক্রমণকারীদেরকে পরামর্শ দিয়ে অথবা পরিচালনা কিংবা পরিকল্পনার দ্বারা সহযোগিতা করে তার সাথে ছাড়া অন্য কারো সাথে লড়াই করা যাবে না। কেননা যুদ্ধ হলো শুধু আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধ। জুলুমের প্রতি বাধা প্রদান এবং শত্রুদেরকে প্রতিরোধ করাই হলো যুদ্ধের উদ্দেশ্য। সুতরাং রণাঙ্গনে কোনো ব্যক্তির অঙ্গ বিকৃতি করা বৈধ নয়। এছাড়া কোনো প্রকার

---

[১০] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ২১৩।

অত্যাবশ্যকতা ও শত্রুদেরকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্য ব্যতীত কাউকে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাখা, শাস্তি দেয়া ও দুর্ব্যবহার করা, লুণ্ঠন ও ছিনতাই করা এবং মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধের উপর আক্রমণ করা বৈধ নয়।

## দুই. মানুষকে মর্যাদা দান ও মানবাধিকার সংরক্ষণ

মানুষের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল-কুরআন নিখুঁত মূলনীতি প্রণয়ন করেছে তা হলো মানুষকে সম্মান ও মর্যাদা দানের বাধ্যবাধকতা, তার অস্তিত্ব রক্ষা করা এবং যে কোনো উপায়ে তার অধিকার সংরক্ষণ করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾

'আমি আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে এদের চলাচলের জন্য বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।'[১১]

মহান আল্লাহ যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে তার অধিকার এবং তার তত্ত্বাবধানের জন্য তিনি জীবন, স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়পরায়ণতা, পরামর্শ এবং নৈতিক চরিত্র রক্ষা ও জীবন যাপনের স্থায়ী মূলনীতি দিয়েছেন। এ সব মূলনীতি রক্ষা করা এবং এর নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিটি মানুষের সাথে পারস্পরিক আচার-আচরণ ও লেনদেন পরিচালনা করা অনস্বীকার্য যা শান্তি ও যুদ্ধ অবস্থায় এককথায় সকল অবস্থায়, আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করবে।

মহান আল্লাহর শরী'আত ও দ্বীন অনুযায়ী কোনো মানুষকে তার নিজ ধর্মের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা ও তাকে কষ্ট দেয়া বৈধ নয়। এরই ধারাবাহিকতায় ধর্ম পরিবর্তন করার জন্য কাউকে চাপ প্রয়োগ করা, তার সম্মানহানি করা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। এছাড়া তাকে এমন শাস্তি দেয়াও যাবে না, যা তার সম্মান ও মর্যাদার সীমা অতিক্রম করে। এমনকি তার ইজ্জত আবরুর উপর আক্রমণ করা যাবে না, তার লজ্জা-শরমে আঁচড় দেয়াও যাবে না কিংবা এতদুদ্দেশ্যে তার উপর প্রভাব খাটানো যাবে না, তার সাথে এমন কোনো বিষয় চর্চা করা যাবে না, যা নৈতিকতা ও শিষ্টাচার পরিপন্থী। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীগণ তাদের ধর্মের মূলনীতিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলবে। এসব হলো মুসলিমদের প্রাথমিক কাজ। কিন্তু আমরা অধিকৃত প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও জোরপূর্বক

[১১] সুরা আল-ইসরা: ৭০।

দখলকৃত দেশে এবং সাম্প্রাতিক যুদ্ধক্ষেত্রসমূহে এর বিপরীত অনুশীলন লক্ষ্য করছি, যা রাষ্ট্রীয় নিয়মনীতির পরিপন্থী এবং মানবিক মূল্যবোধ, শিষ্টাচার ও নৈতিকতা বিবর্জিত।

## তিন. নৈতিকতা ও শিষ্টাচারের নীতিমালা অনুসরণ

চরিত্র হলো দ্বীনের আঁধার, সভ্যতার মূল ভিত্তি এবং আচার-ব্যবহারের বুনিয়াদ। এটি মানবিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নিয়ামক শক্তিও বটে। সুতরাং কোনো মানুষ, কোনো জনগোষ্ঠী অথবা কোনো রাষ্ট্র এমন কোনো আচরণ করবে না, যা নৈতিক মূল্যবোধ ও শিষ্টাচারের সীমালঙ্ঘন এবং মানবিক মর্যাদার মানদন্ডের সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য হয়। এটিই ইসলামের বিধান। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, যতসব কারণ থাকুক না কেন কোনো অবস্থাতেই কাউকে গোলাম বানানো, অপদস্থ করা, বল প্রয়োগ করা এবং দ্বীনের ব্যাপারে তার সাথে জোর-জবরদস্তি করা বৈধ নয়। আর এছাড়া মান-সম্মান ও যথার্থ মূল্যবোধের পবিত্রতা নষ্ট করাও বৈধ নয়। এমনকি শত্রু যদি এমন সমস্যার সৃষ্টি করে, যা নিকৃষ্টতা, হীনতা অথবা সম্মানহানী বলে গণ্য হয় তাহলেও তার সাথে অনুরূপ ব্যবহার করা সঙ্গত হবে না। কারণ এ পৃথিবীতে মানুষের মান-সম্মান হলো মহান আল্লাহর অলঙ্ঘনীয় বিধান। এ বিধানে কোনো প্রকার আঁচড় দেয়া যাবে না, সে যে পর্যায়ের মানুষই হোক অথবা তার সত্তা, দ্বীন, 'আকীদা-বিশ্বাস ও মতবাদ যা-ই হোক না কেন। সুতরাং হারাম ও অবাধ্যতা উভয়টি মৌলিকভাবে হারাম ও অন্যায়। শত্রু এবং বন্ধুর মাঝেও এ দুটির অবস্থা এক ও অভিন্ন।

'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) স্বীয় সেনাপতি সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর নিকট প্রেরিত এক চিঠিতে বলেন,

آمرك ومن معك أن تكون أشد احتراسا من المعاصى من عدوكم، فان ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينتصر المسلمون لمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا قوة بهم؛ لأن عددنا ليس كعددهم، ولا عدتنا كعدتهم، فإن استوينا فى المعصية كان لهم الفضل فى القوة، وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا .. ولا تقولوا : إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا وإن أسأنا، فرب قوم سلط عليهم من هو شر منهم.

'আমি তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি যে, তোমরা তোমাদের শত্রুদের থেকে সতর্ক থাকার চেয়েও তোমাদের নিজেদের মধ্যকার অন্যায়-অপরাধের ব্যাপারে বেশি সতর্ক থাকবে। কারণ, সেনাবাহিনীর অপরাধ তাদের জন্য তাদের শত্রুর অপরাধের চেয়েও ভয়াবহ, আর মুসলিমরাতো শুধু তাদের

শত্রু কর্তৃক মহান আল্লাহর অবাধ্যতার কারণেই জয়লাভ করে থাকে। যদি এটি না হতো, তাহলে তাদের বিপরীত দাঁড়ানোর শক্তি আমাদের নেই। কারণ, আমাদের সংখ্যা তাদের সংখ্যার মত নয়, আর আমাদের দল-বলও তাদের দল-বলের মত নয়; সুতরাং অন্যায়-অপরাধের ক্ষেত্রে আমরা যদি সমান হয়ে যাই, তাহলে আমাদের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য সাব্যস্ত হবে। আর আমরা যদি আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব বা মর্যাদার দ্বারা তাদের উপর বিজয় লাভ করতে না পারি তাহলে আমরা আমাদের শক্তির বলে তাদেরকে পরাজিত করতে পারব না...। তোমরা একথা বলবে না যে, আমাদের শত্রু আমাদের থেকে নিকৃষ্ট সুতরাং আমরা দুর্ব্যবহার করলেও তাদেরকে কখনো আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে না। কারণ এমন অনেক জাতি রয়েছে, যাদের উপর তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।’[১২]

অপরাধের মারাত্মক ক্ষতি বর্ণনা করার জন্য এ নির্দেশনা কেবল রাসূললুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে নাগরিকতা ও সভ্যতার নীতিমালা এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে পারস্পরিক আচরণ বিধি প্রণয়ণ করেছেন। পরবর্তীকালে খলীফা আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত এ আচরণ বিধিতে উজ্জীবিত হয়ে স্বীয় সেনাপতি ইয়াযিদ ইব্ন আবী সুফইয়ানের উদ্দেশ্য এ নীতিমালার পুনরাবৃত্তি করেছেন। নিম্নোক্ত ভাষ্যটি হলো আবূ বাকর (রা)-এর অসীয়ত বা উপদেশ:

وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة، ولا صبيا، ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تفرقنه أو تغرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن.

‘আমি তোমাকে দশটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, অবশ্যই তুমি হত্যা করবে না কোনো নারীকে, কোনো শিশুকে, কোনো বয়ো বৃদ্ধ মানুষকে, আর কাটবে না ফলজ বৃক্ষ; আর কখনো ধ্বংস করবে না কোনো বসতিপূর্ণ অঞ্চল; আর খাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কখনো যবাই করবে না কোনো ছাগল বা উট; আর অবশ্যই তুমি খেজুর গাছ আগুনে পোড়াবে না এবং তা কাটবে না অথবা কাউকে পানিতে ডুবাবে না, খেয়ানত[১৩] করবে না এবং কাপুরুষতা প্রদর্শন করবে না।’[১৪]

‘উমার ইবন ‘আবদিল ‘আযীয (রহ.) স্বীয় গভর্নরের নিকট চিঠি লিখেছেন এভাবে, আমরা অবগত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সৈন্যদল প্রেরণ করতেন তখন তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেন,

---

[১২] জামাল ‘আইয়াদ, *নুযমুল হারব ফিল ইসলাম*, পৃ. ৪৩।

[১৩] الغلول বলে, গনীমত অথবা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে আত্মসাৎ বা খেয়ানত করা।

[১৪] ইমাম মালিক, *আল-মুওয়াত্তা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬;*তানবীরুল হাওয়ালিক শরহু ‘আলা মুওয়াত্তা মালিক*।

اغزوا باسم الله فى سبيل الله، تقاتلون من كفر بالله، لا تغلوا، ولاتغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً و قل ذلك لجيوشك و سرايك إن شاء الله، و السَّلام عليك.

'তোমরা আল্লাহর পথে আল্লাহর নামে লড়াই করবে ঐ ব্যক্তির সাথে যে আল্লাহকে অস্বীকার করে,[১৫] তোমরা বাড়াবাড়ি করবে না, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, অঙ্গ বিকৃতি করবে না এবং শিশুকে হত্যা করবে না। তুমি এ কথাগুলো তোমার সৈন্যদেরকে ও প্রেরিত সৈন্যবাহিনীকে বলে দেবে ইনশাআল্লাহ, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।'[১৬]

এ অসীয়ত দুটি ও অনুরূপ আরো অসীয়তে রয়েছে নির্দেশ ও নিষেধ। কোনো মুসলিমের জন্য তা লঙ্ঘন করা বা অতিক্রম করা বৈধ নয়। তবে কখনো যুদ্ধের আবশ্যকতায় এরূপ করার প্রয়োজন দেখা দিলে তা করার বিষয়টি হবে ভিন্ন কথা। যেমন সৈন্যবাহিনীর অগ্রযাত্রা বা শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য কোনো গাছ কর্তন করা বা প্রাচীর ধ্বংস করা। এখন আমাদের প্রয়োজন, এ ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা থেকে উদ্ভূত কর্মকাণ্ড এবং আজকের বিশ্বে অপ্রয়োজন ও অযৌক্তিকভাবে যোদ্ধাগণ কর্তৃক পরিচালিত কর্মকাণ্ডের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা।

## চার. অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্যে ন্যায়বিচার ও সমতা

আচার-আচরণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার হলো স্বভাবগত বা স্বাভাবিক অধিকার, যা সরকারী শাসন ব্যবস্থার স্থিতি ও স্থায়িত্বের মূলভিত্তি। আর জুলুম হচ্ছে নাগরিক ও সভ্যতা ধ্বংস এবং শাসনব্যবস্থার অধ:পতনের মূল শক্তি। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বাণীর মাধ্যমে ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾

"আল্লাহ ন্যায়বিচার ও সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিচ্ছেন"[১৭] এখানে بالعدل (ন্যায়বিচার) শব্দের উপর "الإحسان" (সদ্ব্যবহার) শব্দকে সংযুক্ত করা হয়েছে ব্যক্তির অন্তরের জ্বালাকে নির্মূল কল্পে মানুষের আন্তরিকতা ও ভালাবাসাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

---

[১৫] এখানে আল্লাহকে অস্বীকার করার অর্থ হলো, কুফরীর ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করা এবং মুসলমানদের উপর আক্রমণ করা।

[১৬] ইমাম মালিক, *তানবীরুল হাওয়ালিক*, পৃ. ৭।

[১৭] সূরাহ্ আন-নাহল: ৯০।

আল্লাহ এ প্রসঙ্গে অরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

'হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে। এটি তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।'[১৮]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে কুদসী'তে বর্ণিত হয়েছে,

يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا

"হে আমার বান্দারা! নিশ্চয় আমি আমার নিজের উপর জুলুমকে হারাম করেছি। আমি তোমাদের উপরও তা হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর জুলুম করো না।"[১৯] এ প্রসঙ্গে 'উমার (রা) স্বীয় অমর বাণীতে বলেছেন,

متى استعبدتم الناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا

"কখন তোমরা মানুষকে গোলাম বানিয়েছ অথচ তাদেরকে তাদের মায়েরা মুক্ত স্বাধীন হিসেবে জন্ম দিয়েছেন।"

অধিকার, দায়িত্ব-কর্তব্য এবং পরস্পর বিচারকের নিকট মুকাদ্দামা পেশ করার ক্ষেত্রে সমতার অধিকার একটি স্বাভাবিক অধিকার, যা ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে পরিপূরক। সুতরাং কোনো ব্যক্তির অন্যের উপর আলাদা কোনো বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নেই যদিও সে রাজা-বাদশা ও ভিন্ন বিশেষ গোষ্ঠীর লোক হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, الناس سواء كاسنان المشط "মানুষ চিরুনির দাঁতের মতো সমান।"[২০]

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

---

[১৮] সূরাহ্ আল-মায়িদা: ৮।

[১৯] ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

[২০] হাদিসটি ইব্‌ন আবী হাতিম আর-রাযী '*ফী 'ইলালিল হাদীস*' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি ছাড়া অন্যরা 'الناس مستوون'' [জনগণ সমান] শব্দের মাধ্যমে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

'যদি ফাতিমা বিন্ত মুহাম্মাদ চুরি করতো, তাহলে আমি স্বয়ং তার হাত কেটে দিতাম।'[২১,২২]

অপরাপর জনগোষ্ঠীর সাথে আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের একটি অভিনব দৃষ্টান্ত হলো, সমরখন্দবাসীদের কাহিনী। তারা এ মর্মে 'উমার ইব্ন 'আবদিল 'আযীয (রহ.) -এর নিকট কুতায়বা কর্তৃক তাদের উপর জুলুম ও নির্যাতনের অভিযোগ উত্থাপন করে যে, তিনি কোনো প্রকার সতর্কবাণী ঘোষণা না করেই তাদের দেশ করায়ত্ব করেছেন। একথা শুনে তাদের বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য 'উমার স্বীয় বিচারককে নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি (বিচারক) ফায়সালা দিলেন যে, যতক্ষণ না সেখানে একটি নতুন সন্ধি চুক্তি অথবা শক্তি দ্বারা বিজয় না আসবে আরবদেরকে সে ভুখ (সমরকন্দ) থেকে বের হয়ে তাদের সেনানিবাসে ফিরে যেতে হবে।

### পাঁচ. শান্তি-চুক্তি এবং রণাঙ্গনে অনুকম্পা প্রদর্শন

ইসলামের মূলনীতিমালার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি, একগুয়েমি এবং মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতার নীতি অবলম্বন না করে ক্ষমা, মার্জনা ও অনুকম্পার মাধ্যমে জটিল বিষয়সমূহের সমাধান করা। কারণ, ইসলামী দা'ওয়াতের প্রকৃতি হলো সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ "আমি আপনাকে সৃষ্টিকুলের জন্য শুধু রহমতরূপেই পাঠিয়েছি।"[২৩] এ আয়াত থেকে প্রতিভাত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষ, জ্বিন, প্রাণীজগৎ, জড়জগৎ এবং প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য রহমতস্বরূপ। এ জন্যই তিনি মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশ বংশের একদল ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, যারা চরমভাবে তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল এবং তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء

"আজ তোমাদের উপর কোনো অভিযোগ নেই, যাও তোমরা মুক্ত।"

প্রাচ্যবিদ আরনোল্ড প্রমুখের মতে, সুবিচারক ব্যক্তিগণ এ দৃশ্যমান বিষয়টিকে সমর্থন করেছেন। গোস্তাফ লুবোন বলেছেন, 'আরবদের চেয়ে এত বেশি ন্যায়পরায়ণ ও দয়াবান কোনো বিজেতাকে ইতিহাস চেনে না।'

---

২১ ইমাম ইব্ন মাজাহ্ ব্যতীত সুনান গ্রন্থের অন্যান্য ইমাম হাদীসটি বর্ণনা করেন।

২২ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসাঈ (রা) বর্ণনা করেছেন।

২৩ সুরা আল-আম্বিয়া: ১০৭।

## ছয়. অপর পক্ষ যতক্ষণ প্রতিশ্রুতি বলবৎ রাখবে ততক্ষণ প্রতিশ্রুতি পূরণ

এটি হলো বিশ্বস্ততা ও মান-সম্মানের মূল বীজ স্বরূপ। ইসলাম সকল অবস্থায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও আমানতের খিয়ানত করাকে হারাম করেছে। আল-কুরআনে বহু ভাষ্য এসেছে যেগুলো অঙ্গীকার, চুক্তি ও ওয়াদা পূরণ করাকে বাধ্যতামূলক করে দেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর।"[২৪] অনুরূপ আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾

'তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূরণ করো, যখন তোমরা পরস্পর করে থাক এবং তোমরা আল্লাহকে তোমাদের যামিন করে শপথ পাকাপোক্ত করার পর তা ভঙ্গ করো না। তোমরা যা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন।'[২৫]

কোনো দুর্বল দল বা গোষ্ঠী কর্তৃক মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা নিষিদ্ধ, যখন সে আহ্বান চুক্তিবদ্ধ গোষ্ঠীকে আক্রমণ করার দিকে ধাবিত করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ﴾

"যদি তারা দ্বীন সম্বন্ধে তোমাদের নিকট সাহায্য পার্থনা করে তখন তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, তবে যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়।"[২৬]

## সাত. সমআচরণ, যতক্ষণ তা মর্যাদা ও নৈতিকতার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়

যদিও এ মূলনীতি প্রাচীন, তবুও ইসলাম অন্যদের সাথে তার আচার-ব্যবহার প্রসঙ্গে শান্তি ও যুদ্ধ উভয় অবস্থায় সমানভাবে এ নীতিকে গ্রহণ করে নিয়েছে, যাতে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং ন্যায়ের ঝান্ডাকে সুদৃঢ় করা যায় এবং শত্রুও যাতে তার কর্মকা ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করে। সুতরাং সেখানে যদি শিষ্টাচার ও নৈতিকতার মূলনীতি লঙ্ঘিত হয় তাহলে তা কার্যকর করা হবে না। এর দৃষ্টান্ত হলো, ইসলাম যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির শরীর

[২৪] সূরাহ্ আল-মায়িদা: ১।

[২৫] সূরাহ্ আন-নাহল: ৯৬।

[২৬] সূরাহ্ আল-আনফাল: ৭২।

বিকৃতি করা অথবা নাক-কান, ঠোঁট কেটে এবং পেট ফেঁড়ে দেহ-বিকৃতি ঘটানোকে বৈধ বলে অনুমোদন দেয় না, এমনকি শত্রুপক্ষ যদি এ ধরনের কাজও করে, তবুও মুসলিমরা হীনতার ব্যাপারে তাদের সাথে একমত হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বোক্ত হাদীসের মাধ্যমে অঙ্গ বিকৃতি করতে নিষেধ করেছেন এভাবে, (لا تمثلوا) "তোমরা অঙ্গ বিকৃতি করো না।"

## ২. অন্যান্য রাষ্ট্রকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান

বিভিন্ন রাষ্ট্রকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের সাথে অথবা 'রাষ্ট্র সংঘের সকল সদস্যের মাঝে সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে সবাই সমান'। এ মূলনীতির সাথে আঞ্চলিক রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার উৎপত্তির বিষয়টি যুক্ত হয়েছে। এটি ইসলামী চিন্তা-দর্শনের মধ্যে একটি গ্রহণযোগ্য মূলনীতি। রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি প্রদান করা হলে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র স্বাধীনভাবে নিরাপত্তা ও শান্তির সাথে জীবন যাপন করতে সক্ষম হয় এবং নাগরিকদের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালনে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারে। সুতরাং কোনো রাষ্ট্রের অধিকার নেই অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করা অথবা আগ্রাসন চালানো এবং তার শক্তি-সামর্থ্য ও সম্পদের উপর প্রভাব বিস্তার করা। তাহলে তা হবে একটি অপরিপূর্ণ সার্বভৌমত্বহীন রাষ্ট্র। এমনিভাবে রাষ্ট্রের অধিকার নেই অপরাপর রাষ্ট্রসমূহের সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এ মূলনীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রমাণ হলো, ইসলাম প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার মূলনীতি ঘোষণা করেছে এবং ইসলামী রাষ্ট্র অন্যান্য জাতি ও গোষ্ঠীসমূহের সাথে শান্তির নীতি মেনে চলেছে, যা ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে সুস্পষ্টভাবে লিখিত রয়েছে।[২৭]

রাষ্ট্র ও জাতিসমূহকে স্বীকৃতি প্রদানের ব্যাপারে আল-কুরআন পরিষ্কার ঘোষণা করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ﴾

'তোমরা সে নারীর মত হয়ো না, যে তার সূতা মযবুত করে পাকানোর পর এর পাক খুলে নষ্ট করে দেয়। তোমরা নিজেদের শপথকে পরস্পরকে প্রতারিত করার জন্য ব্যবহার করে থাকো এজন্য যে, যাতে একদল অন্যদল অপেক্ষা অধিক লাভবান হতে পারে।'[২৮]

---

[২৭] প্রফেসর ড. হামিদ সুলতান, '*আহকামুল কানুন আদ-দাওলীয়্যাহ্ ফিশ শরী'য়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ্*, পৃ. ১১৮।

[২৮] সূরাহ্ আল-নাহল: ৯২।

আয়াতটির অর্থ হলো তোমরা সতর্ক হও এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ব্যাপারে ঐ নির্বোধ নারীর মত হয়ো না, যে তার সূতা মযবুত ও সুদৃঢ়ভাবে পাকানোর পর এর পাক খুলে নষ্ট করে দেয়; ফলে তা নষ্ট ও মুক্ত হয়ে যায়, যেমনটি পাকানোর পূর্বে ছিল। তোমাদের অবস্থা হলো তোমরা প্রতিশ্রুতি পূরণ করার ব্যাপারে তোমাদের কৃত শপথগুলোকে অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার কর তাদের সাথে। ষড়যন্ত্র এবং প্রতারণা করার জন্য তোমরা বাহ্যিকভাবে চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তোমরা অন্যদের জন্য তা লঙ্ঘন কর এবং (চুক্তিবদ্ধদের ছেড়ে) অন্যদের দিকে (চুক্তি করার জন্য) ঝুঁকে পড়া তোমরা মনে কর যে, যাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছো তারা খুব শক্তিশালী (ফলে তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া, যাদের সাথে বর্তমানে তোমরা চুক্তিবদ্ধ আছ, তাদের চেয়েও তোমাদের বেশি কাজে লাগবে মনে করে চুক্তিভঙ্গ করতে প্রবৃত্ত হতে পার)। অথবা তোমরা মনে কর যে, চুক্তিভঙ্গ করে যাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছো সে দলটি সংখ্যায় ভারী হবে। অস্ত্র-শস্ত্রের দিক দিয়েও তারা খুব শক্তিশালী হবে এবং অনেক সম্পদশালী হবে। ফলে তোমরা তাদের দ্বারা বেশি উপকৃত হতে পারবে। এসব কোনো কারণ-ই যেন তোমাদেরকে চুক্তিভঙ্গ করতে প্রবৃত্ত না করে। এখানে আল্লাহ তা‘আলার বাণী, (أن تكون أمة هي أربى من أمة) এর অর্থ হলো, বহুসংখ্যক জাতি, জনগোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দানের ব্যাপারে স্পষ্ট বিজ্ঞাপন বা বিজ্ঞপ্তি। মহান আল্লাহর এ বাণী, অপরাপর জাতি বা জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা, অথবা অন্য রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে দুর্বল করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করেছে। সুতরাং মুসলিমদের এসব কাজ করার কোনো অধিকার নেই। আর সাথে সাথে এটি অন্যান্য জাতি ও রাষ্ট্রগুলোর অস্তিত্বের স্বীকৃতি সাব্যস্ত করছে। সেগুলোর কোনো ধরনের ধ্বংস প্রচেষ্টা কিংবা সেগুলোর সীমানাচিহ্ন অপসারণ করার চেষ্টা অনুমোদন ছাড়াই।

## ৩. শান্তি, মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নীতি উপস্থাপন

ইসলাম তার সকল পদক্ষেপের মধ্যে অন্যান্য জাতির সাথে শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণকর বিষয়ে পরস্পরের অংশিদারিত্বের স্বীকৃতি দেয় এবং অনুসৃত মূলনীতির ভিত্তিতে মানবিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সম্মান করার প্রতি উৎসাহিত করে। কারণ মহান আল্লাহর নির্দেশ ও ইচ্ছার মাধ্যমে প্রত্যেকটি মানুষ অস্তিত্ব লাভ করেছে, বিধায় শরী‘আত সম্মত কারণ ব্যতীত কোনো মানুষকে হত্যা করা বৈধ নয়। অন্যথায় এটি হবে স্রষ্টার সৃষ্টির উপর সীমালঙ্ঘন।

একদল ফিক্হবিদ ঘোষণা করেছেন যে, অন্যদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্কের ব্যাপারে সাধারণ মূলনীতি হলো, শান্তি; যুদ্ধ নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে একাধিক আয়াতে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো নিম্নরূপ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[২৯] মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

"আর কেউ তোমাদেরকে সালাম দিলে দুনিয়ার জীবনের সম্পদের আশায় তাকে বলো না, 'তুমি মুমিন নও।"[৩০]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً﴾

''কাজেই তারা যদি তোমাদের কাছ থেকে সরে দাঁড়ায়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব করে, তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেন নি।"[৩১] মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ﴾

'আর তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে আপনিও সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়বেন এবং আল্লাহর উপর নির্ভর করুন।'[৩২]

এ সব বিধানের উপর ভিত্তি করে ফকীহগণ স্থির করেছেন যে, ইসলামে যুদ্ধের অন্যতম কারণ হলো, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অথবা তাদেরকে আক্রমণ বা তাদের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা। *কুফর* অথবা ধর্মের ভিন্নতা যুদ্ধের কারণ নয়। এর প্রমাণ হলো, যুদ্ধে সাধারণ নাগরিক বা বেসামরিক লোকদেরকে হত্যা করা বৈধ নয়; এছাড়া '*দারুল ইসলাম*' অমুসলিমদের কোনো প্রকার বিরক্তি ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের জন্য নিরাপত্তামূলক চুক্তি সম্পাদনে অসন্তুটি প্রকাশ করা বৈধ নয়। কারণ ইসলাম অপরাপর জাতিসমূহের সাথে

[২৯] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ২০৮।

[৩০] সূরাহ্ আন-নিসা: ৯৪।

[৩১] সূরাহ্ আন-নিসা: ৯০।

[৩২] সূরাহ্ আল-আনফাল: ৬১।

পারস্পরিক লেনদেন ও ব্যবসায়িক তৎপরতার দিগন্ত উন্মোচন করেছে, যাতে করে মুসলিম ও অমুসলিমগণের মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে।

ফকীহ ইবনুস সালাহ বলেন, এ বিষয়ে (অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক) মূলনীতি হলো কাফিরদেরকে বহাল রাখা ও তাদের অস্তিত্ব মেনে নেয়া। কেননা আল্লাহ তা'আলা কোনো সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে চান না। তিনি তাদেরকে হত্যা করার জন্য সৃষ্টি করেন নি। তাদের পক্ষ থেকে আকস্মিক কোনো ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিলে কেবল তখনই তাদেরকে হত্যা করার বৈধতা দেয়া হয়েছে। তবে হত্যার এ বৈধতা তাদের কুফুরীর শাস্তি স্বরূপ নয়। কারণ এ দুনিয়ার আবাস শাস্তির আবাস নয়; বরং শাস্তি হবে আখিরাতে। সুতরাং বিষয়টির প্রকৃতি বিবেচনা করে এ কথা বলা বৈধ হবে না যে, হত্যা করাটাই তাদের ব্যাপারে মূলনীতি।[৩৩]

কোনো কোনো চিন্তাবিদ বলে থাকেন যে, অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো যুদ্ধ, শান্তি বা সন্ধি নয়। বস্তুতঃ অতীতের খারাপ সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রেখে তারা এ ধরনের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এছাড়া মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে যুদ্ধ লেগে থাকা এবং অব্যাহতভাবে আক্রমণ করার বাস্তবতা তাদেরকে এ ধরনের মন্তব্য করতে বাধ্য করেছে। আবার কখনো কখনো মুসলিম অমুসলিম সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুদ্ধই হলো মূলনীতি কথাটি বলার পেছনে মূল বিষয় ছিল অমুসলিমদের মধ্যে যারা মুসলিমগণকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টনী দিয়ে রেখেছিল তাদের বিরুদ্ধে মুসলিম যোদ্ধাদের অভ্যন্তরীণ মানকে উন্নীতকরণ, যাতে তারা অস্ত্রত্যাগ না করে এবং আরাম-আয়েশপ্রিয় না হয়ে যায়, সবসময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকে এবং শত্রুদের সামনে অটল থাকার বাধ্যবাধকতার বিষয়টি অনুভব করতে পারে। এর প্রমাণ হলো, বড় যুদ্ধসমূহ (গাযওয়াসমূহ)। নবী যুগে আরবদের সাথে সংঘটিত এ ধরনের যুদ্ধের সংখ্যা ছিল ২৭। এ যুদ্ধগুলোতে মুসলিমরা আক্রমণের শিকার হয়েছিল। অনুরূপভাবে তাতার বা মোগল জাতির বিরুদ্ধে পূর্ব অঞ্চলের মুসলিম দেশসমূহে স্বেচ্ছাচারীদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। ইতোপূর্বে ক্রুসেডের যুদ্ধ ও অন্য যুদ্ধসমূহেও আগ্রাসন প্রবণতার উপস্থিতির বিষয়টির ব্যতিক্রম হয়নি। এর পর ইউরোপে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, যেমন *ত্রিশ বছরের যুদ্ধ, একশত বছরের যুদ্ধ, সম্রাটদের যুদ্ধসমূহ, নেপোলিয়নের যুদ্ধসমূহ* ও *ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে* ভারসাম্যমূলক যুদ্ধসমূহ। এসব যুদ্ধ আগ্রাসন প্রবণতা থেকে মুক্ত ছিল না।

---

৩৩ ইবনুস সালাহ'র ফতোয়ার পাণ্ডুলিপি, পৃ. ২২৪।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### যুদ্ধকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইতিহাসে যদিও যুদ্ধ প্রবণতা প্রাচীন ও আধুনিক সবসময়ই একটি বাস্তব বিষয়, তবুও একটি বিষয় স্পষ্ট যে, যুদ্ধ একটি আকস্মিক ব্যতিক্রমধর্মী প্রবণতা, মৌলিক কোনো বিষয় নয়। আর এ ধারণার ব্যাপারে মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই। যুদ্ধের জন্য কতগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ থাকে। এছাড়া পরস্পর যুদ্ধরত দু'পক্ষের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর একটি সুস্পষ্ট প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। প্রত্যেক পক্ষ বা দল অপরকে শত্রু হিসেবে দেখে, তার পরাজয় কামনা করে এবং তাদের উপর নিজেদের বিজয় নিশ্চিত করতে চায়।

বিজয় লাভ ও পরাজয় নিশ্চিতকরণের আকাঙ্খা প্রত্যেক পক্ষকে কিছু ভুল-ত্রুটিপূর্ণ কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে। অধিকাংশ সময় তা হয় গুরুতর। সুতরাং যুদ্ধের প্রারম্ভিক, মাঝামাঝি ও শেষ পর্যায়ের দিক বিবেচনা করে কতকগুলো জরুরী বিধান অনুসরণ করা একান্ত আবশ্যক। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিম্মোক্ত চারটি ধারায় আলোচিত হলো,

### ক. ইসলামী শরী'আতে অনিবার্য অবস্থায় যুদ্ধ বৈধ

রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধ হলো দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে এক সশস্ত্র শত্রুতাপূর্ণ অবস্থার নাম। যুদ্ধের সময় অবস্থা ভেদে পরস্পর যুদ্ধরত ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। অনুরূপভাবে তাদের ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের মধ্যেও সম্পর্ক কী ধরনের হবে তাও নির্ধারিত হয়। আর এ সম্পর্ক হয় বিভিন্ন রকম, নিত্য-নতুন ও জটিল।[৩৪] 'আরবী ভাষায় মূল *আল-হারব*, *আল-জিহাদ* ও *আল-গাযওয়া* শব্দগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর মৌলিক অর্থ হলো শত্রুর সাথে লড়াই করা। ইসলামী ফিক্হ অভিজ্ঞানের দৃষ্টিতে *জিহাদ* শব্দটির প্রয়োগ ব্যাপক। রাগিব আল-ইস্পাহানী '*মুফরাদাতুল কুরআন*' গ্রন্থে লিখেছেন *আল-জিহাদ* ও *আল-মুজাহাদাহ্* শব্দ দুটির অর্থ হলো শত্রু প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ব্যাপক শক্তি–সামর্থ্য ব্যয় করা।

ইব্নু 'আরাফাহ্ আল-মালিকী জিহাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, জিহাদ হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণীকে সমুন্নত করার জন্য অথবা মুসলিম কর্তৃক সে

---

৩৪ প্রফেসর ড. হামিদ সুলতান, '*আহকামুল কানূন আদ-দাওলিয়্যাহ্ ফিশ শরী'* আহ আল-ইসলামিয়্যাহ্, পৃ. ২৪৫।

বাণীকে (অন্যের কাছে) পেশ করার জন্য অথবা এতদুদ্দেশ্যে মুসলিম কর্তৃক কোনো যমীনে প্রবেশ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ নয় এমন কাফিরের সাথে লড়াই করা।[৩৫]

ইসলামে *জিহাদকে* বিধিসম্মত করা হয়েছে শত্রুতার-সীমালঙ্ঘন থেকে মুক্ত করার জন্য বাধ্যগত অবস্থা তথা অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় অবস্থার প্রেক্ষাপটে। চৌদ্দ বছর যাবৎ মূর্তিপূজক মুশরিকদের দেয়া কষ্ট সত্ত্বেও মুসলিমদের ধৈর্যধারণ করার পর হিজরতের সময় থেকে বার মাসের মাথায় দ্বিতীয় হিজরীর শুরুতে তা শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী:

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾

''যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম; যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ।"[৩৬] আল্লাহর বাণী (بأنهم ظلموا) [কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে] এবং (الذين أخرجوا) [তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছে] বাক্য দু'টি *জিহাদকে* শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত করার অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুসলিমরা অন্যদের তথা মুশরিকদের পক্ষ থেকে জুলুম-নির্যাতনের শিকার হওয়ায় জিহাদের বিধান প্রবর্তিত হওয়ার প্রধান কারণ। এটি হলো যুদ্ধের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ সম্বলিত নাযিলকৃত সত্তরেরও বেশি আয়াতের পরে যুদ্ধের অনুমতি প্রদানকারী প্রথম অবতীর্ণ আয়াত, যা ইমাম হাকিম স্বীয় *মুসতাদরাক* গ্রন্থে ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।[৩৭] বিষয়টিকে সমর্থনকারী আরেকটি আয়াত নিম্নরূপ:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾

'তোমাদের উপর লড়াই করাকে ফরয করে দেয়া হয়েছে যদিও তোমাদের নিকট এটি অপ্রিয়। কিন্তু তোমরা যা অপছন্দ কর হতে পারে তা তোমাদের জন্য

---

৩৫ ইব্ন রুশদ, '*আল-মুকাদ্দামাত আল-মুমাহ্হাদাত* ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮; আল-খুরাশী, '*ফাতহুল জলীল 'আলা মুখতাসারিল আল্লামা খলীল* দ্বিতীয় সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৭।

৩৬ সূরাহ্ আল-হাজ্জ: ৩৯-৪০।

৩৭ এটি ইমাম আবদুর রাযযাক ও ইবনুল মুনযির ইমাম যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, দ্রষ্টব্য: *তাফসীরুল আলূসী*, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১৬২।

কল্যাণকর এবং যা ভালোবাস হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।'[৩৮] কিন্তু জিহাদ শরী'আতের বিধিবদ্ধ হওয়ার জন্য ধর্মীয় কোনো বিশ্লেষণ বা বৈশিষ্ট্য ছিল না অর্থাৎ ধর্মই হলো যুদ্ধের উদ্দীপক অথবা এর উদ্দেশ্য হলো অন্যদের প্রতি বলপ্রয়োগ করা এবং তাদেরকে ইসলামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া এমন কোনো ব্যাপার ছিল না; বরং জিহাদ ছিল জুলুম-নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য, দুর্বলদেরকে সাহায্য করার জন্য এবং আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য।

আরনোল্ড বলেন, এ বিশাল বিজয়সমূহ আরব সাম্রাজ্যের যে ভিত রচনা করেছিল তা ইসলাম প্রচার-প্রসারের পথে সংঘটিত ধর্মীয় যুদ্ধের ফল ছিল না; বরং একে অনুসরণ করে খ্রিষ্টান ধর্ম থেকে খ্রিষ্টানদের ব্যাপকভাবে স্বধর্মত্যাগের আন্দোলন শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত একটি স্থায়ী ধারণার জন্ম হয় যে, এ ধর্ম পরিবর্তনকেই আরবগণ লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করে, আর এখান থেকেই খ্রিষ্টানরা তরবারীকে ইসলামী দা'য়াতের নিয়ামক শক্তি হিসেবে দেখতে শুরু করে।[৩৯] '*ইসলাম তরবারীর জোরে সম্প্রাসারিত হয়নি*'-এই কথার এটিই অকাট্য দলীল। এটি আরো প্রমাণ করে যে, কলা-কৌশল ও উপদেশের মাধ্যমে ইসলামী দা'ওয়াত সম্প্রসারণ করা এবং শত্রুতাকে প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধ করার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এর থেকে আরো পরিষ্কার হয় যে, দ্বীন ইসলামে প্রবেশের ব্যাপারে বলপ্রয়োগ করার ঘটনা ইসলামী দা'ওয়াতের ইতিহাসে ঘটেনি। বিষয়টিকে আরো সুদৃঢ় করে আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾

"দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই, সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্ত পথ থেকে।"[৪০]

## খ. যুদ্ধের শরী'আতসম্মত শর্তসমূহ

ইসলাম যুদ্ধকে তার জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে অথবা বিরোধ মীমাংসার মাধ্যম হিসেবে অথবা ক্ষমতার প্রাণশক্তি পূরণ করার জন্য অথবা গনীমতের মাল অর্জন করার জন্য স্বীকৃতি বা অনুমোদন দেয়নি। ইসলামে যুদ্ধকে শুধু তখনই বৈধ মনে করা হয় যখন এমন প্রয়োজন দেখা দেয় যার

---

[৩৮] সূরাহ্ আলা-আল-বাকারাহ: ২১৬।

[৩৯] টয়েনবি আরনোল্ড, *আদ-দা' ওয়াহ্ ইলাল ইসলাম*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৭।

[৪০] সুরা আল-বাকারাহ: ২৫৬।

আশ্রয় নেয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না, যেমনটি আমরা উপরে বর্ণনা করেছি। মুসলিমরা যুদ্ধের ব্যাপারে কখনো আগ্রহ প্রকাশ করে না এবং তাদের কেউ রক্ত প্রবাহিত করার তৃষ্ণাও প্রকাশ করে না। এটি ইসলামের বিরুদ্ধে গোঁড়াপন্থীদের ধারণার বিপরীত। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا تتمنوا لقاء العدو، واسالوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا، وأكثروا ذكر الله

'তোমরা শত্রুর সাক্ষাৎ কামনা করোনা; আর আল্লাহর নিকট নিরাপত্তার আবেদন করো, অতঃএব তোমরা যখন (যুদ্ধ করতে বাধ্য হবে এবং) তাদের মুখোমুখি হবে, তখন তোমরা অটল থাক এবং বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ কর।'[৪১]

যুদ্ধ অথবা জিহাদ ঘোষণার পূর্বে জরুরী বিষয় হলো, তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটি গ্রহণের ব্যাপারে শত্রুকে স্বাধীনতা প্রদান করা:

১. ইসলাম গ্রহণ করা, যার অর্থই হচ্ছে শান্তিতে প্রবেশ করা।

২. মুসলিমগণের সাথে সন্ধি ও শান্তিচুক্তি সুদৃঢ়করণের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া।

৩. যুদ্ধ; যখন শত্রু লড়াইয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করবে।

আর এ ক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কোনো প্রকার জোর-জবরদস্তি নেই। কেননা এ তিনটি বিষয়ে স্বাধীনতা দেয়ার ব্যাপারটি জোর-জবরদস্তির বিশেষণটিকে শরী'আতসম্মত ও যুক্তিসঙ্গতভাবে খণ্ডন করে দিয়েছে।

যখন যুদ্ধ সংঘটিত হবে তখন তা ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী চারটি শর্ত দ্বারা শর্তযুক্ত হবে। এগুলো হলো নিম্নরূপ:

**এক:** যে ব্যক্তি কর্ম দ্বারা অথবা সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে কিংবা মতামত ও পরিকল্পনার মাধ্যমে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তার সঙ্গে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকা।

**দুই:** সম্পদ ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকা। তবে সেনাবাহিনী কর্তৃক কোনো সুরক্ষিত স্থানে যাওয়া; প্রয়োজনে তা ধ্বংস করা অনুমোদিত। আবার যে সম্পদ সরাসরি যুদ্ধে শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাও প্রয়োজনে ধ্বংস করা যাবে, যেমন কেল্লা ও দুর্গ।

[৪১] প্রফেসর ড. হামিদ সুলতান, '*আহকামুল কানুন আদ-দাওলিয়্যাহ্ ফিশ শরী'য়্যাহ আল-ইসলামিয়্য*, পৃ. ২৪৭।

**তিন:** যুদ্ধ চলাকালে এবং যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর মানবিক মর্যাদার মূলনীতিগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

**চার:** যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধের নিরবচ্ছিন্নতা বা স্থায়িত্বকে বাধাগ্রস্থ করার জন্য সাধারণ অথবা বিশেষ নিরাপত্তা দানের বিষয়টিকে বিধিবদ্ধ করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বাক্র (রা.) প্রমুখের উপদেশাবলী থেকে যুদ্ধের নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে আরো জানা যায়। এ ধরনের উপদেশাবলীর সংখ্যা হলো দশ, যেগুলো উপরে আলোচিত হয়েছে। যেমন, অবশ্যই তুমি নারী, শিশুকে.... হত্যা করবে না ইত্যাদি।

এছাড়া যুদ্ধের মূলনীতিসমূহ প্রকাশিত হওয়া এবং একে আইনি রীতি নীতির স্তরে উন্নীত করার ব্যাপারে দ্বীনী ও অন্যান্য শিক্ষার প্রভাব সুস্পষ্ট। সেগুলো হলো তিনটি, ক. অত্যাবশ্যকীয় কারণ খ. ঘোড়দৌড় সংক্রান্ত কারণ ও গ. মানবিক কারণ।

## ইসলামে যুদ্ধকে বিধিসম্মত করার অবস্থা তিনটি।[৪২]

এগুলো নিম্নরূপ:

**প্রথম:** মুসলিমদের উপর এককভাবে অথবা দলগতভাবে এবং ইসলামের দিকে আহ্বানকারীগণের উপর আক্রমণ করা অবস্থায়, অথবা দীনের ক্ষেত্রে ফিতনা প্রতিরোধের জন্য (মুসলিমদের দ্বীন ত্যাগের প্রবণতা রোধে), অথবা বাস্তবিকই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া অবস্থায় যুদ্ধ করা বৈধ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾

"যারা আক্রান্ত হয়েছে কেবল তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।"[৪৩] মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾

'আর তোমরা তাদেরকে (মক্কার মুশরিকদেরকে) যেখানে পাবে হত্যা করবে এবং যে স্থান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে, তোমরাও সে স্থান থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করবে। আর ফিতনা (সন্ত্রাস) হত্যার চেয়েও গুরুতর।'[৪৪]

---

[৪২] *আছারুল হারব ফীল ফিকহিল ইসলামী*, পৃ. ৯৩-৯৪।

[৪৩] সূরাহ্ আল-হাজ্জ: ৩৯।

[৪৪] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: **১৯১**। আয়াটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা এ গ্রন্থের ৩২৩ পৃষ্ঠায় **১৮** নং ফুটনোটে সংযোজিত হয়েছে।

**দ্বিতীয়তঃ** নির্যাতিত ব্যক্তিকে সাহায্য করার প্রয়োজনে বিধি সম্মত পন্থায় যুদ্ধ করা অনুমোদিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴾

'আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা যুদ্ধ করবে না আল্লাহর পথে? অসহায় নর-নারী এবং শিশুদের জন্য, যারা বলে, 'হে আমাদের রব! এ জনপদের অধিবাসীরা তো জালিম, এ জনপদ থেকে আমাদেরকে বের করে নিন। আর আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কাউকে অভিভাবক করুন এবং আপনার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের সাহায্যকারী বানিয়ে দিন।'[৪৫]

**তৃতীয়তঃ** আত্মরক্ষা এবং দেশের উপর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য যুদ্ধ করা অনুমোদিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ﴾

'আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, কিন্তু সীমালজ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমা লজ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।'[৪৬]

আল-কুরআনের কিছু কিছু আয়াতে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে শুধু যুদ্ধ চলা অবস্থায়, যুদ্ধের সূচনা করার জন্য নয়। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করাটা একটি জরুরি বিষয়, যাতে শত্রুপক্ষ মুসলিমদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতে সাহস না পায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾

"তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য সাধ্যমত শক্তি প্রস্তুত রাখ"।[৪৭]

ইমাম ইব্‌নু তাইমিয়্যা (রহ.) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন-চরিত থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, তিনি কাফিরদের মধ্য থেকে যার সাথে সন্ধিচুক্তি করতেন, তার সাথে তিনি যুদ্ধ করতেন না। সুতরাং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাফিরদের কারোর সাথে আগ বাড়িয়ে যুদ্ধের সূচনা করেন নি। মহান আল্লাহ যদি তাঁকে প্রতিটি কাফিরকে

---

৪৫ সূরাহ্ আন-নিসা: ৭৫।

৪৬ সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯০।

৪৭ সূরাহ্ আল-আনফাল: ৬০।

হত্যা করার নির্দেশ দিতেন, তাহলে তিনি তাদেরকে হত্যা এবং তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করতেন।'[৪৮]

সারকথা হলো, ইসলামে শরী'আত সম্মত যুদ্ধ মানেই হলো ন্যায়ভিত্তিক যুদ্ধ; আর যুদ্ধ হতে হবে সে ব্যক্তির সাথে যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এটি ইব্‌ন তাইমিয়্যা (রহ.) প্রমুখের মত আলিমগণ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন।

যুদ্ধবন্দীদের সাথে ইসলাম কোমল আচরণের নির্দেশ দিয়েছে। যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীতে পরিলক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন استوصوا بالأسارى خيرا "যুদ্ধবন্দিদের প্রতি ভাল আচরণ করার ব্যাপারে আমার অসিয়ত গ্রহণ কর"।[৪৯] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾

"আর তারা আল্লাহর ভালবাসায় সাথে অভাবগ্রস্থ, ইয়াতীম ও বন্দিকে খাবার প্রদান করে।"[৫০] অধিকাংশ ক্ষেত্রে বন্দিদের শেষ পরিণতি হয়, তাদেরকে সাধারণভাবে মুক্তি দেয়া অর্থাৎ কোনো প্রকার বিনিময় ছাড়াই তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা। আর না হয় মুক্তিপণ আদায় করার মাধ্যমে মুক্তি প্রদান করা অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে অথবা যুদ্ধবন্দির বিনিময়ে যুদ্ধবন্দিদের বিনিময় করা। যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে অসুস্থ ও আহতদেরকে চিকিৎসা সেবাদানের মাধ্যমে এবং নিহত ব্যক্তিদের সম্মান রক্ষার জন্য তাদেরকে দাফন করার মাধ্যমে দেখাশুনা করা অপরিহার্য।

## গ. ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধের কারণ

ধর্মের ক্ষেত্রে ভিন্নতা অথবা অমুসলিমদের উপর ইসলামী বিশ্বাস বাধ্যতামূলক করে দেয়ার চেষ্টা করা অথবা বর্ণবাদী বা শ্রেণিগত বা জাতিগত প্রভাব প্রতিষ্ঠা কিংবা বস্তুগত বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধের কারণ নয়। 'উমার ইব্‌ন 'আবদিল 'আযীয (রহ.) তাঁর এক গভর্নর, যিনি ইসলামের কারণে বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স তথা জাতীয় রাজস্ব ঘাটতির অভিযোগ করেছিলেন তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق هاديا، و لم يبعثه جابيا

[৪৮] ইবনু তাইমিয়া, *রিসালাতুল ক্বিতাল*, পৃ. ১২৫।

[৪৯] তাবারানী আবূ 'আযীয আল'-জুমাহী থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হাসান।

[৫০] সূরাহ্ আদ-দাহর: ৮।

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সত্যসহকারে পথ-প্রদর্শক হিসেবে প্রেরণ করেছেন, তিনি তাঁকে কর আদায়কারী হিসেবে প্রেরণ করেননি।'

অধিকাংশ মুসলিম ফকীহ্‌র মতে যুদ্ধের কারণ হলো, পরস্পরের মারামারি অথবা যুদ্ধবিগ্রহ অথবা সীমালঙ্ঘন বা আক্রমণ। সুতরাং কোনো মানুষকে শুধু ইসলামের বিরোধিতার কারণে তাকে হত্যা করা যাবে না; বরং তাকে হত্যা করা হবে তার আক্রমণ বা সীমালঙ্ঘনকে প্রতিরোধ করার জন্য। এর প্রমাণ হলো, ইসলামে বেসামরিক লোক অথবা যোদ্ধা নন এমন ব্যক্তিদেরকে হত্যা করা এবং তাদের উপর আক্রমণ করা বৈধ নয়, কারণ তারাতো শান্তি প্রিয় অযোদ্ধা। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী, শিশু ও সাধু-সন্ন্যাসীদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। এছাড়া অমুসলিমরা যখন চুক্তি অথবা শান্তি ও সন্ধির অঙ্গীকার সম্পাদন করতে চাইবে তখন তাদের আবেদনের প্রতি যথাযথ সাড়া দেয়াই-হবে ইসলাম সম্মত। এক্ষেত্রে তাদেরকে অন্য কিছুতে বাধ্য করা কিংবা জোর করা যাবে না এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾

"আর তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে আপনিও সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়বেন।"[৫১] মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾

"আর কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে তাকে বলো না, 'তুমি মু'মিন নও'।"[৫২]

ইতোপূর্বে যুদ্ধ করে না এমন কাউকে হত্যা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপদেশসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরেকটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হলো নিম্নরূপ:

انطلقوا باسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا، ولاصغيرا، ولا امرأة، ولاتغلوا، وضموا غنائمكم، وأحسنوا ان الله يحب المحسنين.

'তোমরা আল্লাহর নামে বের হও, আর আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, তোমরা অতি বৃদ্ধ মানুষকে হত্যা করো না, আর হত্যা করো না শিশু, কিশোর ও নারীদেরকে, খিয়ানত করো না, তোমাদের গনীমতের মালসমূহ একত্রিত কর, আর তোমরা সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন।'[৫৩]

---

[৫১] সূরাহ্ আল-আনফাল: ৬১।

[৫২] সূরাহ্ আন-নিসা: ৯৪।

[৫৩] ইমাম বায়হাকী, আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়্যা (রহ.) বলেন, 'সুতরাং মুসলিমদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ করার বৈধতা নির্ভর করে অন্যদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ শুরু করার উপর।' তাঁর ছাত্র ইব্‌ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা (রহ.) বলেন, 'মুসলিমদের উপর যুদ্ধ করা ফরয এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়।'

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ﴾

'আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।'[৫৪]

## ঘ. ফিক্‌হ শাস্ত্রে গোটা বিশ্বকে দু'টি বা তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করার তাৎপর্য

মুসলিম ফকীহ্‌গণ সমগ্র বিশ্বকে দু'টি অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন, এক. *দারুল ইসলাম* দুই. *দারুল হারব*। কিছুসংখ্যক ফকীহ্‌র মতানুসারে পৃথিবীকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে উপরিউক্ত দুটির সাথে অপরটি হলো '*দারুল 'আহদ*'।[৫৫]

**'দারুল ইসলাম':** এমন দেশকে *দারুল ইসলাম* বলা হয় যেখানে ইসলামের ক্ষমতা বিদ্যমান এবং ইসলামের বিধি-বিধানসমূহ চালু থাকে এবং যেখানে মুসলিমদের বিশেষ নিদর্শসমূহও প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এর অধিবাসীরা হলো মুসলিম ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ (কাফির) জন গোষ্ঠী।

**দারুল হারব:** আর '*দারুল হারব*' হলো ঐসব অঞ্চল বা দেশ, যার অবস্থান ইসলামী নেতৃত্বের আওতার বাইরে হওয়ার কারণে ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে তাতে ইসলামের অনুশাসনের প্রয়োগ নেই আর তাঁর অধিবাসীরা হলো সামরিক জনগোষ্ঠী।

**'দারুল 'আহদ':** '*দারুল 'আহাদ*' বলতে ঐ সব অঞ্চলকে বুঝায়, যার সাথে মুসলিমদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য বিষয়ক শান্তিচুক্তি বিদ্যমান আছে অথবা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তি বা দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধবিরতি বহাল রয়েছে। এর

---

[৫৪] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯০।

[৫৫] ইবনুল কায়্যিম, *যাদুল মা'আদ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮।

সাথে সংযুক্ত হবে নিরপেক্ষ জনগণ। ইসলামের ইতিহাসে হাবশা, নূবা ও সাইপ্রাসের অধিবাসীরা এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

এ বিভাজনের পেছনে কোনো নির্ভরযোগ্য শর‘ঈ বক্তব্য নেই; বরং এটি হলো মুসলিমদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের কারণে যা ঘটে থাকে তার একটি বিবরণ। এটি আকস্মিকভাবে সংঘটিত বাস্তব অবস্থা ও কাহিনীর বিবরণ। এটি হলো সম্পূর্ণভাবে তার অনুরূপ যা আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞগণ নির্ধারণ করেছেন। এটি দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বিদ্যমান অবস্থায় আন্তর্জাতিক পরিবারকে দুটি দলে বিভক্ত করার মতো। একটি হলো যুদ্ধরত ব্যক্তিদের দল যা যুদ্ধে লিপ্ত রাষ্ট্রকে শামিল করে। অপর দলটি হলো, বেসামরিক লোকজনের দল যারা নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছে এবং আন্তর্জাতিক বলয়ের অবশিষ্ট সকল সদস্য রাষ্ট্রকে অন্তর্ভুক্ত করে।

মোট কথা আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত ইসলামী আইন শাস্ত্র ইমাম শাফি‘ঈ (রহ.) -এর মতানুযায়ী গোটা দুনিয়াকে *একটি অঞ্চল*[৫৬] বলে আখ্যায়িত করেছে। সুতরাং যখন নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে এবং শান্তির স্থলে যুদ্ধ নেমে আসবে তখন দুনিয়াতে দুটি অঞ্চল দেখা যাবে, একটি হবে শান্তিপূর্ণ অঞ্চল, অপরটি হবে যুদ্ধ-সংঘাতপূর্ণ অঞ্চল।

কিছুসংখ্যক প্রাচ্যবিদের উল্লিখিত বক্তব্য *দারুল হারব* স্থায়ীভাবে *দারুল ইসলামের* সাথে শত্রুতাপূর্ণ অবস্থানে থাকবে তা সঠিক নয়। কারণ শত্রুতা একটি অস্থায়ী জিনিস এবং তা যুদ্ধাঞ্চলসমূহ অথবা সশস্ত্র যুদ্ধের সাথে সীমাবদ্ধ।

[৫৬] আদ-দাবূসী, *তা'সীসুন নাযার*, পৃ. ৫৮।

# ইসলামী শরী'আহ্ আইনের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন*

**ব্রিগেডিয়ার উসামা দামাজ****

## ১. ভূমিকা

অনেক সময় থেকে বিশেষ করে ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ এর ঘটনার পর কয়েকটি দেশে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সাথে ইসলামের কতটুকু সঙ্গতি রয়েছে তা নিয়ে অনেক *লেকচার, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম* অনুষ্ঠিত হয়েছে। এজন্য আমি এ বিষয় সম্পর্কে কিছু সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। যাতে এ বিষয়ে প্রচলিত ভুল ধারণার অপনোদন ঘটে।

প্রথমে আমি এদিকে ইঙ্গিত দেয়া জরুরী মনে করছি যে, আমার বক্তব্য '*ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইন*' শিরোনাম দেয়ার মাধ্যমে এটি মনে হতে পারে যে, ইসলাম ও মানবিক আইনের মধ্যে মৌলিক কোনো সমস্যা পরিদৃষ্ট হলে তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা এবং এর নিরসন করাই আমার উদ্দেশ্য। অথবা এটিও মনে হতে পারে যে, উক্ত শিরোনামের মাধ্যমে আমি এটি সাব্যস্ত করতে চলেছি যে, আসমানী শরী'আতগুলোর মধ্যে কেবল ইসলামের সাথেই আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সমস্যা রয়েছে, আসলে এ দুটোর কোনোটিই আমার উদ্দেশ্য নয়। যারা এটি মনে করেন তাদের ভাল করে জানা উচিত যে, এটি বাস্তবতার বিপরীত। এখানে যদি কোনো সমস্যা থেকেই থাকে তবে তা ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং তা কিছু বিচ্ছিন্ন মুসলিম গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত। আর তাও এমন পর্যায়ের যেমনটি অন্যান্য অমুসলিম জঙ্গী গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে। অথবা এমন কোনো রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত যারা ইন্টারন্যাশনাল কিংবা নন ইন্টারন্যাশনাল সশস্ত্র সংঘর্ষের সময়ে মানবিক আইনের বিধিবিধান মেনে চলে না।

---

* ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির সহযোগিতায় ইয়ামানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সেনা প্রশিক্ষণ কোর্সের ডেলিগেটদের উদ্দেশ্যে লেখক নিবন্ধটি পাঠ করেন।

** বিগ্রেডিয়ার উসামা দামাজ: লেবাননের অবসর প্রাপ্ত সেনাপ্রধান। বর্তমানে তিনি ইতালীর সানরেমতে Institute of International Humanitarian Law (IIHL) এ কর্মরত। এ ছাড়া তিনি লেবাননের আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির FAS-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বিষয়েও পাঠদান করেন। তিনি আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির সামরিক শক্তি ও নিরাপত্তা কমিটির আঞ্চলিক প্রধান।

এ বাস্তবতার নিরিখে যখন আমরা এ বিষয়ে সশস্ত্র বাহিনী অথবা অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে পরিচালিত কোনো বিশেষ ট্রেনিং কোর্সে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বিষয়ে কথা বলব তখন আমরা '*আসমানী শরী'আতে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের উৎস*' এ শিরোনামের অধীনে বক্তব্য রাখব। তবে যেহেতু আমরা এখন ইসলামী সমাজ নিয়ে আলোচনা করছি সেহেতু আমরা (সেটি সম্পর্কে) ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেই কথা বলব। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্মরণ রাখতে হবে:

১. এ বিষয় নিয়ে যখন আমরা ইসলামের কথা বলব তখন অবশ্যই আমাদের এটি উদ্দেশ্য হবে না যে, আমরা ইসলামের ব্যাখ্যা করছি অথবা *ফাত্ওয়া* দেয়ার দাবি রাখছি।

২. আল্লাহ না করুক, মূল্যায়ন এবং গুরুত্বের দিক দিয়ে আমরা কোনো আসমানী শরী'আত এবং মানব রচিত কোনো আইনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করার চেষ্টা করব না।

৩. ইসলামের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রোপাগান্ডা মোকাবিলায় ইসলামের পক্ষ থেকে প্রতিরোধের কোনো চেষ্টা করছি না; এসব প্রোপাগান্ডা অধিকাংশই প্রকাশ্য ঘোষিত মানবিক উদ্দেশ্যকে লঙ্ঘন করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জনকে অভীষ্ট লক্ষ্য বানিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের একজন মহান আল্লাহ আছেন, যিনি এ দ্বীন ইসলামকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট।

৪. যখন আমরা সশস্ত্র সংঘর্ষ চলাকালীন সময়ে আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং এর মৌলনীতির অনুসরণের আহ্বান করব, তখন এ চুক্তিগুলো কেবল ইসলামী শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে এ জন্যে নয়; বরং রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ থেকে এ চুক্তিগুলোতে সম্মতি দেয়ার মাধ্যমে শুধু সশস্ত্র বাহিনীই নয় রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে তা অনুসরণ করা আবশ্যক করে দিয়েছে। তবে এদিকে ইঙ্গিত করাও জরুরী যে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের কিছু মূলনীতি প্রচলিত আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সুতরাং তা সশস্ত্র সংঘর্ষে অংশগ্রহণকারী সকল দলের মান্য করা অপরিহার্য হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সংঘর্ষে লিপ্ত গোষ্ঠীগুলো (চুক্তিতে সম্মতি প্রদানকারী) সেসব রাষ্ট্রের সাথে কতটুকু সম্পর্ক রাখে তা দেখার প্রয়োজন নেই। আর এ জন্যই উক্ত বিষয়গুলো পেশ করার মাধ্যমে কেবল এটিই প্রকাশ করতে চাই যে, মানব রচিত আইনগুলো বিশেষতঃ সেসব আইন, যা মানবিক সম্মানের সাথে সম্পৃক্ত, যেমন আন্তর্জাতিক মানবিক আইন কীভাবে আসমানী শিক্ষার সাথে মিলে যায় এবং তা কার্যত: সেসব আসমানী শিক্ষারই বাস্তব রূপায়ণ বলা

যায়। তবে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, মুসলিমরা তাদের দাওয়াতের সূচনালগ্ন থেকে যুদ্ধের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। কারণ ইসলাম তাদের জন্য যুদ্ধের যাবতীয় মূলনীতি আল-কুরআনুল কারীম, হাদীসে নববী ও খুলাফায়ে রাশেদীনের নির্দেশনার আলোকে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে প্রণয়ন করে দিয়েছে।

## ২. আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বিষয়ে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা

ইসলামী শরী'আহ্র আলোকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে আমরা নিম্নে এ আইন সম্পর্কে সামরিক ও বেসামরিক উভয় সমাজে প্রচলিত সাধারণ কিছু ভ্রান্তির অপনোদন প্রয়োজন মনে করছি :

১. এ আইন কী গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং ইপ্সিত বিজয় অর্জনের প্রতিবন্ধক?

বাস্তবে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এ ধারণার সম্পূর্ণ উল্টো। কেননা এ বিষয়ে প্রণীত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ উৎকৃষ্টমানের সামরিক অভিযানের অত্যাবশ্যকতার নীতিকে স্বীকৃতি দেয়। এমনকি যদিও তাদের কিছু কিছু কাজ সাধারণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু শর্ত হচ্ছে এ সব পদক্ষেপ যেন পার্শ্বস্থ ক্ষতির যথাসম্ভব কম অথবা সম্পূর্ণ পরিহার করে সম্পন্ন করা হয় সেদিকে দৃষ্টি দেয়া। সেসব পার্শ্বস্থ ক্ষতি যা আইন কেবল বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমোদন করে। আরো শর্ত হচ্ছে সামরিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সাথে সাথেই যেন যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। কারণ প্রয়োজনীয়তার নীতি এটিই অনুমোদন করে।

২. আন্তর্জাতিক মানবিক আইন কী কোনো বাইর থেকে চাপিয়ে দেয়া আইন? অর্থাৎ এমন কোনো আইন যা বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ থেকে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে?

এ প্রশ্নের উত্তরে দ্বিতীয়বার আমরা বলব, এটিও বাস্তবতার বিপরীত। যদি কোনো রাষ্ট্র এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এর প্রতি সমর্থন দেয় তাহলে এ চুক্তি সে রাষ্ট্রের দেশীয় আইনে পরিণত হয়ে যায়। এজন্য আন্তর্জাতিক মানবিক আইন সম্পর্কিত এ চুক্তি সবসময় এতে স্বাক্ষরিত পক্ষগুলোকে তাদের দেশীয় আইনে সংশ্লিষ্ট করতে আহ্বান জানায়, যাতে দেশের জনগণ এবং সশস্ত্র শক্তিগুলো মনে করে যে, তারা

দেশীয় অন্যান্য আইনের প্রতি যেমন শ্রদ্ধাশীল তেমনি এ (মানবিক) আইনের প্রতিও তারা শ্রদ্ধাশীল।

৩. এটি কী কোনো বৈদেশিক আইন, যা আমাদের রীতিনীতি, ধর্মীয়ও সামাজিক বিধি-বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক? নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে, কেননা ইসলামী শরী'আত মানবিক আইনের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

## ৩. ইসলামে মানবিক মর্যাদা

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের উৎসসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হয় যে, এ আইন শুধু মানুষকে সুরক্ষা ও মর্যাদাদানের জন্য নয়; বরং এটি আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে মানুষের অতীত ও মানবিক ঐতিহ্যেরও সুরক্ষা দেয়। এছাড়া এটি মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির সংরক্ষকও বটে। যেমনিভাবে আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য ক্ষতিকারক অস্ত্র ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ এবং পৃথিবীতে মানবিক জীবনের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ এ আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য। সুতরাং পৃথিবীতে এ আইন মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ করে। কেননা জেনেভা চুক্তি, এতে সংযুক্ত পরিশিষ্ট এবং এতদ্‌সম্পর্কিত চুক্তিগুলো এমন মৌলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যা আসমানী গ্রন্থসমূহ, সকল নবী ও রাসূলের মাধ্যমে মানব অন্তরে গ্রথিত করেছে। আর এ মৌলিক চেতনা হলো আল্লাহ্ তা'আলা নিজ দয়ায় আদম সন্তানকে সকল সৃষ্টির উপর মর্যাদা দিয়েছেন। আল-কুরআন মানবিক এ মর্যাদা ও মূল্যবোধকে স্পষ্ট ভাষায় বহু আয়াতে বর্ণনা করেছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা সূরাহ্ আত-তীনে দৃঢ় শপথ করার পর বলেছেন,

﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. وَطُورِ سِينِينَ. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾

'শপথ 'তীন' ও 'যায়তুন'-এর। শপথ 'সিনাই' পর্বতের এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর। আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে। অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি। কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ; তাদের জন্য তো আছে নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার। সুতরাং এরপর

কিসে তোমাকে কর্মফল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে? আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?'[১]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

"আমিতো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদেরকে চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম রিয্ক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"[২]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾

'আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদের অবয়ব দান করেছি এবং তৎপর ফিরিশতাদেরকে আদমকে সাজদাহ্ করতে বলেছিলাম; ইবলীস ব্যতীত সকলেই সাজদাহ্ করল, আর সে সাজদাহ্কারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।'[৩] সুতরাং আল-কুরআনের আলোকে মানবিক মর্যাদা ও মূল্যবোধ সকল অবস্থায় সম্মানযোগ্য।

এ কারণে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন সশস্ত্র সংঘর্ষ অথবা যুদ্ধে আক্রান্ত সকলের প্রতি সাহায্যের হাতকে সম্প্রসারিত করার জন্য আহ্বান করে। যাতে বিপন্ন মানবতা পক্ষপাতিত্বের নিষ্পেষণ থেকে রক্ষা পায়। কেননা এ আক্রান্ত মানুষগুলো যে-কোনো ধর্ম, বর্ণ ও গোষ্ঠীর হোক না কেন তাদের পরিচয় হলো তারা সর্বোপরি মানুষ। এটিই হলো মানবিকতার সাম্যবাদ। ইসলাম এ সাম্যবাদী চেতনাকে নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছে:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

---

[১] সূরাহ্ আত্-ত্বীন: ১-৮।

[২] সূরাহ্ ইসরা: ৭০।

[৩] সূরাহ্ আল-আ'রাফ: ১১।

'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সংঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন; আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা কর এবং সতর্ক থাক আত্মীয়তার-বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।'[৪]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিদায় হজ্জের শেষ ভাষণে বিশ্বসমাজকে জানিয়ে দেন,

يا أيها الناس إنما إلهكم إله واحد، كلكم لادم وآدم من تراب، وليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى.

'হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই তোমাদের রব (প্রভূ) একজন। তোমরা সকলেই আদম সন্তান। আর আদম (আ)-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং অনারবীয়ের উপর কোনো আরবীর এবং কোনো 'আরবীয় মানুষের উপর কোনো অনারবীয় মানুষের মর্যাদা নেই। অনুরূপভাবে শেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের এবং কৃষ্ণাঙ্গের উপর শেতাঙ্গের কোনো মর্যাদা নেই। কেবল তাকওয়া তথা আল্লাহ সচেতনতাই হবে এ মর্যাদার মানদণ্ড।'[৫]

পরিশেষে মানবিক সম্মান রক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামের সে সুমহান ঘটনাটি উল্লেখ করা আবশ্যক, যেখানে দেখা যায় যে, ইসলাম মানবিক সম্মান অক্ষুণ্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছে, যদিও তা তার বিপক্ষ দলের হয়। ঘটনাটি খলীফা 'উমার (রা) এর সাথে সম্পৃক্ত। তিনি মিশর বিজেতা সেনাপতি 'আমর ইবনুল 'আসের পুত্র মিশরের জনৈক অধিবাসীকে লাঞ্ছিত করলে 'আমর ইবনুল 'আসকে চিঠি লিখলেন,

متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً

'তোমরা কখন থেকে লোকদেরকে দাস বানিয়েছ? অথচ তাদের মা তাদেরকে স্বাধীনভাবে জন্ম দিয়েছেন।'[৬] ১৯৪৮ সালের মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক ঘোষণায় আমরা ইসলামের এ সুমহান নীতির প্রতিফলন দেখতে পাই।

---

৪ সূরাহ্ আন্-নিসা: ১।

৫ *মুসনাদু আহ্মাদ*, হাদীস নং ২২৯৭৮।

৬ *কানযুল 'উম্মাল*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৬৬০; *হায়াতুস্-সাহাবাহ্*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৮; *ফুতূহু মিসর ওয়া আখবারুহা*, পৃ. ২৯০।

## ৪. ইসলামে যুদ্ধনীতি

স্মর্তব্য যে, আমরা ইসলামে জিহাদের ধারণা এবং এর কারণের উপর কোনো গবেষণা করছি না, যে কারণগুলো মুসলিমদের অস্ত্রধারণ করাকে বৈধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। কেননা আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বিষয়ে আমাদের ভাল করে জানা আছে যে, এ আইন যে কোনো জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘর্ষ সংঘটিত হলে সেটিকে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংঘটিত করতে সাহায্য করে, অপরদিকে সংঘর্ষের কারণ সংক্রান্ত বিষয়াদি আন্তর্জাতিক সাধারণ আইনের ভিন্ন শাখা আইনের আওতাধীন, যা  যুদ্ধ ও শক্তি ব্যবহারের বৈধতার আইন হিসেবে পরিচিত।

### ক. যুদ্ধ চলাকালীন আচরণবিধি

এ বিষয়ে ইসলামের নীতি অনুধাবনের জন্য নিম্নোক্ত বক্তব্যের প্রতি ফিরে যেতে হবে। ইসলামের প্রথম খলীফা আবূ বাকর (রা) দশম হিজরীতে যুদ্ধ প্রাক্কালে মুসলিম সেনা প্রধানদের উদ্দেশ্যে যে বক্তৃতা দেন তা ইসলামের মৌলিক যুদ্ধনীতি হিসেবে নিরূপিত হয়। পরবর্তীকালে এ নীতি ইসলামী বিজয়সমূহে অনুসৃত হয়েছে। তিনি বলেন,

ولا تخونوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها فاذكروا اسم الله عليها.

'তোমরা খিয়ানত করবে না, গনীমতের মাল চুরি করবে না, লাশ বিকৃতি করবে না, ছোট শিশু, বৃদ্ধ বণিতা ও নারীদেরকে হত্যা করবে না, খেজুর গাছ কাটবে না, জ্বালাও-পোড়াও করবে না, ফলদার বৃক্ষ কাটবে না, গরু-ছাগল ও উটকে জবাই করবে না, তবে খাওয়ার প্রয়োজন হলে সেটি ভিন্ন কথা, তোমরা যদি চলার পথে এমন লোকদেরকে দেখতে পাও যারা দুনিয়াবী জীবন পরিত্যাগ করে আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছে তাদেরকে হত্যা করবে না; বরং তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেবে। আর যখন তোমরা এমন কোনো সম্প্রদায়ের কাছে আসবে যারা তোমাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের খাবার নিয়ে এসেছে, তখন তোমরা যদি তা থেকে কিছু খেতে চাও তাহলে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে খাবে।'[৭]

---

[৭] ইবনু 'আসাকির, *তারীখু মাদীনাতি দিমাশক আল-কাবীর*, পূর্বোক্ত।

অনুরূপভাবে 'আলী (রা) সৈন্যদেরকে নির্দেশ দিতেন:

إن هزمتموهم، فلا تقتلوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل، ولا تهتكوا سترا ولا تدخلوا دار إلا بإذن ولا تأخذوا من أموالهم شيئًا ولا تعذبوا النساء بأذى وإن شتمنكم وشتمن أمراءكم واذكروا الله لعلكم ترحمون.

'যদি তোমরা কোনো শত্রুবাহিনীকে পরাজিত কর তাহলে তোমরা রণাঙ্গন থেকে পলায়নকারীকে হত্যা করবে না, আহত ব্যক্তিদের উপর আক্রমণ করবে না, কাউকে দিগম্বর করবে না, লাশের অসম্মান করবে না, বিনা অনুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশ করবে না, বিনা অনুমতিতে কারো সম্পদ থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করবে না, মহিলাদেরকে শাস্তি দেবে না, যদিও তারা তোমাদেরকে এবং তোমাদের শাসকদেরকে গালি দেয়, আর আল্লাহকে স্মরণ করবে, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।'[৮]

আর এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় স্বীয় সাহাবীদেরকে নারী, শিশু, বয়োবৃদ্ধ এবং খানকাহ্ বা আশ্রমে অবস্থানরত সন্যাসীদেরকে হত্যা না করার নির্দেশ দিতেন।

বলাবাহুল্য, আমাদের কেউ যদি আমাদের কারো নিকট থেকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মূলভিত্তিগুলোকে কোনো অর্থপূর্ণ বাক্যে সংক্ষিপ্ত ভাষায় জানতে চায় তাহলে ইতোপূর্বে বর্ণিত ইসলামের বিধিবদ্ধ যুদ্ধনীতি অপেক্ষা অধিকতর সুনিপুণ ভাষায় সুদৃঢ় বাক্যে বর্ণনা করা তার জন্য খুবই কঠিন হবে।

## খ. অন্যের ধর্মীয় বিশ্বাস ও উপাসনালয়ের প্রতি সম্মানবোধ

এ বিষয়ে ইসলাম বিভিন্ন উপলক্ষ্য ও অবস্থানে তার দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। এ স্থলে গুরুত্বপূর্ণ যা এসেছে তা নিম্নরূপ:

'উমার (রা) কর্তৃক আল-কুদ্সবাসীদের জন্য সম্পাদিত চুক্তিপত্রের যে ভাষ্য ইমাম তাবারী তাঁর '*তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূক*' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন তা হলো এই যে, 'তিনি তাদেরকে তাদের জান-মাল, গীর্জা ও ক্রুশের নিরাপত্তা প্রদান করেন। অনুরূপভাবে তাদের অপরাধী, নিরপরাধ ও তাদের ধর্মীয়গোষ্ঠীদের জন্যও তিনি নিরাপত্তা প্রদান করেন। তিনি এটিরও নিশ্চয়তা দেন যে, তাদের গীর্জায় বাস করা হবে না, ধ্বংস সাধন করা হবে না, তা থেকে কমাতে বলা হবে না, এর পরিমাণও হ্রাস করা হবে না, তাদের ক্রুশ থেকেও

[৮] *শারহু নাহজিল বালাগাহ্* থেকে সংগৃহীত।

নয়, অনুরূপভাবে তাদের সামান্যতম সম্পদও লুণ্ঠন করবে না, তাদেরকে ধর্মান্তরিত করতে বাধ্য করা হবে না এবং তাদের কারোও সামান্যতম অনিষ্ট বা ক্ষতি সাধন করা হবে না।'[৯]

## গ. আধুনিক যুদ্ধ আইনের ভিত্তির প্রতি সম্মান

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন যে সমস্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলোর মধ্য থেকে বিশেষভাবে সামরিক ও বেসামরিক লোকদের মধ্যে পৃথকীকরণ, সামরিক অত্যাবশ্যকতা ও সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয়গুলো আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করব।

সূরাহ্ বাকারায় যা বর্ণিত হয়েছে আমরা যদি সে সব নির্দেশনার দিকে ফিরে তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে, অস্ত্র ধারণের জন্য আহ্বানকৃত প্রতিটি মুসলিমের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা অস্ত্র ধারণ সংক্রান্ত সুস্পষ্ট বাস্তব বিধান বর্ণনা করেছেন। যদিও আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমাদের নিকট যুদ্ধ মূলতঃ অপছন্দনীয় বিষয়[১০]। সেসব বাস্তব বিধান হচ্ছে,

ফিকহের নীতি *অত্যাবশ্যকতা নিষিদ্ধ বস্তুকে বৈধ করে* এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের নীতি *সামরিক অত্যাবশ্যকতা* এখানে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে; যখন ইসলাম পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পবিত্র স্থানে প্রয়োজন সাপেক্ষে যুদ্ধ করার ও বৈধতা দিয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾

'মাসজিদুল হারামের নিকট তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না যে পর্যন্ত তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে, এটিই কাফিরদের পরিণাম।'[১১]

---

[৯] 'আরবী ভাষ্য:

أعطاهم الأمان لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وشقيها وبريئها، وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم .

দ্র. মাহমূদ আল-বীসূনী, *আল-ওসাইক আদ্-দাওলিয়াহ্ আল-মা'নিয়াহ্ বি-হুকুমি ইনসান*, ২য় খণ্ড (কায়রো: দারুশ্-শুরূক, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১১২; ইবনুল কাইয়্যিম, *আহ্কামু আহলে যিম্মা*, পৃ. ২৫৩।

[১০] মূল আয়াতটি এই,

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

দ্র. সূরাহ্ আল-বাকারাহ্ : ২১৬।

[১১] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯১।

খলীফা আবূ বাকরের (রা) নির্দেশনামায় *(সামরিক ও বেসামরিক লক্ষ্য) পৃথকীকরণ নীতির* অধীনে কিছু কিছু লোককে যুদ্ধ চলাকালীন সুরক্ষা দেয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে। অপরদিকে সূরাহ্ আল-বাকারায় আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সমস্ত লোকদেরকে চিহ্নিত করেছেন যাদেরকে যুদ্ধের ময়দানেও আসার আহ্বান করা যাবে । যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ্ সীমা লঙ্ঘন কারীদেরকে ভালবাসেন না।'[১২]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾

'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ ফিতনা (সন্ত্রাস) দূরীভুত না হয় এবং আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তারা বিরত হয় তবে জালিমদের ব্যতীত আর কাউকে আক্রমণ করা চলবে না। পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়ে। সমস্ত পবিত্র বিষয় যার অবমাননা নিষিদ্ধ তার জন্য কিসাস। সুতরাং যে কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করলে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে।[১৩]'

অপর একটি আয়াতে '*তানাসুব*' বা সামঞ্জস্যনীতি সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। এ নীতিটি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে সূরাহ্ আন-নাহলের ১২৬ নং আয়াতে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾

'আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে; তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তা-ই তো উত্তম।'[১৪]

---

[১২] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯০।

[১৩] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৯০, ১৯২, ১৯৩।

[১৪] সূরাহ্ আন্-নাহ্ল: ১২৬।

এ আয়াতের প্রেক্ষিতে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা এখন কী করব? হে আল্লাহ্র রাসূল! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমরা এখন ধৈর্য ধারণ করব।'[১৫]

### ঘ. যুদ্ধবন্দিদের সাথে আচরণ

উপরে বর্ণিত বিধানাবলী আমাদেরকে ইসলামের মূল চেতনার দিকে নিয়ে যায়, যা ক্ষমা, দয়াশীলতা ও বিপদে ধৈর্যধারণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলো এটিই সুস্পষ্ট করে যে, ক্ষমা বা উদারতাই হলো মূল আর বদলা নেয়া (قِصاص) বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা সূরাহ্ আন-নূরের ২২ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

'আর তারা যেন ক্ষমা করে এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[১৬]

এরূপভাবে সংক্ষেপে সূরাহ্ আসরে আখিরাতে নিয়ামত প্রাপ্ত হওয়া এবং মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির মাধ্যমে দুনিয়াতে সফলতা অর্জন করার জন্য মানবীয় আচরণ কীরূপ হওয়া উচিৎ তা বিধৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

'সময়ের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।'[১৭]

যখন আমি (প্রবন্ধকার) এ নীতিকে ইসলামী আইনে যুদ্ধবন্দিদের বিধি-বিধান বর্ণনার ভূমিকা হিসেবে উপস্থাপন করি তখন আমি আল-কুরআনের ঐ আয়াতগুলোর উপর নির্ভর করি যা মুসলিমদের জন্য পথ-নির্দেশক ও বিশুদ্ধ উৎস হিসেবে নিরূপিত হয়েছে। যদি এ আয়াতগুলোর এ নীতির সাথে ব্যহ্যিকভাবে মিল না পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে আমরা ঈমানী নীতির প্রতি ধাবিত হবো যাতে করে প্রকৃত ঈমানের রাস্তা সুস্পষ্ট হয়। যেমন মদ্যপানের বিধান প্রবর্তিত হওয়ার ব্যাপারে তিনটি স্তর পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমে

---

[১৫] *আল-মুসতাদরাক*, হাদীস নং ২০৭২৪; *মুসনাদু আহ্মাদ*, হাদীস নং ৩২৯৪।

[১৬] সূরাহ্ আন্-নূর: ২২।

[১৭] সূরাহ্ আল-আসর: ১-৩।

মদ্যপানের উপকারিতা এর অপকারিতার সাথে তুলনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে নামাযের সময় মদ্যপান করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং তৃতীয় পর্যায়ে চূড়ান্তভাবে মদ্যপানের প্রতি সরাসরি নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। আর এর উপরই *ইজমা'* সংঘটিত হয়েছে।

এরূপভাবে যুদ্ধবন্দি সম্পর্কিত আইন তিনটি অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রথম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এমর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দিলেন না কেন? দ্বিতীয় পর্যায়ে বিনিময় অথবা বিনিময় ব্যতিরেকে নি:শর্ত মুক্তি দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। (এখানে একথা উল্লেখ করা জরুরী যে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের ভিত্তির আলোকে বন্দিকারী রাষ্ট্রের অধিকার হলো, যে রাষ্ট্রের লোককে বন্দি করা হয়েছে সে রাষ্ট্রের কাছে বিনিময় চাইবে, যা বন্দিকালীন তার জীবন নির্বাহের জন্য ব্যয়িত হবে।) আর তৃতীয় পর্যায়ের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সরাসরি নির্দেশ হলো:

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾

'আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে এবং বলে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।'[১৮]

আয়াতটি ইসলামী আইনে বন্দিদের সাথে সদাচরণ, ত্যাগ এবং উদারতা প্রদর্শনের একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসও রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

'সুতরাং কারো অধীনে যদি তার ভাই এ ধরনের অবস্থায় পতিত হয়, তখন সে যেন নিজে যা খায় তাকে তা খাওয়ায়, নিজে যা পরে তাকে তা পরায়, আর তোমরা তাদের উপর কঠিন হয় এমন কোনো কষ্ট দিওনা, যদি কষ্ট দাও তাহলে তাদেরকে সাহায্য করবে'[১৯]

[১৮] সূরাহ্ আদ্-দাহ্‌র: ৮-৯।

[১৯] *জামি'উস্-সহীহ*, হাদীস নং ২৯, ২৩৫৯; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৩১৪০; *সুনানু আবী দাউদ*, হাদীস নং ৪৪৯১; *জামি'উত্-তিরমিযী*, হাদীস নং ১৮৬৮; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ২০৪৬১।

এসবের পরেও বন্দীর সম্মান ও জীবন রক্ষার ব্যাপারে আমাদের কোনো সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ আছে কী, যখন বন্দী আমাদের করায়ত্বে থাকবে? (বস্তুত: তখন বন্দীর উদাহরণ তো হবে সে মিসকীন, ইয়াতীমদের মতই, যাদেরকে সম্মান করতে আল্লাহ্ তাআলা বিভিন্ন স্থানে নির্দেশ দিয়েছেন।); বরং বন্দীর সম্মান ও জীবন রক্ষা করা এমন শর'ঈ দায়িত্বে পরিণত হয়েছে, যে বিষয়ে আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে, যেমনিভাবে অন্যান্য হারাম এবং গুণাহ্র ও আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজের জন্য আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

পরিশেষে, এ বিষয়ে উপর্যুক্ত আলোচনা করার পর আমরা এ কথা বলতে পারি কী, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন এবং মানবিক অধিকার আইন বাহির থেকে ইসলামে আমদানিকৃত ও অপরিচিত কোনো আইন? আমি বিশ্বাস করি যে, উপরের আলোচনা এটিই প্রকাশ করে যে, মুসলিমদের ঐতিহ্য এরূপ মূল্যবোধে পরিপূর্ণ। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, বিকৃত মিডিয়া চক্র কোনো কোনো সময় ইসলাম ও মুসলিমদেরকে তাদের ধর্মীয় মানবিক ঐতিহ্য থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এজন্য আমাদের দায়িত্বে বাকী থাকলো, আমাদের ঈমান, আত্ম-বিশ্বাস, জ্ঞান-প্রভা ও কার্যক্রম অটুট রেখে আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা মান্য করা এবং ঐ সমস্ত চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যা আমরা অন্যান্যদের সাথে সুসম্পর্ক বজায়ের জন্য মেনে নিয়েছি এবং স্বেচ্ছায় তা সত্যায়ন করেছি। এগুলোর মাধ্যমে (মুসলিম আকাশের) কালো মেঘকে দূরীভূত করতে হবে। আমরা শর'ঈভাবে ঐসব চুক্তি পূরণে বাধ্য যা আমাদের দ্বীনী বিধি-বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক ও বিরোধী নয়। এটিই হলো মহান আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি সাড়া দেয়া।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾

'আর বলো, তোমরা 'আমল কর। কারণ আল্লাহ্ তোমাদের 'আমল দেখবেন এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনগণও।'[২০]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[২০] সূরাহ্ আত্-তাওবা: ১০৫।

# অনুবাদ ও সম্পাদনা প্রসঙ্গে কিছু কথা

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন একটি আধুনিক প্রবচন। এটি এমন কিছু নীতিমালার সমষ্টি যার মূল উদ্দেশ্য হলো, যুদ্ধ বা সশস্ত্র সংঘাতের কারণে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ সীমিতকরণ এবং যুদ্ধে লিপ্ত ব্যক্তিদের অবাধ মারনাস্ত্র ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা আরোপসহ যুদ্ধাক্রান্তদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদান করা। এ আইনের মূল ধারাগুলো প্রণীত হয় ১৯৪৯ সালে অনুষ্ঠিত জেনেভা কনভেনশনে। এ আইন রচিত হওয়ার বহু বছর পূর্বে ইসলামে এ সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে যা *আস-সিয়ার* নামে খ্যাত। মুসলিম ফকীহ্গণ কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে এ আইন রচনা করেন। মোটকথা, ইসলামের এ মানবিক আইন আজকের বিশ্বে রচিত সকল মানবিক আইনের অগ্রদূত। আধুনিক বিশ্বে মুসলিম আইনবিদগণ আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও ইসলামে রচিত মানবিক আইন নিয়ে তুলনামূলক গবেষণার ধারা অব্যাহত রেখেছেন। পাঠক-পাঠিকাদের সমীপে উপস্থাপিত এ গ্রন্থ তাঁদের তুলনামূলক গবেষণারই ফসল। তাঁদের গবেষণায় এটিই প্রতিভাত হয়েছে যে, আজকে প্রচলিত এ মানবিক আইনের উপাত্ত ইসলামের *সিয়ার আইন* থেকে সংগৃহীত।

গ্রন্থটি কিছু প্রবন্ধমালার সমষ্টি। মিসরের বিখ্যাত আইনবিদ ড. 'আমের আয-যামালী বিশ্বের খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ ও আইনবিদদের প্রবন্ধসমগ্র একত্রিত করে مقالات فى القانون الدولى الإنسانى والإسلام শিরোনামে গ্রন্থটি সংকলন করেছেন। এতে উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলো আরবী ভাষায় রচিত।

ভাষান্তর বা অনুবাদ কর্ম আসলেই জটিল ও দুরূহ কাজ। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি ঢাকা, আরবী ভাষায় সংকলিত এ গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করার দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করে। গ্রন্থটি সম্পূর্ণ অনুবাদ করার দায়িত্ব নেয়াটা চরম দুঃসাহস দেখানো ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে গ্রন্থটির অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজ আজ শেষ হলো। উল্লেখ্য যে, এতে সংকলিত প্রবন্ধের সংখ্যা মোট ১৫টি। তন্মধ্যে ৩টি প্রবন্ধ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া-এর আল-ফিক্হ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া অনুবাদ করেন এবং ১টি প্রবন্ধ অনুবাদ করেন ড. আব্দুল জলীল, যা প্রফেসর ড. মো. শাহজাহান মন্ডল ও মোহাম্মাদ আনোয়ারুল ওহাব কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি ঢাকা *ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইন* শিরোনামে এক পুস্তিকা বের করে। পরবর্তীকালে উক্ত প্রবন্ধগুলো বক্ষমান

গ্রন্থের সাথে রেড ক্রস কর্তৃপক্ষ সংযোজন করে। অবশিষ্ট **১২**টি প্রবন্ধ আমি অনুবাদ করি এবং উক্ত চারটি প্রবন্ধসহ এগুলোর সম্পাদনা করি। সরাসরি মূল আরবী গ্রন্থ থেকে প্রবন্ধগুলো অনুবাদ করা হয়েছে। গ্রন্থটি সুখপাঠ্য করার লক্ষ্যে নিরেট আক্ষরিক অনুবাদ না করে আরবী ভাষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। এছাড়া প্রবন্ধগুলোতে ব্যবহৃত উৎসগুলো *ইননোট* থেকে *ফুটনোটে* নিয়ে আসা হয়েছে। বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে ব্যবহৃত উৎসগুলোর কোন রেফারেন্স ছিল না, *কুরআন, হাদীস, ইসলামী ফিক্হ ও ইতিহাস* গ্রন্থ থেকে সেগুলোর সূত্র *ফুটনোটে* যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া *ফুটনোটে* প্রত্যেক প্রবন্ধকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়া হয়েছে যাতে বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দ প্রবন্ধগুলো পাঠ ও মূল্যায়ন করার সাথে সাথে প্রবন্ধকার সম্পর্কেও সম্যক ধারণা লাভ করতে পারেন। উল্লেখ্য যে, এ গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত প্রবন্ধ সমূহের বিষয়বস্তু ও তথ্যের সকল দায়-দায়িত্ব প্রাবন্ধিকদের। এর কোন দায়-দায়িত্ব অনুবাদকের উপর বর্তাবেনা।

গ্রন্থটির অনুবাদ ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে দেশবরেণ্য আলিম এবং আরবিবিদদের সহযোগিতা ও পরামর্শ নেয়া হয়েছে। তারা আমাকে তাদের সুচিন্তিত পরামর্শ ও সহযোগিতা করে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাদের এ সহযোগিতা স্মৃতির মুকুরে চির অম্লান হয়ে থাকবে। সবশেষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় 'উলামায়ে কিরাম ও সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট আমার সনির্বন্ধ নিবেদন এই যে, এ গ্রন্থের কোথাও কোন ভুল-ত্রুটি, তথ্য বিভ্রাট বা অসামঞ্জস্য কোন বক্তব্য আপনাদের নযরে পড়লে তা আপনারা মেহেরবানি করে কর্তৃপক্ষকে জানাবেন এবং পরামর্শ দেবেন। আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে এবং সে অনুযায়ী পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। এ আশাবাদ ব্যক্ত করে এখানেই শেষ করছি।

তাং- ০১-০৮-২০১৬ ইং

**ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন**
প্রফেসর ও সভাপতি
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

مقالات فى

# الاسلام

# و القانون الدولى الإنسانى

جمعها و رتبها و راجعها

**د. عامر الزمالى**

الترجمة والتحرير

**الدكتور محمد بلال حسين**

الأستاذ والرئيس

قسم الدراسات الإسلامية

جامعة راجشاهى، بنغلاديش

University of Rajshahi

ICRC

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دكا